তফসীরে নূরুল কোরআন

দশম পারা

১০

মওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম (র)

দশম খণ্ড

اقرأ باسم ربك الذي خلق

তফসীরে নূরুল কোরআন

দশম পারা

১০

দশম খন্ড

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক, মাসিক আল-বালাগ,
তফসীরকার রেডিও বাংলাদেশ, প্রাক্তন সদস্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন
বোর্ড অফ গভর্নরস, মরহুম ইমাম ও খতীব লালবাগ শাহী মসজিদ
এবং বহু দ্বীনি গ্রন্থ প্রণেতা

হযরত মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রঃ)

আল-বালাগ পাবলিকেশন্স
ঢাকা

প্রকাশক ঃ মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান

চতুর্থ প্রকাশ ঃ জুলাই ২০১৩ইং

গ্রন্থ সত্ত্ব ঃ প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

হাদীয়া ঃ ৩৫০.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণে ঃ নিউ এস. আর প্রিন্টিং প্রেস
বাংলাবাজার, ঢাকা

অক্ষর বিন্যাস ঃ মোঃ হারুন-অর-রশীদ

প্রাপ্তিস্থান ঃ

আল-বালাগ কার্যালয়
১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড
মোহাম্মদপুর, ব্লক-এ, ঢাকা-১২০৭

এমদাদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা

গাওসিয়া পাবলিকেশন্স
১১, বাংলাবাজার (ইসলামী টাওয়ার)
ঢাকা-১০০০

আন্-নূর পাবলিকেশন্স
৫২, বাংলাবাজার
ঢাকা-১০০০

মোবাইল ঃ ০১৭১৩-০১৪৮৮৯, ৭১৭৩৭২১

Tafsir-e-Nurul Quran (10); Published by Al-Balag Publications 12/17, Sir Sayed ahmed Road, Mohammadpur, Block-A, Dhaka-1207
Price : 350.00. ISBN-978-33-3154-0

ভূমিকা

আল্লাহ পাকের মহান দরবারে অনন্ত অসীম শোকর যে, তিনি তফসীরে নূরুল কোরআনের দশম খন্ড পেশ করার তওফিক দান করেছেন। এজন্য সারা জীবন আল্লাহ পাকের পবিত্র দরবারে সেজদায়ে শোকরানা আদায় করতে থাকলেও শোকরগুজারীর হক্ব আদায় হবে না।

حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

"হক্ব কথা হলো এই-আল্লাহর শোকরের হক্ব আদায় করা বন্দার পক্ষে সম্ভবই নয়।"

অগনিত দরূদ ও সালাম প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি, যিনি নবুওয়তের আকাশের উজ্জ্বলতর সূর্য, যিনি নবীগণের মধ্যে সর্বাধিক গৌরবের অধিকারী, যাঁর নূর অধিকতর চমক প্রদ এবং সমুজ্জল, যিনি চরিত্র মাধুর্যের দিক থেকে পবিত্রতম, যিনি মর্তবার দিক থেকে শ্রেষ্ঠতম, যাঁর নেক নজরের বরকতে তফসীরে নূরুল কোরআনের রচনা ও প্রকাশনার তওফিক পেয়েছি।

হে আল্লাহ! তাঁর প্রতি রহমত নাজিল কর এবং তাঁর আল-আওলাদের প্রতি, যত বস্তু সমুহের উপর রাতের আঁধার ও দিনের আলো পড়ে সেগুলোর সংখ্যা অনুসারে।

পবিত্র কোরআন স্বয়ং আল্লাহ তাআলার পাক কালাম। মানবতার উৎকর্ষ সাধনের এবং বিশ্বমানবের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যেই এ মহান গ্রন্থ বিশ্বনবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। পবিত্র কোরআন হলো শেফা ও রহমত। পবিত্র কোরআনের ভাষায়-

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

(সূরায়ে বণী ইসরাইল)

"আমি অবতীর্ণ করি কোরআন যা মোমেনদের জন্য (শেফা) আরোগ্য ও রহমত।"

পবিত্র কোরআন হলো মোমেনদের জন্য হেদায়েত ও রহমত। এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّهٗ لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

(সূরায়ে নামল)

নিশ্চয়ই এ কোরআন মোমেনদের জন্য হেদায়েত এবং রহমত।

আরো এরশাদ হয়েছেঃ

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

(সূরা বাকারাহ)

যারা আল্লাহ পাককে ভয় করে তাদের জন্য পবিত্র কোরআন হলো পথ প্রদর্শক।

আর পবিত্র কোরআন শুধু যে মোমেন এবং মুত্তাকিনদের জন্যই হেদায়েত এবং রহমত তাই নয়;বরং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য হলো নসিহত। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ

(সূরা ইউসুফ)

"আর কোরআন তো শুধু নসিহত সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে"

অতএব, সমস্ত বিশ্ববাসীর কর্তব্য হলো পবিত্র কোরআনের মর্মবাণী উপলব্ধি করা এবং তার বিধি-নিষেধের বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করা। এতেই রয়েছে সমগ্র মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ।

মুসলিম জাতি যতদিন এ কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করেছে তথা পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার বাস্তবায়ন করেছে ততদিন বিশ্বের নেতৃত্ব মুসলিম জাতির হাতেই ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যেদিন থেকে মুসলিম জাতি এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছে তথা পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা থেকে দূরে সরে পড়েছে সেদিন থেকেই এ জাতির অবনতি শুরু হয়েছে। কথাটি অপ্রিয় হলেও সত্য, এ জন্যই মর্মী কবি বলেছেনঃ

وہ زمانے میں معزز تھے مسلماں ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآں ہو کر

পূর্ব পুরুষগণ মুসলমান হিসেবে ছিলেন সম্মানিত, আর তোমরা পবিত্র কোরআনের শিক্ষাকে বাদ দিয়ে হয়েছ অপমানিত।”

পবিত্র কোরআন মুসলিম জাতিকে তার দায়িত্ব পালনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে এবং পৃথিবীতে মুসলিম জাতির আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ও তার উচ্চ মর্যাদার কথা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ

وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

হে মুসলিম জাতি! তোমরাই উত্তম জাতি, সমগ্র মানব জাতির উপকারার্থেই তোমাদের আবির্ভাব। তোমরা মানুষকে ভাল কাজের নির্দেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। আর আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আনয়ন করবে।

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

আর তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক থাকা দরকার যারা মানুষকে কল্যাণকর কাজের দিকে আহবান জানাবে, ভাল কাজের নির্দেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে (যারা এই দায়িত্ব পালন করবে) তারাই হবে সফলকাম।

মানব জাতির উন্নতির মূল ভিত্তি হলো বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাক ও বিশ্বনবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান। পক্ষান্তরে, মানবতার চরম অধঃপতন হলো পৌত্তলিকতা এবং নাস্তিকতা। এজন্যে পবিত্র কোরআনে তৌহিদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের প্রতি ঈমান আনয়নের এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর রেসালতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে এবং মানবতার উৎকর্ষ সাধনের পথের প্রধানতম অন্তরায় অংশীবাদ ও ভোগবাদকে পরিহার করার বিশেষ তাগিদ করে। এটিই পবিত্র কোরআনের মূল শিক্ষা। এতদ্ব্যতীত সমস্ত আসমানী কিতাব সমূহে রয়েছে এ সম্পর্কে বিশেষ তাগিদ এবং সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম তাঁদের উম্মতদেরকে ইসলামের মূল শিক্ষার দিকে আহবান করেছেন, পবিত্র কোরআন তাঁদের সে আহবানের ইতিহাস বিশ্ববাসীর সম্মুখে তুলে ধরেছে। হযরত নূহ (আঃ) ঘোষণা করেছিলেনঃ

وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

"আর আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হই।"

আর হযরত ইব্রহীম (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছেনঃ

فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

"অতএব, তোমরা প্রকৃত মুসলমান হওয়া ব্যতীত মৃত্যু বরণ করোনা।"

আর হযরত ইউসুফ (আঃ) দোয়া করেছিলেনঃ

تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

"হে আল্লাহ! মুসলমান অবস্থায় আমাকে মৃত্যু দিও, আর নেককারদের মধ্যে আমাকে অন্তর্ভূক্ত করো।"

এখানে এ কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, আল্লাহ পাক জীবন বিধান হিসাবে ইসলামকেই পছন্দ করেছেন। পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

"নিশ্চয় ইসলামই আল্লাহ পাকের নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবন বিধান।" আর এ জীবন বিধানের পরিপূর্ণতার কথাও পবিত্র কোরআনে এ ভাবে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ
وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

আজকের দিনে আমি পরিপূর্ণ করেছি তোমাদের জীবন বিধানকে এবং সম্পূর্ণ করেছি তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য জীবন বিধান রূপে পছন্দ করেছি।" শুধু যে ইসলাম আল্লাহ পাকের নিকট পছন্দনীয় এবং একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবন বিধান তাই নয়; বরং ইসলামের প্রাধান্য এবং বিজয়ও অবশ্যম্ভাবী।

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ
لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ

"তিনিই আল্লাহ পাক, যিনি তাঁর রসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়েত এবং সত্যদ্বীন নিয়ে যেন দ্বীন ইসলামকে অন্য সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন, আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ পাকই যথেষ্ট।

ইতিহাস সাক্ষী। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র ও বরকতময় যুগ থেকে শুরু করে খোলাফায়ে রাশেদ্বীনের সোনালী যুগ পর্যন্ত ইসলাম সারা বিশ্বে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। এমনকি এরপরও উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে ইসলামের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে। যখন ইসলাম স্পেনে পৌঁছেছিল, উপমহাদেশে এসেছিল, এক কথায় আলজেরিয়া থেকে সুদূর ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত ইসলাম তার স্থান করে নিয়েছিল, মানব মনে অভূতপূর্ব ইনকেলাব এনেছিল, বিশ্বের চেহরা বদলে দিয়ে বিশ্ববাসীকে বিস্ময়াবিভূত করেছিল, জুলুম অত্যাচার, অন্যায় অনাচার, অবিচার এবং ব্যাভিচার বিদায় করেছিল। উদারতা মহানুভবতা পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্বভাব মমত্ববোধ সৃষ্টি করেছিল, কায়েম করেছিল বিশ্ব শান্তি, আর তা সম্ভব হয়েছিল পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনিন্দ সুন্দর আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার কারণে।

পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার কারণে মুসলিম জাতি যে ঈমানী শক্তি লাভ করেছিল তার মোকাবেলা করা তদানিন্তন পৃথিবীর কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি। তাই ইয়ারমুকের রণাঙ্গনে ২ লক্ষ ৪০হাজার পারস্য সৈন্যক ৪০ হাজার মোমেনের হাতে পরাজিত হতে হয়েছে। কাদেসিয়ার রণাঙ্গনে মাত্র ৮ হাজার মুসলমানের নিকট ৬০ হাজার কাফেরকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে।

স্পেনের রাজা রডারিকের ১লক্ষ সৈন্যকে মুসলিম বীর তারেকের নেতৃত্বাধীন মাত্র ৭ হাজার মোমেনের হাতে ধরাশায়ী হতে হয়েছে, এমনিভাবে সিন্ধু রাজা দাহিরের ৬০ হাজার সৈন্যকে মোহাম্মদ বিন কাসেমের মাত্র ৫ হাজার মোমেনের হাতে নিশ্চিহ্ন হতে হয়েছে।

এসবই ছিল আল্লাহ পাকের রহমত, পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণের ফলশ্রুতি এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের অনুসরণের বরকত। ৭০০ বছর স্পেনে মুসলিম জাতি শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করে।

ای گلستان اندلس وہ دن یاد ھین تجہ کو=

تہا تیرے ڈالیون مین اشیان ھمارا

স্পেনের বাগান তোমার কি মনে আছে? আমাদের সেই হারানো দিনগুলোর কথা?

কিন্তু আজ সেই ঈমানী শক্তির অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

পবিত্র কোরআনের শিক্ষা ছিল পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকা।

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا

"এবং তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে একত্রিত হয়ে সুদৃঢ়ভাবে আকড়িয়ে ধর, আর পরস্পর বিভক্ত হয়োনা।" আরও এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ

আর তোমরা পরস্পর কলহ দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়োনা তাহলে তোমরা সাহসহারা হয়ে যাবে, তোমাদের দাপট কমে যাবে। কিন্তু মুসলিম জাতি কি কোরআনের এ নির্দেশ মেনে চলছে? বরং বর্তমান যুগে মুসলিম জাতি শুধু দ্বিধা বিভক্ত নয়; বরং , কলহদ্বন্দ্বে লিপ্ত, শুধু তাই নয়, বরং পরস্পর স্থান-কাল বিশেষে যুদ্ধরতও হয় এর পরিণাম ভয়াবহ।

এমনিভবে পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার বাস্তবায়ন পরিপূর্ণভাবে জীবনের কোন্ ক্ষেত্রে হচ্ছে তা হয়ত অনুসন্ধান করেও পাওয়া যাবেনা। কী ব্যক্তিগত জীবনে, কী সমাজ জীবনে কী জাতীয় জীবনে বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার বাস্তবায়ন কোথায়? এমনকি পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনীয়তাও *কোন কোন* মুসলিম অনুভব করেনা।

বস্তুতঃ পৃথিবীতে সব কিছুরই সীমা আছে। কিন্তু আমাদের গাফলতির কোন সীমা নেই, আমরা সকলেই গাফলতের আবর্তে নিপতীত।

وائے ناکامی متاع کاروان جاتا رہا=

کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا

হায় আক্ষেপ! কাফেলার সকল সম্পদ লুণ্ঠিত, এমনকি কাফেলার সদস্যগণ তাদের ক্ষতির অনুভূতি থেকেও বঞ্চিত। পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার বাস্তবায়ন তো দূরের কথা পবিত্র কোরআনকে শুদ্ধ করে পাঠ করার প্রয়াসও আজ অনুপস্থিত। এই দূরাবস্থার অবশ্যম্ভাবী পরিনতি আমাদের সম্মুখেই উপস্থিত।

পূর্বে যাদের উপর মুসলমানদের কর্তৃত্ব ছিল, আজ তারাই মুসলমানদের উপর কর্তৃত্ব করতে আসে।

مین تجھ کو بتاتا ہون تقدیر امم کیا ہے =

شمشیر و سنان اول طاوس ورباب اخر

"আমি কি বলব তোমায় জাতি গুলোর উত্থান পতনের ইতিহাস?"

উত্থান কালে তাদের হাতে থাকে তরবারী, আর বর্ষা, পতন কালে তাদের হাতে দেখা যায় হারমোনিয়াম আর তানবুরা।

তবে নিরাশ হওয়া উচিত হবে না। পবিত্র কোরআনে এ সম্পর্কে পথ-নির্দেশ করেছেঃ

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ

"তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।"

বস্তুতঃ প্রকৃত মোমেন কোন দিনও আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়না।

তত্ত্বজ্ঞানী মর্মী কবি তাই বলেছেনঃ

جہان مین اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہین

اِدھر نکلے اُدھر ڈوبے اُدھر نکلے اِدھر ڈوبے

"পৃথিবীতে মুসলিম জাতি সূর্যের ন্যায় বেঁচে থাকে। সূর্য একদিকে উদিত হয় আর অন্য দিকে অস্তমিত হয়। এরপর পুনরায় সে অন্য দিক থেকে উদিত হয়, মুসলিম জাতির অবস্থাও অনুরূপ। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

(সূরা আল-এমরান)

আর তোমরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়োনা, চিন্তিতও হয়োনা, অবশেষে তোমরাই হবে বিজয়ী, যদি প্রকৃত মোমেন হও।

এ আয়াতে মুসলিম জাতির বিজয়ের তথা হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে একটি শর্তে আর তা হল, প্রকৃত মোমেন হওয়া। এজন্য প্রয়োজন হল পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার ব্যাপক প্রচার প্রসারে আত্মনিয়োগ করা এটি নিঃসন্দেহে মুসলিম জাতির পবিত্র কর্তব্য।

বাংলাভাষী মুসলিম সমাজের পক্ষে এই কর্তব্য পালনে সাহায্য করার জন্যে পবিত্র কোরআনের মর্মবাণীকে বাংলা ভাষায় পেশ করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ প্রয়োজনের আয়োজনে শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই শুরু হয়েছিল একদিন তফসীরে নুরুল কোরআনের এ সাধনা। তাই আজ এ মহান গ্রন্থের দশম খন্ড প্রকাশনার শুভ লগ্নে আদায় করি দরবারে এলাহীতে সেজদায়ে শোকরানা। হে আল্লাহ! কবুল কর আমাদের তরফ থেকে এই সাধনা, তোমার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উসিলায়, তাঁর সৌজন্যে আমাদের ভুল ত্রুটি মাফ করে দিও, এই দ্বীন হীন গোলামকে তোমার নেককার বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে নিও এবং তফসীরে নূরুল কোরআন সম্পূর্ণ করার তৌফিক দিও।

এর পাঠক পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ী সহ আমাদের সকলের প্রতি তোমার অনন্ত অসীম রহমতের দ্বার খুলে দিও।

আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন।

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ

মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম সাহেবের

রচিত বই

১। তফসীরে নূরুল কোরআন (১ম খন্ড, প্রথম পারা)
২। তফসীরে নূরুল কোরআন (২য় খন্ড, দ্বিতীয় পারা)
৩। তফসীরে নূরুল কোরআন (৩য় খন্ড, তৃতীয় পারা)
৪। তফসীরে নূরুল কোরআন (৪র্থ খন্ড, চতুর্থ পারা)
৫। তফসীরে নূরুল কোরআন (৫ম খন্ড, পঞ্চম পারা)
৬। তফসীরে নূরুল কোরআন (৬ষ্ঠ খন্ড, ষষ্ঠ পারা)
৭। তফসীরে নূরুল কোরআন (৭ম খন্ড, সপ্তম পারা)
৮। তফসীরে নূরুল কোরআন (৮ম খন্ড, অষ্টম পারা)
৯। তফসীরে নূরুল কোরআন (৯ম খন্ড, নবম পারা)
১০। তফসীরে নূরুল কোরআন (১০ম খন্ড, দশম পারা)
১১। হাদীস শরীফের আলো
১২। মহান রাষ্ট্রনায়ক হযরত রসূলে করীম (দঃ)
১৩। দালায়েলুল খয়রাত
১৪। স্বপ্ন জগতে প্রিয়নবী (দঃ)
১৫। হযরত গওসুল আযমের অমরবাণী (চতুর্থ সংস্করণ)
১৬। আউলিয়ায়ে কেরামের জীবন ধারা
১৭। ইমাম বোখারী (রঃ)

প্রাপ্তিস্থান

১২/১৭ স্যার সৈয়দ আহম্মদ রোড
ব্লক–এ, মোহাম্মদপুর
ঢাকা–১২০৭

এমদাদিয়া লাইব্রেরী
চক বাজার
ঢাকা

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

পৃষ্ঠা

১।	উম্মতে মোহাম্মদিয়ার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ	২
২।	মালে গনিমতের তাৎপর্য্য	৩
৩।	আয়াতের মর্মকথা	৩
৪।	কয়েকটি প্রনিধানযোগ্য বিষয়	৪
৫।	খোলাফায়ে রাশেদীনের কর্মপন্থা	৯
৬।	বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ দান	১০
৭।	পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক	১৩
৮।	বদরের যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে কম দেখার তাৎপর্য্য	২০
৯।	জেহাদে জয় লাভের পন্থা	২১
১০।	আল্লাহর জিকির একটি হাতিয়ার	২২
১১।	জেহাদ শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে	২৬
১২।	শয়তানের ধোকা	২৮
১৩।	তাদের মন্দ কাজ	২৯
১৪।	আযাব কখন আসে	৩৯
১৫।	শানে নজুল	৪৭
১৬।	জেহাদের জন্য দান করার ফজিলত	৫৫
১৭।	মুসলিম শক্তির মূল উপকরণ	৬৩
১৮।	একজন মুমেন দশজন কাফেরের মোকাবেলায় কেন জয়ী হবে?	৬৪
১৯।	শানে নজুল	৬৫
২০।	মুসলমানদের দুর্বলতার কারণ	৬৬
২১।	কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়	৭৩

২২। আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই ৭৫
২৩। হযরত আব্বাস (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করলেন। ৮০
২৪। মুসলমানদের বিভিন্ন দলের অবস্থান ও মর্তবা ৮৭
২৫। সূরায়ে তওবা প্রসংগে ৯৭
২৬। এই সুরার নাম,এই সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ কেন নেই? ৯৭
২৭। শানে নজুল
২৮। একটি ঘটনা ১০০
২৯। একটি ঘটনা ১০৬
৩০। আশ্রয় প্রার্থীর জন্য ইসলামী বিধান ১১৫
৩১। জেহাদের উদ্দেশ্য ১২৮
৩২। একটি প্রশ্ন ও তার জবাব ১৩০
৩৩। মসজিদ আবাদ করার তাৎপর্য্য ১৪০
৩৪। আয়াতের মর্মকথা ১৪২
৩৫। শুধু আল্লাহকে ভয় করো ১৪৩
৩৬। মসজিদের গুরুত্ব ও ফজিলত ১৪৪
৩৭। কাফেরের ধন-সম্পদ মসজিদে ব্যবহারযোগ্য নয় ১৪৭
৩৮। শানে নজুল ১৪৯
৩৯। জমজমের পানি পান করার ঘটনা ১৫১
৪০। আয়াতের মর্মকথা ১৫৯
৪১। হোনায়েনের ঘটনা ১৬৭
৪২। হযরত রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর মোযেজা ১৬৯
৪৩। শিক্ষণীয় বিষয় ১৭৪
৪৪। যিনি ছিলেন অটল অবিচল ১৭৫
৪৫। প্রিয়নবী (দঃ)-এর সমীপে তাঁর দুগ্ধ মাতা-পিতা ১৮৩
৪৬। আশা শুধু আল্লাহর কাছে ১৯২
৪৭। যিজিয়া ও খেরাজ ১৯৭
৪৮। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ১৯৮
৪৯। কাফেরদের সম্পর্কে ইসলামের নীতি ২০০
৫০। আরব ভূ-খন্ড থেকে মোশরেকদেরকে বহিস্কার করো ২০১

৫১। যিজিয়ার পরিমান সম্পর্কে ২০২
৫২। ইসলামের উদারনীতি ২০২
৫৩। হযরত ওযায়ের (আঃ) সম্পর্কে ইহুদীদের বাতিল আকিদার ইতিহাস ২০৭
৫৪। হযরত ঈসা (আঃ)-কে পুত্র বানাবার বাতিল আকিদা
কিভাবে প্রচলিত হলো ২০৮
৫৫। আয়াতের মর্মকথা ২০৯
৫৬। হুজুর (দঃ)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ২১৭
৫৭। দ্বীন-ইসলামের প্রভাব বিস্তারের তাৎপর্য্য ২১৮
৫৮। ইসলামের দৃষ্টিতে ২২৬
৫৯। সম্পদের মালিকানা ২২৭
৬০। সম্পদের মূল মালিক আল্লাহ পাক ২৩০
৬১। ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত মালিকানা ২৩২
৬২। হিজরতের ঘটনা ২৫২
৬৩। কাবা শরীফের কবুতরের ইতিহাস ২৫৬
৬৪। উম্মে মা'বাদের ঘটনা ২৬১
৬৫। সোরাকার ঘটনা ২৬৪
৬৬। জেহাদে শরীক হওয়ার আহবান ২৭০
৬৭। তাবুক অভিযান ২৮০
৬৮। মোনাফেকদের চক্রান্ত ২৮৬
৬৯। মোনাফেকদের পরিণাম ২৯২
৭০। ইসলামের জন্য কাফেরদের অর্থ গ্রহণ যোগ্য নয় ২৯৫
৭১। কাফেরদের সুখ-সম্পদ রহমত নয় ২৯৭
৭২। যাকাত উসুলকারীর প্রাপ্য প্রসঙ্গে ৩০৬
৭৩। যাকাত প্রদানের ব্যাপারে প্রাধান্য কার? ৩১১
৭৪। প্রিয়নবী (দঃ) ও তাঁর আল-আওলাদের জন্য যাকাত সদকাহ হারাম ৩১৬
৭৫। একটি রহস্য ৩১৭

৭৬।	শানে নজুল	৩১৮
৭৭।	প্রিয়নবী (দঃ) হলেন তোমাদের জন্য রহমত	৩২০
৭৮।	মোমেনের বৈশিষ্ট্য	৩৪২
৭৯।	আল্লাহ পাকের অঙ্গীকার	৩৪৩
৮০।	জান্নাতে আদনের বিবরণ	
৮১।	মোনাফেকের বিরুদ্ধে দোয়া কবুল হলো	৩৫০
৮২।	শানে নজুল	৩৫৬
৮৩।	আয়াতের মর্মকথা	৩৬৭
৮৪।	জেহাদে অংশগ্রহণ করতে না পেরে সাহাবায়ে কেরামের ক্রন্দন	৩৮২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم ۝

তফসীরে নূরুল কোরআন

দশম খন্ড

দশম পারা

وَاعْلَمُوٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ
وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ اِنْ كُنْتُمْ
اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى
الْجَمْعٰنِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤١﴾ اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا
وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰى وَالرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ ؕ وَلَوْ تَوَاعَدْتُّمْ
لَاخْتَلَفْتُمْ فِى الْمِيْعٰدِ ۙ وَلٰكِنْ لِّيَقْضِىَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ۙ
لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْۢ بَيِّنَةٍ وَّيَحْيٰى مَنْ حَىَّ عَنْۢ بَيِّنَةٍ ؕ وَاِنَّ
اللّٰهَ لَسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۙ ﴿٤٢﴾

তরজমা

(৪১) আর জেনে রাখ, যুদ্ধে যে সম্পদ তোমরা লাভ কর তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ পাকের এবং তাঁর রসূলের, রসূলের আত্মীয় স্বজনের, এতীম, মিস্‌কিন এবং মুসাফিরদের জন্যে। যদি তোমরা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান রাখ এবং সেই জিনিসের প্রতি যা আমি মীমাংশার দিন (বদরের যুদ্ধের দিন) আমার বন্দার প্রতি নাজিল করেছি যখন দু'দল পরস্পরের সম্মুখিন হয়েছিল। আর আল্লাহ পাক সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

(৪২) স্মরণ কর সে সময়কে যখন তোমরা ছিলে উপত্যকার নিকট-প্রান্তে আর তারা ছিল দূর-প্রান্তে। আর উষ্ট্রে আরোহী কাফেলা ছিল তোমাদের অপেক্ষা নিম্ন ভূমিতে। যদি তোমরা যুদ্ধের ব্যাপারে পরস্পরের মধ্যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ইচ্ছা করতে তবে সে সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটতো। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যা ঘটবারই ছিল আল্লাহ পাক তা সুসম্পন্ন করার জন্যে উভয় দলকে রণক্ষেত্রে সমবেত করলেন, যাতে করে যে ধ্বংস হবে সে যেন সত্য সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশের পর ধ্বংস হয়। আর যে জীবিত থাকবে সে যেন সত্য সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশের পর জীবিত থাকে এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

এ সূরার শুরুতে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের কথা বলা হয়েছে, আর এ আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতে জেহাদের জন্যে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এবং দুশমনের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে সাহায্যের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ যুদ্ধের পর দুশমনদের থেকে"মালে গনিমত"তথা যুদ্ধ সম্পদ অর্জিত হবে। তাই আলোচ্য আয়াতে যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ বিতরণের বিধান পেশ করা হয়েছে।

উম্মতে মোহাম্মাদিয়ার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ

পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হালাল ছিল না; বরং তাদের জন্য এই বিধান ছিল যে, মালে গনিমত তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে উন্মুক্ত ময়দানে নিয়ে রেখে দেয়া হতো, আসমান থেকে অগ্নি এসে সে সম্পদ নিয়ে যেত। আল্লাহ পাক তাঁর বিশেষ রহমতে উম্মতে মোহাম্মদীয়ার জন্যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হালাল করে দিয়েছেন।

আলোচ্য আয়াতে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বিতরণের পন্থা নির্দেশ করা হয়েছে। সূরার শুরুতে–

قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ

বাক্য দ্বারা যে বিধান পেশ করা হয়েছে তার কিছুটা বিবরণ আলোচ্য আয়াতে রয়েছে।১

যে ধন সম্পদ কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধের পর পাওয়া যায় তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের জন্যে, রসূলের আত্মীয় স্বজনের জন্যে, আর এতিমও মিসকিনের জন্যে ও পথিক মুসাফিরের জন্যে আর অবশিষ্ট চার পঞ্চমাংশ মুজাহেদদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।

(১) তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৩৫

ইমাম আযম আবু হানিফার (রঃ) মতে যে অশ্বারোহী সে পাবে দু'ভাগ, আর যে পদব্রজে জেহাদে অংশ গ্রহণ করে তাকে দেয়া হবে এক ভাগ। এখানে এ কথা উল্লেখযোগ্য, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের যে পাঁচটি ক্ষেত্র বর্ণিত হয়েছে তন্মধ্যে প্রথম দু'টি ক্ষেত্র এখন আর নেই। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অবর্তমানে তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়োজন নেই তাই, তাঁর ও তাঁর আত্মীয় স্বজনের কোন ভাগ নেই বলে হানাফী মাজহাবের অভিমত। অবশ্য এতিম মিসকিন বা দরিদ্র হিসেবে অন্যান্যদের উপর তাঁদের অগ্রাধিকার সর্বদা থাকবে। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীর মতে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অবর্তমানে তাঁর খলিফাগণ উক্ত এক পঞ্চমাংশ গ্রহণ করবেন।

আয়াতের মর্মকথা

এ আয়াতে আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে বিশেষভাবে এ সত্য উপলব্ধি করার তাগিদ করেছেন যে, আল্লাহ পাক তোমাদেরকে বিজয় দান করেছেন এবং কাফেরদেরকে পরাজিত করেছেন ও তাদের ধন-সম্পদ তোমাদেরকে দান করেছেন। অতএব, লব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে বের কর, আর অবশিষ্ট চার পঞ্চমাংশ নিজেদের মধ্যে ভাগ কর, যদি তোমরা আল্লাহ পাকের প্রতি প্রকৃত ঈমান রাখ আর আল্লাহ পাক যে গায়েবী মদদ দিয়েছেন তোমাদেরকে বদরের যুদ্ধের দিন তার প্রতি বিশ্বাস রাখ। যদি তোমরা এ কথার প্রতি একীন রাখ যে, বদরের যুদ্ধের দিন যে ধন-সম্পদ অর্জিত হয়েছে তা শুধু আল্লাহ পাকের গায়েবী সাহায্যের কারণেই হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে "মালে গনিমত" তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের বিতরণের নিয়ম কানুন বর্ণিত হয়েছে।

أَنَّمَا غَنِمْتُم

"অর্থাৎ যে সম্পদ তোমরা গনিমত হিসেবে লাভ করেছ"

মালেগমিতের তাৎপর্য্য

গনিমত শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল সেই সম্পদ যা দুশমন থেকে অর্জন করা হয়। আর শরীয়তের পরিভাষায় যুদ্ধ বিগ্রহের মাধ্যমে দুশমন থেকে যে অর্থ-সম্পদ অর্জন করা হয় তাকে গণিমত বলা হয়। পক্ষান্তরে, পরস্পরের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে যে সম্পদ অর্জিত হয় যেমন জিজিয়া খেরাজ তাকে "ফাই" বলা হয়। কোরআনে করীমে গনিমত এবং ফাই এ দু'টি শব্দ দ্বারাই দুশমণ থেকে অর্জিত সম্পদের বিবরণ পেশ করা হয়েছে।

এখানে একথা বিশেষভাবে প্রনিধাণযোগ্য যে, সমগ্র সৃষ্টি জগতের মালিকানা একমাত্র আল্লাহ পাকেরই, আল্লাহ পাকের কোন বন্দাকে তিনি কোন সম্পদের সাময়িক মালিকানা দান করে থাকেন। তাঁর বিধি মোতাবেক এ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু কোন সম্প্রদায় যদি আল্লাহ পাকের বিদ্রোহী হয়, কোফর ও শেরক করে তখন আল্লাহ পাক তাদের হেদায়েতের জন্যে নবী রসূলগণকে প্রেরণ করেন এবং আসমানী কিতাব নাযিল হয়। কিন্তু যারা ভাগ্যাহত, তারা আল্লাহর তরফ থেকে আগত হেদায়েত গ্রহণ করেনা, তখন আল্লাহ পাক তাদের বিরুদ্ধে জেহাদের আদেশ দেন, যার তাৎপর্য হল এই, যারা আল্লাহর বিদ্রোহী তাদের জান এবং মাল আল্লাহর পথের সৈনিকদের জন্য হালাল করা হয়। আল্লাহ পাকের প্রদত্ত সম্পদ দ্বারা উপকৃত হওয়ার কোন অধিকার তাদের থাকেনা, বরং তাদের ধন-সম্পদ সরকার তথা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে জব্দ করা হয়। মুসলমান সৈনিকগণ কাফেরদের সংগে যুদ্ধ করে যে সম্পদ জব্দ করেন তাকেই শরীয়তের ভাষায় গনিমতের মাল বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বলা হয়, যা কাফেরদের মালিকানা থেকে বের হয়ে মূল মালিক আল্লাহ পাকের মালিকানায় ফিরে আসে। পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কোরামের যুগে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে এ বিধান ছিলো যে কাফেরদের থেকে যা কিছু অর্জিত হত তা ব্যবহার করা কারো জন্যই বৈধ হতনা, বরং উক্ত সম্পদ উন্মুক্ত স্থানে রেখে দেয়া হত। আসমান থেকে অগ্নি এসে ঐ সম্পদকে জ্বালিয়ে ফেলতো। এটা ঐ জেহাদ কবুল হওয়ার নিদর্শন হত। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বহু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে তাঁর উম্মতের জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হালাল করা হয়েছে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَاعْلَمُوٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ

আর তোমরা জেনে রাখ তোমরা যুদ্ধের মাধ্যমে ছোট থেকে বড় যা কিছু লাভ কর তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ পাকের জন্যে এবং তাঁর রসূলের জন্যে এবং রসূলের নিকট আত্মীয়স্বজনের জন্যে ও এতিম, মসকীন, মুসাফিরদের জন্যে।

কয়েকটি প্রনিধানযোগ্য বিষয়

যুদ্ধলব্ধ সম্পদের বিধান ঘোষণা করা হয়েছে তবে সর্ব প্রথম এক পঞ্চমাংশের কথা আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে। অবশিষ্ট চার পঞ্চমাংশের কোন উল্লেখ আলোচ্য আয়াতে নেই। তবে আলোচ্য আয়াতের উপর চিন্তা করলে এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়। আলোচ্য আয়াতে খেতাব করা হয়েছে মুজাহেদীনদেরকে।

اَنَّمَا غَنِمْتُم

"হে মুজাহেদগণ! তোমরা যা কিছু সম্পদ জেহাদ থেকে পেয়েছো" এতে ইংগিত রয়েছে যুদ্ধলব্ধ সম্পদে তোমাদের হক রয়েছে তবে লব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এর তাৎপর্য হল এই যে, অবশিষ্ট চার পঞ্চমাংশ মুজাহেদীনদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। আর এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ পাকের জন্যে তাঁর রসূলের জন্যে, এবং রসূলের নিকটাত্মীয় স্বজনদের জন্যে এবং এতীম মিসকীন ও মুসাফিরের জন্য।

এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এ পঞ্চমাংশ থেকে আল্লাহ পাক তাঁর রসূলের জন্যে অংশ নিদৃষ্ট করেছেন। যেহেতু সদকা খায়রাত আল্লাহর রসূলের শানের খেলাফ তাই তাঁর জন্যে সদকা খায়রাত অবৈধ। আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ

অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের জন্যে। কিন্তু রসূলকে মানুষের মালিকানা থেকে প্রদত্ত হয়নি; বরং কাফেরদের মালিকানার সম্পদ আল্লাহর মালিকানায় ফিরে যায়, আর আল্লাহ পাক সরাসরি তাঁর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ সম্পদ দান করেন।

وَلِذِى الْقُرْبٰى

আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আত্মীয়-স্বজনকে যে অংশ দেয়া হয় তা-ও মানুষের সদকা থেকে নয়; বরং সরাসরি আল্লাহ পাকের দান হিসেবে। অতএব এক পঞ্চমাংশের মধ্যে সর্বপ্রথম হক্ব হল হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের। এরপর তাঁর আত্মীয়-স্বজনের এবং এতীম মিসকীন ও মুসাফিরদের হক্ব রয়েছে।১

وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى

অর্থাৎ এক পঞ্চমাংশে হক্ব রয়েছে আল্লাহর রসূল ও তাঁর নিকটাত্মীয়দের। নিকটাত্মীয়দের ব্যাখ্যায় তফসীরকারদের একাধিক মত রয়েছে। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, নিকটাত্মীয়ের মধ্যে কুরাইশ খান্দানের সকলেই রয়েছেন।

১। তফসীরে নেকাতুল কোরআন, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-২০৯২

তফসীরকার মুজাহেদ (রহঃ) এবং ইমাম জয়নুল আবেদীনের মতে, নিকটাত্মীয় হল শুধু বণী হাশেম। আর ইমাম শাফী (রহঃ)–এর মতে আবদে মনাফের দু' পুত্র হাশেম এবং মোত্তালেবের বংশধরই হল নিকটাত্মীয়। ইমাম শাফী (রহঃ) হযরত জুবাইর এবনে মোত্আম (রাঃ)–এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিকটাত্মীয়ের অংশ শুধু বণি হাসেম ও বণি আবদুল মোত্তালেবের মধ্যে বন্টন করেছেন। বনি আবদুস সামস ও বণি নওফলকে দান করেননি। এ হাদীস বোখোরী শরীফে সংকলিত হয়েছে।১

তত্ত্বজ্ঞানীগণ লিখেছেন, এতীম মিসকিন এবং পথিক মুসাফির এ তিন দল লোককে তাদের অসহায়ত্বের কারণে যুদ্ধেলব্ধ সম্পদ প্রদানের বিধান রয়েছে, যদি তারা সম্পদশালী হয় তবে তাদেরকে গনিমতের অংশীদার করা হবে না। এ ব্যাপারে ইমামগণ একমত রয়েছেন। তবে হযরত রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকটাত্মীয়দের সম্পর্কে এ কথা প্রযোজ্য নয়। কেননা হযরত আব্বাস (রাঃ) সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও প্রিয়নবী হযরত রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ প্রদান করতেন।

এতদ্ব্যতীত, এতীম মিসকিন এবনুস সাবীল তথা মুসাফির এই শব্দ গুলোই তাদের অসহায়ত্বের পরিচয় বহন করে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, সমস্ত ইমামগণ এ ব্যাপারে একমত যে, হযরত রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মালে গনিমত তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে পাঁচভাগে বিভক্ত করতেন। তন্মধ্যে চার ভাগ মুজাহেদগণের মধ্যে বিতরণ করা হতো। আর এক ভাগকে পুনরায় পাঁচ ভাগ করতেন। তন্মধ্যে এক ভাগ নিজের এবং পরিবারবর্গের জন্য রাখতেন, তাঁর সংসারের খরচ এর দ্বারা চলতো, যদি কিছু বেঁচে থাকতো তা দিয়ে অস্ত্র শস্ত্র এবং অশ্ব ক্রয় করতেন এবং মুসলমানদের কল্যাণকর কাজে ব্যয় করতেন। আর এক অংশ বনু হাশিম এবং বনু মোত্তালিবের মধ্যে ব্যয় করতেন এবং তাদের মধ্যে ধনী দরিদ্র নারী পুরুষ সকলের মধ্যে ব্যয় করতেন এবং অবশিষ্ট তিন ভাগ এতীম মিসকিন এবং মুসাফিরদেরকে দান করতেন।২

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য তাহলো এই, যে পাঁচ দল লোকের জন্যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বিতরণের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। তাদের সকল দলকে ঐ সম্পদ প্রদান করা জরুরী এবং এক দলের অংশ অন্য দলকে প্রদান করা বৈধ নয়। অথবা এর অর্থ হলো যে, পাঁচ প্রকার লোককে যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ দেয়া যাবে এ ছাড়া অন্যকে দেয়া বৈধ হবে না। কিন্তু ইমামের এ অধিকার রয়েছে পাঁচ প্রকারের মধ্যে কোন এক প্রকার লোকদের এ সম্পদ দিতে পারবেন?

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড–৫, পৃষ্ঠা–১০১

২। তফসীরে মাজেদী, খন্ড–৫, পৃষ্ঠা–১০৩

আর একদল লোকের মধ্যে শুধু একজনকে দিবেন অন্যকে দিবেন না। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এ মতই পোষণ করতেন।

এবনে হুমাম লিখেছেন, এতীম মিসকিন এবং মুসাফির এরা সকলেই গনিমতের এক পঞ্চমাংশের অধিকারী কিন্তু অবশ্যই তাদেরকে দিতে হবে এমন কোন কথা নেই। যদি একই প্রকার লোককে দেয়া হয় তবে তা বৈধ। ইমাম শাফী (রঃ) এবং অন্যান্য মোজতাহেদদের মধ্যে এক দলের মত হলো প্রত্যেক দলকে গনিমতের সম্পদের অংশ দিতে হবে। ইমাম শুধু একদল লোককে বা দু'দল লোককে বিশেষভাবে দিতে পারে না; বরং সকল প্রকার লোকদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। ইমামে আযম আবু হানিফা (রঃ)-এর মত হলো শুধু এক দলকে দেয়া বা সকল দলকে শরীক করা তা ইমামের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হাদীস সংকলিত হয়েছে যে, যাঁতা ব্যবহার করার কারণে হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর হাতে ফোশকা পড়ে গিয়েছিল। তিনি জানতে পারলেন যে, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে কিছু গোলাম বান্দী এসেছে, তাই একজন বাঁদীর জন্য আবেদন করার উদ্দেশ্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হলেন। কিন্তু তখন তিনি ঘরে ছিলেন না। হযরত ফাতেমা (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে এ বিষয়ে অবগত করলেন। যখন রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বাড়ীতে আগমন করলেন তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বললেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সংগে সংগে আমাদের ঘরে আগমন করলেন। আমরা তখন বিছানায় চলে গিয়েছিলাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দেখে আমরা উঠতে লাগলাম। তিনি আমাদের দু'জনের মধ্যখানে উপবিষ্ট হলেন, তাঁর কদম মোবারকের সুশীতল স্পর্শ আমার পেটের উপর উপলব্ধি করলাম। এরপর তিনি এরশাদ করলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয়ের কথা বলবো যা তোমাদের কাম্য বস্তু থেকে উত্তম হবে। বিছানায় পৌছে ৩৩ বার সোবাহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পাঠ কর। এই আমল তোমাদের জন্যে খাদেমের চেয়ে উত্তম হবে।

তাহাবী শরীফে সংকলিত বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আলী (রাঃ) নিজেই হযরত ফাতেমা (রাঃ)-কে এ সম্পর্কে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আরজি পেশ করার জন্যে বলেছিলেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে একজন খাদেমের আরজি পেশ করলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ আমি আহলে সোফফার লোকদেরকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় রেখে তোমাকে বাঁদী দিতে পারবোনা। আহলে সোফফার ব্যয় ভারের

জন্যে আমার নিকট বর্তমানে কোন টাকা পয়সা নেই, অথচ তারা ক্ষুধার্ত অবস্থায় আছে। আমি এ গোলাম বাদীদের বিক্রয় করে তাদের জন্যে খরচ করবো। আমি কি তোমাকে এমন আমলের কথা বলবো না? যা তোমাদের চাওয়া বস্তু থেকে উত্তম, আমাকে জীব্রাঈল (আঃ) বলেছেনঃ প্রত্যেক নামাজের পর এবং বিছানায় যাওয়ার সময় দশবার আল্লাহ্ আকবার, দশবার সোবহান আল্লাহ এবং দশবার আলহামদুলিল্লাহ পাঠ কর। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ব্যক্তি স্বার্থের উপর জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিতেন, এই হাদীস দ্বারা এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যে চার দলের মধ্যে বিতরণের কথা, তাদের মধ্যে থেকে কাউকে দিতেন, আর কাউকে দিতেন না। যেমন হযরত ফাতেমা (রাঃ)-কে বাঁদী প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন, অথচ তিনি ছিলেন নিকটাত্মীয়।

ইমাম আবু ইউসুফ (রাঃ) আশআস এবনে সওয়াবের সূত্রে হযরত জাবের (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত জাবের (রাঃ) বলেছেন, প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ দ্বারা মুজাহেদীনদের জন্যে অশ্ব, উষ্ট্র ক্রয় করতেন এবং জাতীয় বিপর্যয়ের ক্ষেত্রেও ব্যয় করতেন, এরপর যখন অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধি পেল তখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মালে গনিমতের অংশ থেকে এতীম মিসকিন এবং মুসাফিরদেরকেও দান করতেন।[১]

ইমাম কাতাদা (রঃ)-এর মত হলো এই হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে গনিমতের মাল তথা যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ থেকে যে অংশ বন্টন করা হতো তা এ জন্যে যে, তিনি ছিলেন রাষ্ট্রনায়ক। আর এ কারণে যারা তাঁর খলিফা হয়েছেন তাঁদেরকেও মালে গনিমত থেকে এক পঞ্চমাংশ দেয়া হবে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এ সম্পর্কে বলেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অংশ রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে নয়, বরং রসূল হিসেবে নির্দৃষ্ট ছিল। তাঁর ইন্তেকালের পরে এই অংশ কোন খলিফাকে দেয়া যাবেনা। কেননা তাঁর পরে আর কোন রসূল হবে না। রেসালতের দুয়ার চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে।

এখানে আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে কোন কিছু নিজের জন্য পছন্দ করার অধিকার একমাত্র রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামেরই ছিল আর কারো নয়। বদরের যুদ্ধের দিন মোনাব্বা এবনে হাজ্জাজের তরবারি যাকে জুলফেকার বলা হতো হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তা নিজের জন্য পছন্দ করেছিলেন। এমনিভাবে খায়বয়ের যুদ্ধে বন্দীদের মধ্যে ইহুদী হাই এবনে আখতাবের কন্যা হযরত সফিয়া (রাঃ)-কে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজের জন্য নির্বাচন করেছিলেন। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে

১। তফসীরে মাজেদী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১০৫-৬

ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পরে ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, মালে গনিমতের কোন কিছু নিজের জন্য পছন্দ করার হক্ব কারোই নেই এটি বৈশিষ্ট্যই ছিল হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের। ঠিক এমনি ভাবে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পর তাঁর নিকট আত্মীয়দের যে অংশ যুদ্ধলব্ধ সম্পদে ছিল তাও বাতিল হয়ে যায়। এটি ইমাম আবু হানিফা (রঃ)–এর অভিমত। ইমাম সাহেবের মতে, আত্মীয় স্বজনকে যে অংশ প্রদান করা হতো তা আত্মীয়তার বন্ধনের জন্য নয়; বরং হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সাহায্য করার কারণে। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বনু হাশেম প্রাক ইসলামিক যুগে এবং ইসলামের আবির্ভাবের পরেও সাহায্য করতো । এজন্য তিনি মালে গনিমত থেকে তাদেরকে অংশ দিতেন, অথচ বনু নওফল এবং বনু আবদে শামসকে দিতেন না।

খোলাফায়ে রাশেদীনের কর্মপন্থা

খোলাফায়ে রাশেদীন যুদ্ধলব্ধ সম্পদের তিনটি বিভাগ অব্যাহত রেখেছিলেন। অর্থাৎ এতিম, মিসকিন ও পথিক মুসাফিরকে তাদের অংশ প্রদান করা হতো। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর নিকট আত্মীয়দের অংশ দেয়া বন্ধ হয়ে যায়। যখন খোলাফায়ে রাশেদীন এই কর্মপন্থা গ্রহণ করেন তখন কোন সাহাবী এ সম্পর্কে আপত্তি করেননি। তাই এ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) তাঁর কিতাবুল খেরাজে কালবীর সূত্রে আবু সালেহের উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)–এর কথা বলেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এক পঞ্চমাংশ পাঁচ ভাগে বিভক্ত হতো। একভাগ আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের। দ্বিতীয় ভাগ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আত্মীয়দের হতো। আর তিনভাগ এতীম মিসকিন এবং মুসাফিরদের থাকতো। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ) এবং হযরত ওসমান (রাঃ) শুধু তিন ভাগ কায়েম রেখেছিলেন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর আত্মীয় স্বজনের অংশ বাতিল করে দিয়েছিলেন। এরপর চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রাঃ) এই পর্যায়ে পূর্ববর্তী তিন খলিফার অনুসরণ করেন এবং মালে গনিমতের তিন ভাগই অব্যাহত রাখেন।১

إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড–৫, পৃষ্ঠা–১১০

যদি তোমরা আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস কর এবং বিশ্বাস কর সেই বিষয়ের উপর যা আমি আমার বন্দা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি নাজিল করেছি। অর্থাৎ বদরের যুদ্ধের দিন আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে সাহায্য করার জন্যে যে ফেরেশতা প্রেরণ করেছিলেন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যে সব মোযেজা প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোর প্রতি যদি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর।

يَوْمَ الْفُرْقَانِ

আলোচ্য আয়াতে "ইয়াওমুল ফোরকান" বলা হয়েছে বদরের যুদ্ধের দিনকে। কেননা, সেদিন সত্য অসত্যের মধ্যে মীমাংশা হয়েছে। পার্থক্য হয়েছে হক ও বাতিলের মধ্যে। কাফেরদের বিরাট বাহিনীর মোকাবেলায় মুসলমানদের সামান্য সংখ্যক লোকের ঐতিহাসিক বিজয় সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। সেদিন আল্লাহ পাকের যে অবিস্মরণীয় অনুগ্রহ মুসলমানদের জন্য এসেছে তার কথা স্মরণ করলে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের নামে পরিত্যাগ করার মধ্যে কোন প্রকার সংকোচ থাকতে পারে না। বদরের যুদ্ধে ফেরেশতা বাহিনীর অবতরণ, মুসলমানদের অন্তরে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে সান্তনা প্রদান আল্লাহ পাকের বিশেষ নেয়ামত ব্যতীত আর কিছুই নয়। এ পর্যায়ে বদরের যুদ্ধে আল্লাহ পাকের যে গায়েবী সাহায্য এবং দান এসেছে তার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবেনা।

বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ দান সমূহঃ

(১) আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, কাফেরদের দু'দলের মধ্যে এক দলের উপর মুসলমানদের বিজয় দান করবেন। এরপর একথাও জানিয়ে দিয়েছিলেন যে

মুসলমানদের মনের আকর্ষন বানিজ্যিক কাফেলার দিকে ছিল, কোরায়েশের সৈন্য বাহিনীর দিকে ছিলনা।

(২) আল্লাহ পাকের তরফ থেকে গায়েবী মদদ হিসেবে বৃষ্টিপাত হয় যা মুসলমানদের জন্য রমহত এবং কাফেরদের জন্য বিপদের কারণ হয়।

(৩) আল্লাহ পাক মুসলমানদের সাহায্যের জন্যে ফেরেশতাদেরকে প্রেরণ করেন। মুসলমানগণ তাদের শব্দ শ্রবণ করেন। এমনকি এ কথাও শ্রবণ করেন যে, "হাইয়ুম

এগিয়ে চল", লোকেরা এ বিস্ময়কর দৃশ্য দেখতে পায় যে কোন মানুষের তরবারির আঘাত ব্যতীতই কাফেরদের দেহ থেকে মস্তক পৃথক হয়ে যায় এবং আবু জেহেলের লাশের উপর বেত্রাঘাতের চিহ্নও দেখতে পাওয়া যায়।

(৪) হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক মুষ্টি কংকর নিয়ে কাফেরদের দিকে নিক্ষেপ করেছিলেন যে কারণে কাফেররা কিছুক্ষণের জন্য অন্ধ হয়ে যায় এবং প্রত্যেকটি কাফেরের চোখে কংকর নিক্ষিপ্ত হয়।

(৫) মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধি করার জন্যে কাফেরদের অধিক সংখ্যাকে কম করে দেখানো হয় অর্থাৎ মুসলমানগণ কাফেরদের সংখ্যাকে কম দেখেন।

(৬) হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে যুদ্ধের আগের দিনই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, কোন্ কাফের কোন্ স্থানে নিহত হবে। এমনকি তিনি সে স্থানটি চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন। পরে মুসলমানগণ দেখেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রত্যেকটি কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

(৭) হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কাফেরদের বিখ্যাত নেতা কাব এবনে আবু মুইদকে বলেছিলেন যদি তোমাকে মক্কার পাহাড়ের বাইরে পাই তবে তোমাকে বন্দী করে মারবো, বদরের যুদ্ধের দিন তাই হয়েছে।

(৮) হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা আব্বাস (রাঃ)-কে বলেছিলেন যে, আপনি অমুক জিনিসটি আপনার স্ত্রী উম্মুল ফজলের নিকট রেখে এসেছেন। এই খবর দেয়ার কারণে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের ব্যাপারে হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর অন্তরে যে সন্দেহ ছিল তা দূরীভূত হয়।

(৯) আল্লাহ পাক মুসলমানদের এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিলেন যে, যদি আল্লাহ পাক তোমাদের অন্তর সমূহে কল্যাণ লক্ষ্য করেন (তোমাদের এখলাস প্রমাণিত হয়) তবে যে ধন-সম্পদ তোমাদের থেকে গ্রহণ করা হলো তার চেয়ে উত্তম ধন-সম্পদ তোমাদেরকে প্রদান করা হবে।

হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর তরফ থেকে প্রদত্ত (স্বর্ণ বা রূপার) বিনিময়ে আল্লাহ পাক তাঁকে বিশটি গোলাম দান করেন। যারা তাঁরা মূলধন দ্বারা ব্যবসা করতো এবং লভ্যাংশ এনে তাঁকে দিত।

(১০) আল্লাহ পাক হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অবগত করেন যে, মক্কায় আপনাকে হত্যা করার পরামর্শ করেছে ওমায়ের এবনে ওহাব এবং সোফওয়ান এবনে উমাইয়া (এবং তারা আপনাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আসবে) এরপর আল্লাহ পাক হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের

হেফাজতের ব্যবস্থা করেন। আর এ কারণে ওমায়ের এবনে ওহাব ইসলাম কবুল করেন এবং পরবর্তী কালে ইসলামের দিকে আহবায়কের ভূমিকা পালন করেন।

(১১) খেজুর বৃক্ষের একটি শুষ্ক শাখা তলোয়ার হয়ে গেল। এবনে সাদ, জায়েদ এবনে আসলাম এবং এজীদ এবনে নোমানের সূত্রে লিখেছেন এবং বায়হাকী ও এবনে এসহাক এ ঘটনা হযরত ওমর (রাঃ)–এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, বদরের যুদ্ধে হযরত ওকাসা এবনে মোহসেন (রাঃ)–এর তরবারিটি যুদ্ধ করতে করতে ভেঙ্গে যায় তখন তিনি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলেন। রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে একটি কাষ্ঠখন্ড দান করে এরশাদ করেনঃ ওকাসা এর দ্বারা যুদ্ধ কর। হযরত ওকাসা (রাঃ) ঐ কাষ্ঠখন্ডটি হাতে স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে তা একটি লম্বা সাদা তরবারিতে পরিণত হয়। হযরত ওকাসা ঐ তরবারি দিয়েই যুদ্ধ করেন। অবশেষে মুসলমানগণ বিজয় লাভ করেন। এ তরবারিটির নামকরণ করা হয় 'অইয়ুন'। ওকাসা (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে অনেক যুদ্ধে শরীক হন এবং ঐ তরবারি দিয়েই লড়াই করেন। অবশেষে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর মোরতাদদের ফেৎনার যুগে তালহা এবনে খয়লেদ নামক নবুওয়তের দাবীদারের হাতে তিনি শাহাদত বরণ করেন।

বায়হাকী দাউদ এবনে হোসাইন বণী আশহালের কায়েকজন লোকের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, বদরের যুদ্ধের দিন সালমা এবনে আসলাম এবনে হারসের তরবারিটি ভেঙ্গে গেল। তিনি খালি হাত হয়ে গেলেন। তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দস্তে মোবারকে বণী তাবা গোত্রের খেজুরের বাগানের কোন বৃক্ষের একটি শাখা ছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঐ শাখাটি সালমাকে দান করে এরশাদ করলেনঃ এর দ্বারা আঘাত কর। বিস্ময়কর বিষয় হলো এই যে, 'খেজুর বৃক্ষের, ঐ শাখাটি হযরত সালমার হাতে পৌছামাত্র তলোয়ারে পরিণত হলো। আর তা সর্বদা তাঁর কাছেই রইল। অবশেষে সপ্তম হিজরীতে অনুষ্ঠিত খায়বরের যুদ্ধে তিনি শাহাদত করণ করেন।

(১২) বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, বদরের যুদ্ধের দিন হাবীব এবনে আদী (রাঃ)–এর পাঁজরে ব্যথা পেলেন। ফলে তাঁর পাজরের হাড় বাঁকা হয়ে গেল। (তিনি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলেন) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জাবান মোবারক থেকে একটু থুথু নিয়ে ক্ষত স্থানে লাগিয়ে দিলেন এবং হাড়কে সোজা করে জুড়ে দিলেন। তখন পাঁজর ঠিক হয়ে গেল।

(১৩) বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হযরত কাতাদা (রাঃ) এবনে নোমান বদরের যুদ্ধের দিন তাঁর চোখে আঘাত পেয়েছিলেন। ফলে চোখ বের হয়ে গালের উপর এসে পড়েছিল। লোকেরা চোখটি কেটে ফেলার ইচ্ছা করলো। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন এমন করোনা। এরপর হযরত কাতাদা (রাঃ)-কে তলব করে তাঁর চক্ষুটিকে স্বস্থানে বসিয়ে দিলেন অতঃপর এ কথা জানা যেত না যে, কোন্ চোখে তিনি আঘাত পেয়েছিলেন।

(১৪) বায়হাকী হযরত রোফাআ(রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, বদরের দিন আমার চোখে তীর নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বহস্তে আমার চোখ ঠিক করে দিলেন এবং আমার জন্য দোয়া করলেন। এরপর আমার চোখের ব্যথা দূর হয়ে গেল।

(১৫) এবনে সা'দ (রাঃ) এসহাকের সূত্রে আবদুল্লাহ এবনে নওফলের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, বদরের দিন নওফল বন্দী হলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে লক্ষ্য করে বললেনঃ তোমার যে বর্শাটি জেদ্দায় রয়েছে তা যদি তুমি মুক্তিপন হিসেবে দিয়ে দাও তবে তোমাকে মুক্তি দেয়া হবে। নওফল বললোঃ আল্লাহ্ পাক এবং আমি ব্যতীত আর কেউ জানে না যে, আমার বর্শাটি জেদ্দায় রয়েছে। নিশ্চয়ই এ সংবাদ আপনাকে আল্লাহ পাকই দিয়েছেন। তাই আমি ইসলাম কবুল করলাম। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহর রসূল।১

يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ط

যেদিন দু'দলের মধ্যে মোকাবেলা হয়, একদল আল্লাহর ছিল আর একদল ছিল শয়তানের। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হিজরতের ষোল মাস পরে ১৭ই রমজান, রোজ শুক্রবার বদরের যুদ্ধ হয়।

وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

আর আল্লাহ পাক সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান, তিনি দুর্বলকে সবল করতে পারেন এবং সবলকে পরাজিতও করতে পারেন। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি সর্বশক্তিমান।

اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে বদরের যুদ্ধের ঘটনাবলী এবং এই যুদ্ধে মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ নেয়ামত সমূহের উল্লেখ রয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতেও এমনি আরো একটি নেয়ামতের বর্ণনা রয়েছে।

১। তফসীরে মাজেদী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৩৬-৩৮

إِذْ أَنتُم

হে মোমেনগণ! সে সময়কে স্মরণ কর যখন তোমরা ছিলে নিকট প্রান্তে আর কাফেররা ছিল দূর প্রান্তে অর্থাৎ তোমরা ছিলে মদীনার নিকটে আর কাফেররা ছিল বিপরীত দিকে। আবু সুফিয়ানের বানিজ্য কাফেলা মূল পথ ছেড়ে দিয়ে নিচের দিকে তথা সমুদ্র উপকূলবর্তী পথ অবলম্বন করে মক্কার দিকে চলে যায় এবং মুসলমান ও বানিজ্য কাফেলার মধ্যে প্রাচীর হয়ে দাড়ায় কাফের সৈন্যরা।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, মুসলমানদের থেকে বানিজ্য কাফেলা তিন মাইল দূরে অবস্থিত উপকূলবর্তী পথে যায। দুশমন ছিল শক্তিশালী এবং কাফেলা থেকে তাদের সাহায্য লাভের সম্ভাবনাও ছিল অধিক। তাদের যুদ্ধ করার আকাংখাও ছিল অনেক। পক্ষান্তরে, মুসলমানগণ দুর্বল অবস্থায় ছিলেন। তাদের বিজয়ের সম্ভাবনা প্রকাশ্য দৃষ্টিতে খুবই কম ছিল। কিন্তু এমন অবস্থায়ও আল্লাহ পাক তাঁর বিশেষ দানে ধন্য করে মুসলমানদেরকে বিজয়ী করেছেন।

وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ

যদি মুসলমান এবং কাফেরদের মধ্যে যুদ্ধের ব্যাপারে পূর্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো এবং এ সম্পর্কে উভয়ের মধ্যে আলোচনা হতো তবে যুদ্ধের ব্যাপারে একমত হওয়া সম্ভব হতো না। বরং পরস্পরের মধ্যে মতভেদ দেখা দিত। কেননা কাফেরদের সৈন্যছিল অনেক এবং অস্ত্রশস্ত্রও ছিল প্রচুর

এমন অবস্থায় মুসলমানদের ভীত সন্ত্রস্থ হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। পক্ষান্তরে, মুসলিম বাহিনীর ঈমানী বল, সত্য নিষ্ঠা, আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণের, এবং সত্যের জন্য মুসলমানদের ত্যাগ তিতিক্ষার যে প্রেরণা কাফেররা লক্ষ্য করেছে তা তাদের জন্য রীতিমত আতংকের কারণ ছিল। তাই আলোচনার মাধ্যমে যদি যুদ্ধ সম্পর্কে পূর্বে সিদ্ধান্ত হতো তবে যথাসময়ে হয়ত রণাঙ্গনে কোন পক্ষ হাজির হতো না। আর এমন ঐতিহাসিক যুদ্ধও হতো না।

وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا

কিন্তু আল্লাহ পাক যা করতে চান তা হয়েই থাকে। আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ছিল কাফেরদের বিষদাঁত ভেঙ্গে দিবেন এবং ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন। তাই উভয় পক্ষকে আল্লাহ পাক সুকৌশলে রণাঙ্গনে একে অন্যের মোকাবেলায় দাড় করিয়ে দেন।

হে মোমেনগণ। তোমরা বের হয়েছিলে বাণিজ্য কাফেলার অনুসন্ধানে আর কাফেররা বের হয়েছিল তাদের বাণিজ্য কাফেলার সাহায্যার্থে। আর আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা ছিল সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। তাই তোমাদের উভয়ের মধ্যে বদরের রণাঙ্গনে সংঘর্ষ হলো। ফলে সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হলো, অসত্য চরম পরাজয় বরণ করলো।

لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْۢ بَيِّنَةٍ

অর্থাৎ বদরের যুদ্ধে যারা নিহত হলো তারা দ্বীন ইসলামের সত্যতা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের সত্যতা দেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নিল এবং যারা এই যুদ্ধের পরও জীবিত রইলো তারাও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের সত্যতা দেখেই জীবিত রইলো। এখানে কোন কিছুই অস্পষ্ট নেই, সবই দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট এবং প্রতিভাত। তাই আল্লাহ পাকের দরবারে ইসলাম গ্রহণ না করার কোন ওজর আপত্তি পেশ করার সুযোগ রইলনা, অজানার অভিযোগেরও কোন পথ রইল না। যাঁরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছেন এবং তাঁর প্রেরিত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস এবং ভক্তি নিয়ে তাঁর অনুসারী হয়েছেন তাদের সংখ্যা কম হওয়া সত্ত্বেও এবং প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র না থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ পাক হক্ব ও বাতিলের এই প্রথম সংঘর্ষে তাঁর ভক্ত প্রেমিক মোমেন বন্দাদেরকে বিজয় দান করেছেন। এতে আল্লাহর রসূলের রেসালতের সত্যতার নিদর্শন রয়েছে আর তা বিশ্ববাসীর চক্ষু খুলে দিয়েছে, এখন আর অমানিশা নেই। যারা ঈমান আনবে তারা বুঝে শুনে ঈমান আনবে। আর যারা কাফের হবে তারাও সজ্ঞানেই কাফের হবে।

আল্লামা সানউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন মোহাম্মদ এবনে এসহাক বলেছেন: এখানে هَلَكَ হালাকা শব্দটি কোফর ও নাফরমানী অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আর حَيَّ এর "হায়াত" ঈমান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা কোফর হলো মানবতার মৃত্যু। আর ঈমান হলো মানবতার জীবন। এই অর্থ গ্রহণ করলে আয়াতের তাৎপর্য হবে এই যে, এমন সুস্পষ্ট দলিল প্রমান দেখার পরও যার তকদীরে কাফের থাকা লিপিবদ্ধ রয়েছে সে কাফেরই থাকবে, আর যার তকদীরে মোমেন হওয়ার কথা আছে সে ঈমান আনবে।১

وَإِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-৫, পৃঃ ১৪৯
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃঃ ২৪০

অর্থাৎ আল্লাহ পাক কোফর এবং ঈমানের কথা শ্রবণ করেন,*তোমাদের* কোফর ও ঈমানের আকিদা সম্পর্কেও তিনি সম্পূর্ণ অবগত। ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তোমাদের প্রয়োজন ও দুর্বলতা সম্পর্কেও শুনেন তিনি সর্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত। তাই তিনি তোমাদের প্রয়োজনের আয়োজন করেন। আল্লাহ পাক সবই শুনেন, সবই জানেন। তাই , সুদীর্ঘ তের বছর ধরে যে মুসলিম জাতি উৎপীড়িত এবং নির্যাতীত ছিল তাদের ডাকে তিনি সাড়া দিয়েছেন এবং মুসলমানদেরকে ঐতিহাসিক বিজয় দান করেছেন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের শক্রদের মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিয়েছেন।১

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী আলোচ্য বাক্যটির এই অর্থও করেছেন যে, বদরের যুদ্ধে সত্যের বিজয়ের এবং অসত্যের পরাজয়ের পর কে ইসলামের প্রতি বিশ্বাস করে, আর কে বিশ্বাস করেনা এবং কে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে আর কে শুধু মৌখিক বিশ্বাস করে আল্লাহ পাক সবই জানেন। অর্থাৎ তোমরা মুখে কি বল, তা তিনি শ্রবণ করেন, আর তোমাদের অন্তরে কি থাকে,তাও তিনি জানেন।২

إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ
أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ
سَلَّمَ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٤٣﴾ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ
فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا
كَانَ مَفْعُولًا ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٥﴾

তরজমা

(৪৩) (হে রসূল!) স্মরণ করুন সে সময়কে যখন আল্লাহ পাক আপনাকে স্বপ্নে দেখিয়েছিলেন কাফেরদের সংখ্যা অল্প। যদি তাদের সংখ্যা অধিক দেখাতেন তবে

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৫, পৃষ্ঠা-১৬৮

২। তফসীরে মাজেদী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৮৪

(হে মোমেনগণ!) তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলতে এবং যুদ্ধ সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি করতে। কিন্তু আল্লাহ পাক তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন। তিনি যে (মানুষের) মনের কথা খুব ভালভাবেই জানেন।

(৪৪) আর স্মরণ কর সে সময়কে যখন তোমরা পরস্পরের সাথে সংঘর্ষরত ছিলে তখন আল্লাহ পাক তোমাদের চোখে শত্রুসৈন্যকে অল্প সংখ্যক দেখিয়েছিলেন এবং তাদের চোখে তোমাদেরকেও অল্প দেখিয়েছিলেন। যা ঘটবার ছিল তা সম্পন্ন করবার জন্যে এবং সমস্ত বিষয় আল্লাহ পাকের নিকটই প্রত্যাবর্তিত হয়।

(৪৫) হে মোমনেগণ! যখনই কোন শত্রু সৈন্যের সঙ্গে তোমাদের সংঘর্ষ হয় তখন তোমরা অটল অবিচল থাকবে এবং আল্লাহ পাককে অধিক পরিমাণে স্মরণ করবে যেন তোমরা সফলকাম হও।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের ন্যায় এ আয়াতেও মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ পাকের একটি বিশেষ নেয়ামতের উল্লেখ রয়েছে। আর এ নেয়ামত হলো দুশমনকে অল্প সংখ্যক দেখা, যার ফলে মুসলমাদের সাহস বৃদ্ধি পায় এবং মনোবল বেড়ে যায়। ঘটনা ছিল এই, বদরের যুদ্ধের দিন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে এ নির্দেশ দিয়েছিলেন, যতক্ষণ আমি আদেশ না দেই ততক্ষণ যুদ্ধ শুরু করো না। যদি দুশমন তোমাদের নিকট এসে যায় তখন তীর ব্যবহার করো, তরবারি নয়। তরবারি দ্বারা যুদ্ধ তখন হয়, যখন তারা তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে স্থানে ছিলেন সেখানে তাঁর নিকট হযরত আবু বকর (রাঃ) ছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ক্ষণিকের জন্যে তন্দ্রাহত হয়ে পড়েছিলেন। তখন হযরত আবুবকর (রাঃ) আরজ করেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! দুশমন অতি নিকটে এসে গেছে। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর এ কথার শব্দে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল ঐ তন্দ্রার সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে দুশমনদেরকে অল্প সংখ্যক দেখেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সাহাবায়ে কেরামকে তাঁর এ স্বপ্নের কথা জানিয়ে দেয়া হলো। ফলে তাদের সাহস এবং মনোবল বেড়ে গেল।

এবনে এসহাক এবং এবনুল মুনজের হাব্বাস এবনে ওয়াসের সূত্রে বর্ণনা করেছেনঃ জাগ্রত হয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে বলেছিলেনঃ হে আবু বকর! সুসংবাদ, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তোমাদের জন্যে সাহায্য এসে পৌঁছেছে। এইতো জীব্রাইল, তাঁর অশ্বের লাগাম ধরে রেখেছেন।১

১। তফসীরে মাজেদী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১০৪

আলোচ্য আয়াতের তফসীরে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক হযরত রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অতি অল্প সংখ্যক দেখিয়েছেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে স্বপ্নের কথা জানিয়ে দিলেন। তখন তারা বললেনঃ নবীর স্বপ্ন অবশ্যই সত্য, নিঃসন্দেহে কাফেরদের সংখ্যা কম। আর স্বপ্নের এ বিবরণ মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধির ব্যাপারে বিশেষভাবে উপকারী হয়। এভাবে আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে সাহায্য করেন। আর নিঃসন্দেহে এটি আল্লাহ পাকের নেয়ামত।

শাহ আঃ কাদের (রঃ) এ স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ যারা সেদিন বদরের রণাঙ্গনে উপস্থিত ছিল তাদের অধিকাংশই শেষ পর্যন্ত মুসলমান হয়ে যায়। তাই কাফেরদের সংখ্যা সেদিন তিনি অল্প দেখেছিলেন। তাছাড়া সৈন্য সংখ্যা বেশী কি কম, এ কথার উপর যুদ্ধের জয় পরাজয় নির্ভর করে না; বরং তা নির্ভর করে এক আল্লাহ পাকের ইচ্ছা এবং সাহায্যের ওপর। বদরের যুদ্ধের ঐতিহাসিক ঘটনা এ সত্যেরই জীবন্ত সাক্ষী।

إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ط

তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ হে রসূল! সে সময়কে স্মরণ করুন যখন আল্লাহ পাক আপনাকে স্বপ্নে কাফেরদের সংখ্যা কম করে দেখালেন। বস্তুতঃ এটি ছিল মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ দান। যদি কাফেরদেরকে তিনি অধিকসংখ্যক দেখাতেন তবে হে মোমেনগণ! তোমরা সাহসহারা হতে এবং জেহাদের ব্যাপারে পরস্পর মতভেদ করতে। কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন তোমাদেরকে এমন বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছেন। আর তোমরা এ কথা নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ পাক মানুষের মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

দুশমনের সংখ্যা মুসলমানদের দৃষ্টিতে কম দেখানোর একটা বিবরণ আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) উপস্থাপিত করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ দুশমনের সংখ্যা সম্পর্কে আমি একটি ধারণা করে আমার সাথীকে বললামঃ কাফেরদের সংখ্যা ৭০–এর কাছাকাছি হবে। আর আমার সাথী বললো–না, প্রায় ১০০ হবে। এরপর কাফেরদের এক ব্যক্তি আমাদের হাতে বন্দী হলো, আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমাদের সংখ্যা কত? সে বললোঃ আমাদের সংখ্যা এক হাজার।১

১। তফসীরে এবন কাসীর (উর্দু), খন্ড–১১, পৃষ্ঠা–১১

তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত–আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড–৩; পৃষ্ঠা–২৪২

وَاِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ

(হে মুসলমানগণ!) সে সময়কে স্মরণ কর যখন আল্লাহ পাক ঠিক যুদ্ধের সময় তোমাদের দুশমনকে তোমাদেরকে কম দেখিয়েছেন, যাতে করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইতিপূর্বে স্বপ্নে দেখে তোমাদেরকে যে সংবাদ দিয়েছেন তার সত্যতা তোমরা জাগ্রত অবস্থায় দেখতে পাও, যেন তোমাদের একীন এবং মনোবল বৃদ্ধি পায়।

وَيُقَلِّلُكُمْ فِىْ اَعْيُنِهِمْ

যেভাবে মুসলমানগণ কাফেরদেরকে অল্প সংখ্যক দেখেছেন ঠিক তেমনিভাবে কাফেররাও মুসলমানদেরকে অল্প সংখ্যক দেখেছে। কেননা যদি তারা মুসলমানদেরকে অধিক সংখ্যক দেখতো তবে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পলায়ন করতো এবং যুদ্ধের জন্যে তৈরী হতো না। আর কাফেরদের সত্তর জন নিহতও হতো না। এ পর্যায়ে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) প্রদত্ত একটি বিবরণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বদর রণাঙ্গনের নিকটে পৌঁছে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কাফেরদের সম্পর্কে খবর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে হযরত আলী (রাঃ), হযরত সা'দ এবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) এবং হযরত জোবায়ের এবনে আওয়াম (রাঃ)–কে আরো কয়েকজন সাহাবীসহ প্রেরণ করেন। তাঁরা কুপের নিকট বণী সাইদ এবনে আস এবং বনু হোজ্জাজের দু'জন গোলামকে পেয়ে গ্রেফতার করে নিয়ে আসলেন। তখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামাজে রত ছিলেন। তাই সাহাবায়ে কেরাম তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করলেন। জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমাদের পরিচয় কি?

তারা বললো আমরা কোরায়েশের খাদেম, তারা আমাদেরকে পানির জন্যে প্রেরণ করেছে। সাহাবায়ে কেরামের ধারণা ছিল এরা আবু সুফিয়ানের লোক তাই তাদের সাথে কঠোর ব্যবহার করা হলো। তখন তারা ভীত হয়ে বললোঃ আমরা আবু সুফিয়ানের কাফেলার লোক। তখন তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হলো। এ সময় হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক রাকাআত নামাজ আদায় করেই সালাম ফেরালেন এবং এরশাদ করলেনঃ যতক্ষণ তারা সত্য কথা বলছিল ততক্ষণ তোমরা তাদেরকে প্রহার করছিলে। আর যখন তারা মিথ্যা বললো তখন তোমরা তাদেরকে ছেড়ে দিলে। এরা সত্য কথা বলেছে, তারা কোরায়েশের গোলাম। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তাদের সঙ্গে কথা বললেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমরা বল, কোরায়েশদের সৈন্যরা এখন কোথায় আছে? তারা বললো

ওয়াদী কসোয়া নামক স্থানে পাহাড়ের পেছনে। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ তাদের সংখ্যা কত? তারা বললোঃ অনেক। তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ অনেক হলেও সংখ্যা কত? তারা বললোঃ প্রকৃত সংখ্যা আমাদের জানা নেই। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ এ কথা বলতে পার প্রতিদিন তাদের খাবারের জন্য কতটি উষ্ট্র জবেহ হয়?

তারা বললোঃ একদিন নয়টি, আর একদিন দশটি। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ তা হলে তাদের সংখ্যা নয়শ' থেকে এক হাজার হবে।

অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ এদের মধ্যে কোরায়েশদের কোন্ কোন্ সর্দার রয়েছে?

তারা বললোঃ উৎবা এবনে রবীয়া, শাইবা এবনে রবীয়া, আবুল বোকতারী এবনে হিশাম, হাকিম এবনে খারাম, নওফল এবনে খোয়াইলেদ, হারেস এবনে আমের এবনে নওফল, তাইমা এবনে আদি, নজর এবনে হারেশ, জোময়াহ এবনে আসওয়াদ, আবু জেহেল, ওমাইয়া এবনে খালফ, নবীয়া এবনে হোজ্জাজ, মোনাব্বা এবনে হোজ্জাজ, সাহল এবনে আমর। নামগুলো শ্রবণ করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে বললেনঃ মক্কা তার কলিজার টুকরাগুলো তোমাদের দিকে নিক্ষেপ করেছে।[১]

মূলতঃ এ জন্যই আল্লাহ পাক কাফেরদের দৃষ্টিতে মুসলমানদেরকে অল্প সংখ্যক দেখিয়েছেন যেন তারা যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ হয়। আর যুদ্ধ না হলে ইসলামের এ শত্রুদেরকে নিপাত করা সম্ভব হতো না।

বদরের যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে কম দেখার তাৎপর্য

আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমত অনন্ত অসীম। অল্প সংখ্যককে বেশী দেখা, অথবা অধিক সংখ্যককে কম দেখা এটি আল্লাহ পাকের কুদরতের একটি জীবন্ত নির্দশন। যেভাবে কারো অন্তরের চক্ষু যখন বিনষ্ট হয় তখন মন্দকে সে ভাল দেখে। ধৈর্য বা সবর অবলম্বন তার জন্যে অসম্ভব হয়ে পড়ে। অথচ বিবেক বুদ্ধি সবরকে একান্ত জরুরী মনে করে। ওহোদের যুদ্ধে বেশীকে কম বা কমকে বেশী দেখা সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের কুদরতের একটি জীবন্ত নমুনা ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর এর কারণ হলো

لِيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ط

যেন যে কাজের সম্পর্কে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে পূর্বাহ্নে সিদ্ধান্ত হয়ে আছে তা সম্পন্ন হয়। ইসলামের চরমতম শত্রুদেরকে নিপাত করার

১। তফসীরে এবন কাসীর (উর্দু), খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-১০

সিদ্ধান্ত আল্লাহ পাক ইতিপূর্বেই গ্রহণ করেছেন। আর তা বদরের যুদ্ধে কার্যকর হয়েছে। সব কিছু আল্লাহ পাকের নিকটই প্রত্যাবর্তিত হয়ে থাকে। সর্বত্র আল্লাহ পাকের ইচ্ছাই কার্যকর হয়।

যুদ্ধের শুরুতেই কাফেররা মুসলমানদেরকে অত্যন্ত অল্প সংখ্যক দেখেছে। কিন্তু যখন যুদ্ধ শুরু হলো তখন মুসলমানদেরকে কাফেররা তাদের প্রকৃত সংখ্যা থেকে দ্বিগুণ দেখেছে। যেমন সূরায়ে আল এমরানে এ সম্পর্কে এরশাদ হয়েছেঃ

وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ

বর্ণিত আছে যে, আবু জেহেল যুদ্ধের শুরুতে মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলঃ মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এবং তার সাহাবীরা আমাদের উষ্ট্রের একটি মাত্র লোকমা হবে। এদের সঙ্গে হাতিয়ার দিয়ে লড়াই করোনা। আর তাদের সঙ্গে হাতিয়ার ব্যবহার করোনা। এমনিই ধরে ফেলো এবং বেঁধে মক্কা নিয়ে চল। কিন্তু যখন লড়াই শুরু হলো তখন আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে কাফেরদের দৃষ্টিতে দ্বিগুণ দেখিয়ে দিলেন। এ দৃশ্য দেখে অনেক কাফের ভীত সন্ত্রস্ত হলো এবং অবশেষে পরাজিত হলো।[১]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا

হে মোমেনগণ! যখন তোমরা কোন শত্রু সৈন্যের মোকাবেলা কর তখন তোমরা অটল অবিচল থাকবে এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহ পাককে স্মরণ করবে হয়ত তোমরা সফলকাম হবে।

জিহাদে বিজয় লাভের পন্থা

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে বদরের জেহাদের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াতে মুসলমানদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদে বিজয় লাভের পথ নির্দেশ করা হয়েছে। হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা এ কথার প্রতি বিশ্বাস কর যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন দুর্বল এমনকি নিবস্ত্রপ্রায় অসহায় দলকে সবল শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে বিজয়ী করতে পারেন। অতএব, কাফেরদের মোকাবেলায় তোমাদের দুর্বল হওয়ার কোন কারণ নেই, বরং যখন কাফেরদের সঙ্গে তোমাদের সংঘর্ষ বাঁধে তখন কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে তোমরা বিশেষভাবে সতর্ক থাকবে এবং বিজয় লাভের সুনির্দৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করবে।

(১) তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৪৩-৪৪

এ পর্যায়ে প্রথম কথা হলো, তোমরা কাফেরদের মোকাবেলায় অটল অবিচল থাকবে। কোন অবস্থাতেই মনোবল হারাবে না। কেননা অস্ত্রবল বা বাহুবল অকেজো হয়ে যায় যদি মনোবলের অভাব হয়। আর দ্বিতীয় কথা হলো তোমরা অধিক পরিমাণে আল্লাহ্ পাককে স্মরণ করবে, আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমেই মর্দে মোমেন ঈমানী শক্তি অর্জন করে। অতএব, জেহাদের সময় অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকির করতে থাক। আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমেই মোমেনের ঈমান ও একীন বৃদ্ধি পায়। যে আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য এই জেহাদ, তাঁর জিকিরের মাধ্যমেই মর্দে মোমেন শক্তি অর্জন করে। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুর্তবী লিখেছেনঃ

امر بالذكر حتى يثبت القلب على اليقين

"আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে জেহাদের সময় আল্লাহর জিকিরের আদেশ এ জন্যে দিয়েছেন যেন অন্তরে আল্লাহ পাকের প্রতি একীন সুদৃঢ় হয়।" বস্তুতঃ আল্লাহর প্রতি একীনই হলো মুসলমানদের শক্তির মূল উৎস। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে জেহাদে সাফল্য লাভের দু'টি কর্মসূচী দিয়েছেন (১) দুশমনের মোকাবেলায় অটল অবিচল থাক, সাহস হারা হয়োনা, দুশমনের মোকাবেলা থেকে পলায়ন করোনা। কেননা যুদ্ধে যদি প্রাণ যায় তবে শাহাদতের দুর্লভ মর্তবা পাওয়া যায়। আর যদি মুজাহেদ জীবিত থাকে তবে গাজী হওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়। অতএব, মোমেনকে হতে হবে সৎ সাহসী, বলিষ্ঠ মনের অধিকারী, দুশমনের মোকাবেলায় অত্যন্ত তৎপর এবং অটল অবিচল।

(২) জেহাদের ঐ কঠিন মুহূর্তেও অধিক পরিমাণে আল্লাহ পাককে স্মরণ করতে হবে। এভাবেই আল্লাহ পাকের তরফ থেকে সাহায্য লাভ হবে। কেননা সাফল্য আল্লাহ পাকের সাহায্যের মাধ্যমেই হয়। অতএব, অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকির করা কর্তব্য। আর এই কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমেই সাফল্য তথা বিজয় লাভ হবে।১

আল্লাহর জিকির একটি হাতিয়ার

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক মোমেনদেরকে জেহাদে সাফল্য লাভের পন্থা শিক্ষা দিয়েছেন। যুদ্ধে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে বলেছিলেনঃ "হে লোক সকল! তোমরা দুশমনের সঙ্গে সংঘর্ষের আকাংখা করোনা। আল্লাহ পাকের দরবারে সকল প্রকার বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তার জন্যে ফরিয়াদ করতে থাক। কিন্তু দুশমনের সঙ্গে যুদ্ধ যদি বেঁধেই যায় তবে অটল অবচিল থাক। মনে রেখো জান্নাত তরবারির ছায়াতলে।"

(১) তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৪৫

এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের মহান দরবারে এভাবে দোয়া করেছেনঃ হে সত্য কিতাব অবতরণকারী। হে মেঘমালা প্রেরণকারী! হে সৈন্যদেরকে পরাজিতকারী আল্লাহ! এ কাফেরদেরকে পরাজিত করো এবং তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর। (বাখারী, মুসলিম)

আবদুর রাজ্জাকের বর্ণনা হলো এই, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমরা দুশমনের মোকাবেলার আকাংখা করোনা কিন্তু যখন যুদ্ধ শুরু হয় তখন সংকল্পের দৃঢ়তার পরিচয় দাও এবং অটল অবিচল থাক। যদি দুশমন চিৎকারও দেয় তবে তোমরা নিরব থাকবে।

তেবরানীতে রয়েছে, তিনটি সময় এমন আছে যখন আল্লাহ পাক নিরবতাকে পছন্দ করেন।

(১) পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করার সময় শ্রোতাদের নিরবতা পালন করা।

(২) জেহাদের সময়

(৩) জানাজার সময়।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কাতাদা (রঃ) বলেছেনঃ যখন যুদ্ধ হয় ঘোরতর তখনও আল্লাহর জিকিরকে অবশ্য কর্তব্য করা হয়েছে।

তফসীরকার আতা (রঃ) বলেছেনঃ যুদ্ধের সময় নিরব থাকা এবং আল্লাহর জিকির করা অবশ্য কর্তব্য অতঃপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেছেন।

আর কাবে আহবার (রঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ পাকের নিকট কোরআনে করীমের তেলাওয়াত এবং আল্লাহর জিকিরের চেয়ে অধিকতর প্রিয় কোন জিনিষ নেই।১

১। তফসীরে এবন কাসীর (উর্দু), খন্ড–১১, পৃষ্ঠা–১২

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ
وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ
خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن
سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٤٧﴾ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ
الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ
إِنِّي جَارٌ لَّكُمْ ۖ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ
إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ۚ وَاللَّهُ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤٨﴾

তরজমা

(৪৬) আর আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের হুকুম মেনে চল এবং আত্মকলহে লিপ্ত হবেনা, নতুবা তোমরা সাহসহারা হয়ে পড়বে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। আর তোমরা সবর অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক সবর অবলম্বনকারীদের সাথে রয়েছেন।

(৪৭) আর তোমরা তাদের ন্যায় হয়োনা, যারা দম্ভ ভরে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে তাদের ঘর থেকে বের হয়েছিল এবং মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বারণ করতো। আর তাদের যাবতীয় কীর্তিকলাপ আল্লাহ পাকের আয়ত্তে রয়েছে।

(৪৮) আর স্মরণ কর সে সময়কে যখন শয়তান তাদের চোখে তাদের কার্যাবলীকে সাজিয়ে দিয়েছিল এবং বলেছিল আজ কেউ তোমাদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সাথেই রয়েছি। এরপর যখন উভয় দল পরস্পরের সম্মুখীন হয় তখন শয়তান পশ্চাদপদে সরে যায় এবং বলে আমি তোমাদের সাথে নেই তোমরা যা দেখতে পাওনা আমি তা দেখি, আমি আল্লাহকে ভয় করি আর আল্লাহর শাস্তি অত্যন্ত কঠিন।

তফসীরুল কোরআন

আলোচ্য আয়াত সমূহে জেহাদে বিজয় লাভের পথ-নির্দেশ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতে এ সম্পর্কে দু'টি কর্মসূচী পেশ করা হয়েছে (১) যুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন যে কোন অবস্থায় দুশমনের মোকাবেলায় অটল অবিচল থাক।

(২) অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করতে থাক।

আলোচ্য আয়াতে আরো দু'টি কর্মসূচী তথা তৃতীয় ও চতুর্থ কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়েছে যার মাধ্যমে মুসলমানদের বিজয় সুনিশ্চিত হবে।

(৩) আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের হুকুম মেনে চলা, আনুগত্য প্রকাশ করা। এ আনুগত্যের বরকতেই বিজয়ের গৌরব অর্জন করা যাবে। আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের বিধি-নিষেধ যথাযথ ভাবে পালনের মধ্যেই রয়েছে মুসলিম জাতির সাফল্য।

(৪) জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি রক্ষা করা। কোন অবস্থাতেই পরস্পর কলহ-দ্বন্দ্বে লিপ্ত না হওয়া। পরস্পরের মধ্যে যদি কলহদ্বন্দ হয় তবে তার পরিণাম হয় অত্যন্ত ভয়াবহ, আত্মকলহে লিপ্ত কোন জাতি শুধু যে পৃথিবীতে উন্নতি করতে পারেনা তা নয়; বরং আত্মরক্ষাও করতে পারেনা। তাই আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ প্রদান করা হয়েছেঃ

وَلَا تَنَازَعُوا

তোমরা পরস্পর কলহ দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়োনা। যদি পরস্পর কলহ দ্বন্দ্বে লিপ্ত হও তবে দু'টি বিপদে নিপতিত হবে।

فَتَفْشَلُوا

তোমরা সাহস হারা হয়ে পড়বে, পরস্পরের কলহ দ্বন্দ্বের কারণে মুসলমানদের শক্তি খর্ব হবে, একতার বল বিদায় নেবে, আর তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ তোমরা সাহস হারা হয়ে পড়বে।

وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ

অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে দুশমনদের উপর তোমাদের যে দাপট ছিল তা থাকবে না। বরং দুশমনের দুঃসাহস বেড়ে যাবে এবং বিজয় লাভের আশা সুদূর পরাহত হবে।

আলোচ্য আয়াতের

৩

ريح শব্দটি সম্পর্কে সুদ্দী (রঃ) বলেছেনঃ এর অর্থ হলো বীরত্ব। আর নজর এবনে সোমায়েল বলেছেনঃ এর অর্থ শক্তি। আর তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেনঃ এর অর্থ হলো ব্যাগবান হওয়া, পরস্পরের রেশারেশী কলহ–দ্বন্দ্ব জাতীয় জীবনে বিপদ ডেকে আনে, তাই এ সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

(৫) মর্দে মোমেনকে বিজয় লাভের জন্যে যে কর্মসূচী দেয়া হয়েছে তা হলো দুশমনের মোকাবেলায় যত কষ্টই হোকনা কেন যে কোন মূল্যে তোমরা সবর অবলম্বন কর, ধৈর্য্য ধারণ কর। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَاصْبِرُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

আর তোমরা সবর অবলম্বন কর, ধৈর্য্য ধারণ কর, নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ পাক সবর অবলম্বনকারীদের সঙ্গে রয়েছেন। অর্থাৎ দুনিয়াতে আল্লাহ পাকের সাহায্য তারাই লাভ করে যারা সবর অবলম্বন করে, আর আখেরাতেও উত্তম বিনিময় তারাই লাভ করবে। আর আল্লাহ পাকের সাহায্য লাভের ফলশ্রুতি হলো নিশ্চিত বিজয়। অতএব জেহাদে বিজয় লাভের জন্যে শুধু জনবল এবং অস্ত্রবলই যথেষ্ট নয়, বরং এর জন্যে চাই আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের একান্ত অনুগত হওয়া, আত্মকলহ পরিহার করা এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দেয়া। দুশমনের মোকাবেলায় অটল অবিচল থেকে নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করা এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহ পাককে স্মরণ করা। মূলতঃ পবিত্র কোরআনে বর্ণিত এ গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমেই মুসলিম জাতি বিজয়লাভে সক্ষম হয়।

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّرِئَآءَ النَّاسِ

জেহাদ শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে

পূর্ববর্তী আয়াতে জেহাদে বিজয় লাভের পাঁচটি কর্মসূচী পেশ করা হয়েছে। এ আয়াতেও আরো দু'টি কর্মসূচী রয়েছে। এ আয়াতে বিশেষভাবে নিয়ত সঠিক করার তাগিদ রয়েছে এবং দম্ভ, অহমিকা, অহংকার পরিহার করার বিশেষ নির্দেশ রয়েছে এবং জেহাদ যেন শুধু এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়, লোক দেখানোর কোন অসৎ উদ্দেশ্য যেন না থাকে সেদিকে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখারও তাগিদ রয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَا تَكُوْنُوْا

(৬)"আর তোমরা তাদের ন্যায় হয়োনা যারা দম্ভ ভরে লোক দেখানোর উদ্দশ্যে নিজেদের ঘর থেকে বের হয়েছে। আর যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বারণ রেখেছে।" আলোচ্য আয়াতে আবু জেহেল বদরের যুদ্ধের সময় যেভাবে দম্ভ প্রকাশ করেছিল তার প্রতি ইঙ্গিত করে মুসলমানদেরকে এ সম্পর্কে সতর্ক থাকার নির্দেশ রয়েছে। আবু জেহেল মক্কা থেকে বের হয়েছিল আবু সুফিয়ানের বানিজ্য কাফেলার হেফাজতের জন্যে। আবু সুফিয়ান যখন নিরাপদে মক্কার দিকে অগ্রসর হলো, তখন আবু জেহেলকে খবর দেয়া হলো যে এখন আর মদীনার দিকে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু আবু জেহেল ছিল দাম্ভিক, সে স্বদম্ভে বললোঃ যখন একবার বের হয়ে এসেছি তখন এত সহজে মক্কা ফিরবো না। আরববাসী জানুক যে, মক্কার সরদার আবু জেহেল এসেছে। তাই বদরের প্রান্তরে যাব, আনন্দ উৎসব করবো, নর্তকী এবং গায়িকারা নাচ গান করবে, মদ্যপান করে সকলে আনন্দে মত্ত হবো এবং তিন দিন পর্যন্ত উট জবেহ করে মানুষকে ধুমধাম সহকারে আহার করাবো, এরপর মক্কা যাব, তার আগে নয়।"

আবু জেহেলের এ কথা আংশিক ভাবে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। কেননা তাকে আর মক্কায় ফিরে যেতে হয়নি। সে বদরের রণাঙ্গনেই পান করেছে মৃত্যুর পেয়ালা। গান বাজনায় আকাশকে মুখরিত করেনি তবে বিলাপ ও আর্তনাদে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়েছে। মজলুম জালেমের বিরুদ্ধে দাড়িয়েছে, তৌহিদের পতাকা উড্ডীন হয়েছে। সত্য ন্যায়ের ভিত্তি প্রস্তর রাখা হয়েছে বদরের প্রান্তরে।

বিশ্বমানবের ইতিহাস সেদিন পরিবর্তন হয়েছে, দুর্গত জরাজীর্ণ মানবতা নবপ্রাণ লাভ করেছে। যে সত্যটি বদরের রণাঙ্গনে সেদিন প্রমাণিত হলো তা হচ্ছে সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী, আর অহংকার আল্লাহ পাক পছন্দ করেননা। অহংকারীকেও তিনি পছন্দ করেন না। তাই অহংকারের পরিণাম হয় ভয়াবহ, মুসলমান যেন অহংকার না করে, কথায় বা কাজে যেন কোন প্রকার অহংকারের ভাব প্রকাশ না পায় সেদিকে সতর্ক সৃষ্টি রাখা একান্ত কর্তব্য।

رِئَاءَ النَّاسِ

(৭) আরো একটি কর্মসূচী হলো মুসলমান যেন কোন সময়ই লোক দেখানোর জন্য কিছু না করে। বরং এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই মর্দে মোমেনের জীবন সাধনা। তাই অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন–

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

হে রসূল! আপনি ঘোষণা করুন, নিশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার সকল এবাদত এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। অতএব মুসলমান যেন লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কাজ না করে যেমন মক্কার পৌত্তলিকরা দম্ভভরে বের হয়েছে এবং লোক দেখানোর জন্য কাজ করেছে, অহংকারী পৌত্তলিকরা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রেখেছে তথা মানুষ যেন আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান না আনে তারা এই চেষ্টা করেছে।

وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ

আল্লাহ পাক তাদের কার্যাবলীকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন অর্থাৎ তাদের কোন আমলই আল্লাহ পাকের নিকট গোপন নেই, তাই কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তাদেরকে শাস্তি দেবেন।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এই আয়াতে আল্লাহ পাক কাফেরদের উদ্দেশ্যে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।[১]

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ

শয়তানের ধোকা

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এই আয়াতের তফসীরে লিখেছেনঃ আবু জেহেলকে ইবলিস শয়তান বদরের দিনও ধোকা দিয়েছে। সোরাকা এবনে মালেকের আকৃতি ধারণ করে ইবলিস শয়তান আবু জেহেলের নিকট হাজির হয় এবং আবু জেহেলকে বলে আমি বনু মোদলাজ গোত্রের সরদার। সমস্ত লোক আমার অনুগত, আমি তোমাদের সঙ্গে রয়েছি। আর তোমাদের বিজয় সুনিশ্চিত। কিন্তু যখন মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় তখন ইবলিস ফেরেশতাদেরকে দেখতে পেয়ে পলায়ন করে এবং বলে আমি যা দেখি তোমরা তা দেখনা।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন বদরের দিন ইবলিস তার পতাকা উচু করে বনু মোদলাজ গোত্রের সরদারের আকৃতি ধারণ করে তার দল বল সহ হাজির হয় এবং কাফেরদের সাহস বৃদ্ধি করে। যখন যুদ্ধ শুরু হয় তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক মুষ্টি কংকর হাতে নিয়ে কাফেরদের দিকে নিক্ষেপ করলেন ফলে কাফেরদের অবস্থা বিপদজনক হয়ে পড়লো। তারা

(১) তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৪৩
তফসীরে কবীর, খন্ড-১৫, পৃষ্ঠা-১৭৪

পলায়ন'পর হলো। হযরত জীব্রাইল (আঃ) শয়তানের দিকে এগিয়ে গেলেন। এ সময় শয়তান একজন মোশরেকের হাতে হাত দিয়ে রেখেছিল। হযরত জীব্রাইল (আঃ)–কে দেখে সে হাত ছেড়ে ছিল এবং তার দলবল সহ পলায়ন করলো। তখন ঐ ব্যক্তি বললো তুমি না আমাদের সাহায্যে এসেছিলে? এখন কি করছ?

إِنِّىٓ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّىٓ أَخَافُ ٱللَّهَ

তখন অভিশপ্ত ইবলিস বললো আমি যা দেখি তোমরা তা দেখনা আর আমি আল্লাহকে ভয় করি। আর আল্লাহ পাকের শাস্তি অত্যন্ত কঠিন।

এই পর্যায়ে অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে ইবলিস শয়তান পলায়ন করার সময় হারেস এবনে হেশাম নামক এক মোশরেক তাকে ধরে ফেলেছিল। তখন ইবলিস তাকে এত জোরে এক চাপড় মারে যে, সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। অন্য লোকেরা তাকে বলেঃ হে সোরাকা! তুমি এমন সময় আমাদের থেকে বিদায় নিচ্ছ? এবং আমাদেরকে ধোকা দিচ্ছ? ইবলিস বললো তোমাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি যা দেখি তোমরা তা দেখনা।১

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَعْمَٰلَهُمْ

আর স্মরণ কর সে সময়কে যখন শয়তান তাদের মন্দ কাজকে সুন্দর করে দেখিয়েছিল এবং বলেছিল আজ কেউ তোমাদের উপর জয়ী হতে পারবে না। আর আমি তোমাদের সঙ্গেই আছি।

أَعْمَٰلَهُمْ

তাদের মন্দ কাজ

আল্লামা সানউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, তাদের মন্দ কাজের ব্যাখ্যা হলো হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে শত্রুতা করা, তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করা এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। আর "আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কেউ জয়ী হতে পারবে না"– এ কথার তাৎপর্য হলো তোমাদের সংখ্যা অনেক তোমরা সমৃদ্ধশালী এবং আমার দলবল তোমাদের সাহায্যে রত রয়েছে। অতএব, তোমাদের

১। তফসীরে এবন কাসীর (উর্দু) খন্ড–১১, পৃষ্ঠা–১৩–১৪

বিজয় হবেই, আর কাফেরদের মন্দ ও নিন্দনীয় কাজকে সুন্দর করে সাজিয়ে পেশ করার তাৎপর্য হলো তোমরা যা কিছু করছ সবই ভাল কাজ। এই কাজের মাধ্যমেই তোমাদের জীবনের সাফল্য অর্জিত হবে।

বর্ণিত আছে যে, বদরের যুদ্ধের পর লোকেরা যখন মক্কায় সোরাকাকে দেখলো তখন তাকে বললোঃ তুমি বদরের রণাঙ্গনে আমাদেরকে ধোকা দিয়েছ। সোরাকা বললোঃ আমি তোমাদের কোন বিষয়ে কিছুই জানিনা। আমি বদরে কোন সময় যাইনি। তখন মক্কাবাসী সোরাকার কথা বিশ্বাস করলোনা। কিন্তু কিছুদিন পর যখন তারা ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং শয়তানের সম্পর্কে কোরআনে করীমের আয়াত সমূহ শ্রবণের পর উপলব্ধি করলেন যে, বদরের রণাঙ্গনে সোরাকার রূপ ধারণ করে ইবলিস শয়তানই এসেছিল।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, ইবলিস একথা বলেছিল যে, "আমি যা দেখি তা তোমরা দেখনা"–এ কথাটি সত্য বলেছিল কেননা সে ফেরেশতাদেরকে দেখেছিল। কিন্তু এরপর সে বলেছিল

إِنِّيْ أَخَافُ اللّٰهَ

(নিশ্চয়ই আমি আল্লাহকে ভয় করি) এ কথাটি সে মিথ্যা বলেছে। কেননা তার অন্তরে আল্লাহর ভয় ছিল না, বরং এর দ্বারা সে লোকদেরকে ধোকা দেয়ার চেষ্টা করেছে।

তফসীরকার আতা (রঃ) আলোচ্য বাক্যটির এই অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, ইবলিস বলেছে আল্লাহর তরফ থেকে আমার এই ভয় হয় যে অন্যদের সঙ্গে আমাকেও তিনি ধ্বংস করে দেন। এই আশংকা আমার হয়েছে

কালবী (রঃ) বলেছেনঃ শয়তান জীব্রাইল (আঃ)–এর সম্পর্কে ভয় করছিল যে জীব্রাইল (আঃ) তাকে ধরে মানুষের সম্মুখে তার প্রতারণা সম্পর্কে সব রহস্য ফাঁস করেদেবেন।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য বাক্যটির অর্থ হলো আমি আল্লাহ পাকের প্রতিশ্রুতির সত্যতা সম্পর্কে অবগত। তিনি তাঁর বন্ধুদেরকে সাহায্য করে থাকেন। আর কোন কোন তফসীরকার আলোচ্য বাক্যটির এই ব্যাখ্যা করেছেন যে তোমাদের সম্পর্কে আমি আল্লাহকে ভয় করি। কেননা তিনি কঠোর শাস্তি দিয়ে থাকেন।

হযরত তালহা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ শয়তান আরফার দিনে যখন দেখে যে, আল্লাহ পাকের

রহমত নাজিল হচ্ছে এবং মানুষের অনেক বড় বড় গুণাহ আল্লাহ পাক মাফ করে দিচ্ছেন এ অবস্থা দেখে তাকে অত্যন্ত অপমানিত ও রাগান্বিত দেখা যায় শুধু বদরের দিন ব্যতীত। কেননা এমন অপমানিত আর লাঞ্ছিত অবস্থায় তাকে কখনও দেখা যায়নি। তখন আরজ করা হলো ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

শয়তান বদরের দিন কি দেখেছিল যে সে ঐ দিন নিজেকে এত অপমানিত মনে করলো? তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ সে দেখেছিল জীব্রাইল (আঃ) ফেরেশতাদেরকে তাদের দায়িত্ব ভাগ করে দিচ্ছেন। এই অবস্থা দেখে সে তার যাবতীয় প্রতারণাকে ব্যর্থ মনে করলো।১

এখানে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, যদিও আবু জেহেল এবং তার সঙ্গীরা বাগাড়ম্বর করছিল কিন্তু তাদের একটা বিষয়ে আশংকা ছিল যে কেনানা গোত্রের লোকেরা এ মুহূর্তে কি ভূমিকা পালন করবে? কেননা বহুদিন ধরে তাদের সঙ্গে কোরায়েশদের যুদ্ধ চলছিল। এই অবস্থায় শয়তান কেনানা গোত্রের সরদারের বেশে ঐ গোত্রের পক্ষ থেকে সহযোগীতার আশ্বাস দেয়। সে (শয়তান) বলে "চিন্তার কোন কারণ নেই, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। "কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতাই যে শয়তানের বৈশিষ্ট্য।

إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم
مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ ۗ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٩﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا ۙ الْمَلَائِكَةُ
يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٥٠﴾ ذَٰلِكَ
بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٥١﴾ كَدَأْبِ
آلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ
اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٢﴾

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৪৫-৪৬

তরজমা

(৪৯) এবং স্মরণ কর সে সময়কে যখন মোনাফেকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা বলতে থাকে এই "লোকদেরকে তাদের দ্বীন বিভ্রান্ত করেছে।" আর যে কেউ আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করে তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক অত্যন্ত পরাক্রমশালী এবং অতীব প্রজ্ঞাময়।

(৫০) (হে রসূল!) যদি আপনি দেখতে পেতেন (সেই ভয়াবহ দৃশ্য) যখন ফেরেশতাগণ কাফেরদের মুখ ও পিঠে আঘাত করে তাদের প্রান হরণ করতে থাকে এবং বলে, "তোমরা দহন যন্ত্রনা ভোগ কর।"

(৫১) (এই শাস্তি) তোমরা যা সহস্তে পূর্বে প্রেরণ করেছিলে তারই পরিণাম, আর নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের উপর জুলুম করেন না।

(৫২) ফেরাউনের পরিজন এবং তাদের পূর্ববর্তী লোকদের ন্যায় এরা আল্লাহর নির্দেশকে প্রত্যাখ্যাণ করে; আল্লাহ পাক তাদের পাপাচারের জন্য তাদেরকে পাকড়াও করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক অত্যন্ত শক্তিশালী, শাস্তি প্রদানে কঠোর।

তফসীরুল কোরআন

اِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ

বদরের রণাঙ্গনে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন। আর কাফেরদের সংখ্যা ছিল ১০০০। কাফেররা সর্ব প্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল। নগন্য সংখ্যক নিরস্ত্র প্রায় মুসলমানদের মনোবল দেখে মদীনাবাসী মোনাফেকরা বলতে লাগলোঃ এই মুসলমানগণ আসলে ধর্মান্ধ হয়ে গেছে। এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের মোকাবেলায় তারা রণাঙ্গনে উপস্থিত হয়েছে। তারা নিজেদেরকে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকেই ঠেলে দিচ্ছে। কেননা নিজেদের চেয়ে অনেক বেশী সৈন্যের মোকাবেলা তাদের পক্ষে কিভাবে সম্ভব হতে পারে।

وَالَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ

একথা শুধু মোনাফেকরাই বলেনি বরং সে সব লোকেরাও একথা বলেছে যাদের চিত্ত ছিল দুর্বল, অন্তরে ছিল সন্দেহ, যাদের ঈমান খাঁটি ছিল না।কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, তারা মুশরেক ছিলো। আর কেউ বলেছেন তারাও মোনফেকই ছিল। আল্লামা বগভী লিখেছেন, রুগ্ন অন্তর বিশিষ্ট লোক যাদেরকে বলা হয়েছে তারা হল সে সব লোক, যারা মক্কায় ইসলাম কবুল করেছিলো কিন্তু হিজরত করেনি। যখন পৌত্তলিকরা বদরের ময়দানে গমন করে তখন তাদেরকেও সংগে যেতে বাধ্য করে।

রণাঙ্গনে মুসলমানদের সংখ্যা কম দেখে তাদের মনে ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগে তারা মোরতাদ হয়ে যায় তখন বলে, পবিত্র কোরআনের ভাষায়,

غَرَّ هٰٓؤُلَآءِ دِيْنُهُمْ

(মুসলমানদেরকে তাদের ধর্ম ধোকা দিয়েছে)

যারা সেদিন এই সব আপত্তিকর মন্তব্য করেছে তারা সকলেই বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছে। তারা ছিল কায়েস এবনে ওলীদ এবনে মুগীরা মখজুমী, আবু কায়েস এবনে ফাকেহ এবনে মুগীরা মখজুমী, হারেস এবনে জুমায়া এবনে আসওয়াদ, আলী এবনে উমাইয়া, আস এবনে মোনাব্বাহ এবনে হাজ্জাজ।[১]

ইমাম রাজী (রহঃ) এই আয়াত সম্পর্কে লিখেছেন আলোচ্য আয়াতে মোনাফেক বলা হয়েছে মদীনার আউস এবং খাজরাজ গোত্রের লোকদেরকে, আর যাদের চিত্ত রুগ্ন বলা হয়েছে তারা হল মক্কার সে সব লোক যারা ইসলাম কবুল করেছিল কিন্তু তাদের ঈমান দুর্বল ছিল বলে তারা হিজরত করেনি। মক্কা থেকে যখন মোশরেকরা বদরের জন্য রওনা হয় তখন তারাও সংগী হয় এই ধারণায়, যদি হযরত মোহাম্মদ (সঃ)–এর সংগীদের সংখ্যা বেশী হয় তবে তাঁর নিকট চলে যাবে আর যদি মুসলমানদের সংখ্যা কম হয় তবে নিজেদের সম্প্রদায়ের সাথেই থাকবে। এবনে ইসহাক বলেছেন, এই সব লোক বদরের যুদ্ধের দিন নিহত হয়। আলোচ্য আয়াতে মোনাফেকদের ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে যে, দুশমনের বিরুদ্ধে অল্প সংখ্যক মুসলমানদের মনোবল তাদের ধর্মান্ধতা নয়, বরং প্রকৃত অবস্থা হল সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের প্রতি মুসলমানদের যে পরিপূর্ণ বিশ্বাস এবং ভরসা রয়েছে এটি হল তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্রতিটি মুসলমানের অন্তরে এই অটুট বিশ্বাস রয়েছে যে আল্লাহ পাক যা ইচ্ছা তা করেন সবলকে দূর্বল করা দূর্বলকে সবল প্রমাণিত করা আল্লাহ পাকের পক্ষে সর্বদা সহজ এবং সম্ভব। আর আল্লাহ পাক স্বয়ং এরশাদ করেছেন,

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ

১। তফসীরে কবীর, খন্ড–১৫, পৃষ্ঠা–১৭৬

"যে আল্লাহ পাকের প্রতি ভরষা করে তিনি তার জন্য যথেষ্ট"। আরও এরশাদ হয়েছে

যে শক্তির কারণে মুমেনগণ দুশমনের মোকাবেলায় অনমনীয় এবং অবিচলিত তা তাদের জনবল বা অস্ত্রবল নয়, বরং তা হল ঈমানী বল। সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমানের কারণে প্রত্যেকটি মুমেনই ঈমানী বলে বলীয়ান হয়। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও ভরসার কারণে মুমেনের অন্তরের গোপনতম প্রকোষ্ঠে যে শক্তি সৃষ্টি হয় তা মুমেন মাত্ররই উপলব্ধির ব্যাপার। যারা মুমেন নয়, তারা এই সত্যের সন্ধান পায়না। তাই পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

আর যে আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখে সে অপমানিত হয়না, সে দুর্বল হয়না। আর একথা নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে আল্লাহ পাক পরাক্রমশালী, তিনি বিজ্ঞানময় তাঁর প্রতিটি কাজ হেকমতপূর্ণ, তাৎপর্যবহ। তিনি সকল অবস্থায়ই তাঁর প্রতি নির্ভরশীল লোকদেরকে বিজয় দান করতে পারেন। কিন্তু যদি কোন সময় বিজয় দান না করেন তবে তা হয় কোন বিশেষ হেকমতের কারণে।১

ইমাম রাজী (রহঃ) এই বাক্যটির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে–আর যে আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করে তথা যে নিজের বিষয় আল্লাহ পাকের উপর সপর্দ করে আল্লাহ পাকই তাকে হেফাজত করেন এবং সাহায্য করেন কেননা তিনি পরাক্রমশালী, তাঁর কতৃত্ব সর্বত্র সু প্রতিষ্ঠিত, তিনি প্রজ্ঞাময় তাঁর দুশমনদেরকে তিনি শাস্তি দিয়ে থাকেন এবং তাঁর প্রিয় বন্দাদের দান করে থাকেন সওয়াব এবং রহমত।[২] আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) এই বাক্যটির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ ভরসা রাখে সে কোন দিনও অপমানিত হয়না, কেননা আল্লাহ পাক পরাক্রমশালী, সর্বশক্তিমান, আর তিনি বিজ্ঞানময় হেকমতওয়ালা, তিনি তাঁর হেকমতের কারণে এমন কাজ করেন যা মানুষের জন্য হয় কল্পনাতীত। এজন্য বদরের যুদ্ধে কাফেরদের পরিণাম এত ভয়াবহ হয়েছে যা তাদের জন্য ছিল সম্পূর্ণ অচিন্তনীয় ও অকল্পনীয়।

১। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা–২৩৭
তফসীরে মাজেদী, খন্ড–১, পৃষ্ঠা–৩৮৬
২। তফসীরে কবীর, খন্ড–১৫, পৃষ্ঠা–১৭৭

দুনিয়াতে কাফেরদের অপমান পরাজয় এবং নিহত হওয়ার বর্ণনার পর আখেরাতে তাদের যে কঠোর শাস্তি হবে তার উল্লেখ রয়েছে পরবর্তী আয়াতে।

وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمَلٰٓئِكَةُ
يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ

হে রসূল! যদি আপনি কাফেরদের মৃত্যুকালীন মর্মান্তিক দৃশ্য দেখতেন যখন তাদেরকে ফেরেশতারা তাদের মুখ এবং পিঠে প্রহার করে তাদের রূহ কবজ করে, তখন ফেরেশতাগণ বলে এই শাস্তিতো শুধু সূচনা মাত্র এরপর আলমে বরজখ বা মধ্যলোকের শাস্তি এবং আখেরাতের তথা পরকালের শাস্তি তোমাদের জন্য রয়েছে অবধারিত। বদরের যুদ্ধে কাফেররাও এই শাস্তি ভোগ করেছে। বস্তুতঃ কাফেরদের মৃত্যুকালীন অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ।

يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ

অর্থাৎ ফেরেশতাগণ কাফেরদেরকে অগ্নির কোড়া দিয়ে তাদের মুখে এবং পৃষ্ঠে প্রহার করে থাকে। তফসীরকার সায়ীদ এবনে যুবাইর (রাঃ) ও মুজাহেদ (রহঃ) বলেছেন। আলোচ্য আয়াতে ادبارهم শব্দটি দ্বারা তাদের নিতম্ব উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আল্লাহ পাক এর দ্বারা তাদের কঠোর শাস্তির কথাই ঘোষণা করেছেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, যে শাস্তির কথা আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে তা বদরের যুদ্ধের ঘটনা। মধ্যলোকের বিষয় নয়। বদরের যুদ্ধে যখন মুশরেকরা মুসলমানদের দিকে অগ্রসর হত তখন ফেরেশতাগণ তাদের মুখের উপর তরবারী দিয়ে আঘাত দিতেন। আর যখন তারা পলায়ন করতো তখন তাদের পৃষ্ঠে প্রহার করতেন। এভাবে ফেরেশগন কাফেরদেরকে হত্যা করেন। তখন ফেরেশতাগণ একথাও বলেছেন, ভবিষ্যতে অগ্নির শাস্তি ভোগ করবে। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, ফেরেশতাগণ লোহার বরুজ দ্বারা কাফেরদেরকে প্রহার করতেন। এজন্য ফেরেশতাদের প্রহারের কারণেই তাদের দেহ অগ্নিদগ্ধ হত।[১]

এই আয়াত সম্পর্কে ইমাম রাজী (রেহঃ) বলেছেন কাফেরের রুহ যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, যখন তাদের দুনিয়ার জীবনের অবসান ঘটে তখন সে চরম কষ্ট পায়। এ দিকে যখন সম্মুখে তাকায় তখন অন্ধকার ছাড়া সে কিছুই দেখেনা, তখন দু'দিক থেকেই সে কষ্ট ভোগ করে। এই নিষ্ঠুর পরিণাম প্রত্যেক কাফেরের জন্যই অপেক্ষা করছে।[২]

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৪৮

২। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৫, পৃষ্ঠা-১৭৮

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ

আর কাফেরদের এই শাস্তির জন্যে তারা নিজেরাই দায়ী। তাই এরশাদ হয়েছে যে, এই শাস্তি তোমাদের কৃতকর্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ব্যতীত আর কিছুই নয়। যে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন যাঁর অনন্ত অসীম নেয়ামত তোমরা সারাজীবন ভোগ করেছ তাঁর একত্ববাদকে তোমরা অস্বীকার করেছো, তাঁর বিধি-নিষেধকে অমান্য করেছো তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়েছো তিনি দয়া করে তোমাদের হেদায়েতের জন্যে নাজিল করেছেন পবিত্র কোরআন তোমরা তাকে অবিশ্বাস করেছ, তিনি তোমাদের হেদায়েতের জন্যে তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীকে প্রেরণ করেছেন তোমরা তাঁকে ভক্তি ও বিশ্বাস করনি। অতএব, এই শাস্তি তোমাদের কৃত কর্মেরই পরিণতি। আর এর দ্বারা তোমাদের প্রতি বিন্দু মাত্রও অবিচার করা হয়নি, কেননা আল্লাহ পাকের দরবারে অবিচার নেই, তিনি তাঁর বন্দাদের প্রতি আদৌ অবিচার করেননা।

كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

বদরের যুদ্ধে কাফেরদের ব্যাপারে যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছে তা নতুন কিছু নয় বরং ফেরাউন এবং তার দলবল যখন আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হয়েছিলো, তখন তিনি তাদের হেদায়েতের জন্য হযরত মুসা (আঃ)-কে প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু ফেরাউন এবং তার দলবল আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবীকে অস্বীকার করে এবং তারও পূর্বে আদজতি, সামুদ জাতি পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করেছিলো আল্লাহর নাফরমান হয়েছিলো আল্লাহ পাক যথারীতি তাদের হেদায়েতের জন্যও নবী পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তারা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেল। এমনকি তাদের অবাধ্যতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেলো। পরিণামে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে শাস্তি নেমে এল। ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের সলীল সমাধি হল। আদ জাতি এবং সামুদ জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। অতএব, বদরের যুদ্ধে কাফেরদের সংগে যা হয়েছে তা আল্লাহ পাকের চির শাস্বত নীতি, নতন কিছু নয়, যুগ যুগ ধরে এই নীতিই কার্যকর রয়েছে। এই পৃথিবীতে যখনই কোন জাতি আল্লাহ পাকের অবাধ্য হয় তখন তাদেরকে কিছু দিন অবকাশ দেয়া হয়। এই অবকাশের সুযোগে আল্লাহর অবাধ্য লোকেরা আরও বেশী পাপাচারে লিপ্ত হয়।

অবকাশের সুযোগে তারা গাফলতের আবর্তে নিপতিত হয়। তখন তারা ধরাকে সরা মনে করে। এরপর তাদের ব্যাপারে আল্লাহ পাকের শাস্তির সিদ্ধান্ত হয়। অবশেষে তাদেরকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করা হয়। কোরআনে করীমের সূরায়ে বণী ইসরাঈলে আল্লাহ পাক বিষয়টিকে এভাবে ঘোষনা করেছেন।

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا
فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا

আর আমি যখন কোন জনপদকে ধ্বংস করতে চাই তখন তার সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদের সৎকাজের আদেশ প্রদান করি কিন্তু তারা সেখানে অসৎ কাজ করে এরপর তাদের প্রতি দন্ডাজ্ঞা ন্যায় সংগত হয়, অবশেষে আমি তাদেরকে সম্পূর্ণরুপে বিধ্বস্ত করি।

إِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ

নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক অত্যন্ত শক্তিশালী, শাস্তি প্রদানে কঠোর। কেউ তাঁর শাস্তিকে প্রতিরোধ করতে পারেনা। নাফরমানদের জন্যে তাঁর শাস্তি অবধারিত।[১] কোন তদবীর এবং কোন জাগতিক শক্তি আল্লাহর আজাবকে বাধা দিতে পারেনা।

ذٰلِكَ بِأَنَّ
اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوا مَا
بِأَنْفُسِهِمْ ۙ وَأَنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ
وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٥٤﴾ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ
عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٥﴾ الَّذِينَ عَاهَدْتَ
مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿٥٦﴾
فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ
يَذَّكَّرُونَ ﴿٥٧﴾ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلٰى
سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴿٥٨﴾

(১) তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত–আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী, খন্ড–৩, পৃষ্ঠা–২৫০
তফসীরে মাজহারী, খন্ড–৫, পৃষ্ঠা–১৪৮–৪৯

তরজমা

(৫৩) এর কারণ এই যে যদি কোন সম্প্রদায় নিজের অবস্থার পরিবর্তন না করে আল্লাহ পাকও তাদেরকে প্রদত্ত নেয়ামত পরিবর্তন করেননা, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

(৫৪) ফেরাউনের দল এবং তাদের পূর্ববর্তী লোকদের দশার ন্যায় তারা তাদের প্রতিপালকের আয়াত সমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করে। তাদের পাপাচারের জন্যই আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং ফেরাউনের দলকে নিমজ্জিত করেছি তাদের সকলেই যে অত্যাচারী ছিল।

(৫৫) আল্লাহ পাকের নিকট সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব তারাই, যারা কাফের হয়েছে এবং ঈমান আনেনা।

(৫৬) (হে রসূল!) তাদের মধ্যে যাদের সংগে আপনি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন তারা প্রত্যেকবারই চুক্তি ভংগ করে এবং তারা ভয় করেনা।

(৫৭) অতএব, (হে রসূল!) যদি আপনি তাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে পান তবে তাদেরকে এমন শিক্ষা দান করুন যে তা দেখে তাদের পরবর্তীরাও পলায়নে বাধ্য হয়, যেন তারা উচিত শিক্ষা লাভ করে।

(৫৮) (হে রসূল!) যদি আপনি কোন জাতির বিশ্বাসঘাতকতার আশংকা করেন তবে তাদের চুক্তি তাদের প্রতি এমনভাবে ছুড়ে ফেলুন যে উভয় পক্ষ সমান হয়ে যায়। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক বিশ্বাসঘাতকদের আদৌ পছন্দ করেন না।

তফসীরুল কোরআন

বদরের যুদ্ধে মক্কার মুশরেকদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছে। প্রশ্ন হল কেন এই ভাগ্য বিপর্যয় ঘটলো? আলোচ্য আয়াতে এই প্রশ্নেরই জবাব রয়েছে। আল্লাহ পাক মানুষকে ধন-দৌলত সুখ-সম্পদ, মান মর্যাদা, শক্তি সামর্থ, প্রভাব প্রতিপত্তি সম্মান এবং জনপ্রিয়তা দান করেন, এসবই মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের নেয়ামত। মানুষ যখন এই নেয়ামতের অনাদর করে তথা দানের অপব্যবহার করে আল্লাহর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়, আল্লাহর প্রদত্ত নেয়ামতকে আল্লাহ পাকের নাফরমানীর কাজে ব্যয় করে তখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে নেয়ামতের বদলে আযাব আসতে শুরু করে। অতএব মানুষের অবস্থা যখন সে নিজেই পরিবর্তন করে তখনই আল্লাহ পাক তার সম্পর্কে তাঁর নীতি পরিবর্তন করেন, তিনি তাঁর নেয়ামত কেড়ে নেন এবং তাদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। অনেক সময় দেখা যায় মানুষ সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে অথবা ক্ষমতা লাভ করে দিশেহারা হয়ে যায় এবং যিনি সম্পদ বা ক্ষমতা দান করেছেন তাকে ভুলে যায়

এবং আত্মবিস্মৃত হয়, এরপর সব পেয়েও সর্বহারা হয়, যেমন পবিত্র কোরআনের সূরায়ে হাশরে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللّٰهَ فَأَنْسٰهُمْ أَنْفُسَهُمْ

"হে মুমিনগণ। তোমরা তাদের ন্যায় হয়োনা যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে তখন আল্লাহ পাক তাদেরকে অত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন" তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে

আযাব কখন আসে

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا

অর্থাৎ বদরের যুদ্ধে যে আযাব মক্কার কাফেরদের উপর আপতিত হয়েছে তার কারণ এই যে, আল্লাহ পাক যখন কোন সম্প্রদায়কে নেয়ামত দান করেন ঐ নেয়ামতকে সে পর্যন্ত আজাবে পরিবর্তন করেন না যে পর্যন্ত সে সম্প্রদায় নিজের অবস্থা পরিবর্তন না করে এবং নিজেকে শাস্তির উপযুক্ত প্রমাণিত না করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মক্কাবাসীর কথা বলা যেতে পারে। আল্লাহ পাক মক্কাবাসীকে রিজিক, সম্মান এবং নিরাপত্তা দান করেছেন। আবরাহা বাদশাহ মক্কাবাসীর প্রতি হামলায় উদ্যত হয়েছিলো, আল্লাহ পাক তাকে তার হস্তি বাহিনী সহ ধ্বংস করে দিয়েছেন। এরপর তাদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ পাক তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীকে প্রেরণ করেছেন, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কোরআন নাযিল করেছেন। কিন্তু মক্কাবাসী এই সমস্ত নেয়ামতের কদর করেনি, বরং প্রত্যাখ্যান করেছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের সংগে শত্রুতা করেছে। তাঁকে মক্কাশরীফ থেকে হিজরত করতে বাধ্য করেছে, এমনকি এরপরও তারা ক্ষান্ত হয়নি বরং প্রাণের মদীনা আক্রমনের পাঁয়তারা করেছে, তারা মিল্লাতে ইব্রাহীমের বিরোধিতা করেছে। মুসলমানদেরকে মসজিদে হারামে প্রবেশে বাধা দিয়েছে এবং মুসলমানদের প্রতি নির্যাতন ও উৎপীড়ন করেছে, পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহকে মিথ্যা জ্ঞান করেছে, তাই তাদের সম্পর্কে আযাবের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

وَأَنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক সবকিছু শুনেন সব কিছু জানেন তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নেই, মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই তাঁর নখদর্পনে। ঐতিহাসিকগণ

বর্ণনা করেছেন, যে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পিতামহ আবদুল মোত্তালেব এবেন হাসেমের দাদার নাম ছিল আবদে মনাফ। আর আবদে মনাফ এবনে কুসাইর পিতামহের নাম ছিল কেলাব এবনে মোররা এবনে কাব এবনে লুই। কেলাবের পূর্বে তাদের পূর্ব পুরুষগণ হযরত ইসমাঈল (আঃ)–এর দ্বীনের অনুসারী ছিলেন। প্রত্যেক পুত্র তার পিতা থেকে ওয়ারিশসূত্রে গোত্রীয় নেতৃত্ব লাভ করতো। আর প্রত্যেক পিতা পুত্রকে দ্বীনে ইসমাঈলের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকতে ওসিয়ত করতো। হযরত ইসমাঈল (আঃ)–এর বংশধরদের মধ্যে মূর্তি পূজার প্রথা প্রচলিত হয় কুসাই এবনে কেলাবের যুগ থেকে। কাব এবনে লুই আরববাসীকে একত্রিত করেছিলো কোরাইশ এর সমস্ত লোক একত্রিত হয়েছিল। কুসাই তাদেরকে হযরত রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের সংবাদ দিয়েছিলো এবং বলেছিলো তিনি আমার বংশধরদের মধ্য থেকেই হবেন। অতএব, তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। এরপর সে কবিতা আবৃত্তি করতেন। তন্মধ্যে একটি পংক্তির অর্থ ছিল এই, হায় আক্ষেপ!। আমি যদি সর্বশেষ নবীর দাওয়াতের সময় উপস্থিত থাকতাম, যখন কোরাইশরা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে না। কুসাই মিনা এবং আরাফায় হাজীদের খাবারের ব্যবস্থা করতেন এবং প্রচুর পরিমানে পানির ব্যবস্থা করতেন। কুসাইর আদেশে বর্বরতার যুগে হাজীদের পানাহারের ব্যবস্থা করা হত। ইসলামের আবির্ভাবের পরও সেই প্রথা প্রচলিত ছিল। কুসাই আর একটা ব্যবস্থা করেছিল মোজদালেফায় আগুন জ্বালিয়ে রাখতো যেন আরাফা থেকে যারা মুজদালেফায় রওনা হয় তারা যেন সঠিক পথ পায়। ইসলামের আবির্ভাবের পরও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে এবং হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) এবং হযরত ওসমান (রাঃ)–এর যুগেও এই ব্যবস্থা ছিল। মুজাদালেফায় অগ্নি প্রজ্জলিত করা হত।

نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ

তফসীরকার সুদ্দী (রহঃ) বলেছেন আলোচ্য আয়াতে যে নেয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা দ্বারা হযরত রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আল্লাহ পাক এই নেয়ামত কোরাইশ এবং মক্কাবাসীকে দান করেছিলেন। কিন্তু তারা তাঁর নবুওয়তের প্রতি ঈমান আনেনি এবং তাঁর বিরোধিতা করেছে। তাই আল্লাহ পাক এই নেয়ামত মদীনার আনসারদেরকে দান করেছেন।১

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আর্বিভাবের পূর্বে মক্কাবাসীরা মূর্তি পূজা করতো। যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন, তখন

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড–৫, পৃষ্ঠা–১৫০

তাদের কর্তব্য ছিল, তাঁর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁকে সাহায্য করা। সাহায্য করাতো দূরের কথা তারা সত্য নবীকে মিথ্যাজ্ঞান করলো। তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করলো। মানুষকে আল্লাহর পথে আসতে বাধা দিল তবুও আল্লাহ পাক তাদেরকে আযাব দেননি। কিন্তু যখন তাদের অবস্থা তারা এতটা পরিবর্তন করলো যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনায়ে মোনাওয়ারায় হিজরত করার পরও তারা তাঁকে সেখানে শান্তিতে বসবাস করতে দিলনা, এমন কি প্রাণের মদীনা আক্রমনের অসৎ উদ্দেশ্যে দাম্ভিক আবু জেহেলের দল মদীনার দিকে ছুটে আসলো। অবশেষে বদরের রণাঙ্গনে মুসলমানদের সাথে তাদের সংঘর্ষ হল। তাই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে এরশাদ করেছেন, "যদি কোন জাতি বা সম্প্রদায়কে আল্লাহ পাক নেয়ামত দান করেন সেই জাতি তার অবস্থার পরিবর্তন করে, তখন আল্লাহ পাকও তাদের সম্পর্কে তাঁর নীতি পরিবর্তন করেন। তাদের থেকে নেয়ামত কেড়ে নেয়া হয় এবং তারা কোপগ্রস্থ হয় আর এই অবস্থাই হয়েছিলো মক্কাবাসীর। পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছে, মক্কাবাসীর অবস্থা হল ফেরাউন ও তার পূর্ববর্তী কাফেরদের ন্যায়।১

كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ وَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط

ফেরাউন ও তার পূর্বের কাফেররা আল্লাহ পাকের অসংখ্য নেয়ামত লাভ করার পরও তাঁর আয়াত সমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতকে আল্লাহর নাফরমানীর কাজে প্রয়োগ করেছে তখন আল্লাহর নেয়ামত বিদায় নিয়েছিলো এবং তারা আল্লাহর গজবে পতিত হয়েছিলো লোহিত সাগরের অতলতলায় ফেরাউন ও তার দলবলকে পৌছিয়ে দেয়া হয়েছিলো। যারা আল্লাহর অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ করেও তাঁর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয় তাদের সাথে এটিই তাঁর চির শাশ্বত নীতি।

فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ

তাদেরকে তাদের পাপাচারের কারণেই ধ্বংস করেছি। অর্থাৎ এই ধ্বংসের জন্য তারা নিজেরাই দায়ী।

وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ

আর ফেরাউন এবং তার দলবলকে আমি নিমজ্জিত করেছি, কোন সম্প্রদায়কে আমি ভূমিকম্প দ্বারা আর কাউকে জমীনে ধ্বসিয়ে, আর কারো আকৃতি পরিবর্তন করে আর কোন সম্প্রদায়কে তুফান দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৫০

তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-২০

وَكُلٌّ كَانُوا ظٰلِمِينَ

আর এরা সকলেই ছিল জালেম। তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে। কেননা কোফরী এবং নাফরমানীর কারণে নিজেদের প্রতি তারা জুলুম করেছে এবং তারা অন্য মানুষকে কষ্ট দিয়ে তাদের প্রতিও জুলুম করেছে।

আর তাদের জুলুমের কারণে আল্লাহ পাক তাদেরকে ধ্বংস করেছেন।

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٥﴾

যারা আল্লাহর নাফরমানী এবং বেঈমানিতে চির অভ্যস্ত, যারা আল্লাহর অবাধ্যতায় এবং বিশ্বাসঘাতকতায় দৃঢ় সকংল্প, তারা কখনও ঈমান আনবেন। তারা আল্লাহর পাকের দৃষ্টিতে জঘণ্য নিকৃষ্ট জীব। মদীনায়ে মোনাওয়ারার ইহুদী বনু কোরাইজার এই বদ অভ্যাস ছিল যে তারা সর্বদা বিশ্বাসঘাতকতা করতো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে তারা এই অঙ্গীকার করেছিল, যে, তাঁর বিরুদ্ধে তারা মোশরেকদের সাহায্য করবেনা। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে বারে বারে কাফেরদেরকে সাহায্য করেছিল, যদি তাদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হতো তারা বলতো, অঙ্গীকারের কথা ভুলে গিয়েছিলাম, একেবারেই মনে ছিলনা। এভাবে তারা বারে বারে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং অবশেষে তাদের শাস্তি হয়। তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي
كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿٥٦﴾

হে রসূল! আপনি যাদের থেকে অংগীকার গ্রহণ করেছিলেন, তারা প্রত্যেকবারই নিজেদের কৃত অংগীকার ভংগ করেছে, তারা এর পরিণামকে ভয় করেনা।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) এবনে এসহাকের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে যাদের অংগীকার ভংগের কথা বলা হয়েছে তারা হল ইহুদীদের বনু কোরাইজা গোত্র। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইহুদীদের থেকে এই অগীকার গ্রহণ করেছিলেন যে তারা মুসলমানদের ক্ষতি সাধন করবে না। কিন্তু তারা এই অংগীকার ভংগ করেছে, আর একবার নয়, বরং বারে বারে অংগীকার

করে ভংগ করেছে। কাব এবনে আশরাফ মক্কায় গমন করে কাফেরদেরকে সহযোগীতার আশ্বাস দিয়ে এসেছে এর ফলে পঞ্চম হিজরীতে আনুষ্ঠিত আহযাবের যুদ্ধে সমস্ত কাফের সম্মিলিতভাবে মুসলমানদের উপর হামলা করে।

وَهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ

অর্থাৎ যদিও ইহুদীরা খুব ভালভাবেই জানে যে প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সত্য নবী। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা তাঁর নবুওয়ত ও রেসালতকে অস্বীকার করে এবং তাঁর সাথে কৃত অংগীকারকে ভংগ করে এবং এর ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে ভয়ও করেনা।

আবদ এবনে হামীদ এবনে জরীর এবং আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন, হযরত মাআজ এবনে জবল (রাঃ) হযরত বসীর এবনে বারাহ এবং হযরত দাউদ এবনে সালমা (রাঃ) ইহুদীদেরকে বলেছিলেন, হে ইহুদী সম্প্রদায় তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, মুসলমান হয়ে যাও। আমরা যখন মুশরেক ছিলাম তখন তোমরা হযরত রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নাম নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার উদ্দেশ্যে দোয়া করতে এবং আমাদেরকে বলতে যে তাঁর আবির্ভাব হবে এবং তোমরা তাঁর গুণাবলীও বর্ণনা করতে পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক কাফেরদেরকে মন্দ এবং নিকৃষ্টতম চতুষ্পদ জন্তু বলেছেন আর কাফেরদের মধ্যেও মন্দ হল সেই কাফের যে কোফরী ও নাফরমানীতে অবিচল থাকে। আর তাদের মধ্যেও মন্দ সেই সব লোক যারা বিশ্বাস ঘাতক।

فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ

অর্থাৎ যারা অংগীকরে ভংগ করে তাদেরকে যদি যুদ্ধরত অবস্থায় পাওয়া যায় তবে হে রসূল! তাদেরকে এমন দৃষ্টান্ত-মূলক শাস্তি দিবেন যেন তাদের পরবর্তী লোকেরাও এর দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াতের অর্থ হল তাদেরকে এমন শাস্তি দিন যেন তাদের পরবর্তী লোকেরা এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

অর্থাৎ এই বিশ্বাসঘাতকদেরকে এভাবে হত্যা কর অথবা শাস্তি বিধান কর যে মক্কা এবং ইয়েমেনে যারা তাদের পিছনে রয়েছে তারাও শিক্ষা গ্রহণ করে এবং ভীত সন্ত্রস্থ হয় এবং তাদের দলবলকে তোমাদের মোকাবেলায় না নিয়ে আসে। এ জন্যই

হযরত রসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বনু কোরায়জার প্রাপ্ত বয়স্ক লোকদেরকে মৃত্যুদন্ড দিয়েছেন এবং নারী ও শিশুদেরকে গোলামবাঁদী বানিয়েছেন। আর তাদের ধন–সম্পদ বিতরণ করেছেন।

তিবরানী হযরত আসলাম আনসারীর (রাঃ) বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বনু কোরাইজার বন্দীদের সম্পর্কে আমাকে আদেশ দিয়েছিলেন। আমি যাকে প্রাপ্ত বয়স্ক পেয়েছি তাকে মৃত্যুদন্ড দিয়েছি। যেন তারা এ ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং ভবিষ্যতে বিশ্বাসঘাতকতা করার দুঃসাহস না দেখায়।

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانۢبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ۚ

(হে রসূল!) যদি কোন সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে আপনি বিশ্বাসঘাতকতার আশংকা করেন তবে তাদের অংগীকারনামা তাদেরকে ফেরত দিন।

অর্থাৎ যদি এমন কোন আলামত পাওয়া যায় যে কোন সম্প্রদায় বিশ্বাসঘাতকতা করছে তবে তাদের অংগীকারনামা তাদের উপরই ছুড়ে মারুণ, যেন অংগীকার ভঙ্গের ব্যাপারে উভয় পক্ষের মধ্যে সমভাবে জানাজানি হয় তাদের বিশ্বাসঘাতকতার আশংকায় মুসলমানদের তরফ থেকেও যে অংগীকার বাতিল করা হলো একথা যেন তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়। আবু শেখ তুহুরের সূত্রে লিখেছেন, হযরত জিব্রাঈল (আঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, আপনিতো অস্ত্রসস্ত্র খুলে ফেলেছেন আমরা এখনও দুশমনের পশ্চাতধাবনে ব্যস্ত রয়েছি। আপনি চলুন আল্লাহ পাক বনু কোরাইজার বিরুদ্ধে আপনাকে জেহাদ করার অনুমতি দান করেছেন। এ সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন এই ঘটনা আহযাবের যুদ্ধের পর হয়েছে। হাফেজ মোঃ ইউসুফ সালেহীন সাবিলুর রাশাদ গ্রন্থে লিখেছেন ইহুদীদের বনি কিনকাহ গোত্র বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল তারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে কৃত অংগীকারও ভংগ করেছিল। এই গোত্রের ইহুদীরা অংগীকার করা সত্ত্বেও ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতা করতো। একজন মুসলিম মহিলাকে একজন ইহুদী স্বর্ণকার অবমাননা করলে মুসলমাদের হামলায় ঐ ইহুদী নিহত হয়। এরপর ইহুদীদের হামলায় ঐ মুসলমান শহীদ হন। এভাবেই অংগীকার ভংগ হয়। শহীদ মুসলমানের আত্নীয় স্বজনের ফরীয়াদে অন্য মুসলমানগণও ইহুদীদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন, এভাবে মুসলমান ও ইহুদীদের ঝগড়া শুরু হয়। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন এরশাদ করেন, আমি বনি কিনুকাহ গোত্রের তরফ থেকে অংগীকার ভংগের আশংকা করছি। এরপর এই

আয়াতের আদেশ মোতাবেক হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইহুদী গোত্র বনি কিনুকাহ্ এর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। ইহুদীরা তাদের দূর্গের ভিতর চলে যায়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পনের দিন যাবত বনি কিনুকাহ্ গোত্রের দূর্গের চারিপাশে ঘেরাও অব্যাহত রাখেন। অবশেষে আল্লাহ্ পাক ইহুদীদের অন্তরে ভয় সৃষ্টি করেন। তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শর্ত মোতাবেক বের হয়ে আসলো এবং তাদের ধন-সম্পদ মুসলমানদের করায়ত্ত হল, তারা নারী এবং শিশুদেরকে নিয়ে বের হয়ে গেল। তিন দিন পর তারা মদীনা শরীফ থেকে বহিস্কৃত হল।

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক খেয়ানতকারীদের পছন্দ করেন না।

আল্লামা বগভী (রহঃ) একজন হুমাইরী ব্যক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) ও রুমীদের মধ্যে চুক্তি ছিল। চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার পূর্ব মূহুর্তে হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) রোমের দিকে রওয়ানা দিলেন যেন চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার সংগে সংগে প্রতিপক্ষকে না জানিয়েই তাদের সাথে জেহাদ শুরু করেদিবেন। তিনি লক্ষ্য করলেন একজন অশ্বারোহী সম্মুখ দিকে আসছেন আর বলছেন, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার অংগীকার পূর্ণ কর, বিশ্বাসঘাতকতা করোনা। হযরত মোয়াবীয়া (রাঃ) দেখলেন অশ্বারোহী হলেন হযরত আমর .এবনে আমবাসা (রাঃ) হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার? তখন আমর এবনে আমবাসা (রাঃ) বললেন, আমি নিজে হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তির সাথে কোন সম্প্রদায়ের অংগীকার থাকে ঐ অংগীকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে তা ভংগ করবে না। যদি অপর পক্ষের অংগীকার ভংগের কারণে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয় তবে তাদেরকে অংগীকার নামা ফেরত দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোন কর্মসূচি গ্রহণ করবে না। এই কথা শ্রবণ করে হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) ফিরে এলেন, (অভিযান বাতিল করলেন।)।১

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৫৬-৫৪

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا سَبَقُوْا ۚ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُوْنَ ﴿٥٩﴾ وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ
مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَ
اٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا
مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٦٠﴾ وَ
اِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ
الْعَلِيْمُ ﴿٦١﴾

তরজমা

(৫৯) কাফেররা যেন কখনও মনে না করে, যে তারা (পলায়ন করে) রক্ষা পেয়েছে নিশ্চয়ই তারা কখনও আমাকে ঠেকাতে পারবে না।

(৬০) আর তোমরা তাদের সংগে যুদ্ধ করার জন্যে যথাসাধ্য শক্তি অর্জন করবে। অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে এর দ্বারা তোমরা ভীত সন্ত্রস্থ করবে আল্লাহর শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে। অন্যদেরকেও, যাদেরকে তোমরা জাননা কিন্তু আল্লাহ পাক জানেন। আর তোমরা আল্লাহ পাকের পথে যা কিছু ব্যয় করবে তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি এতটুকু জুলুম করা হবেনা।

(৬১) আর তারা যদি সন্ধিরদিকে আকৃষ্ট হয় তবে (হে রসূল!) আপনিও সন্ধির দিকে আকৃষ্ট হবেন আর আল্লাহ পাকের প্রতিই ভরসা করবেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাত।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে সব কাফেরকে রণক্ষেত্রে তাঁর মোকাবেলায় পাবেন তাদের সম্পর্কে কি করণীয় তা

এরশাদ হয়েছে। এরপর যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সংগে কৃত অংগীকার ভংগ করে তাদের সম্পর্কে যা করণীয় তারও নির্দেশ রয়েছে।

আর আলোচ্য আয়াতে সে সব কাফেরদের সম্পর্কে নীতি ঘোষণা করা হয়েছে, যারা বদরের রণাঙ্গন থেকে পলায়ন করে আত্মরক্ষা করেছে। এরশাদ হয়েছে–

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبَقُوْا ۭ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُوْنَ

কাফেররা যেন মনে না করে তারা পলায়ন করে রক্ষা পাবে তারা কখনও আমাকে ঠেকাতে পারবে না।

শানে নজুল

আল্লামা বগভী লিখেছেন, বদরের যুদ্ধের দিন যে সব মুশরেকরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছিল তাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।১

আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে অত্যন্ত যত্নসহকারে অংগীকার রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই সুযোগে কাফেররা হয়তো চিন্তা করবে মুসলমানগণ তাদের কৃত অংগীকার রক্ষা করবে তারা কোন অবস্থাতেই বিশ্বাস ঘাতকতা করবে না। আমরা এই সুযোগে গোপন ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেব। তারই জবাবে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন।

اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُوْنَ

অর্থাৎ কাফেররা যত ষড়যন্ত্রই করুক না কেন আল্লাহ পাক যখন ইচ্ছা করবেন তাদের শাস্তি বিধান করতে তখন তারা তা প্রতিরোধ করতে পারবে না। আল্লাহ পাকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের কোন তদবীর কোন কৌশলই কাজে আসবে না। কাফেররা যদি পলায়ন করে বাঁচতে চায় তাও পারবে না। পলায়নের স্থানও পাবেনা। আর যারা আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস এবং ভরসা রাখবে তারা আল্লাহ পাকের সাহায্য লাভে ধন্য হবে এবং বিজয়ের দিকে এগিয়ে যাবে।

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ এবং মুসলমানদের সাথে তাদের

১ তফসীরে মাজহারী, খন্ড–৫, পৃষ্ঠা–১৫৪

শত্রুতা এবং বিশ্বাস ঘাতকতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে মুসলমানদেরকে দুশমনের মোকাবেলা করার এবং অস্ত্রসস্ত্র সংগ্রহ করার, যথাসাধ্য শক্তি সঞ্চয় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর এত শক্তি অর্জনের আদেশ দেয়া হয়েছে যেন দুশমন ভীতসন্ত্রস্থ হয় এবং তারা যেন বিশ্বাসঘাতকতা করার দুঃশাহস না দেখায়, আর যেন তোমাদের কোন শত্রুকে তারা সাহায্য না করে। যখন কাফেররা মুসলমানদের শক্তি সম্পর্কে অবগত হবে তখন তারা ভীত–সন্ত্রস্থ হবে আর আক্রমনের দুঃসাহস করবে না।

অথবা এভাবে বিষয়টির ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, পূর্ববর্তী আয়াত সমূহ ঘোষণা করা হয়েছে, বিজয় লাভ হয় আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এবং আল্লাহ পাকের সাহায্যে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তোমাদেরকে যাগতিক ব্যবস্থা অবশ্যই রাখতে হবে তথা দুশমনের মোকাবেলার প্রস্তুতি থাকতে হবে। আল্লাহ পাকের প্রতি তাওয়াক্কুল অবশ্যই রাখতে হবে। কিন্তু এর অর্থ নিজেকে নিস্ক্রীয় রাখা নয় বরং একদিকে আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা থাকবে, এর পাশাপাশি দুশমনকে প্রতিরোধ করার জন্য যথাসাধ্য যুদ্ধের আসবাবপত্রও সংগ্রহ করতে হবে। প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে অশ্ব এবং অন্যান্য প্রচলিত অস্ত্রের প্রয়োজন হতো। তাই সেই প্রয়োজনের তাগিদেই আলোচ্য আয়াতে যুদ্ধসামগ্রী একত্রিত করার নির্দেশ রয়েছে। বর্তমান যুগে তথা যান্ত্রিক সভ্যতার এই অত্যাধুনিক যুগে যে সব অস্ত্রসস্ত্রের প্রয়োজন, তার চালনাশিক্ষা ও সংগ্রহ করা আলোচ্য আয়াতের নির্দেশের অর্ন্তভূক্ত বলে তফসীরকারগণ মন্তব্য করেছেন। এমনিভাবে জেহাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা এবং অর্থ সম্পদ সঞ্চয় করা এসবেরই নির্দেশ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে। হযরত আকাবা এবনে আমের (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি নিজে শুনেছি হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মিম্বরে উপবিষ্ট অবস্থায় এরশাদ করেছিলেন,

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ

(আর তোমরা যথাসাধ্য শক্তি অর্জনে স্বচেষ্ট হও।

মনে রেখ, শক্তি হল তীর নিক্ষেপ করা, ভাল করে শ্রবণ কর, শক্তি হল তীর নিক্ষেপ করা, অবগত হও শক্তি হল তীর নিক্ষেপ করা। (মুসলিম শরীফ)

হযরত আবু নাযীহ সালমী (রাহঃ) বর্ণনা করেন, আমি নিজে শ্রবণ করেছি হযরত রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে একটি তীর পৌছিয়ে দিল তাঁর জন্য জান্নাতে একটি মর্তবা রয়েছে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে একটি তীর নিক্ষেপ করলো তা সে ব্যক্তির জন্য

ফিদিয়া অর্থাৎ তার দ্বারা সে ব্যক্তির গুণাহ মাফ হবে। আর ঐ তীরটি তাকে আজাদকারী হবে। (অর্থাৎ সে দোজখের শাস্তি থেকে মুক্তিলাভ করবে।)

(নেসায়ী শরীফ)

হযরত আকাবা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ অদুর ভবিষ্যতে তোমাদেরকে বিজয় দান করা হবে। আর আল্লাহ পাক তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবেন। অতএব, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন তীর নিক্ষেপের ব্যাপারে অপারগ না হয়, (অর্থাৎ তীর নিক্ষেপের প্রশিক্ষন অব্যাহত রাখা উচিত। এই হাদীস তিরমিজি শরীফেও সংকলিত হয়েছে তবে তিরমিজির বর্ণনায় এতটুকু কথা সংযোজিত হয়েছে," আল্লাহর রাহে যে ব্যক্তির চুলসাদা হয়েছে কেয়ামতের দিন তা ঐ ব্যক্তির জন্য নূর হবে।"

হযরত আকাবা এবনে আমের (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি শ্রবণ করেছি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তীর নিক্ষেপ করা শিখেছে এরপর ছেড়ে দিয়েছে সে আমাদের মধ্যে নয়। অথবা তিনি এরশাদ করেছেন, সে নাফরমানী করেছে।

(মুসলিম শরীফ)

বোখারী শরীফে সংকলিত এবং হযরত আবু উসায়েদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেছেন, বদরের যুদ্ধের দিন যখন আমরা কুরাইশদের সম্মুখে এবং কুরাইশ আমাদের সম্মুখে কাতারবন্দী হয় তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হয় তখন তীর ব্যবহার করা তোমাদের কর্তব্য। হযরত আকাবা এবনে আমের জুহানী (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি নিজে শ্রবণ করেছি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক একটি তীরের মাধ্যমে তিনটি মানুষকে জান্নাত দিবেন।

১। যে সওয়াবের নিয়তে তীর তৈরী করে।

২। যে তীর নিক্ষেপ করে।

৩। যে তীর সরবরাহ করে। তোমরা তীর নিক্ষেপ কর এবং অশ্বের উপর আরোহন কর। অশ্বে আরাহনের চেয়েও তোমাদের তীর নিক্ষেপ উত্তম। মানুষের জন্য সকল খেলাধূলা নাজায়েজ। তবে ধনুক থেকে তীর নিক্ষেপ করা এবং অশ্বে আরোহনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা এবং স্বীয় স্ত্রীর সাথে আনন্দ উল্লাস করা ব্যতীত।

(তিরমিজি এবনে মাজা)

আল্লামা বগভীর বর্ণনায় রয়েছে যে একটি তীরের দ্বারা আল্লাহ পাক তিনজন

মানুষকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। তীর নির্মাতা তীর সরবরাহ্ কারী সাল্লাহর রাহে তীর নিক্ষেপ কারী।১

ইমাম রাজী (রহঃ) এই আয়াতের তফসীরে লিখেছেন যেহেতু এর পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের বিশ্বাস ঘাতকতার কথা রয়েছে এবং যারা বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের উপর অংগীকার পত্র নিক্ষেপ করার নির্দেশ রয়েছে। তাই আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের মোকাবেলা করার প্রস্তুতি গ্রহণের আদেশ হয়েছে।

কোন কোন তফসীর্‌কার বলেছেন যেহেতু বদরের যুদ্ধে দুশমনের মোকাবেলায় মুসলমানদের নিকট তেমন অস্ত্রসস্ত্র ছিল না। তাই আলোচ্য আয়াতে যথাসাধ্য অস্ত্রসস্ত্র সংগ্রহের আদেশ হয়েছে, যেন ভবিষ্যতে এভাবে নিরস্ত্রপ্রায় অবস্থায় দুশমনের মোকাবেলা করার পুনারাবৃত্তি না হয়, বরং যথাসাধ্য অস্ত্রসস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করা কর্তব্য।

ইমাম রাজী (রহঃ) আরো লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে শক্তি অর্জনের নির্দেশ রয়েছে তা বিভিন্ন প্রকার হতে পারে।

১। বিভিন্ন প্রকার অস্ত্রসস্ত্র সংগ্রহকরা।

২। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মিম্বরে উপবিষ্ট অবস্থায় তীর নিক্ষেপের যে তাগীদ করেছেন তাও শক্তি অর্জনের একটি কর্মসূচী।

৩। সেই সমস্ত অস্ত্র সংগ্রহ করা যার দ্বারা দুশমনকে প্রতিরোধ করা যায়। তফসীরকারগণ বলেছেন, যদিও হাদীস শরীফে শক্তি অর্জনের ক্ষেত্রে তীর নিক্ষেপের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু শক্তি অর্জন শুধু এর মধ্যে সীমিত নয়, বরং এর অর্থ হল দুশমনের মোকাবেলা করার জন্য সকল প্রকার যুগপোযোগী অস্ত্রসস্ত্রের ব্যবস্থা করা। যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে অশ্বে আরোহন এবং তীর নিক্ষেপ প্রভৃতি যুদ্ধের উপকরণ ছিল তাই এ সবের উল্লেখ রয়েছে। এই সব কিছুর উদ্দেশ্য হল যুদ্ধের জন্য সর্ব প্রকারের প্রস্তুতি গ্রহণ করা। এই আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় মুসলমানদেরকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যে তোমরা দুশমনদের মোকাবেলা করার জন্যে সর্ব প্রকার প্রস্তুতি গ্রহণ কর। সেই যুগে তীর ধনুক, বল্লম, তরবারী ছিল যুদ্ধাস্ত্র। আর বর্তমান যুগে তার স্থলে এসেছে (বামারু বিমান, ট্যাংক, মিসাইল আরও অনেক কিছু। অতএব, যুগের আবর্তন বিবর্তন এবং পরিবর্তনের কারণে যে সব নতুন নতুন যুদ্ধ সমগ্রী নির্মান করা হচ্ছে সেগুলো সংগ্রহ করাও আলোচ্য আয়াতের অর্ন্তভূক্ত। জেহাদের উদ্দেশ্যে এই পর্যায়ে অস্ত্র নির্মাণের সর্বাধুনিক কারখানা তৈরী করাও মুসলিম রাষ্ট্র সমূহের একান্ত কর্তব্য। যে ভাবে কাফেররা মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার জন্যে মারণাস্ত্র তৈরী করে, এমনিভাবে মুসলমানদেরও কর্তব্য হল অস্ত্র

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫৫-৫৬

কারখানা তৈরী করা এবং দুশমনের মোকাবেলার জন্য সর্ব প্রকার প্রস্তুতি গ্রহণ করা।১

وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ

আর তোমরা জেহাদের জন্যে অশ্ব তৈরী রাখো।

হযরত জরীর এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি দেখেছি হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অশ্বের কপালের চুল স্পর্শ করছিলেন এবং বলেছিলেন–

الخيل معقود فى نواصيها الى يوم القيامة

অর্থাৎ কেয়ামতের দিন পর্যন্ত অশ্বের কপালে কল্যাণ বাধা থাকবে। আর সে কল্যাণ হল অশ্বারোহী জেহাদের অথবা শাহাদত লাভের সওয়াব পাবে। আর বিজয় হলে লাভ করবে মালেগনীমত।

(মুসলিম শরীফ)

আল্লামা বগভী হযরত আবুহোরাইরাহ (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ অশ্ব তিন প্রকার। এক প্রকার অশ্ব হল মানুষের জন্য তা (পাপের) বোঝা হয়। দ্বিতীয় প্রকার অশ্ব হল এমন যা (অপমান এবং দোজখের শাস্তি থেকে) মানুষের জন্য আড়াল হয়। তৃতীয় প্রকার অশ্ব হল এমন যা মানুষের জন্য সওয়াবের কারণ হয়। যে অশ্ব লোক দেখানোর জন্যে অথবা অহংকারের জন্যে পালন করা হয় সেগুলো পালন কারীর জন্য পাপের বোঝা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর যে অশ্ব মানুষ জেহাদে শরীক হওয়ার জন্য রাখে আর আল্লাহ পাক অশ্বের ব্যাপারে যে হক নিদৃষ্ট করে দিয়েছেন তা বিস্মৃত না করে। তবে এমন অশ্ব তার জন্যে আড়াল হিসেবে থাকবে। আর যে অশ্ব কোন মুসলমানকে জেহাদে শরীক হওয়ার জন্য পালিত হয় তা সওয়াবের কারণ হয়। কেয়ামতের দিন এমন অশ্বের পানাহার তথা সবকিছুই দাড়িপাল্লায় ওজন করা হবে।১ যেহেতু অশ্ব জেহাদে ব্যবহৃত হয় তাই এমন অশ্বের এত ফজিলত বর্ণিত হয়েছে।

(১) তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত–আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড–৩, পৃষ্ঠা–২৫৫

তফসীরে মাজহারী, খন্ড–৫, পৃষ্ঠা–১৫৫–৫৭

তফসীরকারগণ লিখেছেন আলোচ্য আয়াতে দুশমনের মোকাবেলা করার জন্যে সর্ব প্রকার যুগোপযোগী অস্ত্রসস্ত্র সংগ্রহের এবং শক্তি অর্জনের তাগীদ রয়েছে। স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর জামানায় এবং খোলাফায়ে রাশেদীন তাঁদের যুগে নতুন নতুন অস্ত্রের ব্যবস্থা করেছেন। পঞ্চম হিজরীতে অনুষ্ঠিত আহযাবের যুদ্ধে মদীনায়ে মোনওয়ারায় পরীখা খনন করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কার হামলাকারীদের মোকাবেলা করেছেন। পরীখা খননের এই পন্থা পারস্য রাজা এবং ইরানীরা অবলম্বন করতো। হযরত সালমান ফারসীর পরামর্শক্রমে এই কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় যা আরব দেশে ইতিপূর্বে প্রচলিত ছিলনা। পরীখা খনন কার্যে সাহাবায়ে কেরামের সংগে স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামও অংশগ্রহণ করেন। এভাবে জেহাদে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটি নতুন পন্থা অবলম্বন করেন।

এমনিভাবে সপ্তম হিজরীতে অনুষ্ঠিত খায়বরের যুদ্ধে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ইহুদীদের দূর্গ দখল করতে প্রায় এক মাস সময় গেলেছিলো। অবশেষে সআব নামক দূর্গটি সাহাবায়ে কেরাম দখল করেন। ঐ দূর্গে অনুসন্ধানের পর অনেক যুদ্ধাস্ত্র মুসলমানদের হস্তগত হয়। এর মধ্যে দাব্বাবাহ এবং মেনজানিক নামক অস্ত্র পাওয়া যায়। এসব অস্ত্র সে যুগে রুমীরা দুর্গ ভাঙ্গার কাজে ব্যবহার করতো। দাব্বাবাহ (কাষ্ঠ নির্মিত ট্যাংক) ইমাম এবনে আসীর জযোরী (রহঃ) লিখেছেন, দাব্বাবাহ এমনি একটি অস্ত্র যা কাঠ এবং চামড়া দ্বারা তৈরী করা হয়। তাতে কয়েকজন লোক বসতে পারে এবং দুশমনের তরফ থেকে নিক্ষিপ্ত তীর থেকে তারা নিরাপদে থাকতে পারে। দাব্বাবাহকে দুশমনের দূর্গের নিকট দাড় করিয়ে দূর্গ ভেঙ্গে ফেলা যায়।[১]

আল্লামা এবনে আসীর (রহঃ) হযরত ওমর (রাঃ) এর একটি কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, হযরত ওমর (রাঃ) দুশমনের মোকাবেলায় সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করার সময় জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাঁর ভাষায়

كيف تصنعون بالحصون قال نتخذ

অর্থাৎ তোমরা দুশমনের দুর্গ কিভাবে জয় করবে?

তখন সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, আমরা দাব্বাবাহ তৈরী করবো। আমাদের জওয়ানরা তাতে বসবে এবং দুশমনের দূর্গকে জয় করবে। সে যুগের দাব্বাবাহ আধুনিক কালের ট্যাংকে রুপান্তরিত হয়েছে। পার্থক্য এতটুকু যে তখন কাঠ

১। নেহায়া, কৃত এবনে আসীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১০
মাজমাউল বেহার খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৯৪
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৫৬

এবং চামড়া দ্বারা দাব্বাবাহ তৈরী হত এখন লৌহদ্বারা ট্যংক নির্মিত হয়। আর এই বিবরণ দ্বারা একথা প্রমাণিত হল যে সে যুগেও এমন অস্ত্রের প্রচলন ছিল।

খায়বরের যুদ্ধে ইহুদিদের দূর্গ থেকে মুসলমানগণ মেনজানিক নামে একটি অস্ত্র পেয়েছিলেন। এটিকে বর্তমান যুগের মেশিনগান বলা যায়। কেননা, মেনজানিক এমন একটি অস্ত্র যার দ্বারা দুশমনের উপর পাথর বর্ষণ করা হত। আর যে মেনযানিক দ্বারা পাথর নিক্ষেপ করে তাকে যানেক বলা হয়।১

অষ্টম হিজরীতে মক্কায়ে মোয়াজ্জমা বিজয় হয়। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তায়েফ গমন করেন। বিশদিন পর্যন্ত তায়েফের দূর্গ ঘেরাউ করে রাখা হয়। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) এর পরামর্শ মোতাবেক মেনযানিক ব্যাবহারের আদেশ দেন। আর এ মেনযানিক তৈরী করেছিলেন হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)। এ সম্পর্কে আল্লামা জুরকানী (রহঃ) লিখেছেন, ইসলামের ইতিহাসে এটিই ছিল সর্ব প্রথম মেনজানিক যা দুশমনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়।

আল্লামা জুরকানী (রহঃ) আরো লিখেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ব প্রথম নমরূদ মেনযানিক তৈরী করেছিল। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)–এর উপর অগ্নিগোলা নিক্ষেপের জন্য সে তা ব্যবহার করেছিল।২

এ আলোচনা দ্বারা একথা প্রমাণিত হল যে হযরত রসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তীর ধনুক ছাড়া অন্যান্য নতুন অস্ত্র ব্যবহারের এবং তৈরী করার আদেশ দিয়েছিলেন এবং তাঁর পর দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) সিরিয়া এবং ইরাক বিজয়ের সময় নতুন নতুন অস্ত্র তৈরীর ও ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন।

অতএব, আলোচ্য আয়াতে

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ

সর্ব প্রকার অস্ত্রসস্ত্র তৈরীর যে আদেশ রয়েছে তাতে কেয়ামত পর্যন্ত যত প্রকার অস্ত্র তৈরী হবে সবই তার অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। যদি মুসলিম রাষ্ট্র সমূহ আল্লাহ পাকের এই নির্দেশের উপর যথাযথভাবে আমল করে তবে পৃথিবীর কোন জাতি মুসলমানদের মোকাবেলা করতে সক্ষম হবেনা। কিন্তু যদি মুসলিম রাষ্ট্র সমূহ এ ব্যাপারে অবহেলা করে তবে তার শোচনীয় পরিণাম অবশ্যই তারা ভোগ করবে। এতে ইসলামের

১। নেহায়া, কৃত এবনে আসীর খন্ড–১, পৃষ্ঠা–১৮৩
আদদুররুণ নাসীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১০ কৃত আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) এবংমাজমাউল বেহার খন্ড–১, পৃষ্ঠা–২১৫
২। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন জুরকানী শরহে মওয়াহেব খন্ড–৩, পৃষ্ঠা–৩১

কোন ক্রটি হবেনা ক্রটি হবে সেইসব লোকদের যারা নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করেও পবিত্র কোরআনকে অবহেলা করে।

আলোচ্য আয়াতে দু'টি নির্দেশ রয়েছে

১। যথাসাধ্য শক্তি অর্জনের এবং সর্বপ্রকরের যুদ্ধাস্ত্র তৈরী ও সংগ্রহ করার।

২। রেবাতে খায়েল তথা দুশমনের মোকাবেলার জন্যে অশ্ব পালনের, এর উদ্দেশ্য হল মুসলমানদের সিমান্ত রক্ষা করা। অন্যত্র আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

(সূরা আলএমরান)

"(হে মুমিনগণ তোমরা সবর অবলম্বন কর এবং সবর অবলম্বনে প্রতিযোগীতা কর এবং সিমান্ত রক্ষায় সদা প্রস্তুত থাক, আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক হয়তো তোমরা সফলকাম হবে।"এই আয়াত দ্বারা সিমান্ত রক্ষা ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য প্রমাণিত হয়।

تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ

পূর্ববর্তী আয়াতাংশে যথাসাধ্য শক্তি অর্জন এবং সর্ব প্রকার অস্ত্রসস্ত্র সংগ্রহ করার নির্দেশ রয়েছে। আর আয়াতের এই অংশে শক্তি অর্জন ও অস্ত্র সংগ্রহ করণের উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্য হল শত্রুকে ভীত সন্ত্রস্থ করা। শত্রুর মনে প্রভাব বিস্তার করা, যারা আল্লাহর দুশমন এবং তোমাদের দুশমন, তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করাই হল যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্য। যুদ্ধে জয় পরাজয় অস্ত্রের ভীত্তিতে নয় বরং আল্লাহ পাকের ইচ্ছা এবং সাহায্যে হয়। আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে দুর্বল এমনকি অসহায়কে বিজয়ী করতে পারেন। আর তিনি ইচ্ছা করলে শক্তিশালীকেও মূহুর্তের মধ্যে পরাজিত করতে পারেন। কিন্তু এতদসত্তে ও মুসলমানদেরকে যথাসাধ্য শক্তি অর্জন করতে হবে এবং প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে, আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা রাখতে হবে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে নিজেরা নিস্ক্রীয় এবং আরামপ্রিয় হয়ে বসে থাকবে। এই পর্যায়ে মহান আনিন্দ-সূন্দর আদর্শ পেশ করেছেন স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ পাকের প্রতি সর্বাধিক ভরসা তাঁরই ছিল, অথচ তিনি সাতাশটি যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। ওহোদের যুদ্ধে তাঁর চারটি দান্দান মোবারক শহীদ হয়েছে। তায়েফে দুশমনদের পাথর বর্ষনের কারণে দেহ মোবারক রক্তাপ্লুত হয়েছে। এ সব একথারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে ইসলাম কর্মের

ধর্ম। এখানে ক্লিবতা, জড়তা, অলসতা, অকর্মন্যতার কোন স্থান নেই। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কর্মময় জীবনের মহান আদর্শ এই সত্যেরই জীবন্ত সাক্ষী।

وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ اللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ

অর্থাৎ অস্ত্রসস্ত্র সগ্রহের মাধ্যমে শুধু যে তোমাদের দুশমনদেরকে ভীতসন্ত্রস্থ করবে তাই নয়, বরং তাদের ব্যতীত তোমাদের এমন গোপন শত্রুও রয়েছে যাদেরকে তোমরা জাননা, আল্লাহ পাক জানেন। যারা তোমাদের অজ্ঞাত শত্রু, যারা মুসলমানের বেশে তোমাদের নিকট আসে তারা প্রকৃত মুসলমান নয় বরং মোনাফেক অস্ত্র সংগ্রহের মাধ্যমে তোমরা সেই সব গোপন শত্রুকেও ভীত সন্ত্রস্থ করবে। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন আলোচ্য আয়াতের

عَدُوَّ اللّٰهِ

দ্বারা মক্কার কাফেরদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে আর

وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ

দ্বারা মাক্কার কাফের ছাড়া অন্য কাফেরদেরকে বুঝানো হয়েছে। তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) এবং মুকাতেল (রহঃ) এর মতে এই বাক্যটি দ্বারা বণি কোরাইজা গোত্রের ইহুদীদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর সুদ্দী (রহঃ) এর মতে এই বাক্যটি দ্বারা পারশ্যবাসীকে বুঝানো হয়েছে। আর এবনে জায়েদ এর মতে এই বাক্য দ্বারা মুনাফেকদের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ

জেহাদে অস্ত্রবল, জনবলের পাশাপাশি অর্থ বলের প্রয়োজনও থাকে। পূর্ববর্তী আয়াতে অস্ত্রবল আহরণের তাগীদ রয়েছে আর এ আয়াতে অর্থবল অর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাই এরশাদ হয়েছে তোমরা যা কিছু আল্লাহর রাহে ব্যয় করবে তার সওয়াব পুরাপুরি দেয়া হবে, অর্থ ব্যয় করলে তাতে তোমাদের লাভই হবে কোন অবস্থাতেই ক্ষতি হবেনা। তোমাদের প্রতি কোন প্রকার জুলুম করা হবেনা অর্থাৎ সওয়াব কম করা হবেনা।

জেহাদের জন্য দান করার ফজিলত

হযরত জায়েদ এবনে খালেদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি কোন মুজাহেদকে জেহাদের দ্রব্য সম্ভার দিয়েছে সে নিজে জেহাদ করেছে। আর যে ব্যক্তি মুজাহেদ

চলে যাওয়ার পর তার পরিবারবর্গের দেখাশোনা করেছে সেও যেন জেহাদ করেছে।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা নিজেদের অর্থ–সম্পদ জীবন এবং রসনা দ্বারা দুশমনের বিরুদ্ধে জেহাদ কর।

(আবুদাউদ, নেসায়ী দারেমী)

হযরত খোজায়মা এবনে ফাতেক (রাঃ) বর্ণনা করেন হযরত রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে কিছু দান করবে তার জন্য সাতশত গুণ সওয়াব লেখা হবে।

(তিরমীজি নেসায়ী)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, মুজাহেদের জন্য তার সওয়াব রয়েছে। আর অস্ত্র নির্মাতার জন্য নির্মানের সওয়াব লেখা হয়েছে।

(আবু দাউদ শরীফ)

এবনে মাজা হযরত আলী (রাঃ) হযরত আবু দারদা (রাঃ) হযরত আবু হোরাইরাহ (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত হাদীস লিখেছেন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জেহাদের জন্য কিছু ব্যয় করেছে আর নিজে ঘরে বসে রয়েছে তার প্রত্যেক দেরহামের বিনিময়ে সাতশত গুণ সওয়াব হবে। আর যে ব্যক্তি নিজে জেহাদ করেছে আর নিজেই তার ব্যয়ভার বহন করেছে তার জন্য প্রত্যেক দেরহামের বিনিময়ে সাত হাজার সওয়াব হবে। এরপর হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পবিত্র কোরআনের এ আয়াত পাঠ করেন।

وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ

আর আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা দ্বিগুণ দান করেন।

হযরত আবদুর রহমান এবনে হোবাব (রাঃ) বর্ণনা করেন আমি উপস্থিত ছিলাম হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাবুক গমনকারী সৈন্যদের সাহায্যের জন্য অনুপ্রানিত করছিলেন। তখন হযরত ওসমান (রাঃ) দন্ডায়মান হলেন এবং আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসূল! একশত উট ও আসবাব পত্রের দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পুনরায় যুদ্ধের সাহায্যের জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন। তখন হযরত ওসমান (রাঃ) আরজ করলেন, দু'শত উট তার আসবাব পত্রের দায়িত্ব আমার। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পুনরায় এ সম্পর্কে কথা

বললেন, তখন হযরত ওসমান (রাঃ) দন্ডায়মান হয়ে আরজ করলেন, আল্লাহর রাহে তিনশত উট আসবাবপত্র সহ পেশ করার দায়িত্ব আমার উপর। বর্ণনাকারী বলেন, আমি লক্ষ্য করছিলাম প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মিম্বর থেকে অবতরণ করার সময় এরশাদ করছিলেন এরপর ওসমান যা কিছু করুক তাকে পাকড়াও করা হবে না।

(তিরমীজি)

হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বর্ণনা করেন, তাবুকের যুদ্ধের প্রস্তুতির সময় হযরত ওসমান (রাঃ) এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা এনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট পেশ করলেন। তিনি ঐ স্বর্ণমুদ্রাগুলো নাড়াচাড়া করেছিলেন এবং বলেছিলেন এরপর ওসমান যে কাজই করুক তাঁর কোন ক্ষতি হবেনা। একথাগুলো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুবার বলেছিলেন।১

(আহমদ)

يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ

আল্লাহর রাহে ব্যয় করার সময় স্বভাবগত কারণে মানুষের মনে এই ধারণা সৃষ্টি হয় এই সম্পদ চলে যাচ্ছে অথচ তার বিনিময়ে কিছুই পাওয়া যাবে না। আলোচ্য ব্যাংকাংশে এমন ভুল ধারণার নিরসন করা হয়েছে এবং নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে যে আল্লাহর রাহে দান করার কারণে কোন ক্ষতির প্রশ্নই আসেনা বরং তার দ্বিগুণ ত্রিগুণ বিনিময় লাভ করবে এবং এ দানের সওয়াব এতটুকু কম করা হবেনা।২

আলোচ্য বাক্যের তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে আল্লাহর রাহে দানের সওয়াব পুরাপুরি দেয়া হবে এবং আখেরাতে এর সওয়াব এতটুকু কম করা হবেনা।

وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ

তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবেনা অর্থাৎ তোমাদের সওয়াব কম করা হবেনা।৩

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড–৫, পৃষ্ঠা–১৫৮
২। তফসীরে মাজেদী, খন্ড–১, পৃষ্ঠা–৩৮৮
৩। তফসীরে কবীর, খন্ড–১৫, পৃষ্ঠা–১৮৭

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ

পূর্ববর্তী আয়াতে মুসলমানদেরকে শক্তি সঞ্চয়ের এবং অস্ত্রসস্ত্র সংগ্রহের আদেশ দেয়া হয়েছে আর আলোচ্য আয়াতে তোমাদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ এবং শক্তি অর্জন দেখে যদি কোন অমুসলিম শক্তি সন্ধির হস্ত প্রসারিত করে এবং "যুদ্ধ নয়" চুক্তি করতে আগ্রহী হয় তবে তোমরাও সন্ধির হস্ত প্রসারিত কর। কেননা জেহাদের মুল উদ্দেশ্য হল আল্লাহর দ্বীন সুপ্রতিষ্ঠিত করা অমুসলিম নিধন নয়। যদি রক্তপাত ব্যতীতই এই মহান উদ্দেশ্য সফল হয় তবে অকারণে রক্তপাতের অনুমতি ইসলাম দেয়না। অবশ্য এখানে সন্দেহের ইদ্রেক হতে পারে যে কাফেররা হয়তো সন্ধির ভান করে মুসলিম রাষ্ট্রের ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। এই সন্দেহকে অমুলক বলে যেমন উড়িয়ে দেয়া যায় না ঠিক তেমনিভাবে এমন সন্দেহের কারণে সন্ধি প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যানও করা যায় না। তাই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছে

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ

এসব ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করাই কর্তব্য, নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাত, তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নেই অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত সব কিছুই তাঁর নখদর্পণে, অতএব ভয়ের কোন কারণ নেই, যে আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করে আল্লাহ পাক তার জন্য যথেষ্ট। তফসীরকারগণ বলেছেন যদিও আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী হযরত রসূলাল্লাহ (দঃ) কে সম্বোধন করা হয়েছে কিন্তু এই আদেশ সমগ্র মুসলিম জাতির জন্য প্রযোজ্য।

وَاِنْ يُّرِيْدُوْٓا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ؕ هُوَ
الَّذِيْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٢﴾ وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ؕ
لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ
اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٣﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ
وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٤﴾

তরজমা

(৬২) (হে রসূল!) যদি তারা আপনাকে প্রতারণা করতে চায় তবে আল্লাহ্ পাকই আপনার জন্য যথেষ্ট। তিনিইতো আপনাকে স্বীয় সাহায্য ও মুমেনদের দ্বারা শক্তি প্রদানকরেছেন।

(৬৩) আর তিনি তাদের অন্তরে সম্প্রীতি স্থাপন করেছেন, পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করেও আপনি তাদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করতে পারতেন না। একমাত্র আল্লাহ পাকই তাদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করেছেন, নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

(৬৪) হে নবী! আপনার জন্য আল্লাহ পাক যাথষ্ট আর যে সব মুমেনগণ আপনার অনুসারী হয়, তারা যথেষ্ট।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে যদি কাফেররা সন্ধির প্রস্তাব দেয় তবে হে রসূল! আপনি সন্ধির প্রস্তাব গ্রহণ করুন। অর্থাৎ তাদের সাথে সন্ধি করুন। আর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে যদি শত্রুরা সন্ধি করার পরও আপনাকে প্রতারণা করতে চায় তথা বিশ্বাসঘাতকতা করতে চায়, উপর দিয়ে সন্ধির কথা বলে আর তলে তলে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে তবে হে রসূল! আপনার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। কেননা, আপনার জন্য আল্লাহ পাকই যথেষ্ট। শত্রুর শক্তি যত বেশীই থাকুক না কেন, এবং তাদের ষড়যন্ত্র যত বিপদজনকই হোকনা কেন তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করা আল্লাহ পাকের পক্ষে কোন কঠিন কাজ নয়। আর আল্লাহ পাক আপনার জন্য যথেষ্ট। বদরের রণাঙ্গনে আল্লাহ পাকইতো মুসলমানদেরকে সাহায্য করেছিলেন। আল্লাহ্ পাকের অদৃশ্য সাহায্য মুসলমানদেরকে বিজয় লাভে ধন্য করেছিলো। অতএব, কাফেররা যদি সন্ধির নামে প্রতারণা করে তবে আল্লাহ পাকের সাহায্যই আপনার জন্য যথেষ্ট। তিনি তাঁর সাহায্য দ্বারা এবং মুমেনদের দ্বারা আপনাকে শক্তি দান করেছিলেন। আর আল্লাহ পাকই মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন।

বিশেষতঃ প্রাক ইসলামিক যুগে আরবদের মধ্যে কলহ দ্বন্দ্ব ছিল সর্বত্র। সামান্য কথায় তাদের মধ্যে হতো যুদ্ধ বিগ্রহ, রক্তারক্তি। আর যখন একবার যুদ্ধ বাঁধতো তখন দু'একযুগে তা শেষ হতোনা। অন্যায় অনাচার কলহ দ্বন্দ্ব, জুলুম অত্যাচার ছিল তখন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। হিংসা বিদ্বেষ ছিল তখন সকলেরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট। পরস্পরের সম্প্রীতি সৌহাদ্দ কোথাও পরিলক্ষিত হত না। আউস এবং খাজরাজ মদীনায়ে মোনাওয়ারার দু'টি বিখ্যাত গোত্র। এই দু'গোত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং সংঘর্ষ যুগ যুগ ধরে অব্যাহত থাকে। এমন একটি দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে আগমন করেছিলেন

বিশ্বনবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। তিনি কলহ দ্বন্দ্ব এবং সংঘর্ষে লিপ্ত, আত্মবিস্মৃত, পথভ্রষ্ট মানুষকে সরল সঠিক পথ গ্রহণের আহবান জানান। তিনি তাদেরকে কলেমায়ে তায়্যেবার সোনালী সূত্রে গ্রথিত করেন। তিনি তাদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্বভাব এবং বন্ধুত্ব সৃষ্টি করেন। পরস্পরকে ভাই ভাই বলে ঘোষণা করেন। পরস্পরকে সম্প্রীতির, আন্তরিকতার অটুট বন্ধনে আবদ্ধ করেন, আর এমন ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করেন যার কোন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে নেই তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন,

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ط

আর আল্লাহ পাকই তাদের অন্তরে সম্প্রীতি সৃষ্টি করেছেন। যদি সারা বিশ্বের সমস্ত সম্পদ ব্যয় করা হত তবুও তাদেরকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করা সম্ভব হতো না। কিন্তু আল্লাহ পাক দয়া করে তাদের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দিয়েছেন নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী বিজ্ঞানময়।

তফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক মুমেনদেরকে তিনভাবে নিশ্চিন্ত করেছেন।

১। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ফয়েজ ও বরকত নাযিল হওয়ার মাধ্যমে।

২। মুমেনদের সাহায্য করার মধ্যমে।

৩। মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টির মাধ্যমে।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে الْمُؤْمِنِينَ শব্দ দ্বারা আউস ও খাজরাজ গোত্রের লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, এই দুই গোত্রের মধ্যে শত্রুতা এবং কলহ দ্বন্দ্ব সর্বদাই লেগে থাকতো। কিন্তু আল্লাহ পাক তাদের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী, তিনি এত শক্তিশালী যে তাঁর ইচ্ছাকে কেউ প্রতিরোধ করতে পারে না। আর তিনি এত বিজ্ঞানময় যে তিনি খুব ভালভাবেই জানেন যে, ইচ্ছা মোতাবেক কখন কি করতে হয় এবং তাঁর প্রতিটি কর্ম হেকমতপূর্ণ।

১। খোলাসাতুত্তাফাসীর, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৮২

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, হে নবী! আপনার জন্য আল্লাহ পাকই যথেষ্ট।

তফসীরকাগণ আলোচ্য আয়াতের দু'টি অর্থ বর্ণনা করেছেন।

১। হে নবী! আপনার জন্য আল্লাহ পাক এবং আপনার অনুসারী মুমেনগণ যথেষ্ট।

২। হে নবী! আপনার এবং আপনার অনুসারী মুসলমানদের জন্য আল্লাহ পাকই যথেষ্ট।

অর্থাৎ দুনিয়া, আখেরাত উভয় জাহানে যে কোন প্রয়োজনে আল্লাহ পাকই আপনার জন্য যথেষ্ট। ইমাম রাজী (রহঃ) বলেছেন, এই আয়াত নাযিল হয়েছে বদরের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে বায়দা নামক স্থানে। আর মুমেনদের মধ্যে আপনার অনুসারী বলতে আনসার সাহাবায়ে কেরামকে বুঝানো হয়েছে।

হযরত আবদুলাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত ওমর (রাঃ) এর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পুর্বে তেত্রিশজন পুরুষ এবং ছয়জন নারী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, এরপর ইসলাম গ্রহণ করেছেন হযরত ওমর (রাঃ)। তিনি ছিলেন ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে চল্লিশতম ব্যক্তি। আবু শেখ হযরত সায়ীদ এবনে মুসায়্যিবের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে হযরত ওমর (রাঃ) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন আল্লাহ পাক তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল করেন।

বাজজার একরামার সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)–এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে হযরত ওমর (রাঃ) যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন মুশরেকরা বললো আজ আমাদের সম্প্রদায়ের অর্ধেক শক্তি কমে গেল। তখন আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করেন। এই হাদীস সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে এ আয়াত মক্কায় নাযিল হয়েছে। কিন্তু আয়াতের বর্ণনা শৈলী দ্বারা বুঝা যায় যে আয়াত মদীনা শরীফে নাযিল হয়েছে।[১]

আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী আর একটি ব্যাখ্যাও করেছেন তা হল "হে নবী! যদি আপনি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে লক্ষ্য করেন তবে দেখবেন এক আল্লাহ পাকই আপনার জন্য যথেষ্ট। আর যদি আপনি বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখেন, এর কারণ উপকরণের প্রতি

১। তফসীরে কবীর, খন্ড–৫, পৃষ্ঠা–১৬০

লক্ষ্য করেন তবে আপনার অনুসারী মুমেনগণ আপনার জন্য এবং আপনার দ্বীনের জন্য যথেষ্ট। আপনার অনুসরণের বরকতে মুসলমানদের নগন্য সংখ্যক দলও কাফেরদের বিরাট দলকে পরাজিত করতে পারে। যেমন বদরের যুদ্ধের ঘটনা একথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।[১]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ
عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَٰبِرُونَ يَغْلِبُوا۟ مِا۟ئَتَيْنِ ۚ
وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّا۟ئَةٌ يَغْلِبُوٓا۟ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ
لَّا يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾ ٱلْـَٔـٰنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ
فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّا۟ئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا۟ مِا۟ئَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن
مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوٓا۟ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿٦٦﴾

তরজমা

(৬৫) হে নবী! মুমেনদেরকে জেহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন। যদি তোমাদের অটল অবিচল কুড়িজন লোক থাকে, তবে তারা শত্রুদের দু'শ লোককে পরাজিত করবে। আর যদি তোমাদের একশজন থাকে এক হাজার কাফেরকে তারা পরাভূত করতে পারবে, কেননা তারা এমন সম্প্রদায় যাদের বোধশক্তি নেই।

(৬৬) আল্লাহ পাক এখন তোমাদের ভার লাঘব করে দিয়েছেন, তিনি অবগত আছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে, তাই এখন যদি তোমাদের মধ্যে একশ' জন অটল অবিচল যোদ্ধা থাকে, তবে তারা দু'শ শত্রুকে পরাজিত করতে পারবে। আর যদি তোমাদের মধ্যে এক হাজার লোক থাকে তবে তারা আল্লাহ পাকের হুকুমে দু' হাজার দুশমনের বিরুদ্ধে জয় লাভ করবে। যারা সবর অবলম্বনকারী, অটল, অবিচল আল্লাহ পাক তাদের সাথেই আছেন।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃঃ ২৬০

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে প্রয়োজন মোতাবেক কাফেরদের সংগে সন্ধি করার অনুমতি প্রদানের কথা বলা হয়েছে। আর এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, কাফেরদের সংগে সন্ধি করার অনুমতি রয়েছে ঠিকই, কিন্তু কাফেরদের সংগে জেহাদের আদেশ বজায় রয়েছে। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছে হে নবী! মুমেনদেরকে জেহাদের জন্য উদ্ধুদ্ধ করুন, যেন আল্লাহর কলেমা বলুন্দ হয়, সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, কোফর এবং নাফরমানীর অন্ধকার দূরীভূত হয়।

আলোচ্য আয়াতে জেহাদে বিজয় লাভের মূল তত্ত্বের প্রতি ইংগিত করে এরশাদ হয়েছেঃ

إِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ

যদি তোমাদের মধ্য থেকে কাফেরদের মোকাবেলায় বিশ জন লোক সবর অবলম্বনকারী অটল অবিচল থাক, তবে দু'শ দুশমনের উপরও তোমরা বিজয় লাভ করবে।

মুসলিম শক্তির মূল উপকরণ

আলোচ্য আয়াতের صٰبِرُوْنَ

শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যবহ। বিপদে ধৈর্য ধারণ করা, দুশমনের মোকাবেলায় সুদৃঢ় থাকা হল বিজয়ের পূর্বশর্ত। আর এই অবস্থা তখন হয়, যখন মানুষ সর্ব শক্তিমান আল্লাহ পাকের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়। আর আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা বা নির্ভরশীলতা আসে পরিপূর্ণ ঈমান, একীন তথা খাঁটি বিশ্বাসের ফলশ্রুতি স্বরূপ। অতএব, আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস যত খাঁটি এবং নিখুত হবে তাঁর প্রতি ভরসাও তত বেশী হবে। আর আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা যত বেশী হবে জেহাদে স্থিরতা, দৃঢ়তা, ধৈর্য্যও সহনশীলতা তত বেশী হবে। আর তাই হল মুসলমানদের বিজয়ের মূল উৎস এবং মুসলিম শক্তির মূল উপকরণ। এজন্যই এরশাদ হয়েছে হে মুমেনগণ! তোমরা যদি বিশজন লোক অটল অবিচল থাক তবে দু'শ শত্রুকে পরাজিত করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হবে। আর যদি তোমরা সংখ্যায় একশ জন হও, তবে এক হাজার কাফেরকে পরাভূত করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হবে অর্থাৎ একজন মুসলমান দশজন কাফেরের মোকাবেলা করে বিজয় লাভ করবে।

একজন মুমেন দশজন কাফেরের মোকাবেলায় কেন জয়ী হবে?

কেননা মুমিন আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস এবং ভরসা করে, এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই সে জেহাদ করে, তার জীবনও মৃত্যুর একমাত্র উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ। এজন্যে মুমিন যখন জেহাদে প্রাণ উৎসর্গ করে তখন সে শাহাদাতের উচ্চ মর্তবা লাভে ধন্য হয়। আর সে একথা নিশ্চিতভাবে জানে যে আজ হোক বা কাল একদিন তার মৃত্যু হবেই এবং অবশেষে তাকে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাজির হতেই হবে। এমন অবস্থায় আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য প্রাণ উৎসর্গ করার চেয়ে বড় সাফল্য আর কি হতে পারে? যিনি দান করেছেন এই প্রাণ তাঁর নামে প্রাণ উৎসর্গ করার মান শহীদগণই উপলব্ধি করেন। আর যদি জেহাদে অংশগ্রহণের পর মুমেন বেঁচে থাকে তবে সে গাজী হওয়ার মর্যাদা লাভ করে। এই মনোভাব নিয়ে যখন মর্দে মুমিন রণাঙ্গনে দুশমনের মোকাবেলা করে তখন তার সম্মুখে কেউ টিকতে পারেনা। মৃত্যু যার কাছে জীবনের চেয়েও অধিকতর প্রিয়, যে আল্লাহর রাহে মৃত্যু বরণের মাধ্যমে নবজীবনের সন্ধান করে সে পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় সম্মুখ পানে। পিছনে যাওয়ার কথা সে কোনদিন চিন্তাও করেনা। এজন্যে একজন মুমিন দশজন কাফেরের মোকাবেলা করে। বদরের যুদ্ধই এই সত্যের জীবন্ত নিদর্শন।

পক্ষান্তরে কাফেরদের কোন ভবিষ্যত নেই, এই ক্ষণস্থায়ী জগত এবং জীবনকে নিয়েই তাদের সকল ব্যস্ততা। এখানের আনন্দ উল্লাসই তাদের একান্ত কাম্য। এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দকে কেন্দ্র করেই তাদের সকল চাওয়া এবং পাওয়া। তাই সে মৃত্যুকে দারুন ভাবে ভয় করে, আত্মত্যাগের আদর্শ থেকে সে হয় বঞ্চিত। আল্লাহ পাকের সাহায্য কাফেররা কোন সময় পায় না, পেতে পারেনা। তাই তারা হয় ভীরু, মরণের ভয়ে তাদের কলিজা করে দুরুদুরু। আর মুসলমান হয় ঈমানের বলে বলীয়ান। আল্লাহ পাক ব্যতীত কাউকে সে ভয় করেনা, তাই আল্লাহর রাহে প্রাণ দিতে সে এতটুকু কুণ্ঠিত হয়না।

بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ

কাফেররা এই সত্য উপলব্ধি করেনা। তারা সৈন্যসংখ্যা এবং অস্ত্রসস্ত্রের উপর নির্ভর করে। আর মর্দে মুমিন নির্ভর করে এক আল্লাহ পাকের উপর।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ

(হে নবী! মুমিনদেরকে জেহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করুণ।)

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এই আয়াতের তফসীরে একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন বদরের দিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এরশাদ করেছিলেন তোমরা উঠো, সেই জান্নাতকে অর্জন কর যার প্রস্থ আসমান জমীনের চেয়ে অধিকতর। হযরত উমায়ের এবনে হাম্মাম বলেন, এত প্রস্থ? তিনি এরশাদ করলেন, হাঁ এত প্রস্থই। তখন তিনি বললেনঃ আমি আশা করি যেন আল্লাহ আমাকে জান্নাত নসীব করেন। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি যে, তুমি জান্নাতী। এরপর তিনি উঠে পড়েন এবং রণাঙ্গনের দিকে অগ্রসর হন। রসদ হিসেব যে খেজুর তাঁর সংগে ছিল তা খেতে শুরু করেন। একটুপর খেজুর গুলো ফেলে দেন। এরপর বলেন, এই খেজুর খাওয়ার জন্য বিলম্ব করা আমার পক্ষে সহনীয় নয়। তাই হাত থেকে খেজুর গুলো নিক্ষেপ করেন। সিংহের ন্যায় দুশমনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। অনেক দুশমনকে শেষ করে অবশেষে তিনি আল্লাহর রাহে শাহাদত বরণ করেন। এরপর আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে সুসংবাদ দিয়েছেন যে যদি তোমরা বিশজন যুদ্ধে অটল অবিচল থাক ধৈয্য ও সহনশীলতার পরিচয় দাও তবে দু'শ কাফেরের উপর তোমরা জয়ী হবে। আর যদি ধৈর্য্য ও সহনশীলতার গুণে গুণান্বিত হয়ে তোমাদের একশজন দুশমনের মোকাবেলা কর তবে দুশমনের এক হাজার লোকের উপর তোমরা বিজয় লাভ করবে।[১]

اَلْئٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا

আল্লাহ পাক এখন তোমাদের ভার লাঘব করেছেন তোমাদের দূর্বলতা সম্পর্কে তিনি ওয়াকেফহাল। অতএব, এখন তোমাদের একশজন সবর অবলম্বনকারী যুদ্ধা দু'শ কাফেরকে পরাজিত করতে পারবে।

শানে নজুল

বোখারী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে এসহাক এবনে রাহবিয়া তাঁর মসনদে হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ-এর সূত্রে লিখেছেন যখন লোকেরা একজনে দশজন কাফেরের মোকাবেলা করা কঠিন মনে করলো। তখন এই আয়াত নাজিল হয়। এরশাদ হয়েছেঃ তোমাদের অবস্থা এবং দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহ পাক

১। তফসীরে এবন কাসীর (উর্দু) খন্ড-১০, প্রষ্ঠা-২২

তোমাদের ভার লাঘব করেছেন। এখন শুধু দ্বিগুণ শত্রুর মোকাবেলায় সুদৃঢ় থাকতে হবে, দ্বিগুণ শত্রুর মোকাবেলা থেকে পশ্চাদপসরণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বা হারাম। তফসীরকারগণ বলেছেনঃ এখানেও শর্ত হলো সবর অবলম্বন, তথা ধৈর্য্যও সহনশীলতার গুণ অর্জন, দুশমনের মোকাবেলায় পর্বতের ন্যায় অটল অবিচল আকা। যদি মুমেনগণ এইগুণ অর্জন করে তবে দ্বিগুণ শত্রুর উপর আল্লাহ পাক মুমেনদেরকে বিজয় দান করবেন।

কিন্তু যদি সবরের গুণের অভাব হয়, তবে বিজয়ের কোন প্রতিশ্রুতি নেই।১

وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا

(তোমাদের দুর্বলতা সম্পর্কে আল্লাহ পাক জানতে পেরেছেন)

মুসলমানদের দুর্বলতার কারণ

আলোচ্য আয়াতাংশে মুসলমানদের যে দুর্বলতার কথা উল্লেখিত হয়েছে, তার কারণ সম্পর্কে তফসীরকারগণ বলেছেনঃ

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন ইসলামের জন্য, সত্য ও ন্যায়ের জন্য প্রিয় মাতৃভূমি মক্কায়ে মোয়াজ্জমা থেকে হিজরত করে মদিনায় মোনাওয়ারায় আগমন করলেন, এবং সারা আরব থেকে মুসলমানগণ নির্যাতীত উৎপীড়িত অবস্থায় মদিনাশরীফে হিজরত করলেন তখন তাঁদের সংখ্যা ছিল অতি নগন্য কিন্তু তাঁদের সাহস, শক্তি মনোবল ছিল অসামান্য, জেহাদে তাঁরা থাকতেন অটল, অবিচল এবং অপরাজেয়। কিন্তু তাঁরা যখন বয়োবৃদ্ধ হলেন, তখন দুর্বলও হলেন, ঈমানীশক্তি অটুটই ছিল কিন্তু বাহুবল স্বাভাবিক কারণেই পূর্বের ন্যায় ছিলনা। তাঁদের স্থলে নবীনরা আসলেন মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি হলো। কিন্তু প্রবীনদের ঈমানীশক্তি, বিচক্ষণতা এবং বিচার বুদ্ধি নবীনদের মধ্যে থাকার কথা নয়। এমন অবস্থায় কিছুটা দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়, তাই আলোচ্য আয়াতে দশগুণ শত্রুদের মোকাবেলার স্থলে দ্বিগুণ শত্রুর মোকাবেলা করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আজও সেই নির্দেশই কার্য্যকর রয়েছে। এখানে একথা উল্লেখযোগ্য যে যদি কেউ দ্বিগুণের চেয়ে বেশী সৈন্যের মোকাবেলায় অবিচল থাকে, তবে তা হবে অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জমানায় এক হাজার মুজাহেদ ৮০ হাজার কাফেরের সংগে লড়াই করেছেন। পবিত্র কোরআন এ সম্পর্কে ঘোষণা করেছে–

كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত–আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রহঃ), খন্ড–৩, পৃষ্ঠা–২৬২

কত মুষ্টিমেয় সংখ্যক মোমেনদল, কত বিরাট কাফের বাহিনীকে পরাজিত করেছে।"

পবিত্র কোরআনের এ ঘোষণার সত্যতার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রয়েছে ইতিহাসের পাতায়। প্রকৃতপক্ষে বিগত দেড় হাজার বছরের ইতিহাসে অমুসলমানদের সাথে যত যুদ্ধ হয়েছে তাতে কোন দিনই মুসলমানদের সংখ্যা শত্রু সৈন্য থেকে অধিক ছিল না; কিন্তু অধিকাংশ সময়ই বিজয় মালা শোভা পেয়েছে মুসলমানদের কণ্ঠে। এ পর্যায়ে কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

যুদ্ধ	মুসলমানদের সংখ্যা	শত্রুসৈন্য	বিজয়
বদর	৩১৩	১,০০০	মুসলমানদের
ওহোদ	৭০০	৩,০০০	,,
খন্দক	৩,০০০	১২,০০০	,,
মুতা	৩,০০০	১০,০০০	,,
ইয়ারমুক	৪০,০০০	২,৪০,০০০	,,
কাদেসিয়া	৮,০০০	৬০,০০০	,,
স্পেন	৭,০০০	১,০০,০০০	,,
সিন্ধু	৬,০০০	৫০,০০০	,,

এতে একথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, মুসলমান কোনদিন জনবল বা অস্ত্রবলে বিশ্বাসী হয়ে লড়াই করে না, বরং সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁরই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। যদি যুদ্ধে জয়লাভ হয়, তবে তা আরও বড় সাফল্য।

بِإِذْنِ اللَّهِ

অর্থাৎ মুসলমানগণ তাদের দ্বিগুণ শক্তির মোকাবেলায় বিজয়ী হবে। এই বিজয় হবে আল্লাহ পাকের অনুমতিক্রমে অতএব, প্রকাশ্য উপকরণের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। কেননা, যদি আল্লাহ পাকের অনুমতি না হয় তবে তাঁর সাহায্য এবং বিজয় কিছুই লাভ হবে না।[১]

وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

১। তফসীরে মাজেদী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৯০

আর আল্লাহ পাক সবর অবলম্বনকারীদের সংগে রয়েছেন।

অর্থাৎ যারা ধৈর্য্য ধারণ করে এবং দুশমনের মোকাবেলায় অটল অবিচল থাকে আল্লাহ পাকের সাহায্য তারাই লাভ করে।

ইমাম আহমদ (রহঃ) হযরত আনোস (রাঃ) এর সূত্রে এবনে মরদবীয়া হযরত আবু হোরাইরাহ (রাঃ)–এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন বদরের বন্দীদের মধ্যে হযরত আব্বাস (রাঃ) ছিলেন। একজন আনসারী তাঁকে গ্রেফতার করেছিলেন। আনসারী সাহাবীগণ তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিলেন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এই খবর পেয়ে অত্যন্ত ব্যাকুল হলেন। তিনি বললেন, আমি আমার পিতৃব্য আব্বাসের চিন্তায় নিদ্রিত হতে পারিনি। আনসারদের ইচ্ছা হল তাঁকে হত্যা করবে। হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করলেন আমি কি আনসারদের কাছে যাব? তিনি এরশাদ করলেন, হ্যাঁ হযরত ওমর (রাঃ) আনসারদের নিকট গমনকরে তাদেরকে বললেন, আব্বাস (রাঃ)–কে ছেড়ে দাও। তারা বললেন, আল্লাহর শপথ!তাঁকে আমরা ছাড়ব না।

হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে ছেড়ে দেওয়া পছন্দ করছেন। তখন আনসারী সাহাবীগণ বললেন, যদি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি এতেই থাকে, তবে তাঁকে এখনই নিয়ে যান। হযরত ওমর (রাঃ) তখন হযরত আব্বাস (রাঃ)–কে নিজ দায়িত্বে নিয়ে নিলেন এবং বললেন, আব্বাস আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন, আপনার ইসলাম গ্রহণ আমার পিতা খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণের চেয়েও আমার নিকট প্রিয়। এর কারণ এই যে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আপনার মুসলমান হওয়া অত্যন্ত পছন্দনীয়।

ইমাম বোখারী এবং বায়হাক্বী হযরত আনাস এবনে মালেকের(রাঃ) বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন কয়েকজন আনসারী সাহাবী অনুমতি নিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলেন এবং আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসূল! সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যদি আপনি অনুমতি দান করেন তবে আমরা আমাদের ভাগিনেও আব্বাসের মুক্তিপন মাফ করেদেই, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ না আল্লাহর শপথ এক দেরহামও ছাড়বে না। এরপর তিনি এরশাদ করলেন এই বন্দীদেরকে আল্লাহ পাক তোমাদের নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দিয়েছেন, এরা তোমাদেরই ভাই বেরাদর। এদের সম্পর্কে তোমাদের কি অভিমত? তখন আবু বকর (রাঃ) আরজ করলেন, এরা আপনার গোত্রেরই লোক, তাদের উপর আল্লাহ পাক আপনাকে বিজয় ও সাফল্য দান করেছেন। এরা সকলেই আপনার পিতৃব্য পুত্র, ভাই বেরাদর। এদেরকে হত্যা করবেন না। আমার অভিমত হল তাদের নিকট থেকে মুক্তিপন গ্রহণ করুন এর কারণে যে অর্থ সম্পদ সংগ্রহ হবে তার দ্বারা আমরা কাফেরদের মোকাবেলায় শক্তি সঞ্চয় করতে পারবো। এতদ্ব্যতীত এই আশা করা যায়

যে আল্লাহ পাক তাদেরকে আপনার মাধ্যমে হেদায়েত করবেন। এমন অবস্থায় তারা আপনার সহায়ক শক্তি হবেন।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন এরশাদ করলেনঃ হে এবনে খাত্তাব! এ সম্পর্কে তোমার কি অভিমত? হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এই লোকেরা আপনাকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, আপনাকে দেশ থেকে বের করে দিয়েছে এবং আপনার সাথে যুদ্ধ করেছে, আমার অভিমত আবুবকর (রাঃ) এর অভিমতের অনূরুপ নয়, আমার অভিমত হল অমুক ব্যক্তিকে (হযরত ওমর (রাঃ)–এর একজন নিকটাত্মীয় ছিলেন, তার দিকে ইংগিত করে বললেন) আমার নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দিন আমি তাকে হত্যা করবো, যেন আল্লাহ পাকের নিকট এ কথা প্রকাশিত হয় যে আমাদের অন্তরে মোশরেকদের জন্য কোন স্থান নেই। এরা সব কোরাইশদের নেতা, এদের সকলকে হত্যা করুন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে রাওয়াহা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, ময়দানে জ্বালানী একত্রিত করে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে এদের সকলকে জ্বালিয়ে ফেলুন। হযরত আব্বাস (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে রাওয়াহার কথা শ্রবণ করে বললেন, তুমি আত্মীয়তার বন্ধন বিনষ্ট করেছো। এরপর হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বগৃহে তশরীফ নিয়ে গেলেন। কিছু লোক বলতে লাগলোঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আবুবকর (রাঃ)–এর পরামর্শ গ্রহণ করবেন। কিছু লোক বললো হযরত ওমর (রাঃ) এর পরামর্শ মোতাবেক কাজ হবে। আর কোন কোন লোকের ধারণা ছিল হযরত আবদুল্লাহ এবেন রাওয়াহার মত গ্রহণ করা হবে। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন এবং এরশাদ করলেনঃ আল্লাহ পাক কোন কোন লোকের মনকে এত বিনম্র করেদেন যেন দুধের চেয়েও বিনম্র। আর কোন কোন লোকের অন্তরকে এত কঠোর করেন যা পাথরের চেয়েও শক্ত হয়ে যায়। আবু বকর তোমার দৃষ্টান্ত (সাহাবাদের মধ্যে) যেমন মিকাঈল (আঃ) যিনি বৃষ্টি আনয়ন করেন। আর আম্বিয়ায়ে কেরামের মধ্যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)–এর ন্যায়, যিনি বলেছিলেনঃ

فَمَنْ تَبِعَنِى فَإِنَّهُ مِنِّى وَمَنْ عَصَانِى فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

অর্থাৎ যে আমার অনুসরণ করে সে আমার। আর যে আমার আদেশ অমান্য করে নিশ্চয়ই হে আল্লাহ! তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল অতীব দয়াবান।

হে ওমর! (সাহাবাদের মধ্যে) তোমার দৃষ্টান্ত এমন যেমন ফেরেশতাদের মধ্যে জীব্রাঈল (আঃ) যিনি আল্লাহর দুশমনদের জন্যে বালা মসিবত এবং আজাব নিয়ে আসেন। আর আম্বিয়ায়ে কেরামের মধ্যে যেমন হযরত নূহ (আঃ) যিনি বলেছিলেনঃ

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا

হে প্রতিপালক! পৃথিবীতে একটি কাফেরকেও জীবিত রাখবেন না। অথবা তোমার দৃষ্টান্ত হল যেমন নবীগনের মধ্যে হযরত মুসা (আঃ) ছিলেন, যিনি বলেছিলেনঃ

رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ

হে আল্লাহ! তাদের অর্থ সম্পদ ধ্বংস করে দিন এবং তাদের অন্তরকে কঠিন করে দিন যেন ঈমান আনতে না পারে যে পর্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি না দেখে। (আর শাস্তি দেখার পর ঈমান গ্রহণযোগ্য হয়না।)

এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তোমরা উভয়ে যদি একমত হতে, তবে আমি তোমাদের মতের বরখেলাফ করতাম না। তোমরা দারিদ্র প্রপীড়িত, তাই এই বন্দীদের মধ্যে কেউ মুক্তিপন আদায় না করে যেতে পারবেনা, অথবা তাকে হত্যা করা হবে।[১]

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗۤ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ ؕ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا ۖۗ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٧﴾ لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَاۤ اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٦٨﴾ فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖؗ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٦٩﴾

তরজমা

(৬৭) দেশে ব্যাপকভাবে দুশমনকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর পক্ষে শোভনীয় নয়। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা কর আর আল্লাহ পাক চান আখেরাতের কল্যাণ এবং আল্লাহ পাক মহা পরাক্রমশালী মহান প্রজ্ঞাময়।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৬২-৬৩

(৬৮) আল্লাহ পাকের একটি সিদ্ধান্ত যদি পূর্বে লিখিত না থাকত, তবে তোমরা যা গ্রহণ করেছো তার জন্যে তোমাদের উপর ভয়ঙ্কর শাস্তি আপতিত হতো।

(৬৯) অতএব, যুদ্ধলব্ধ যে হালাল ও উত্তম সম্পদ তোমরা পেয়েছো তা ভোগ কর। আর আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাকো নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীবদয়াবান।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে জেহাদের বিভিন্ন বিধান বর্ণিত হয়েছে। জেহাদের পর কাফের বন্দী হয়ে আসে তাই আলোচ্য আয়াতে বন্দীদের সম্পর্কে বিধান পেশ করা হয়েছে। বিশেষতঃ বদরের যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে ফরমান জারী করা হয়েছে।

শানে নজুল

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বদরের যুদ্ধে যে সত্তর জন কাফের বন্দী হয়ে এসেছিল তাদের সম্পর্কে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করেছিলেন তাঁরা একাধিক পরামর্শ দিয়েছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছিলেন দয়ার সাগর, তাই তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)—এর পরামর্শ গ্রহণ করে বন্দীদের থেকে মুক্তি পন নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত রসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে দেখলেন তিনি এবং হযরত আবুবকর (রাঃ) ক্রন্দন করছেন। তিনি আরজ করলেন? ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম! ক্রন্দনের কারণ জানতে পারলে আমিও ক্রন্দন করব। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ (বদরের যুদ্ধের কয়েদীদের ব্যাপারে) এবনে খাত্তাবের পরামর্শ গ্রহণ না করার কারণে আমাদের উপর আযাব আপতিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। যদি সে আযাব আপতিত হ'ত তবে এবনে খাত্তাব ব্যতীত আর কেউ রক্ষা পেতনা। নিকটস্থ একটি বৃক্ষের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেছিলেন, এ বৃক্ষটি থেকেও নিকটতর সে আযাব আমাকে দেখান হয়েছিল (কিন্তু আল্লাহপাক ঐ আযাব তুলে নিয়েছেন) তখন এ আয়াত নাজিল হয়। এরশাদ হয়েছেঃ

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗٓ اَسْرٰى

দেশে কাফেরদের উত্তমরূপে পরাভূত না করা পর্যন্ত নবীর পক্ষে নিজের কাছে বন্দীদের রাখা শোভা পায়না। কেননা জেহাদের উদ্দেশ্য কাফেরদের শক্তি নিশ্চিহ্ন করে দেয়া, আল্লাহর দুশমনদের মেরুদন্ড ভেঙ্গে দেয়া, মানবতার চিরশত্রু পৌত্তলিকদের মূলোৎপাটন করা। মুক্তিপন নিয়ে ছেড়ে দেয়ার মাধ্যমে এ উদ্দেশ্য অর্জিত হয়না; বরং তাদেরকে হত্যা করে আল্লাহর জমীনকে পাক করাই ছিল কর্তব্য।

তফসীরকারগণ বলেছেনঃ বদরের যুদ্ধের বন্দীদেরকে নিয়ে মুসলমানদেরকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। হযরত ওমর (রাঃ) পরামর্শ দিয়েছিলেন তাদেরকে হত্যা করাই শ্রেয়। হযরত আবুবকর (রাঃ) বলেছিলেন, মুক্তিপন নিয়ে ছেড়ে দেয়া সমিচীন মনে করি। হয়তো তারা পরবর্তীকালে হেদায়েত লাভ করবে এবং মুক্তিপন হিসেবে লব্ধ সম্পদ মুসলমানদের আর্থিক সমস্যার সমাধানে উপকারী হবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হলেন রহমাতুলল্লিল আলামীন। তাঁর স্বভাবসুলভ দয়ামায়ার কারণে তিনি হযরত আবুবকর (রাঃ)–এর মতই পছন্দ করলেন। এবং বন্দীদেরকে মুক্তিপন নিয়ে ছেড়ে দিলেন, যদি তাদেরকে হত্যা করা হতো তবে কাফেরদের দৌরাত্বের অবসান ঘটতো। মুসলমানদের প্রতি তারা যে অকথ্য নির্যাতন করেছিল তার দুঃসাহস আর কোন দিন করতোনা। আর এই কর্মপন্থাই ছিল আল্লাহ পাকের পছন্দনীয়। তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗٓ اَسْرٰى

অর্থাৎ দুশমনকে ব্যাপকভাবে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা নবীর পক্ষে সমিচীন নয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোন কোন সাহাবায়ে কেরামের অর্থনৈতিক দিকের প্রতিও লক্ষ্য ছিল তাই পরবর্তী বাক্যে এ সম্পর্কে এরশাদ হয়েছেঃ

تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا ۖ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ؕ

অর্থাৎ তোমরা এই ক্ষণস্থায়ী জগতের তুচ্ছ অর্থ–সম্পদ কামনা করছো? অথচ দুনিয়ার ধন–দৌলতের কামনা মুসলমানের পক্ষে শোভনীয় নয়। আল্লাহ পাকের মর্জি হ'ল তোমরা আখেরাতের চিরস্থায়ী সাফল্য লাভ কর। তোমাদের আখেরাতের সাফল্যই আল্লাহ পাকের কাম্য এবং পছন্দনীয়। আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে যা তোমরা মুক্তিপন হিসেবে পেয়েছো তার চেয়ে সহস্রগুণ বেশী তোমাদেরকে দিতে পারেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এই ঘটনা বদরের দিনের যখন

মুসলমানদের সংখ্যা কম ছিল। আর যখন মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল এবং শক্তিও বেড়ে গেল তখন আল্লাহ পাক এ আয়াত

فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً

নাযিল করে আলোচ্য আদেশকে বাতিল করেছেন এবং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং মুসলমানদেরকে এই অধিকার দিয়েছিলেন ইচ্ছা করলে বন্দীদেরকে হত্যা করতে পারেন অথবা গোলাম বানিয়ে নিতে বা মুক্তিপন নিয়ে ছেড়ে দিতে পারেন অথবা কিছু না নিয়েও মুক্তি দিতে পারেন।১

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

১। ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে ইমামুল মুসলেমীনের এই অধিকার আছে যে তিনি ইচ্ছা করলে বন্দীদেরকে মৃত্যুদন্ড দিতে পারেন যেমন হযরত রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বনু কোরাইজাকে হত্যা করিয়েছিলেন এবং নজর এবনে হারেস, তায়ীমা এবনে আদী, আকাবা এবনে আবী মুয়ীদ নামক কুখ্যাত শত্রুদেরকে গ্রেফতারের পর হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন।

২। কয়েদীদেরকে গোলাম বানিয়ে রাখাও বৈধ। এভাবে কাফেরদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করার সুযোগ হয়। এজন্য ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বলেছেন, কোন মুসলমান ব্যক্তিগত ভাবে কোন বন্দীকে হত্যা করার অধিকার রাখেনা বরং এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দায়িত্ব হল ইমামুল মুসলেমীনের। এই সম্পর্কে সিদ্বান্ত গ্রহণের অধিকার একমাত্র তাঁরই, তিনি যা পছন্দ করেন তা সিদ্বান্ত গ্রহণ করতে পারেন।

৩। বন্দীদেরকে কোন রকম মুক্তিপন না নিয়ে কাফেরদের দেশে প্রেরণ করা অথবা মুক্তিপন নিয়ে প্রেরণ করা, বা মুসলিম বন্দীদের সংগে বিনিময় করা অথবা জিম্মি করে মুসলিম দেশে রাখা এ সব পন্থাই আয়াতাংশের মর্মের অন্তর্ভুক্ত।

فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً

তবে তত্ত্বজ্ঞানী ওলামায়ে কেরাম এ সম্পর্কে একাধিক মত পোষণ করেন। ইমাম মালেক (রহঃ) ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ইমাম আহমদ (রহঃ), সুফিয়ান সওরী

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড–৫, পৃষ্ঠা–১৬৫

(রহঃ) ইসহাক এবনে রাহবীয়া (রহঃ) হাসান (রহঃ) এবং আতা (রহঃ) এর মত হল কোন রকম মুক্তিপন না নিয়ে বন্দীদেরকে ছেড়ে দেয়া, অথবা মুক্তিপন নিয়ে রেহাই দেয়া বা মুসলিম বন্দীদের সংগে বিনিময় করা সবই জায়েজ।

আর ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) ইমাম মোহাম্মদ আওজায়ী (রহঃ), কাতাদা (রহঃ) প্রমুখ তত্ত্বজ্ঞানীগণের মত হল কোন মুক্তিপন না নিয়ে বন্দী ছেড়ে দেয়া জায়েজ নয়। অবশ্য মুক্তিপন নিয়ে বন্দী মুক্তি দেয়ার ব্যাপারে ইমাম সাহেব এবং ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদের মতে এতে ক্ষতি নেই যদি মুসলমানদের অর্থ-সম্পদের প্রয়োজন থাকে, এমনিভাবে মুসলিম বন্দীদের সঙ্গে বিনিময় করার ব্যাপারেও আমাদের ইমাম সাহেবের একটি মত হল যে তা বৈধ।

বন্দীদেরকে মুক্তি দিয়ে জিম্মী বানিয়ে রাখা ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এবং ইমাম মালেক (রহঃ) এর নিকট জায়েজ। যেমন হযরত ওমর (রাঃ) ইরাকের অধিবাসী ও সিরিয়ার অধিবাসীদেরকে জিম্মি করে রেখেছিলেন। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বলেন যে, মুক্তিপন ব্যতীত অথবা মুক্তিপন নিয়ে যদি কাফেরদেরকে কাফেরের দেশে পাঠানো হয় তবে কাফেরদের শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং তারা দ্বিতীয়বার মুসলমানদের সংগে লড়াই করবে। এজন্য কাফেরদেরকে দারুল হরবে প্রেরণ করা জায়েজ নয়। আর যদি এভাবে কাফের বন্দীদেরকে প্রেরণ করা হয় তবে এর অর্থ হবে কাফেরদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাহায্য করা। এজন্যে এর অনুমতি দেয়া যায় না। মুসলিম শরীফ, আবুদাউদ শরীফ এবং তিরমিজি শরীফে হযরত এমরান এবনে হোসাইনের সূত্রে হাদীস সংকলিত হয়েছে। হযরত রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দু'জন মুসলমানের সংগে একজন মুশরেক কয়েদীর বিনিময় করেছেন।

এবনে ইসহাক এবং আবু দাউদ হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যখন মক্কাবাসী তাদের বন্দীদের মুক্তিপন প্রেরণ করে তখন হযরত রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কন্যা হযরত জয়নব তাঁর স্বামী আবুল আসের মুক্তিপন হিসেবে সেই হারটি প্রেরণ করেন যা তাঁকে হযরত খাদীজা (রাঃ) বিয়ের সময় দিয়েছিলেন। ঐ হারটি দেখে হযরত রসূলালাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রাণ কেঁদে উঠলো। তখন তিনি সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, যদি তোমরা সমিচীন মনে কর তবে জয়নবের স্বামীকে ছেড়ে দাও আর মুক্তিপন হিসেবে যা প্রেরণ করেছে তাও ফেরত দাও। সাহাবায়ে কেরাম এই আদেশ পালন করেছেন।

হাকেম এই হাদীস বর্ণনা করে একথা সংযোজন করেছেন, আবুল আসকে মুক্তি দেয়ার সময় হযরত রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার নিকট থেকে এই অংগীকার গ্রহণ করেছিলেন যে সে হযরত জয়নব (রাঃ)-কে মদীনা শরিফ প্রেরণ করবে। সে তার অংগীকার অনুযায়ী কাজ করেছিলো। এবনে এসহাক লিখেছেন,

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যাদেরকে মুক্তিপন ব্যতীত রেহাই দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিল হযরত আবু সাইদ আনসারী (রাঃ)–এর বন্দী মোত্তালেব এবনে হালতব এবং আবু এজ্জা। এই ব্যক্তি অত্যন্ত দরিদ্র ছিল। তার কয়েকটি কন্যা সন্তান ছিল সে তার সংসারের অভাব অনটনের কথা বলে রেহাই পাওয়ার জন্য আবেদন করেছিলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার নিকট থেকে অগীকার নিয়েছিলেন, আমার বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করবে না। সে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রশংসায় একটি কবিতাও রচনা করেছিলো। কিন্তু ওহোদের যুদ্ধের সময় দেখা যায় সে পুনরায় হাজির হয়েছে। এবারও তাকে গ্রেফতার করা হয়। পুনরায় সে ক্ষমাপ্রার্থী হয়। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ এবার তোমার গন্ডদেশ আর মক্কার মাটি স্পর্শ করতে পারবেনা। আর তুমি মক্কায় পৌছে বলবে মোহাম্মদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমি দু'বার ধোকা দিয়েছি। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে হত্যা করার নির্দেশদিলেন।

সাবিলুর রাশাদ গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে যে কোন কোন বন্দীর নিকট কোন অর্থ সম্পদ ছিল না বলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে মুক্তিপন ব্যতীতই মুক্তি দিয়েছেন।

আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই

হযরত আবু হোরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কিছু অশ্বারোহীকে ইয়ামামার দিকে প্রেরণ করেন। তারা বণু হানিফা গোত্রের সোমামা এবনে আসলে নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে আনে। তাকে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা হয়। হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার নিকট গমন করলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সোমামা তোমার কি ধারণা? সে বললোঃ কল্যাণ। হে মোহাম্মদ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) যদি তুমি আমাকে হত্যাকর তবে একজন খুনি ব্যক্তিকে হত্যা করবে। আর যদি দয়া করে আমাকে ছেড়ে দাও তবে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি দয়া করবে। আর যদি মুক্তিপন হিসেবে ধন–সম্পদ চাও তবে যত ইচ্ছা, চাওয়ার সুযোগ আছে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে ঐ অবস্থায় রেখে তশরীফ নিয়ে গেলেন।

দ্বিতীয় দিন তিনি পুণরায় তার নিকট আগমন করলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন সোমামাহ! এখন তোমার কি অভিমত? সে গতকালের কথাই পুনরায় বললো।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে ঐ অবস্থায় রেখে চলে গেলেন।

তৃতীয় দিন তিনি পুনরায় তশরীফ আনলেন, এবং জিজ্ঞাসা করলেন সোমামাহ। তোমার কি ধারনা?

সে বললোঃ আমি ইতিপূর্বে যা বলেছি সেই ধারণাই পোষন করছি তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আদেশ দিলেন, "সোমামাহকে ছেড়ে দাও।" সাহাবায়ে কেরাম তার বাঁধন খুলে দিলেন। মসজিদের কাছেই কিছু খেজুর বৃক্ষ ছিল। সোমামাহ সেখানে গমন করে গোসল করলো। পুনরায় মসজিদে আসলো এবং বললো,

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد الرسول الله

(আমি সাক্ষ্য দেই যে আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, আর আমি সাক্ষ্য দেই যে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর বন্দা ও রসূল।)

হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! এই পৃথিবীতে আমার নিকট আপনার চেহারার চেয়ে অধিকতর ঘৃন্য কোন চেহরা ছিলনা, কিন্তু এখন আমার নিকট আপনার চেহারা সবচেয়ে প্রিয়। এই পৃথিবীতে আপনার ধর্ম আমার নিকট সবচেয়ে অপ্রিয় এবং অপছন্দনীয় ছিল, কিন্তু আজ আপনার ধর্ম সবচেয়ে প্রিয় এবং পছন্দনীয়। আপনার শহর আমার নিকট সবচেয়ে ঘৃন্য ছিল, কিন্তু এখন আপনার শহর আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় শহর। আমি ওমরাহ করার জন্যে গমন করছিলাম এমন অবস্থায় আপনার অশ্বারোহীরা আমাকে নিয়ে এসেছে। এখন আপনার কি আদেশ? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সোমামাহকে সুসংবাদ দিলেন এবং ওমরাহ করার আদেশ দিলেন। সোমামাহ যখন মক্কায় পৌছলো এক ব্যক্তি তাকে বললো, তুমি বেদ্বীন হয়েগেছ। সোমামাহ বললো, না, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আল্লাহর শপথ; ভবিষ্যতে হযরত রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুমতি ব্যতীত গমের একটি দানাও ইয়ামামাহ থেকে তোমাদের নিকট পৌছবেনা।১

لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَآ اَخَذْتُمْ

অর্থাৎ যদি আল্লাহ পাকের একটি সিদ্ধান্ত পূর্বেগৃহিত না থাকতো তবে তোমরা যা গ্রহণ করেছো তার জন্য তোমাদের উপর ভয়াবহ আযাব আপতিত হত। অপরাধ যত সঙ্গীন হয় শাস্তিও তত ভয়াবহ হয়। বহু পূর্বে গৃহিত একটি সিদ্ধান্ত যদি লিপিবদ্ধ না থাকতো, তবে তোমরা যা গ্রহণ করেছ, তার জন্য ভয়াবহ আজাব তোমাদের প্রতি আপতিত হতো।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৬৬-৬৮

এখন প্রশ্ন হলো পূর্বে গৃহিত সিদ্ধান্তটি কি? এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় কোন কিছু ঘোষণা করা হয়নি, তবে তফসীরকারগণ এ সম্পর্কে একাধিক সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেনঃ

(১) মুজতাহিদের এমন ভুলের শাস্তি দেওয়া হবেনা, যেমন, বদরের বন্দীদের যদি হত্যা করা হ'ত তবে কাফেররা ভীত সন্ত্রস্ত হ'ত এবং ইসলামের শক্তি এবং প্রভাবের বহিঃ প্রকাশ হ'ত। মুসলমানগণ এ সত্যটি উপলব্ধি করতে পারেননি বরং তাঁরা ধারণা করেছেন যদি মুক্তিপন নিয়ে বন্দীদেরকে ছেড়ে দেয়া হয় তবে দু'টি উপকার হবে

(ক) বন্দীরা হয়তো কোন দিন ইসলাম গ্রহণ করবে, বাস্তব ক্ষেত্রে অবশ্য তাই হয়েছিল। অধিকাংশ বন্দী অবশেষে ইসলাম গ্রহণের সুযোগ পেয়েছিল।

(খ) মুক্তিপন হিসেবে যে সম্পদ লাভ হবে তা দ্বারা মুসলমানদের আর্থিক সংকট দূরীবূত হবে বিশেষতঃ অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়ের মাধ্যমে জেহাদী শক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। এটি ছিল মুসলমানদের ইজতেহাদী ভুল। আর এ সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ

লওহে মাহফুজে আল্লাহ পাক পূর্বেই লিখে রেখেছেনঃ যদি কেউ ইজতেহাদের ব্যাপারে ভুল করে তবে এজন্যে তার উপর আযাব হবেনা। যদি ইতিপূর্বে এ সিদ্ধান্ত না হত তবে বদরের যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপারে যে ভুল হয়েছে তার পরিণাম স্বরূপ আল্লাহর আযাব আপতিত হ'ত।

(২) কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী একথাও বলেছেন যে লওহে মাহফুজে আল্লাহপাক একথা পূর্বেই লিখে রেখেছেন যে, বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের উপর আযাব নাজিল করবেননা। যদি পূর্বে এ সিদ্ধান্ত না থাকতো তবে তাদের উপর আযাব আসতে।

فِيْمَآ اَخَذْتُمْ

তোমরা আল্লাহর হুকুম নাজিল হওয়ার পূবেই নিজেদের বিবেচনায় বন্দীদের থেকে মুক্তিপন নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছ। এ কারণে তোমাদের উপর আযাব আসত কিন্তু যদি আযাব না দেয়ার পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকতো তবে আযাব আপতিত হ'ত।

(৩) কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত আল্লাহ পাক অপরাধীকে শাস্তি দেননা।

(৪) মুক্তিপনের বিনিময়ে বন্দীমুক্তি অচিরেই আল্লাহ পাকের তরফ থেকে বৈধ ঘোষণা করা হবে। যদি পূর্বে এ সিদ্ধান্ত না হ’ত তবে আল্লাহর আযাব আপতিত হ’ত।

(৫) আল্লাহ পাকের একথা জানা ছিল যে বন্দীদের অনেকে ইসলাম গ্রহণ করবে। যদি এমন কথা না হ’ত তবে তোমাদের উপর আযাব আসত।

(৬) আল্লাহ পাক পূর্বেই সিদ্ধান্ত করেছেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বর্তমানে এবং মানুষ যদি এস্তেগফাররত থাকে তবে এমন অবস্থায় আযাব দিবেন না। যদি এমন সিদ্ধান্ত পূর্বে গৃহিত না হ’ত তবে অবশ্যই আযাব নাজিল হ’ত।

এবনে ইসহাক লিখেছেনঃ সেখানে যত লোক উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে হযরত ওমর (রাঃ) এবং হযরত সাদ এবেন মাআজ (রাঃ) বন্দীদের হত্যা করার পরামর্শ দিয়ে ছিলেন। অন্য সকলেই মুক্তিপন গ্রহণের পক্ষে মত দিয়েছিলেন। তাই হযরত রসূলালাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি আসমান থেকে আযাব আসত তবে ওমর এবনে খাত্তাব এবং মাআজ ব্যতীত আর কেউ রক্ষা পেতনা

لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ

আলোচ্য আয়াতের তফসীরে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ এ আয়াতের অর্থ হ’ল যদি সৃষ্টির প্রথম দিন আল্লাহ পাক এমন সব ব্যাপারে ক্ষমা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করতেন তবে তোমাদের উপর কঠিন আযাব আপতিত হ’ত। আর এ কথাই ঘোষণা করা হয়েছে পবিত্র কোরআনের এ আয়াতে।

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ

অর্থাৎ তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে রহমত নাজিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এমনিভাবে, আরো এরশাদ হয়েছেঃ

غلبت رحمتى على غضبى

অর্থাৎ আমার রহমত আমার গজবের উপর প্রাধান্য পেয়েছে।

এতদ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য আয়াতের মর্মকথা হ’ল পূর্বাহ্নে তোমাদেরকে ক্ষমা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত না হলে তোমাদের উপর আযাব নাজিল হত।

ইমাম রাজী (রঃ) এ সম্পর্কে আরো বলেছেনঃ বদরের যুদ্ধে যে পূণ্যাত্মা সাহাবায়ে কেরাম অংশ গ্রহণ করেছেন, ইসলামের জন্যে তাঁদের অবদান অসামান্য। তাঁরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুকরণ ও অনুসরণে যে ভূমিকা পালন করেছেন তার দৃষ্টান্ত বিরল। তাঁরা হানাদার কাফেরদের বিরুদ্ধে অস্ত্র শস্ত্র ব্যতীত যেভাবে যুদ্ধ করেছেন তা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। তাই একথা বলা অত্যুক্তি হবেনা যে, এ সমস্ত পূণ্য সাধনায় তাঁরা যে সওয়াবের যোগ্য বিবেচিত হয়েছেন তা তাঁদের দ্বারা সংঘটিত ভুলের শাস্তি থেকে অনেক অনেক বেশী। তাই তাঁদের এ ভুল আল্লাহ পাক মাফ করে দিয়েছেন।১

এবনে আবিশায়বা, তিরমিজী, নেসায়ী এবনে জরীর হযরত আলীর (রাঃ) সূত্রে লিখেছেন যে, হযরত জীব্রাঈল (আঃ) হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে বললেনঃ হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আপনার সম্প্রদায় বন্দীদের থেকে মুক্তি পন গ্রহণ করেছে তা আল্লাহ পাকের নিকট অপছন্দনীয় হয়েছে। আল্লাহ পাক আপনাকে এ আদেশ দিয়েছেন যে, আপনি আপনার সম্প্রদায়কে দু'টি বিষয়ের একটি অবলম্বনের আদেশ দিন।

(১) অগ্রসর হয়ে বন্দীদেরকে হত্যা করা।

অথবা

(২) তাদের থেকে মুক্তিপন গ্রহণ করা তবে শর্ত হলো, যত সংখ্যক বন্দী রয়েছে তোমাদের তত সংখ্যক লোককে আগামীতে প্রাণ দিতে হবে।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে ডাক দিয়ে আল্লাহ পাকের হুকুমের কথা জানিয়ে দিলেন। সাহাবায়েকেরাম আরজ করলেন ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এই বন্দীরাতো আমাদের বংশেরই লোক, আমাদের ভাই বেরাদের। আমরা তাদের থেকে মুক্তিপন এই জন্য গ্রহণ করেছি যেন আমরা দুশমনের মোকাবেলায় অস্ত্রসস্ত্র সংগ্রহ করতে পারি এবং শক্তি অর্জন করি। যদি তাদের সংখ্যার সমান আমাদের লোক শহিদ হয়ে যায় তবে তা আমরা অপছন্দ করি না। বাস্তবেও তা হয়েছে পরবর্তী বছর ওহুদের যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবায়েকরাম শাহাদত বরণ করেন।

আল্লামা বগভী লিখেছেন আলোচ্য আয়াত নাযিল হওয়ার পর সাহাবায়ে করাম মুক্তিপন স্বরূপ যে সম্পদ এসেছিলো তা গ্রহণে বিরত থাকেন। তখন আল্লাহ পাক পরবর্তী আয়াত নাযিল করেন এবং বন্দীদের থেকে গৃহিত ধন-সম্পদকে হালাল এবং উত্তম ঘোষণা করে তা ভোগ করার অনুমতি দান করেন। এরশাদ হয়েছে।২

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৫, পৃষ্ঠা-২০৩

২। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৭০

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا

অতএব তোমরা যা কিছু গ্রহণ করেছো তাকে হালাল এবং উত্তম মনে করে ভোগ কর আর আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাক আর নাফরমানীর কাজ থেকে বিরত থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল অতীব দয়ামান। অর্থাৎ তোমরা যে মুক্তিপন এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ গ্রহণ করেছো আল্লাহ পাক তোমাদের জন্য তা হালাল ঘোষণা করেছেন, এখন তোমরা তা ভোগ করতে পারো।

হযরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃআমাকে ছয়টি বৈশিষ্ট্য দান করার মাধ্যমে অন্যান্য নবীগণের উপর আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে। ঐ ছয়টি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি হলো আমার জন্যে মালেগানিমত তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হালাল করা হয়েছে। (তিরমীজি)

তেবরাণী এবনে এজিদের সূত্রে এ হাদীস এভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমাকে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে আর আমার জন্যে মালে গনিমত হালাল করা হয়েছে যা আমার পূর্বে কারো জন্যে হালাল ছিলনা।

আল্লামা বগভী হযরত জাবের (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত এ হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

হযরত আব্বাস (রাঃ) ইসলামগ্রহণর করলেন

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ হযরত আব্বাস এবনে আবদুল মোত্তালেব বদরের দিন বন্দী হন। তিনি সে দশ ব্যক্তির একজন, যাদের উপর কাফের সৈন্যদের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। তিনি অনেক স্বর্ণমুদ্রা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। তখনও ঐ স্বর্ণমুদ্রা তাঁর সঙ্গে ছিল। তিনি তার মুক্তিপন হিসেবে ঐ স্বর্ণমুদ্রা পেশ করলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তা গ্রহণ করতে আস্বীকৃতি জানান। তিনি বলেন, যে জিনিষ তুমি ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যয় করার উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছ তা আমি তোমার জন্যে ছেড়ে দেবনা। অর্থাৎ এ সম্পদকে আমি তোমার জন্যে মুক্তিপন হিসেবে গ্রহণ করবনা। হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে তাঁর ভাতস্পুত্র আকিল এবনে আবু তালিব এবং নওফেল এবনে হারেসের মুক্তিপন আদায়ের কথা বলা হয়।

হযরত আব্বাস (রাঃ) আরজ করলেনঃ হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তুমি আমাকে এমন অবস্থায় উপনীত করেছ যে, আমি যতদিন জীবিত থাকি আমাকে কোরায়শের নিকট ভিক্ষা করতে হবে। তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ তবে ঐ স্বর্ণগুলোর কি হ'ল যা

আপনি মক্কা থেকে রওয়ানা হবার সময় উম্মুল ফজলকে (হযরত আব্বাস (রাঃ)–এর স্ত্রী) দিয়ে এসেছেন এবং বলে এসেছেনঃ জানিনা কি হয় তবে যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে যায় তবে এই স্বর্ণ তোমার এবং আবদুল্লাহ, ওবায়দুল্লাহ, ফজল এবং কুলসুমের জন্যে রইল। অর্থাৎ হযরত আব্বাস (রাঃ) তাঁর চার পুত্রের জন্যে স্বর্ণমুদ্রা রেখে এসেছেন। (একথা তিনি এবং তাঁর স্ত্রী ব্যতীত কেউ জানেনা।) হযরত আব্বাস (রাঃ) তাই আরজ করলেনঃ আপনাকে এসব কথা কে বলেছে? তখন রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আমাকে আমার প্রতিপালক বলেছেন। তখন হযরত আব্বাস (রাঃ) সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেনঃ

اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك عبده ورسوله

আমি স্বাক্ষ্য দেই আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং এ স্বাক্ষ্যও দেই যে নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহর বান্দা এবং রসূল। আল্লাহ ব্যতীত এ সম্পর্কে কেউ অবগত ছিলনা। এভাবে হযরত আব্বাস (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করলেন।

وَّاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং ভবিষ্যতে এমন ভুল যেন না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখ। আর নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, তাঁর এ ক্ষমাশীলতার কারণেই তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন। এর পাশাপাশি তিনি পরম করুণাময়, তাঁর দয়ামায়া অনন্ত অসীম। আর এ দয়ামায়ার কারণেই তিনি মুক্তিপন হিসেবে অর্জিত সম্পদকে তোমাদের জন্যে হালাল এবং উত্তম ঘোষণা করেছেন। এবং গনিমতের মাল তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও মুক্তিপণ হিসেবে অর্জিত সম্পদ আল্লাহর দান হিসেবে স্বচ্ছন্দে ভোগ করার অনুমতি দিয়েছেন।

এখানে একথা বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য যে, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বা মুক্তিপনকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়াই হ'ল নিন্দনীয় এবং নিষিদ্ধ। পবিত্র কোরআন এখানে মানব মনের সংশোধন করতে চায় যে, মর্দে মোমেনের মন অর্থ সম্পদের লোভলালসা থেকে পবিত্র থাকবে। মর্দে মোমেনের মন আল্লাহ পাকও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহব্বতে পরিপূর্ণ থাকবে। এটি মোমেনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এখানে আরো একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা হ'ল মুক্তিপন গ্রহণের ব্যাপারে যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে তা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাকে লক্ষ্য করে নয়; বরং সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যাঁরা অর্থ–সম্পদের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন তাঁদের সম্পর্কে, পবিত্র কোরআনের ভাষায় লক্ষ্য করুন।

يُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا

তোমরা দুনিয়ার সম্পদ কামনা কর? অথচ আল্লাহ্ পাক তোমাদের জন্যে আখেরাতের সাফল্য কামনা করেন। অর্থাৎ মোমেনের কর্তব্য হ'ল আখেরাতের সাফল্যের জন্যে স্বচেষ্ট হওয়া। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের উপকারী বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করা যদিও বৈধ, কিন্তু আল্লাহর নৈকট্য-ধন্য পূণাত্মা সাহাবায়ে কেরামের উচ্চ মর্তবা এবং শানের সাথে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে হযরত আবু বকর (রাঃ)–এর অভিমতকে প্রাধান্য দিয়েছেন তার কারণও তাঁর দয়ামায়া। কোন আর্থিক সুবিধা অর্জন নয়। কেননা, মোমেনদের কষ্ট ছিল তাঁর পক্ষে অসহনীয় এবং মুক্তিপন হিসেবে অর্থ–সম্পদ অর্জিত হলে মুসলমানদের কষ্ট কিছুটা লাঘব হবে, এটিই ছিল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি যা তাঁর দয়ামায়া ব্যতীত আর কিছুই নয়।১

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنْ فِيْۤ
اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰۤى ۙ اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ
خَيْرًا مِّمَّاۤ اُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٧٠ وَ
اِنْ يُّرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ ؕ
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝٧١ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا
بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْۤا
اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا
مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا ۚ وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ
فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
مِّيْثَاقٌ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝٧٢

১) তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত–আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড–৩, পৃষ্ঠা–২৬৩–২৬৪

তরজমা

(৭০) হে নবী! আপনার করায়ত্ত যুদ্ধ বন্দীদেরকে বলে দিন যে, আল্লাহ পাক যদি তোমাদের হৃদয়ে ভাল কিছু দেখেন তবে তোমাদের নিকট থেকে যা কিছু লওয়া হয়েছে তার চেয়ে উত্তম বস্তু তিনি তোমাদেরকে দান করবেন ও তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

(৭১) আর যদি তারা (হে রসূল!) আপনার সাথে ধোকাবাজী করতে চায় তবে ইতিপূর্বে আল্লাহ্ পাকের সাথেও তারা ধোকাবাজী করেছে। এরপর আল্লাহ পাক তোমাদেরকে তাদের উপর শক্তিশালী করেছেন আর আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

(৭২) নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর রাহে জেহাদ করেছে, আর যারা আশ্রয় দিয়েছে এবং সাহায্য করেছে, তারা একে অন্যের বন্ধু এবং যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করেনি, হিজরত না করা পর্যন্ত (হে রসূল!) তাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব আপনার নেই। আর যদি তারা (হে মোমেনগণ!) তোমাদের সাহায্য কামনা করে তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য, তবে সে সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়, যাদের এবং তোমাদের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। আল্লাহ্ পাক তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করছেন।

তফসীরুল কোরআন

শানে নজুল

মোহাম্মদ ইবনে ইউসুফ সালেহী সাবিলুর রাশাদ গ্রন্থে লিখেছেন যে বদরের যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে একদল হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করলো আমরা প্রকৃত অবস্থায় মুসলমান ছিলাম নিতান্ত বাধ্য হয়ে যুদ্ধ করতে এসেছি। আমাদের থেকে মুক্তিপন কেন গ্রহণ করা হচ্ছে, যারা এ আরজী পেশ করল তাদের মধ্যে হযরত আব্বাস (রাঃ) ছিলেন অন্যতম। ঐ সময়ই এই আয়াত নাজিল হয়।

তিবরাণী আল্ আওসাতে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের সূত্রে লিখেছেন যে হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেছেন আমি যখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আমার মুসলমান হওয়ার খবর দিয়ে বলি যে আমার নিকট থেকে যে স্বর্ণ জমা হয়েছে তা আমার মুক্তিপন হিসাবে গ্রহণ করা হোক তখন এ আয়াত নাযিল হয়। আর আল্লাহ পাক আমার তরফ থেকে গৃহিত স্বর্ণের বিনিময়ে আমাকে

বিশটি গোলাম দান করেছেন। যাদের প্রত্যেকেই আমার পুঁজি দ্বারা ব্যবসা করে এবং সমস্ত লাভ আমি পাই, এর সঙ্গে সঙ্গে আমি আশাকরি যে আল্লাহপাক আমাকে মাগফেরাত দান করবেন।

আল্লামা বগভী (রহঃ) লিখেছেন হযরত আব্বাসের (রাঃ) কথা এভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে। আল্লাহ পাক আমাকে ঐ স্বর্ণের বিনিময়ে বিশটি গোলাম দান করেছেন তারা সকলেই ব্যবসায়ী। অনেক ধন-সম্পদ তারা রোজগার করে। প্রত্যেকে কমপক্ষে বিশ হাজার দেরহাম আয় করে। আর আল্লাহ পাক আমাকে জমজমের অভিভাবক হওয়ারও তৌফিক দান করেছেন যার মোকাবেলায় মক্কার সমস্ত ধন-সম্পদ আমার নিকট পছন্দনীয় নয় আর আমি আমার প্রতিপালকের কাছে আশাকরি যে তিনি আমাকে মাগফেরাত দান করবেন।

সাবিলুর রাশাদ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেছিলেন হায় যদি মুক্তিপন হিসাবে আমার নিকট থেকে আরও অধিক পরিমানে অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করা হতো, কেননা আল্লাহ পাক আমাকে মুক্তি পনের জন্য প্রদত্ত সম্পদের বিনিময়ে অনেক উত্তম সম্পদ দান করেছেন অর্থাৎ আমাকে চল্লিশটি গোলাম দান করেছেন সকলের নিকট আমার সম্পদ রয়েছে যার দ্বারা তারা ব্যবসা করে আর রোজগার আমারই হয় আর আল্লাহ পাকের মহান দরবারে আশাকরি যে তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন।

বোখারী এবং ইবনে সাদের বর্ণনা হলো এই যে বাহরাইন থেকে কিছু ধন-সম্পদ এসেছে তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আদেশ দিলেন এগুলো মসজিদে ফেলে রাখ এমন সময় হযরত আব্বাস (রাঃ) আসলেন এবং আরজ করলেন ইয়া রসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে এই সম্পদ থেকে কিছু দান করুন আমি আমার এবং আকিলের মুক্তিপন আদায় করেছি। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ নিয়ে নিন, তখন হযরত আব্বাস (রাঃ) দুহাতে ঐ মুদ্রা গুলো তুলে নিজের কাপড় পরিপূর্ণ করলেন এবং উঠিয়ে নিতে স্বচেষ্ট হলেন কিন্তু বোঝা উঠাতে পারলেন না তখন বললেন কাউকে আদেশ দিন যেন উঠিয়ে দেয়, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, না (অর্থাৎ কাউকে উঠিয়ে দেওয়ার হুকুম দেবেননা।) হযরত আব্বাস (রাঃ) বললেন তাহলে আপনি নিজে উঠিয়ে দিন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাতেও অস্বীকৃতি জানালেন, তখন হযরত আব্বাস (রাঃ) বাধ্য হয়ে কিছু অংশ কমিয়ে নিলেন এরপর মুদ্রার বোঝাটি নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে রওয়ানা হলেন এবং বললেন আল্লাহ পাক যে ওয়াদা করেছেন তাই আমি নিয়ে যাচ্ছি। আল্লাহ পাক তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অর্থ-সম্পদের প্রতি হযরত আব্বাস

(রাঃ)–এর আকর্ষণ লক্ষ্য করলেন এবং তাঁর যাওয়ার দৃশ্য দেখতে থাকলেন। যতক্ষণ ঐ দেরহামের বিতরণ শেষ না হলো ততক্ষণ তিনি তাঁর স্থান ত্যাগ করলেন না।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন বদরের যুদ্ধ বন্দীদের মধ্যে যারা মুক্তিপন আদায় করার পর ইসলাম গ্রহণ করেছেন আর তাদের মধ্যে এই সম্পর্কে এখলাস তথা আন্তরিকতা পরিলক্ষিত হয় তবে তাদের থেকে যা গ্রহণ করা হয়েছে তারচেয়ে উত্তম সম্পদ আল্লাহ্ পাক তাদেরকে দান করবেন। এরশাদ হয়েছেঃ হে নবী যে সব বন্দী আপনার করায়ত্তে রয়েছে তাদেরকে বলে দিন আল্লাহ্ পাক যদি তোমাদের অন্তরে খাঁটি ঈমান লক্ষ্য করেন তবে মুক্তিপন হিসাবে তোমাদের থেকে যা কিছু গ্রহণ করা হয়েছে তার থেকে উত্তম সম্পদ তোমাদেরকে দান করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

এই আয়াতে বদরের যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাদেরকে সান্তনা প্রদান করা হয়েছে যে তোমরা যদি সত্যিকার অর্থে মুসলমান হও যদি আল্লাহ্ পাক তোমাদের অন্তরে প্রকৃত ঈমান দেখতে পান তবে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো বর্তমানে মুক্তিপন হিসাবে তোমাদের নিকট থেকে যা গ্রহণ করা হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে দান করবেন, তাছাড়া আল্লাহ্ পাক তোমাদের গুণাহ মাফ করে দেবেন। ইতিপূর্ব উল্লেখিত ঘটনাবলী দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়েছে যে আলোচ্য আয়াতের আশ্বাসবানী সত্য পরিণত হয়েছে। তারা অনেক ধন–সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন।

فِىْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا

خَيْرًا এর অর্থ হলো ঈমান এবং এখলাছ,

يُؤْتِكُمْ خَيْرًا

অর্থাৎ যা তোমাদের থেকে মুক্তিপন হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে তার চেয়ে অধিকতর সম্পদ অদূর ভবিষ্যতে তোমাদেরকে প্রদান করা হবে।[১]

وَاِنْ يُّرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ ؕ

হে নবী। যদি তারা আপনাকে তাদের ইসলাম প্রকাশ করার মাধ্যমে ধোকা দিতে চায় তবে তাতে আশ্চযন্বিত হবার অথবা চিন্তিত হবার কিছুই নেই কেননা ইতিপূর্বে তারা আল্লাহপাকের সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, সৃষ্টির প্রথম দিন যখন তাদেরকে

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড–৫, পৃষ্ঠা–১৭৩

জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তখন তারা অঙ্গীকার করেছিলো হ্যাঁ তুমি আমাদের প্রতিপালক, এই কথা বলে কিন্তু এরপর তারা শির্ক ও কুফরের মাধ্যমে সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। অথবা এর অর্থ হলো

(হে রসূল!) বনী হাশেমের কোন কোন লোক আপনার সাহায্য করার অঙ্গীকার করেছিলো কিন্তু তারাও অবশেষে কাফেরদের পক্ষে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো তারা কি লাভ করেছে, আল্লাহ পাক তাদেরকে আপনার নিয়ন্ত্রণে দিয়েছেন যদি তারা পুনরায় অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তবে তাদেরকে আমি আবার আপনার নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দিবো। ইমাম রাজী (রহঃ) বলেছেন আলোচ্য আয়াতের খেয়ানত অর্থ দ্বীন ইসলামের ব্যাপারে খেয়ানত তথা কুফরী করা। এমন অবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে এই, হে রসূল! যদি এই যুদ্ধবন্দী লোকেরা কুফর ও শিরকে লিপ্ত হয় তবে এটা নতুন কিছু হবে না, কুফর ও শিরক তাদের পুরাতন নীতি, ইতিপুর্বেও তারা আল্লাহপাকের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। অথবা এর অর্থ হলো তারা মুক্তিপন হিসাবে যা আদায়ের অঙ্গীকার করেছে তা আদায় না করা। অথবা এ খেয়ানতের অর্থ হলো তাদের একথা যে যদি আমাদেরকে বন্দীদশা থেকে মুক্তি দেন তবে আর আমরা আপনার বিরুদ্ধে এ যুদ্ধ করবো না এবং মুশরেকদের সঙ্গে সহযোগিতা করবো না। যদি এসব কথার পরও তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই, কেননা তাদের ধোকাবাজি এবং প্রতারণার পরিণাম তাদেরকেই ভোগ করতে হবে।

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাঁদের মনের সকল গোপন কথা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল, আর তাঁর যাবতীয় কার্যক্রম হেকমত পূর্ণ, তাৎপর্যবহ। আল্লাহ পাক খুব ভাল ভাবেই জানেন কে তাদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক আর কে বিশ্বাসঘাতক নয়।১

আল্লাহ পাকের কোন কাজ হেকমত ব্যতীত হয় না তিনি তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে যা কিছু করেন তা সম্পূর্ণ জ্ঞান এবং হেকমতের সঙ্গে করেন। আল্লামা এবনে কাসীর (রহঃ) লিখেছেন যে তফসীরকার হযরত কাতাদা (রহঃ) বলেছেন যে এই আয়াত আবদুল্লাহ ইবনে সায়াদ ইবনে আবি ছারা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যে মুরতাদ হয়ে মুশরিকদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলো।

আতা খোরাছানী (রহঃ) বলেছেন এই আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত আব্বাস (রাঃ) এবং তাঁর সাথীদের সম্পর্কে যখন তারা বলেছিলেন যে আমরা আপনার সাথে

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৭৪
তফসীরে কবীর, খন্ড-১৫, পৃষ্ঠা-২০৬

সহযোগিতা করতে থাকবো। তফসীরকার সুদ্দী (রহঃ) বলেছেন যে আয়াত সকলের জন্যে সমভাবে প্রযোজ্য।[১]

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী কয়েক রুকুতে জেহাদ এবং সন্ধির বিধান বর্ণিত হয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কেও নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ আয়াতে মুহাজের এবং আনসারদের ফজিলত ও মর্তবা বর্ণিত হয়েছে এবং হিজরতের ভিত্তিতে মুসলমানদের বিভিন্ন দলের অবস্থান ও মর্তবা সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে।

মুসলমানদের বিভিন্ন দলের অবস্থান ও মর্তবা

শরীয়তের বিধান হ'ল এই যে, যদি কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করার সামর্থ্য থাকে তবে জেহাদ ফরজ। আর যদি কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার শক্তি না থাকে তবে হিজরত করা ফরজ। বিগত একাধিক রুকুতে জেহাদের উল্লেখ ছিল। আর এ আয়াত থেকে হিজরতের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা জেহাদ এবং হিজরত পাশাপাশি, কাছাকাছি, ঠিক যমজ ভাইয়ের ন্যায়। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং হিজরত করেছেন তাদেরকে চারভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথম ভাগঃ মুহাজের

যাঁরা দ্বীন ইসলামের জন্যে অসহনীয় নির্যাতন ভোগ করছেন অবশেষে তাঁরা সত্য ও ন্যায়ের জন্যে তথা ইসলামের জন্যে প্রিয়মাতৃভূমি ছেড়ে হিজরত করেছেন।

দ্বিতীয় ভাগঃ

আনসার, যাঁরা মুহাজেরীনদেরকে তাদের বাড়ী ঘরে আশ্রয় দিয়েছেন, জীবন ও সম্পদ দিয়ে সাহায্য করেছেন এবং তাঁদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইসলামের দুশমনদের সঙ্গে লড়াই করেছেন। তাঁদের সম্পর্কেই এরশাদ হয়েছেঃ

أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

১। তফসীরে এবন কাসীর (উর্দু) খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-২৬

তারা একে অন্যের বন্ধু, তারা একে অন্যের ভাই, তাদের সন্ধি এক, একের সন্ধি সকলের সন্ধি, একের বন্ধু সকলের বন্ধু। তাঁরা পরস্পর একান্ত আপন। শুধু বন্ধু বা আপনই নন, বরং একে অন্যের ওয়ারিশ। আনসার ও মুহাজেরদের মধ্যে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করেছিলেন এবং পরস্পরের সাহায্য করা ওয়াজিব বা অবশ্য কর্তব্য বলে বর্ণনা করেছেন। যুদ্ধ এবং শান্তি উভয় অবস্থায়ই তাঁরা ছিলেন একে অন্যের সঙ্গে একাত্ম।

এখানে আরো একটি কথা প্রণিধানযোগ্য, কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা তথা আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা মুমেনদের জন্য জায়েয নয়। যদিও কাফের কোন মোমেনের পিতা, পিতামহ বা পৌত্র হোক কিন্তু সম্পর্ক ঈমানের ভিত্তিতে গড়ে উঠে এবং ঈমানের অভাবে বিনষ্ট হয়।

তৃতীয় ভাগ

সে সব মুসলমান এ ভাগের অন্তর্ভূক্ত, যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছেন কিন্তু হিজরত করেননি, মুসলমান ছিলেন কিন্তু অমুসলিম রাষ্ট্র বা দারুল হরবে অবস্থান করেন। তাদের সম্পর্কে দু'টি আদেশ দেয়া হয়েছে। তাঁদের বন্ধুত্ব বা সন্ধির কোন গুরুত্ব দারুল ইসলামের কোন মুসলমানের নিকট নেই। যে পর্যন্ত তারা হিজরত না করে সে পর্যন্ত মুসলমানদের সাহায্য বা উত্তরাধিকারে তারা শরীক হবেনা। মোহাজের ও আনসারগণ যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন দারুল হরবের মুসলমানগণ তাতে অন্তর্ভূক্ত হবেনা এবং মোহাজের ও অনসারদের উত্তরাধিকারীও হবেনা। "মালেগনিমত" তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদে তাদের কোন অংশ থাকবেনা।

দ্বিতীয় আদেশ হ'ল যদি দারুল হরবের মুসলমানগণ ধর্মীয় ব্যাপারে ইসলামী রাষ্ট্রের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে তবে ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য হ'ল তাদেরকে সাযায্য করা। অবশ্য, যাদের সঙ্গে মুসলমানদের সন্ধি চুক্তি রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করার অনুমতি নেই। কেননা, অঙ্গীকার রক্ষা করা মুসলমানদের জন্যে ওয়াজেব।

চতুর্থ ভাগ

এ ভাগে রয়েছেন সে সব মুসলমান যারা ষষ্ঠ হিজরীতে অনুষ্ঠিত হেদায়বিয়ার সন্ধির পর ঈমান এনছেন এবং হিজরত করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এসেছেন। তাঁরাও প্রাথমিক যুগের মোহাজেরদের সঙ্গেই

সম্পৃক্ত। যদিও হিজরত পরে হওয়ার কারণে তাঁদের চেয়ে প্রাথমিক যুগের মোহাজেরীনদের মর্তবা অধিকতর। কিন্তু দ্বীনি সাহায্য সহায়তার ব্যাপারে তাঁরা এক ও অভিন্ন।

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ

وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, এবং হিজরত করেছে (ঘরবাড়ী ছেড়েছে) জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর রাহে জেহাদ করেছে, আর যারা মোহাজেরীনদেরকে আশ্রয় দিয়েছে এবং সাহায্য করেছে তারা পরস্পর একে অন্যের বন্ধু, ভাই, একান্ত আপনজন, এমনকি, একে অন্যের উত্তরাধিকারী। আর যারা ঈমান এনেছে অথচ হিজরত করেনি তাদের সহযোগিতায় তোমাদের কোন প্রয়োজন নেই যে পর্যন্ত না তারা হিজরত করে। আর যদি অমুসলিম রাষ্ট্রের মুসলমানগণ দ্বীনি ব্যাপারে ইসলামী রাষ্ট্রের সাহায্য প্রার্থনা করে তবে তোমাদের কর্তব্য হ'ল সাহায্য করা। তবে যে সম্প্রদায়ের সঙ্গে তোমাদের পূর্বেই কোন চুক্তি রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করার অনুমতি নেই কেননা, ইসলামে অঙ্গীকার রক্ষা করার গুরুত্ব সমধিক।[১]

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

আর আল্লাহ পাক তোমাদের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করছেন।

এ সত্যটি যদি মানুষ সর্বদা মনে রাখে তবে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা সহ সকল অন্যায় অনাচার এবং পাপাচার থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হয়।[২] ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হয়েছে মক্কায়ে মোয়াজ্জমায়। তিনি মানুষকে ইসলামের দিকে আহবান করেছেন। অতি সামান্য সংখ্যক লোক ব্যতীত আর সকলেই তাঁর আহবানে সাড়া দিতে প্রস্তুত হয়নি। শুধু যে

(১) তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৭০-৭১

২। তফসীরে মাজেদী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৯১

তাঁর আহবানে সাড়া দেয়নি তা নয়; বরং তাঁর প্রতি এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামের প্রতি কাফেররা অকথ্য নির্যাতন করে। এ নির্যাতন অব্যাহত থাকে সুদীর্ঘ তেরটি বছর যাবত। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ধৈর্যের পাহাড় হয়ে তাদের জুলুম অত্যাচার সইতে থাকেন এবং পবিত্র কোরআনের বহু আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সবর অবলম্বনের তথা ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দেয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا

হে রসূল! কাফেররা যা বলে আপনি তার উপর সবর অবলম্বন করুন এবং তাদের থেকে সৌজন্য সহকারে দূরে থাকুন। (সূরায়ে মুজ্জাম্মেল)

আর কোথাও মজলুম মোহাজেরীনদের উচ্চ মর্যাদার কথা এবং শুভ পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا

(সূরা আল এমরান)

সুতরাং যারা হিজরত করেছে, যাদেরকে তাদের বাড়ী ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে এবং যাদেরকে আমার পথে নির্যাতন করা হয়েছে এবং যারা যুদ্ধ করেছে এবং নিহত হয়েছে আমি অবশ্যই তাদের মন্দ কাজগুলো দূরীভূত করব এবং তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবো যার পাদদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত। এ হ'ল আল্লাহ পাকের তরফ থেকে পুরস্কার। আর উত্তম পুরস্কার আল্লাহ পাকের নিকট।

যাহোক, যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হিজরত করে গেছেন তাঁদের এবং যারা মদীনায়ে মোনাওয়ারায় তাঁদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন তাদের সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে যে এরা হ'ল পরস্পর বন্ধু।

কিন্তু যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছে কিন্তু অমুসলিম দেশেই রয়ে গেছে, যে পর্যন্ত তারা হিজরত না করে সে পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলমানগণ তাদের সন্ধিচুক্তি মেনে নিতে বাধ্য নন। তবে যদি তাঁরা দ্বীনি ব্যাপারে মুসলমানদের সাহায্য কামনা করে তবে সাধ্য মোতাবেক তাদেরকে সাহায্য করা কর্তব্য। কেননা, তারা ঈমানদার।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ যাঁরা ঈমান এনেছেন এবং হিজরত করেছেন তাঁরা চারটি গুণে গুণান্বিত।

(১) তাঁরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছেন, এবং ফেরেশতাদের প্রতি, আসমানী কিতাব সমূহের প্রতি, নবী রসূলগণের প্রতি, কেয়ামতের দিনের প্রতিও, আর এ ঈমানের জন্যে সর্বপ্রকার কষ্ট তাঁরা ভোগ করেছেন।

(২) তাঁরা হিজরত করেছেন وهاجروا অর্থাৎ তারা ছেড়েছেন তাদের বাড়ীঘর এমনকি, নিজের দেশ পর্যন্ত, আত্মীয় স্বজন প্রিয়জন, ধন-সম্পদ এককথায় সব কিছু ত্যাগ করেছেন এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। এটি ইসলামের জন্যে তাঁদের বিরাট এবং বিশেষ অবদান। আল্লাহর প্রতি আনুগত্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুকরণে তাঁদের জানমাল কোরবান করতে তাঁরা কোন সময়ই এতটুকু কুণ্ঠিত হননি।

وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

(৩) তাঁরা নিজের জানামাল দিয়ে আল্লাহর রাহে দুশমনের বিরুদ্ধে জেহাদ করেছেন। একদিকে, তাদের বাড়ীঘর, সহায়-সম্পত্তি বাগবাগিচা সবই ফেলে চলে এসেছেন, দুশমনরা যা কজা করে নিয়েছে এবং মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় তাদের সব কিছু থাকা সত্ত্বেও হিজরতের পর তারা চরম অভাব অনটন ভোগ করেছেন। আর তা করেছেন সন্তুষ্ট চিত্তে, এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। এরপরও তারা জেহাদের জন্যে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেছেন, শুধু তাই নয়, অত্যন্ত নিরস্ত্র প্রায় অবস্থায় বদরের রণাঙ্গনে দুশমনের মোকাবিলা করেছেন, বীর বিক্রমে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করেছেনঃ

(৪) তাঁরা সেদিন যে ত্যাগ তিতিক্ষার পরিচয় দিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত বিরল এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠায় এবং ইসলামকে শক্তিশালী করার ব্যাপারে তাঁদের অবদান অসামান্য। এজন্যেই আল্লাহ পাক তাঁদের সম্পর্কে বলেছেন।

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ

আল্লাহ পাক তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তাদের ফজিলত সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বহু আয়াত নাজিল হয়েছে।[১]

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৫, পৃষ্ঠা-২০৭-২০৮

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ
اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍ ۭ اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ
كَبِيْرٌ ﴿٧٣﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ۭ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ
وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٧٤﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا
مَعَكُمْ فَاُولٰۤىِٕكَ مِنْكُمْ ۭ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ
كِتٰبِ اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٧٥﴾

তরজমা

(৭৩) আর যারা কাফের তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, যদি তোমরা তা না কর তবে দেশে ফেৎনা-ফাসাদ এবং মহাবিপর্যয় দেখা দেবে।

(৭৪) আর যারা ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে ও আল্লাহর রাহে জেহাদ করেছে, এবং যারা আশ্রয় দান ও সাহায্য করেছে তারাই খাঁটি মোমেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।

(৭৫) যারা পরে ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে এবং তোমাদের সঙ্গে থেকে জেহাদ করেছে তারাও তোমাদের অন্তর্ভূক্ত, আর আত্মীয় স্বজনগণ পরস্পরের মধ্যে আল্লাহ পাকের হুকুম মোতাবেক অপেক্ষাকৃত অধিক হক রাখে, আল্লাহ পাক সব বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে মুসলমানদের পরস্পরের সম্পর্কের কথা বর্ণিত হয়েছে, আর এই আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে কাফেরদের পরস্পরের সম্পর্কের কথা যে,

কাফেররা পরস্পর বন্ধু, একে অন্যের ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী। মুসলমানদের বিরুদ্ধে সকল কাফেরই এক, অতএব, মুসলমানদেরও হতে হবে তাদের বিরুদ্ধে এক এবং অভিন্ন। কাফের কখনও মুসলমানের বন্ধু হতে পারে না এবং ওয়ারিশও হতে পারে না।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) মুস্তাদরাকের উদ্ধৃতি দিয়ে একখানি হাদীসের উল্লেখ করেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দু' ধর্মে বিশ্বাসী লোক পরস্পরের উত্তরাধিকারী হতে পারেনা। মুসলমান কাফেরের এবং কাফের মুসলমানের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসেও রয়েছে যে, মুসলমান কাফেরের এবং কাফের মুসলমানের ওয়ারিশ হতে পারে না।

এবনে জরীরে রয়েছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একজন নওমুসলিম থেকে এ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন যে, নামাজ কায়েম করবে, জাকাত আদায় করবে, বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্জ করবে, রমজান মাসের রোজা রাখবে এবং যখন যেখানে শেরকের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হবে সেখানে তাদের মোকাবেলা করবে এবং নিজেকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত মনে করবে। আবু দাউদ শরীফে সংকলিত হাদীসে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে কাফেরদের সঙ্গে মিলেমিশে চলে এবং তাদের মধ্যে অবস্থান করে সে তাদেরই (কাফেরদের) ন্যায়।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ কাফেররা পরস্পর বন্ধু। অতএব কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সাহায্য করা কোন মোমেনের জন্য জায়েজ নয়।

মবসুত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে যে, যদি দারুল হারবে কোন কাফের অন্য কাফেরদের এলাকায় হামলা করে আর সেখানকার অধিবাসীদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে, সেখানে কাফেরদের সঙ্গে মুসলমানও থাকে এমন অবস্থায়ও কাফেরদের সাহায্য করা মুসলমানদের জন্য জায়েজ নয়। তবে যদি কোন মুসলমান তার জীবন ও সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার আশংকা করে, তবে হামলাকারীদের মোকাবেলা করা জায়েজ। কেননা যুদ্ধে মোকাবেলা করার অর্থ হলো নিজের জীবন উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত হওয়া, আর মুসলমানের জীবন উৎসর্গ করা যায় একমাত্র আল্লাহ পাকের নাম বলুন্দ করার লক্ষে, এবং দ্বীন ইসলামের সম্মান রক্ষা করার জন্যে। অথবা যদি মুসলমানদের নিজেদের উপর কোন ক্ষতির আশংকা দেখা দেয় তবে তা দূরীভূত

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-২৭

করার জন্যে। যদি নিজের জীবন ও সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে তবে হামলাকারী কাফেরের মোকাবেলা করে অন্য কাফেরদের সাহায্য করার জন্যে জীবন দেয়া বৈধ নয়।

إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

অর্থাৎ–হে মুসলমানগণ যদি তোমরা এমন না কর, অর্থাৎ কাফেরদেরকে শত্রু মনে না কর এবং তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না কর এবং কাফেরদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ পাকের প্রদত্ত বিধান অমান্য কর তবে দেশে চরম অশান্তি এবং মহাবিপর্যয় দেখা দেবে। যদি মুসলমানগণ পরস্পরকে বন্ধু মনে না করে এবং একে অন্যকে সাহায্য না করে তবে মুসলমানদের অবস্থা শোচনীয় হবে এবং কাফেররা প্রাধান্য বিস্তার করবে। আর কোফরের প্রাধান্য বিস্তার হওয়ার চেয়ে বড় ফেৎনা এবং বিপর্যয় আর কিছুই নেই।

অতএব কাফেরদের থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাক, আর ইসলাম উত্তরাধিকারের যে বিধান পেশ করেছে তা মেনে চল।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا

পূর্ববর্তী আয়াতে মুসলমানদের দুনিয়ার জিন্দেগী সম্পর্কে বিধান পেশ করা হয়েছে এবং মুসলমানদের পরস্পরের সম্পর্কের কথাও বলা হয়েছে। এরপর কাফেরদের পারস্পারিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদের আখেরাতের অবস্থা সম্পর্কে সুসংবাদ রয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনে এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিজের দেশ ত্যাগকরে হিজরত করে এবং ইসলামের দুশমনদের সঙ্গে আল্লাহর রাহে জেহাদ করে এবং যারা সত্য সাধক মোমেনদেরকে আশ্রয় দেয় এবং তাদেরকে সাহায্য করে তারাই হলো প্রকৃত মোমেন। ঈমানের দাবীতে তারা সত্যবাদী। কেননা তারা সত্য ও ন্যায়ের জন্যে তথা ইসলামের জন্যে ঘরবাড়ী, আত্মীয়–স্বজন প্রিয়জন সব কিছু ছেড়েছে এবং শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যেই এসব কিছু করেছে, এই মোহাজেরদেরকে মদীনা তৈয়্যেবায় যারা আশ্রয় দিয়েছেন এবং মোহাজেরীনদেরকে সাহায্য করেছেন, তারাই মোহাজের এবং আনসার, সত্যিকার অর্থে তারাই প্রকৃত মোমেন।

لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيمٌ

তাদের জন্য রয়েছে মাগফেরাত এবং জান্নাতে তাদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত সম্মানজনক জীবিকার ব্যবস্থা। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ ইসলাম (মানুষের) পূর্বকৃত পাপাচার দূরীভূত করে। আর হিজরতও পূর্বকৃত গুণাহগুলো দূর করে। হযরত আমর এবনুল আস (রাঃ) থেকেও এ হাদীস বর্ণিতআছে।

لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ

যারা প্রকৃত মোমেন, যাদের কথা আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে তাদেরকে আল্লাহ পাক মাগফেরাত দান করবেন, তারা লাভ করবে জান্নাতের অনন্ত অসীম নেয়ামত সুখ এবং শান্তির, সম্মান এবং মর্যাদার জীবন জীবিকা। যে নেয়ামত মানুষ এ পৃথিবীতে দেখে নাই, যে সম্পর্কে কারো কাছে শ্রবণও করে নাই এবং যে নেয়ামতের ব্যাপারে কোন দিন কল্পনাও করে নাই এমন নেয়ামত সমূহ তারা লাভ করবে।

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا
مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ

আর যারা (হোদাইরিয়ার চুক্তির পরে) ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে ও তোমাদের সঙ্গে মিলেমিশে কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে তারাও তোমাদের অন্তর্ভূক্ত।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে ইসলামের প্রথম যুগের মোহাজের এবং আনসারদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, ৬ষ্ঠ হিজরীতে অনুষ্ঠিত হোদাইবিয়ার চুক্তির পর যারা ইসলাম গ্রহণ করে হিজরত করে মদীনা শরীফ এসেছে তারাও তোমাদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। তোমরা পরস্পর বন্ধু এবং একে অন্যের ওয়ারিশ।

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ

আর আত্মীয় স্বজন পরস্পরের মধ্যে আল্লাহ পাকের হুকুমে অপেক্ষাকৃত বেশী হকদার। মোমেনগণ উত্তরাধিকারের বিধানে সকলেই সমান। তবে যারা আত্মীয়, উত্তরাধিকারীতায় তাদের অগ্রাধিকার থাকবে এটিই স্বাভাবিক। এখানে এ কথাটি

বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ইসলামের প্রথম যুগে যারা হিজরত করেছেন তাদের কিছু আত্মীয় স্বজন মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় থেকে যায়। পরবর্তী কালে তারাও ইসলাম গ্রহণ করে হিজরত করেন। মোহাজের হিসেবে অন্য মোহাজের উত্তরাধিকারীতায় সমান। কিন্তু যে আত্মীয় পরবর্তীকালে হিজরত করে এসেছেন তিনি অনাত্মীয় মোহাজেরদের চেয়ে উত্তরাধিকারের অধিকতর হকদার। যদিও অনাত্মীয় ব্যক্তি অধিকতর মর্তবার অধিকারী হয়। এই আয়াত দ্বারা একটি বিধান পেশ করা হলো। হিজরত এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে উত্তরাধিকারী হওয়ার যে বিধান ইতিপূর্বে ছিল তা বাতিল হলো। এখন উত্তরাধিকারীতার সিদ্ধান্ত আত্মীয়তার ভিত্তিতেই হবে। তবে ঈমান ও ইসলাম শর্ত অবশ্যই থাকবে অর্থাৎ মুসলমানের কোন কাফের আত্মীয় উত্তরাধিকারী হবে না।

إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ⑮

নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তোমাদের সমস্ত বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। কার হক কতখানি তা তিনি জানেন। আর সে অনুসারেই তিনি উত্তরাধিকার সম্পর্কে আদেশ দিয়েছেন।[১]

আলহামদুলিল্লাহ অদ্য ৯ই জানুয়ারী ১৯৯১ ইং, ২২ জমাদিউসসানী ১৪১১ হিজরী, বুধবার সূরায়ে আনফালের তফসীর সমাপ্ত হলো। হে আল্লাহ! কবুল কর। আর এই তফসীর সম্পূর্ণ করার তওফিক দান কর।

আমিন।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃঃ ২৭৪
তফসীরে কবীর খন্ড-১৫, পৃঃ ২১৩

সূরা তওবা

মদীনায় অবতীর্ণ, আয়াত-১২৯, রুকু-১৬

بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝١

সূরায়ে তওবা প্রসংগে

আবু অতীয়াহ হামদানী (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত ওমর (রাঃ) একটি ফরমানে লিখেছিলেনঃ "তোমরা নিজেরা সূরা তওবা শিখ আর তোমাদের স্ত্রীলোকদেরকে সূরায়ে নূর শিক্ষাদাও" এর কারণ, সূরায়ে তওবাতে জেহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, আর সূরায়ে নূরে পর্দা প্রথা প্রচলনের তাগীদ করা হয়েছে। প্রথমে পুরুষদের, পরে স্ত্রীলোকদের কর্তব্য পালনের নির্দেশ রয়েছে।

এই সূরার নাম

এই সূরার একাধিক নাম রয়েছে

১। বরাআত, কেননা এই সূরায় কাফেরদের ব্যাপারে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়েছে।

২। তওবা, কেননা এই সূরায় মুসলমানদের তওবা কবুল হওয়ার কথা রয়েছে।

৩। মোকাশকাশা, অর্থাৎ মোনাফেকী থেকে ঘৃণা সৃষ্টিকারী, আবু শেখ এবং এবনে মরদবীয়া জায়েদ এবনে আসলামের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন মোকাশকাশা নামকরণের কারণ হ'ল এই সূরায় মোনাফেকীর প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়েছে।

৪। মোবায়ছেরা, এই নামকরণের কারণ সম্পর্কে এবনুল মুনজের মোহাম্মদ এবনে ইসহাকের সূত্রে বর্ণনা করেছেনঃ যেহেতু মানুষের মনের গোপন রহস্য এতে প্রকাশ করা হয়েছে এই জন্য তাকে মোবায়ছেরা বলা হয়েছে।

৫। আল বহুস, এই নাম এবনে আবী হাতেম তেবরানী এবং হাকেম আবু রুশদ হাব্রানীর সূত্রে হযরত মেকদাদ এবনে আসওয়াদের তরফ থেকে লিখেছেন।

৬। আল মাসীরা, এই নাম এবনুল মুনজের আবুস শেখ এবং এবনে আবী হাতেম কাতাদার সূত্রে লিখেছেন এই নামকরণের কারণ হল এই সূরায় মোনাফেকদের রহস্য উদঘাটন করা হয়েছে।

৭। মুনকেলা (আজাব বিশিষ্ট)।

৮। মুদামদেমা (ধ্বংস আনয়নকারী)।

৯। সুরাতুল আজাব, এই নামকরণ করেছেন হযরত হোজায়ফা (রাঃ)। তিনি বলেছেন, তোমরা যে সূরাকে সূরা তওবা বল তা আসলে সুরাতুল আজাব, আল্লাহর শপথ! এমন কেউ নেই যার উপর এই সূরা প্রতিক্রিয়া করেনা। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন হযরত ওমর (রাঃ) এই সুরাকে সূরাতুল আজাব বলতেন।

(১০) আলফাজেহা (মোনাফেকদেরকে) অবমাননাকারী। আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ সাঈদ এবনে যোবাইর (রাঃ) বলেছেন আমি হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-কে বল্‌লাম সূরায়ে "তওবা", তিনি বললেন এই সূরায় মানুষকে মোনাফেকদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।১

এই সূরার শুরুতে "বিসমিল্লাহ" কেন নেই?

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ আমি হযরত ওসমান (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে সূরায়ে তওবার শুরুতে "বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম" কেন নেই? হযরত ওসমান (রাঃ)-এর কারণ বর্ণনা করলেন যে সূরায়ে আনফাল হিজরতের প্রথম দিকে নাজিল হয়। আর সূরায়ে তওবা শেষের দিকে। পবিত্র কোরআনের কোন সূরা বা কোন আয়াত যখন নাজিল হত তখন প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এই আদত মোবারক ছিল যে তিনি বলতেন অমুক সূরার পর এই সূরা এবং অমুক সূরার অমুক আয়াতের পর এই আয়াত বসবে। আর বিভিন্ন সূরার মধ্যে পার্থক্য করার জন্য বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম লিপি বদ্ধ করার কথাও বলতেন।

সূরায়ে আনফাল এবং সূরায়ে তওবার বক্তব্যের মধ্যে রয়েছে এক বিস্ময়কর সামঞ্জস্য। আর এ কারণে সূরায়ে আনফালের পাশেই রাখা হয়েছে সূরায়ে তওবা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্ট ভাষায় বলেননি যে এর শুরুতে বিসমিল্লাহ লিপিবদ্ধ কর। এ কারণে সাধারণত মনে করা হয়েছে সূরায়ে তওবা কোন স্বতন্ত্র সূরা নয় বরং সূরা আনফালেরই পরিশিষ্ট। কিন্তু সূরায়ে তওবার আয়াত সমূহ কোন্ সূরার কোন্ আয়াতের পর বসবে এ নির্দেশও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দেননি। ফলে ধারণা করা হয়েছে যে এটি একটি স্বতন্ত্র সূরা। এ কারণে

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৭৯-৮০
তফসীরে কবীর, খন্ড-১৫, পৃষ্ঠা-২১৫

সূরায়ে তওবা এবং সূরায়ে আনফালের মধ্যস্থলে ফাঁক রাখা হয়েছে যেন এই সূরাকে সূরায়ে আনফালের অংশ মনে না করা হয়। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও এই দু'টি সূরার ব্যাপারে মতভেদ ছিল। কেউ বলেছেন দু'টি স্বতন্ত্র সূরা আর কেউ এই অভিমতও প্রকাশ করেছেন দু'টি মিলে এক সূরা। অতএব, যারা বলেন যে তওবা এবং আনফাল দু'টি সূরা তাদের মতের প্রতি লক্ষ্য রেখে দু' সূরার মধ্যে ফাঁক রাখা হয়েছে। আর যারা বলেন যে উভয়টিই আসলে এক সূরা তাদের মতের প্রতি লক্ষ্য করে বিসমিল্লাহ লিপিবদ্ধ হয়নি।

২।হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন আমি হযরত আলী (রাঃ)–কে জিজ্ঞাসা করেছি আপনারা সূরায়ে তওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ কেন লিপিবদ্ধ করেননি। তিনি বলেছেন বিসমিল্লাহতে রয়েছে শান্তি এবং নিরাপত্তা, আর এই সূরায় কাফেরদের বিরুদ্ধে তরবারী ব্যবহারের আদেশ রয়েছে এজন্য বিসমিল্লাহ লিপিবদ্ধ হয়নি যেন আল্লাহ পাকের গজবের নিদর্শন প্রতিভাত হয়।

৩। ইমাম কুসাইরী বর্ণনা করেন, প্রকৃত অবস্থা এই যে এই সূরার প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ এ জন্য লিপিবদ্ধ হয়নি জিব্রাইল (আঃ) এই সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ নিয়ে অবতরণ করেননি যা সাধারণতঃ নিয়ম ছিল। প্রত্যেক সূরার শুরুতেই বিসমিল্লাহ নাজিল হত যেন অন্য সূরা থেকে পার্থক্য প্রমাণিত হয়। কিন্তু সূরায়ে তওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ নাজিল হয়নি তাই পবিত্র কোরআন সংকলনের সময় সূরায়ে তওবার শুরুতে সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের তরফ থেকে বিসমিল্লাহ সংযোজন করেননি। অন্য সূরার শুরুতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিসমিল্লাহ লিপিবদ্ধ করার আদেশ দিতেন, কিন্তু সূরায়ে তওবার ব্যাপারে বিসমিল্লাহ লেখার আদেশ দেননি।

৪। ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেন সমস্ত আয়াত এবং সূরার তরতীব অর্থাৎ কোন্ সূরার পরে কোন্ সূরা বসবে এবং কোন্ আয়াতের পরে কোন্ আয়াত থাকবে এই সবও আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তরফ থেকেই হয়েছে এ সম্পর্কে অন্য কারো মত বা ইচ্ছার কোন প্রশ্নই উত্থিত হয়না। এজন্যই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সূরায়ে আন্‌ফালের পরে সূরায়ে তওবা লেখার নির্দেশ দিয়েছেন। আর সূরায়ে তওবার প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ লিপিবদ্ধ না হওয়াও আল্লাহ পাকের ওহী মোতবেকই হয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম তারই অনুসরণ করেছেন।[১]

---

(১) তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত–আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড–৩, পৃষ্ঠা–২৭৭
ফাতহুল বারী, খন্ড–৮, পৃষ্ঠা–২৩৫

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরা আনফালে বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত এবং বনুকোরাইজার ঘটনা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর এই সূরার শেষে কাফেরদের সংগে সন্ধি করার অনুমতির বিবরণ রয়েছে। এর পাশাপাশি জেহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের ও অস্ত্রসস্ত্র সংগ্রহেরও নির্দেশ রয়েছে।

কাফেরদের সংগে সন্ধি করার অনুমতি থাকলেও জেহাদ অবশ্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং মুসলমানদের পরস্পরের সম্পর্ক ভ্রাতৃত্বভাবকে সুদৃঢ় করার নির্দেশ রয়েছে। জাতীয় ঐক্য, সংহতি এবং ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে অটুট রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

আর এই সূরায় যারা মুসলমানদের সংগে কৃত অংগীকার ভংগ করেছে তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা রয়েছে। এর পাশাপাশি ইসলামের দুশমনদের ব্যাপারে বিশেষত চুক্তি ভংগকারীদের ব্যাপারে কিছু বিধান পেশ করা হয়েছে এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এরপর মক্কা বিজয় এবং তাবুকের যুদ্ধের উল্লেখ রয়েছে। এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণে যারা ব্যর্থ হয়েছে তাদের প্রতি তিরস্কারও রয়েছে। মোট কথা হল সূরায়ে আনফাল ও সূরায়ে তওবা উভয় সূরায়ই জেহাদের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। তাই উভয় সূরার বক্তব্যের মধ্যে রয়েছে একটি বিশেষ সামঞ্জস্য। দ্বিতীয়তঃ সূরায়ে আনফালের শেষে মুমেনদের পরস্পরের ভ্রাতৃত্বের কথা বলা হয়েছে, আর সূরায়ে তওবার শুরুতেই ইসলামের দুশমনদের ব্যাপারে অসন্তুষ্টির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এমনকি একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে মুশরেকরা হ'ল নিতান্ত অপবিত্র। তাই মসজিদুল হারামের নিকটেও যেন তারা না আসতে পারে তা নিশ্চিত করা মুসলমানদের কর্তব্য। সূরায়ে আনফালের শেষে মুসলমানদের প্রতি এই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যেন তারা পরস্পর এক, অভিন্ন অবিচ্ছেদ্য হয়ে থাকে। আর সূরায়ে তওবার শুরুতে এই আদেশ হয়েছে মুসলিম জাতির কর্তব্য হল কাফের মুশরেকের সংগে যাবতীয় সম্পর্কচ্ছেদ করা। তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকা। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত কোফর ও শেরকের উপর অসন্তুষ্টি এবং ঘৃনা সৃষ্টি না হবে ততক্ষণ ঈমান পরিপূর্ণ হবেনা।

শানে নজুল

এই সূরা তাবুকের যুদ্ধের পর নাজিল হয়েছে। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন তাবুকের যুদ্ধের জন্যে রওয়ানা হন তখন মোনাফেকেরা বিভিন্ন প্রকার ভিত্তিহীন খবর এবং গুজব রটাতে থাকে যেন মুসলমানদের মধ্যে অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে মোশরেকেরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের

সংগে যে সব চুক্তি করেছিলো এই সুযোগে তারা ঐ চুক্তি সমূহ ভংগ করা শুরু করে। মোশরেকদের এই ধারণা ছিল মুসলমানগণ তাবুকের যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবে না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফ থেকে প্রায় চার'শ মাইল দুরে অত্যন্ত গরমের মৌসুমে রমজানের মাসে ত্রিশ হাজার সাহাবায়ে কেরাম নিয়ে তাবুকের দিকে রওয়ানা হন। তখন এই সূরা নাজিল হয়। আল্লাহ পাক এই সূরায় তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি যেন মোশরেকদের সাথে সর্বপ্রকার সম্পর্কচ্ছেদের এবং তাঁর অসন্তুষ্টির কথা ঘোষণা করেন এবং তাদের সাথে কৃত অংগীকার নামা তাদেরকে ফেরত দিয়ে দেন। যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ

অর্থাৎ যদি কোন সম্প্রদায়ের তরফ থেকে অঙ্গীকার ভঙ্গের ভয় করা হয় তবে তাদেরকে অঙ্গীকার নামা টি ফেরৎ দাও।

سُوْرَةُ التَّوْبَةِ مَدَنِيَّةٌ وَّهِيَ مِائَةٌ وَّتِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ اٰيَةً وَّسِتَّةَ عَشَرَ رُكُوْعًا

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ①
فَسِيْحُوْا فِي الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي
اللّٰهِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِي الْكٰفِرِيْنَ ② وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى
النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِيْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ ۵ وَ
رَسُوْلُهٗ ۭ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ
غَيْرُ مُعْجِزِي اللّٰهِ ۭ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ③ اِلَّا
الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْـًٔا وَّلَمْ
يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْٓا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ ۭ اِنَّ
اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ④

اعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ١٢

তরজমা

(১) যে সব মোশরেকদের সাথে তোমাদের চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছিল তাদেরকে আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূলের তরফ থেকে সুস্পষ্ট জবাব–যে তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা হলো।

(২) এরপর তোমরা দেশে চার মাস কাল পরিভ্রমন কর এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয় তোমরা আল্লাহ তাআলাকে হীনবল করতে পারবেনা। আর নিশ্চয় আল্লাহ পাক অবশ্যই কাফেরদেরকে অপদস্ত করবেন।

(৩) বড় হজ্জের দিনে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি এই ঘোষণা যে, মোশরেকদের সঙ্গে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের কোন সম্পর্ক নেই। যদি তোমরা তওবা কর তবে তা তোমাদের জন্য ভাল। আর যদি তোমরা না মান, তবে জেনে রাখ যে, তোমরা কখনও আল্লাহ পাককে হীনবল করতে পারবেনা। আর কাফেরদেরকে নিদারুন শাস্তির সংবাদ দাও।

(৪) তবে মোশরেকদের মধ্যে যাদের সঙ্গে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ রয়েছ এবং পরে যারা তোমাদের চুক্তি রক্ষায় কোন প্রকার কসুর করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কারো সাহায্যও করেনি তাদের সাথে নিদৃষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত অঙ্গীকার পুর্ণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক পরহেজগার লোকদেরকে পছন্দ করেন।

তফসীরুল কোরআন

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন ত্রিশ হাজার সাহাবায়ে কেরাম নিয়ে তাবুকের যুদ্ধে রওয়ানা হলেন তখন যে সব কাফের গোত্রের সঙ্গে মুসলমানদের শান্তি চুক্তি ছিল তারা চুক্তি ভঙ্গ করে ফেলল। এমনি ভাবে, মদীনার ইহুদীরাও বিশ্বাসঘাতকতা করল। তাই এ সূরার শুরুতেই আল্লাহ পাক মুসলমানদের পক্ষ থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করার এবং অসন্তুষ্টির কথা ঘোষণা করলেন। কাফেররা মনে করেছিলো তাবুকের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় বরণ করতে হবে তাই তারা পূর্বাহ্নেই তাদের শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করে ফেলল।

এজন্যে আলোচ্য আয়াতে হুকুম জারী হ'ল যে, মুসলমানদের তরফ থেকেও যেন কাফেরদের সাথে সকল সম্পর্কেচ্ছেদ করার এবং অসন্তুষ্টির ঘোষণা করা হয়। কেননা, মুসলমানদের পক্ষে কাফেরদের এসব অঙ্গীকারে বিশ্বাস করা ও আস্থা রাখা সম্ভব নয়। এরপর তাদেরকে চার মাসের অবকাশ দেয়া হয়েছে। এ চার মাস আরব জাহানে ঘুরে বেড়াও। কিন্তু চার মাস পর সমস্ত কাফেরকে আরব জাহান থেকে বের করে দেয়া হবে কেননা, মুসলিম জাতির সংহতি এবং বিশ্ব মুসলিমের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের

প্রাণকেন্দ্র হিসেবে আরব ভূখন্ডকে নির্বাচন করা হয়েছে। কাফেরদের উৎপাত উপদ্রব, ফেতনা ফাসাদ এবং বিশ্বাসঘাতকতা থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে একটি শান্তিপূর্ণ শক্তিশালী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ব্যতীত গত্যান্তর নেই। এ উদ্দেশ্যেই সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে।

দ্বিতীয় হিজরীতে অনুষ্ঠিত বদরের যুদ্ধ থেকে এ প্রচেষ্টা মক্কা বিজয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। মক্কা বিজয়ের ফলে ইসলামের প্রাণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এ কেন্দ্রের হেফাজত বা নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে সর্ব প্রথম প্রয়োজন ছিল আরব ভূখন্ড থেকে সকল বাধা বিপত্তি এবং প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত করা। মানবতার কলংক পৌত্তলিকতার মূলোৎপাটন করা এবং কাফের মোশরেক থেকে আরবভূমিকে পবিত্র করা। বিশ্বমানবের কল্যাণ ও মুক্তির মহাসনদ পবিত্র কোরআনের মহান বাণী নির্বিঘ্নে সারা বিশ্বে পৌঁছে দেয়ার জন্যে যে শান্ত পরিবেশের প্রয়োজন তা কাফেরদের উপস্থিতিতে সম্ভব নয়। তাই চারমাস পর কাফেরদেরকে আরব ভূমি থেকে বহিষ্কারের আদেশ দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ

যে সব মোশরেকদের সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার রয়েছে তাদেরকে আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূলের তরফ থেকে সকল সম্পর্কচ্ছেদের এবং অসন্তুষ্টির কথা ঘোষণা করা হ'ল। অতএব, তোমরা চার মাস যাবত ঘুরাফেরা কর, এরপর তাদেরকে আরব ভূখন্ড থেকে বের করে দেয়া হোক যেন আরব ভূখন্ড শুধু মুসলমানদের হয়ে যায় এবং সেখানে ইসলামের কোন দুশমন না থাকে, ইসলাম প্রচারে যেন কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা না থাকে। আরব ভূখন্ড যেন মুসলমানদের জন্যে নিরাপদ হয় এবং কোফর ও শেরকের প্রভাব মুক্ত হয় এবং নিরংকুশ মুসলিম সংহতির প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। এ সম্পর্কচ্ছেদ এবং অসন্তুষ্টির ঘোষণা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তরফ থেকে সেই মোশরেকদের নামে–যারা মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি করেও তার উপর কায়েম রয়নি; বরং বারে বারে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। অতএব, ঘোষণা কর যে, হে মোশরেকের দল! এখন আর তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে কোন অঙ্গীকার নেই। আর এ কথাও ঘোষণা কর হে মোশরেকের দল! চার মাস যাবত তোমরা দেশে শান্তি এবং নিরাপত্তার সঙ্গে চলাফেরা কর, তোমাদেরকে চার মাসের অবকাশ দেয়া হ'ল। যেখানে ইচ্ছা সেখানে তোমরা যেতে পার তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হ'ল। তোমাদের জীবন ও সম্পদের উপর কোন প্রকার ঝুঁকি থাকবেনা। এ অবকাশের মেয়াদ শুরু হবে হজ্জের দিন থেকে, শেষ হবে ১০ই রবিউল আউয়াল। আর খুব ভালভাবেই জেনে রাখ যে, পৃথিবীর যে কোন স্থানেই তোমরা যাও না কেন আল্লাহ

পাক তোমাদেরকে পাকড়াও করে আনবেন। তোমরা এ ব্যাপারে কোন প্রকার বাধা সৃষ্টি করতে পারবেনা এবং তোমরা আল্লাহ্ পাকের নিয়ন্ত্রণ থেকে বাইরেও যেতে পারবেনা।

وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ

আর একথাও নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ পাক কাফেরদেরকে অবশ্যই অপমানিত লাঞ্ছিত এবং অপদস্ত করবেন।

কফেরদের সংখ্যা যত অধিকই হোকনা কেন, তাদের শক্তি যত বেশীই হোকনা কেন, তাদের দুনিয়াতে অবমাননা এবং আখেরাতে কঠোর কঠিন শাস্তি অবধারিত। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْىَ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ

الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ

আল্লাহ্ পাক তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে অবমাননার শাস্তি দিয়েছেন আর আখেরাতের শাস্তি আরো বড়, আরো কঠিনতর। যদি তারা এ সত্য উপলব্ধি করত।

দুনিয়াতে তাদের জন্য রয়েছে হত্যা এবং বন্দী হওয়ার অবমাননা, আর আখেরাতে রয়েছে দোজখের কঠিন শাস্তি।

وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖۤ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ

আর আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তরফ থেকে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, মোশরেকদের সঙ্গে আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন সম্পর্ক নেই। আলোচ্য আয়াতে আযান অর্থ হলো এলান বা ঘোষণা। আর এই মর্মেই নামাজের এলানকে আযান বলা হয়।

আল্লামা বগভী (রঃ) একরামার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে,

يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ

বড় হজ্জের দিন বলে আরাফার দিনকে বুঝানো হয়েছে। হযরত ওমর (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে জোবায়ের (রাঃ)

এই মত পোষণ করতেন বলে লিখেছেন আল্লামা বগভী (রঃ)। আতা (রঃ), তাউস (রঃ), মুজাহেদ (রঃ) এবং সাঈদ এবনে মুসাইয়েব (রঃ) আলোচ্য বাক্যের এই অর্থই বর্ণনা করেছেন। তাদের এই তফসীরের ভিত্তি হলো হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ফরমান, তিনি বলেছেন; "হজ্জ হলো আরফা"।

(আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি, নেসায়ী, এবনে হাব্বান, হাকেম, দারে কুতনী, বায়হাকী)

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীর মতে, বড় হজ্জের দিন বলতে কোরবানীর দিনকে বুঝানো হয়েছে। ইয়াহিয়া এবনে খাররাত বর্ণনা করেন হযরত আলী (রাঃ) একটি সাদা বর্ণের খচ্চরের উপর আরোহন করে কোরবানীর দিন কোথাও গমন করছিলেন। এক ব্যক্তি তাঁর খচ্চরের লাগাম ধরে জিজ্ঞাসা করেছেন, আলোচ্য আয়াতে বড় হজ্জের দিন বলতে কোন্ দিনকে বুঝানো হয়েছে হযরত আলী (রাঃ) বলেছেনঃ এই দিনকেই বুঝানো হয়েছে। ইমাম তিরমিজি লিখেছেন, হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন যে, আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট "বড় হজ্জের দিনের" সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তা কোরবানীর দিন।

এবনে জরীর এই মতের সমর্থনে হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আবি আওফা (রাঃ) এবং হযরত মগীরা এবনে শো'বা (রাঃ) সাঈদ এবনে জোবায়ের (রঃ) এবং সুদ্দী (রঃ) প্রমুখ তফসীরকারগণ এই মতই পোষন করতেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, বিদায় হজ্জের কোরবানীর দিন জমারাতের নিকট দন্ডায়মান হয়ে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ এ হলো হজ্জে আকবরের দিন।

আল্লামা বগভী (রঃ) এবনে জোরায়েরের সূত্রে বর্ণনা করেছেনঃ তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, বড় হজ্জের দিন বলতে হজ্জের সকল দিনকেই তথা মিনায় অবস্থানের দিনগুলোকে বুঝনো হয়েছে। সুফয়ানসওরী (রঃ) এই মতই পোষণ করতেন।

এখানে এ কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, যেহেতু ওমরাহকে ছোট হজ্জ বলা হয় তাই হজ্জক বড় হজ্জ বলা হয়। সাধারণতঃ এই ভুল ধারণা প্রচিলত রয়েছে যে, শুক্রবার হজ্জ হলে সে হজ্জকে হজ্জেআকবর বলা হয়, অথচ শরীয়তে এর কোন দলিলনেই।[১]

---

(১) তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৭৭-৭৮

أَنَّ اللَّهَ بَرِىٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ۙ

নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের সঙ্গে মোশরেকদের কোন সম্পর্ক নেই। পূর্ববর্তী আয়াতে মোশরেকদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের যে ঘোষণা ছিল তা সে সব মোশরেকদের ব্যাপারে ছিল যারা চুক্তি করে ভঙ্গ করেছে। আর আলোচ্য আয়াতে সাধারণভাবে সমস্ত মোশরেকের ব্যাপারে এই সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে যে, আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের সঙ্গে মোশরেকদের কোন সম্পর্ক নেই।

একটি ঘটনা

নবম হিজরীর শাওয়াল মাসে এই সূরা নাজিল হয়। হজ্জের সময় মানুষকে এই সূরা শুনিয়ে দেয়ার জন্যে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ)-কে প্রেরণ করেন। ইমাম নেসায়ী হযরত জাবের (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে আমীরুল হজ্জ নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। ওরজ নামক স্থানে পৌছার পর যখন ফজরের নামাজের আযান হলো হযরত আবু বকর (রাঃ) নামাজের জন্য তৈরী হয়ে আল্লাহু আকবর বলতে যাবেন এমন সময় উষ্ট্রের শব্দ শ্রবণ করে তকবীর বলা মুলতবী রাখলেন, এবং বললেন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের "যাদ আ" নামক উষ্ট্রীর শব্দ শ্রবন হচ্ছে হয়ত হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হজ্জ করার ইচ্ছা হয়েছে, যদি তাই হয় তবে আমরা তাঁর সঙ্গে নামাজ আদায় করবো। এমন সময় হযরত আলী (রাঃ) উষ্ট্রের উপর আরোহন করে আগমন করলেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ আপনি কি আমিরুল হজ্জ হয়ে আগমন করেছেন, না কোন সংবাদের বাহক হয়ে? হযরত আলী (রাঃ) জবাব দিলেন বাহক হয়ে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে এজন্যে প্রেরণ করেছেন যেন আমি হজ্জের সময় মানুষকে সূরায়ে বরাআত পাঠ করে শুনাই।

যাহোক, আমরা মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় পৌছলাম। জিলহজ্জের সাত তারিখ হযরত আবু বকর (রাঃ) দন্ডায়মান অবস্থায় ভাষণ দিলেন এবং হজ্জের নিয়ম কানুন সম্পর্কে বর্ণনা করলেন। যখন তাঁর ভাষণ শেষ হলো তখন হযরত আলী (রাঃ) দন্ডায়মান হলেন এবং সূরায়ে বরাআত পাঠ করে শুনালেন। অতঃপর আমরা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর সঙ্গে বের হয়ে আসলাম। আরফার দিনও হযরত আবু বকর (রাঃ) দন্ডায়মান হলেন এবং মানুষকে হজ্জের বিধান সম্পর্কে বললেন। এরপর হযরত আলী (রাঃ) দন্ডায়মান হয়ে সূরায়ে বরাআত শেষ পর্যন্ত পাঠ করে শুনালেন। অতঃপর

কোরবানীর দিন হযরত আবু বকর (রাঃ) পুনরায় ভাষণ দিলেন এবং কোরবানীর বিধান সমূহ বর্ণনা করলেন। আর হজ্জের অন্যান্য নিয়ম কানুনও বর্ণনা করলেন এবং তারপর হযরত আলী (রাঃ) দন্ডায়মান হলেন এবং সূরায়ে বরাআত পাঠ করে শুনালেন। এরপর যেদিন সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করবেন সেদিন হযরত আবু বকর (রাঃ) বক্তিতা করলেন এবং কিভাবে মানুষ ফিরে যাবে তার পন্থা এবং নিয়ম কানুন বর্ণনা করলেন। এরপর হযরত আলী (রাঃ) দন্ডায়মান হয়ে সূরায়ে বরাআত পাঠ করলেন।[১]

অতঃপর আর কোন মোশরেক হজ্জ করতে আসবেনা

হযরত জায়েদ বর্ণনা করেন যে, আমরা হযরত আলী (রাঃ)–কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আপনাকে কি বাণী দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে? তিনি বললেন, চারটি কথা ঘোষণা করার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।

(১) ভবিষ্যতে আর কোন লোক নগ্ন অবস্থায় তওয়াফ করতে পারবে না।

(২) হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যাদের শান্তি চুক্তি রয়েছে তাদের চুক্তির মেয়াদ বহাল থাকবে। কিন্তু যাদের সাথে কোন চুক্তি নেই তাদেরকে চার মাসের অবকাশ দেয়া হলো।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এই চার মাসের সুযোগ দেয়া হলো নিতান্ত দয়া করে যেন যে তওবা করতে চায় সে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারে।

(৩) মোমেন ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

(৪) এ বছরের পর এই পবিত্র স্থানে মোমেনদের সঙ্গে কোন মোশরেক একত্রিত হতে পারবে না। অর্থাৎ মোশরেকরা হজ্জ করতে পারবে না।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ)–এর বিবরণ সংকলিত হয়েছে যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) আমাকে কোরবানীর দিনে মিনায় এই ঘোষণা করার জন্য প্রেরণ করেছেন যে, এ বছরের পর কোন মোশরেক হজ্জ করতে আসবে না। আর কোন ব্যক্তি নগ্ন অবস্থায় তওয়াফ করতে পারবে না।

فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

অতঃপর যদি তোমরা তওবা কর তথা কোফর ও শেরক পরিহার করে ইসলামের দিকে ফিরে আস তবে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে তোমাদের জন্য হবে তা কল্যাণকর। কেননা নাজাত লাভের একমাত্র পন্থাই হলো ইসলাম।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড–৫, পৃষ্ঠা–১৮৪–৮৫

وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ

আর যদি তোমরা বিমুখ হও অর্থাৎ তওবা না কর ইসলাম গ্রহণ প্রস্তুত না হও তবে–

فَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ؕ

নিশ্চিত ভাবে জেনে রাখ যে, তোমরা কোন অবস্থাতেই আল্লাহ পাককে ঠেকাতে পারবে না। অর্থাৎ তাঁর নিয়ন্ত্রণ থেকে তোমরা পলায়ন করতে পারবে না, দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে তিনি তোমাদের শাস্তি দেবেন, আর সে শাস্তি থেকে তোমরা কোন ভাবেই রক্ষা পাবে না।

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۙ﴿۳﴾

আর কাফেরদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিয়ে দিন। দুনিয়াতে তাদেরকে বন্দী করা হবে, হত্যা করা হবে এবং আখেরাতে দোজখের কঠিন কঠোর শাস্তি তারা ভোগ করবে।

اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ

আরবের যে সব গোত্র মুসলমানদের সঙ্গে নিদৃষ্ট মেয়াদে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিল এবং সাঠিকভাবে সে চুক্তি পালনও করেছে, মুসলমানদের ক্ষতি সাধনে সচেষ্ট হয়নি এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাউকে কোন প্রকার সাহায্যও করেনি যেমন বণী জোমরা বণী মোদলাজ গোত্র তাদের উদ্দেশ্যেই আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, চুক্তিতে নিৃদষ্ট মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা তোমাদের সাথে চুক্তি রক্ষা করবো। তবে নিদৃষ্ট সময় শেষ হওয়ার পর নতুন করে কোন চুক্তি করা হবে না। এরপর তোমাদের জন্য দু'টি পথই খোলা থাকবে ইসলাম গ্রহণ অথবা ইসলামের প্রাণকেন্দ্র থেকে বিদায় গ্রহন। যারা মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ ছিল তাদের ব্যাপারে দু'টি শর্তে চুক্তি অব্যাহত রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

(১) তারা চুক্তি রক্ষার ব্যাপারে কোন কসুর করেনি।

(২) মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন কাফেরকে সাহায্য করেনি।

তফসীরকারগণ বলেছেন, যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করা হয়

তবে এর অর্থ হলো চুক্তি ভঙ্গ করা। মুসলমানদের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ গোত্রগুলো যদি উপরোল্লিখিত দু'টি শর্ত পূর্ণ করে তবে তাদের ব্যাপারে আদেশ হলো–

فَأَتِمُّوٓا۟ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ

অর্থাৎ–তাদের সাথে সন্ধির নির্দৃষ্ট মেয়াদ পূর্ণ কর।

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٤

নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক পরহেজগার লোকদেরকে পছন্দ করেন। আর অঙ্গীকার রক্ষা করা পরহেজগারীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অতএব, আল্লাহর পছন্দনীয় হতে হলে পরহেজগারী অবলম্বন করতে হবে। যে এ কথা বিশ্বাস করে যে, আমাকে আমার জীবনের প্রত্যেকটি কথা এবং কাজের জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে জবাবদেহী করতে হবে এবং ভাল কাজ হলে পুরুস্কার, আর মন্দ কাজ হলে শাস্তি ভোগ করতে হবে সে আল্লাহর নাফরমানী করতে পারে না এবং অঙ্গীকারও ভঙ্গ করতে পারে না।

فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ
حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُوا۟ لَهُمْ كُلَّ
مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّوا۟
سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ
ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُۥ ۚ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ٦

তরজমা

(৫) অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হবে তখন মোশরেকদেরকে যেখানে পাও হত্যা কর তাদেরকে বন্দী কর এবং অবরোধ কর এবং সর্বত্র তাদের জন্যে ওঁৎ পেতে থাক, এরপর যদি তারা তওবা করে এবং নামাজ কায়েম করে,

যাকাত আদায় করে তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

(৬) (হে রসূল!) মোশরেকদের মধ্যে যদি কেউ আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে তবে আপনি তাকে আশ্রয় দিন যেন সে আল্লাহ পাকের বাণী শ্রবণ করে। এরপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দিন। আর (এ সুযোগ এজন্যে যে) এরা এমন লোক যাদের কোন জ্ঞানবুদ্ধি নেই।

তফসীরুল কোরআন

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) এবং এবনে এহ্হাক (রঃ) বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে নিষিদ্ধ মাস বলতে চুক্তির মাসকে বোঝানো হয়েছে যার মেয়াদ চার মাস। আর যাদের সঙ্গে কোন চুক্তি নেই, তাদের শেষ সময় হবে মহররমের শেষ তারিখ। কেননা, এই সময়ে কোন মোশরেককে হত্যা করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন, যখন নিষিদ্ধ চার মাস শেষ হয় তখন মুসলমানদেরকে চারটি কাজের অনুমতি দেয়া হ'ল।

(১) কাফেরদেরকে যেখানে পাও হত্যা কর।

(২) তাদেরকে বন্দী কর।

(২) তাদেরকে অবরোধ কর তথা তাদের চলাফেরা বন্ধ করে দাও।

(৪) সর্বত্র তাদের জন্যে ওঁৎ পেতে থাক অর্থাৎ নিষিদ্ধ চার মাস অতিবাহিত হবার পর কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধকালীন অবস্থা শুরু হবে যেন ইসলামের প্রাণকেন্দ্র সংরক্ষিত হয়।১

আলোচ্য আয়াতে মোশরেকদের বিরুদ্ধে জেহাদের অবাধ অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ

অতএব, তোমরা মোশরেকদেরকে হত্যা কর, তবে যাদের সঙ্গে মুসলমানদের শান্তিচুক্তি রয়েছে এবং যারা সে অঙ্গীকার মেনে চলে সে মোশরেক ব্যতীত।

حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৫, পৃষ্ঠা-২২৫

"তোমরা তাদেরকে যেখানে পাও হত্যা কর।"

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ এর অর্থ হলো হরম শরীফের বাইরে যেখানে পাও, সেখানে তাদেরকে হত্যা কর। কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হরম শরীফে হত্যাকান্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তিনি এরশাদ করেছেনঃ যেদিন আল্লাহ পাক আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন সেদিনই এই শহরকে (মক্কা শরীফকে) সম্মানিত ঘোষণা করেছেন। তাই এশহর কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ পাক প্রদত্ত সম্মানে সম্মানিত থাকবে। আমার পূর্বে এই শহরে লড়াই করার অনুমতি কারো জন্যই ছিলনা আর আমার জন্য শুধু এক ঘন্টার জন্য লড়াই করা হালাল করা হয়েছিল। যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের লড়াই করার কারণে এখানে লড়াইকে বৈধ মনে করে তবে তাকে বলে দাও যে, আল্লাহ পাক তাঁর রসূলকে অনুমতি দিয়েছেন তোমাকে নয়। আর আমাকেও শুধু এক ঘন্টার জন্য অনুমতি দেয়া হয়েছিল। এখন পুণরায় তা নিষিদ্ধ হয়েছে যেমন গতকাল ছিল। এই হাদীস বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে। অবশ্য যদি মোশরেকরা হরম শরীফে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে তবে মুসলমানদেরকেও এর অনুমতি দেয়া হয়েছে। (এ সম্পর্কে সূরায়ে বাকারায় বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে)

وَخُذُوهُمْ

এবং তাদেরকে পাকড়াও কর বন্দী কর।

وَاحْصُرُوهُمْ

আর তাদেরকে অবরোধ কর।

হযরত আবদুল্লাহ এবেন আব্বাস (রাঃ)-এর অর্থ বলেছেন যে, যদি মোশরেকরা দূর্গের ভিতর আবদ্ধ থাকে তবে তাদেরকে অবরোধ কর, যেন দূর্গ থেকে বের হতে না পারে এবং বাধ্য হয়ে যুদ্ধ করবে, অথবা মুসলমান হবে অথবা জিজিয়া আদায় করবে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আয়াতের অর্থ হলো কাফেরদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে বা মুসলিম রাষ্ট্রে ঘুরাফেরা করতে দিওনা।

وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

আর সর্বত্র ওঁৎ পেতে থাক। যেখান থেকে তাদের প্রতি নজর রাখা যায় সেখানে প্রহরা মোতায়েন কর আর যেদিক থেকে তারা আসে তাদেরকে বন্দী কর যেন মক্কায় প্রবেশ করতে এবং দেশে ছড়িয়ে পড়তে না পারে।

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ

এরপর যদি শেরক থেকে তারা তওবা করে, নামাজ কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

তফসীরকারগণ বলেছেনঃ ইসলাম গ্রহণের পর যদি কেউ নামাজ কায়েম না করে, জাকাত আদায় না করে তবে তার শাস্তি বিধান করা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য এবং মুসলমানদের অধিকার। এ সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (রঃ), ইমাম মালেক (রঃ) এবং ইমাম আহমদ (রঃ) প্রমুখ ইমামদের মতে এমন ব্যক্তিকে হত্যা করাই রাষ্ট্রের কর্তব্য। কিন্তু যদি সে ব্যক্তি তওবা করে তবে এ শাস্তি থেকে রেহাই পাবে।

ইমাম আহমদ (রঃ)–এর মতে এই ব্যক্তি ইসলামের মূল শিক্ষাকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে তাই সে মোরতাদ। (ধর্মত্যাগী) অতএব তার শাস্তি হবে মোরতাদের শাস্তি। ইমাম মালেক (রঃ) এবং ইমাম শাফেয়ী (রঃ)–এর মতে সে মোরতাদ নয় বরং শাসন শৃংখলার তাগিদেই তার এ অবস্থা। ইমাম আজম আবু হানিফা (রঃ) বলেছেনঃ তাকে খুব প্রহার করবে এবং বন্দী করে রাখবে। তখন হয় সে তওবা করে নাজাত লাভ করবে অথবা বন্দী অবস্থায় তার মৃত্যু হবে। এক কথায় এমন ব্যক্তিকে কোন অবস্থাতেই শাস্তি ব্যতীত ছাড়া হবে না।[১]

এভাবে যারা জাকাত আদায় না করে তাদের থেকে জাকাত উসুল করা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য। আর যদি কিছু লোক একত্রিত হয়ে জাকাত আদায়ে বিরত থাকে তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে জাকাত প্রদানে বাধ্য করা ইসলামী রাষ্ট্রের একান্ত করণীয় কাজ। প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ)–এর গৌরবোজ্জ্বল যুগে এমন ঐতিহাসিক কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন যা সকল যুগেই প্রশংসনীয় এবং অভিনন্দিত হয়েছে। তত্ত্ববিদগণ বলেছেন, হযরত আবু বকর (রাঃ)–এর যুগে যারা জাকাত আদায়ে অস্বীকৃতি জানায় তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা আলোচ্য আয়াতের আলোকে ফরজ বলে হযরত আবু বকর (রাঃ) সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াত সম্পর্কে লিখেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে শরীয়তের বিধানগুলোকে ধারাবাহিক ভাবে পেশ করা হয়েছে। কলেমায়ে শাহাদত পাঠ করার পর সর্ব প্রথম কাজ হলো নামাজ আদায় করা যা আল্লাহ পাকের হক। নামাজের পরই হয় জাকাতের প্রশ্ন। জাকাতের দ্বারা মিসকিন, অনাথ বিপদগ্রস্থ মানুষকে সাহায্য করা হয়। আর আল্লাহর সৃষ্টির যে হক মানুষের উপর রয়েছে তার একটা বিরাট অংশ

১। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা–২৪৩

জাকাতের মাধ্যমে আদায় হয়। আর এ কারণেই পবিত্র কোরআনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নামাজের পরই জাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, আমার প্রতি এ আদেশ করা হয়েছে যেন আমি মানুষের সঙ্গে জেহাদ অব্যাহত রাখি যতক্ষণ না তারা এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল, আর তারা নামাজ কায়েম করে এবং জাকাত আদায় করে। যে নামাজ আদায় করে অথচ যাকাত আদায় করেনা তার নামাজ হয় না। হযরত আসলাম বর্ণনা করেন, আল্লাহ পাক কারো নামাজ সে পর্যন্ত কবুল করেন না যে পর্যন্ত সে জাকাত আদায় না করে।

আল্লাহ্ পাক হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর প্রতি রহম করুন, তাঁর ধী শক্তি ছিল সর্বাধিক, তিনি জেহাদ করে ছিলেন সে সব লোকদের বিরুদ্ধে যারা জাকাতকে অস্বীকার করেছিল।

মসনদে আহমদে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমাকে জেহাদের আদেশ দেয়া হয়েছে যতক্ষণ লোকেরা এ স্বাক্ষ্য না দেয় যে, আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ এবাদতের যোগ্য নয় এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল। যখন তারা এ দু'টি কথার অঙ্গীকার করে এবং আমাদের কেবলার দিকে মুখ করে, আমাদের জবেহ করা প্রানীর গোশ্ত আহার করে এবং আমাদের ন্যায় নামাজ আদায় করে, তখন তাদের রক্ত ও ধন-সম্পদ হারাম। তবে যদি শরীয়তের কোন নির্দেশ জারী করতে হয় তবে তা ভিন্ন কথা। এমন অবস্থায় তারা সে সমস্ত হক্ব অর্জন করবে যা অন্য মুসলমানের রয়েছে এবং তাদের উপর সেই দায়িত্ব বর্তাবে যা অন্য মুসলমানের রয়েছে। এ হাদীস বোখারী শরীফে সংকলিত হয়েছে।

এবনে জরীরে অন্য একখানি হাদীস রয়েছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি এ অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করে যে, শুধু এক আল্লাহর বন্দেগী করে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করে তবে সে এমন অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করে যে আল্লাহ পাক তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ মূলতঃ এটিই আল্লাহ পাকের দ্বীন। আর সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) এ দ্বীনই আল্লাহর তরফ থেকে নিয়ে এসেছিলেন এবং নিজ নিজ উম্মতের নিকট পৌঁছিয়ে ছিলেন।

আর এ কথার সত্যতার স্বাক্ষী হ'ল আল্লাহ পাকের সর্বশেষ ওহী তথা পবিত্র কোরআনের আলোচ্য আয়াত।

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেনঃ যদি তারা তওবা করে নামাজ কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। অতএব, তওবা হলো এক আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য সব কিছুর বন্দেগী থেকে আত্মরক্ষা করা এবং নামাজ কায়েম করা, যাকাত আদায় করা। এ তিনটি কাজ করার পর তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ সূরায়ে বারাআত নাজিলের চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পর কাফেরদের সঙ্গে কোন চুক্তি বা দায়িত্ব রাইলনা। এখন ইসলাম এবং জেহাদ বাকী রইল। হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ আল্লাহ পাক হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে চারটি তলোয়ার সহ প্রেরণ করেছেনঃ অর্থাৎ চারটি দলের ব্যাপারে তলোয়ার ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন।

(এক) আরবের মোশরেকদের ব্যাপারে, এরশাদ হয়েছেঃ

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ

অর্থাৎ মোশরেকদেরকে যেখানে পাও হত্যা কর।

(দুই) আহলে কেতাবদের সম্পর্কে।

এরশাদ হয়েছেঃ

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের প্রতি এবং কেয়ামতের দিনের প্রতি যারা ঈমান না আনে এবং আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যা কিছু হারাম ঘোষণা করেছেন যারা তাকে হারাম না মানে ও আহলে কেতাবদের মধ্যে যারা সত্য দ্বীনকে না মানে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ কর যে পর্যন্ত তারা অবমাননার সঙ্গে অমুসলিম কর আদায় করতে প্রস্তুত না হয়।

(তিন) মোনাফেকদের ব্যাপারে, এরশাদ হয়েছেঃ

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ

হে নবী। কাফের এবং মোনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করুন।

(চার) বিদ্রোহীদের ব্যাপারে, এরশাদ হয়েছেঃ

وَاِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا

যদি মোমেনদের মধ্যে দু' দল যুদ্ধরত হয় তবে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। যদি এরপরও একদল আরেক দলের উপর অবিচার করে তবে ঐ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে তোমরা জেহাদ কর যে পর্যন্ত তারা আল্লাহর হুকুম কবুল করতে প্রস্তুত না হয়।১

اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল অতীব দয়াবান।

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ
حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ

আশ্রয় প্রার্থীর জন্যে ইসলামী বিধান

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে একজন মোশরেক হযরত আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, যদি আমরা নিদৃষ্ট চার মাস সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহর কালাম শুনবার জন্যে অথবা অন্য কোন প্রয়োজনে রসূলের নিকট হাজির হতে চাই তবে কি আমাদেরকে হত্যা করা হবে?

তখন হযরত আলী (রাঃ) বললেন, না। কেননা, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ

অর্থাৎ-হে নবী। যাদের সঙ্গে যুদ্ধ এবং যাদের সঙ্গে মোকাবলো করার জন্য আমি নির্দেশ দিয়েছি তাদের মধ্যে কেউ যদি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে বা

১। তফসীরে এবন কাসীর (উর্দু) খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৩৩-৩৪

নিরাপত্তা চায় তবে তাদেরকে আশ্রয় দিবেন। তাদের আরজি রক্ষা করবেন। এই সুযোগে তারা আল্লাহ পাকের মহান বাণী শ্রবণ করবে, ইসলামের মূল নীতি সম্পর্কে অবগত হতে পারবে। এরপর যদি তারা মুসলমান হয় তবে উত্তম। কিন্তু সে যদি ইসলাম কবুল না করে তবে তাকে নিরাপদে তার নিরাপদ স্থানে পৌছিয়ে দাও তথা তাকে স্বস্থানে ফিরে যেতে দাও।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাই করতেন। বস্তুতঃ মুসলিম রাষ্ট্রনায়ক এবং তার প্রতিনিধির প্রতিও এমন ব্যবহারেরই নির্দেশ রয়েছে। যুদ্ধরত রাষ্ট্রের কোন অমুসলিম যদি ইসলামের মূল তত্ত্ব বুঝবার জন্যে অথবা দূত হিসেবে বা ব্যবসা বানিজ্যের লক্ষ্যে অথবা সন্ধি প্রস্তাব নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রে আসে এবং নিরাপত্তার আবেদন করে তথা রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করে তবে তাকে আশ্রয় দেয়া ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য। কিন্তু তবুও কথা থাকে যে এমন ব্যক্তিকে সুদীর্ঘ কাল পর্যন্ত বা স্থায়ীভাবে ইসলামী রাষ্ট্রে অবস্থানের অনুমতি দেয়া যাবে না। এখন প্রশ্ন হলো কতদিন তাকে ইসলামী রাষ্ট্রে থাকতে দেয়া হবে এবং তার নিরাপত্তা বিধান করতে হবে। তত্ত্বজ্ঞানীদের একদল বলেছেন, এক বছরের কম সময় পর্যন্ত তাকে ইসলামী রাষ্ট্রে অবস্থানের সুযোগ দেয়া যেতে পারে।

আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, তাদেরকে চার মাসের কম সময় দেয়া যেতে পারে আর এ সময়ে তার জান এবং মালের নিরাপত্তা দেয়া ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য। এই সুযোগে সে ইসলামকে বুঝবার এবং ইসলামের মূল নীতির যথার্থতা উপলব্ধি করার সুযোগ পাবে। যদি সে মুসলমান হয় তবে তা তার সৌভাগ্য, আর যদি সে ইসলাম কবুল করতে রাজী না হয় তবে এ উদ্দেশ্যে তার উপর কোন প্রকার জুলুম অত্যাচার করা যাবে না; বরং তাকে নিজের দায়িত্বে নিরাপদ স্থানে পৌছিয়ে দেয়া ইসলামী রাষ্ট্রের একান্ত কর্তব্য। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ

অর্থাৎ তাকে তার নিরাপদ স্থানে নিরাপদে পৌছিয়ে দাও।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, যদি এরপরও সে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসে তবে তোমরাও তার সঙ্গে যুদ্ধ কর। আলোচ্য আয়াত দ্বারা কয়েকটি কথা প্রমাণিত হয়।

(১) আলোচ্য আয়াতে আশ্রয়প্রার্থী কাফেরকে আল্লাহ পাকের পবিত্র কালাম শুনাবার যে কথা রয়েছে তাতে সমগ্র পবিত্র কোরআন শুনানো জরুরী নয়; বরং হেদায়েত লাভের জন্যে তথা ইসলাম সম্পর্কে যাবতীয় সন্দেহ দূরীভূত করার জন্য

যতখানি শুনানো প্রয়োজন ততখানি শুনাতে হবে। আর কত সময় এ কাজে ব্যবহার করবে তার সিদ্ধান্ত দিবেন ইমামুল মুসলেমীন।

(২) এর দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, কোন কাফের যদি দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে কিছু শিখতে চায় তবে তাকে প্রয়োজনীয় বিষয়ে শিক্ষা দেয়া বৈধ।

(৩) কোন কাফেরের জন্য নিরাপদ স্থানে পৌছাবার যে আদেশ রয়েছে তা পালনের কয়েকটি পন্থা হতে পারে।

(ক) ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পার করে দারুল হারবের সীমান্ত পর্যন্ত পৌছে দেয়াই যথেষ্ট।

(খ) যদি এমন অবস্থা হয় যে, উভয় সীমান্তের মধ্যে এমন কোন অবস্থা বিরাজমান থাকে এ সময় সে যদি এ পথ অতিক্রম করে তবে তার ধ্বংস হওয়ার আশংকা থাকে এমন অবস্থায় তাকে দারুল ইসলামে আশ্রয়প্রার্থী হিসেবে রাখা কর্তব্য।

(গ) যদি সে অন্য কোন দেশ অতিক্রম করে এসে থাকে তবে যেখানে তাকে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছিল সেখান পর্যন্ত পৌছে দেয়াই যথেষ্ট।

(ঘ) যদি সে এ শর্তারোপ করে থাকে যে আমাকে অমুক সম্প্রদায়ের এলাকা পার করে দিতে হবে আর মুসলমানগণ এই শর্ত কবুলও করেছিলেন তবে এমন শর্ত পুরা করাও কর্তব্য।১

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ۝٦

আশ্রয়প্রার্থী মোশরেককে আশ্রয়ের সুযোগ এজন্য দেয়া হবে যে, তারা এমন সম্প্রদায় যারা কিছু বোঝেনা। হক ও বাতিল, সত্য অসত্যের মধ্যে পার্থাক্য সম্বন্ধে তারা অবগত নয়।

আল্লাহ পাকের মহান বাণী পবিত্র কোরআন শ্রবণ করার কারণে হয়ত সত্যকে উপলব্ধি করার সুযোগ পাবে এবং ইসলাম কি? কেন? এবং এই ক্ষনস্থায়ী জীবনের মর্মার্থ কি? এবং এ জীবনে মানুষের কর্তব্য কি? এসব সত্য উপলব্ধি করে সত্যকে গ্রহণের সুযোগ দেয়ার জন্যই আশ্রয় প্রদাণের অনুমতি দেয়া হয়েছে। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের আদেশ কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।২

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট কোন অমুসলিম হাজির হলে তাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা দেয়া হতো। মিথ্যা নবুওয়তের

১। খোলাসাতুত্তাফাসীর, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১৯৮

২। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৮৯

দাবীদার মুসাইলামাতুল কাজ্জাবের দূত যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হলো তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি মুসাইলামাকে আল্লাহর রসূল মান? সে বললো হ্যাঁ। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ যদি দূতকে হত্যা করা নিষিদ্ধ না হতো তবে আমি তোর গর্দান উড়িয়ে দিতাম। এরপরও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে আশ্রয় দেন এবং পরে নিরাপদে তাকে ফিরে যেতে দেন।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেনঃ হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) যখন কুফার গভর্ণর, এবনে তাওয়াহামা নামক ঐ ব্যক্তি কুফায় হাজির হয় সে তখনও মোসায়লামার প্রতি বিশ্বাসী ছিল তাই হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) তাকে বললেনঃ এখন তুমি দূত নও, কাজেই তোমাকে মৃত্যু দন্ড দেয়া হবে এবং পরবর্তীকালে তার মৃত্যু দন্ড কার্যকারী হয়।[১]

كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ
اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُوْلِهٖٓ اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ
فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۷﴾
كَيْفَ وَاِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ؕ
يُرْضُوْنَكُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ وَتَاْبٰى قُلُوْبُهُمْ ۚ وَاَكْثَرُهُمْ فٰسِقُوْنَ ۚ ﴿۸﴾
اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ اِنَّهُمْ
سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۹﴾ لَا يَرْقُبُوْنَ فِيْ مُؤْمِنٍ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ؕ
وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ ﴿۱۰﴾

তরজমা

(৭) আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের নিকট মোশরেকদের চুক্তি কি করে বলবৎ

১। তফসীরে এবন কাসীর (উর্দু) খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৩৫

থাকবে? তবে যাদের সাথে মসজিদুল হারামের নিকট তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছো তারা যতক্ষণ তোমাদের চুক্তিতে ঠিক থাকবে, তোমরাও তাদের চুক্তিতে ঠিক থাকবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক পরহেজগার লোকদেরকে পছন্দ করেন।

(৮) কেমন করে তাদের সন্ধি টিকে থাকবে? অথচ তারা যদি তোমাদের উপর জয়ী হয় তবে তারা তোমাদের আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা দেবেনা। তারা শুধু মুখের কথায় তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করতে চায়, কিন্তু তাদের মন তা মানেনা, তাদের অধিকাংশ লোকই বিশ্বাসঘাতক।

(৯) তারা আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহকে বিক্রয় করে ও মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে, তারা যা কিছু করছে তা অত্যন্ত জঘন্য।

(১০) কোন মোমেনের ব্যাপারে তারা আত্মীয়তা এবং অঙ্গীকারের পরোয়া করেনা, বস্তুতঃ তারাই হ'ল সীমা লংঘনকারী।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে মোশরেকদের উদ্দেশ্যে চরম পত্র ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই, একথা তাদেরকে সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এর কারণ বর্ণনা করা হয়েছেঃ

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ

যারা একটু সুযোগ পেলেই মুসলমানদের উপর নির্যাতন ও উৎপীড়ন করতে থাকে, মুসলমানদের ক্ষতিসাধনে যারা সর্বক্ষণ তৎপর থাকে, আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং নিজেদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে একটুও দ্বিধাবোধ করেনা, নিজেদের কৃত প্রতিজ্ঞা এবং প্রতিশ্রুতির কোন মর্যাদাই যারা দেয়না, তাদের সাথে কি করে সন্ধিচুক্তি টিকে থাকতে পারে? যেহেতু বর্তমানে তারা প্রভাব প্রতিপত্তি বঞ্চিত, তাই মুখের কথায় তোমাদেরকে প্রতারিত করতে চায় অথচ বাস্তব অবস্থা এই যে, তারা মুখে যা বলে তা তাদের মনে থাকেনা আর মনে যা থাকে তা আদৌ মুখে বলেনা, তাই তারা যত প্রতিজ্ঞা করুক না কেন সুযোগ পেলে তা ভঙ্গ করতে তারা কিছুমাত্র বিলম্ব করবেনা। তাই তাদের অঙ্গীকার গ্রহনযোগ্য নয়। যখন তারা অঙ্গীকার করে তখনও তাদের মনে প্রতারণার ভাব বিদ্যমান থাকে। তাই তারা তাদের প্রথম

সুযোগেই কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। কেননা, বিশ্বাসঘাতকতা তাদের বৈশিষ্ট্য। যাদের মনের চেহারা অত্যন্ত কৃষ্ণ, মুসলমানদের ক্ষতিসাধনে যারা ষড়গহস্ত, তাদের সাথে কোনরকম সন্ধি বলবৎ থাকতে পারেনা। তাই মোশরেকদের উদ্দেশ্যে পূর্ববর্তী আয়াতে চরমপত্র ঘোষণা করা হয়েছে।

এজন্যেই আল্লাহ পাক পূর্বেই বরাআত বা সম্পর্কোচ্ছেদের ঘোষণা দিয়েছেন, যেন এ কথা সকলের জানা হয়ে যায় যে, আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোকাবিলায় অঙ্গীকার ভঙ্গ করা বা কোন প্রকার প্রতারণা করা কার্যকর হয়না।

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

তবে যে সব সম্প্রদায়ের সঙ্গে মসজিদুল হারামের নিকট তোমাদের চুক্তি হয়েছে তোমরা তাদের সাথে সন্ধি করেছ যে পর্যন্ত তারা সন্ধিভঙ্গ না করে সে পর্যন্ত তোমরাও সন্ধির শর্ত সমূহ সঠিকভাবে পালন কর তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ

যতক্ষণ তারা তোমাদের পক্ষে ঠিক থাকবে তোমরাও তাদের সঙ্গে ঠিক থাকবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে তারা হ'ল কোরায়েশ গোত্র। আর তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেনঃ তারা হ'ল মক্কাবাসী যাদের সাথে ষষ্ঠ হিজরীতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হোদায়বিয়া নামক স্থানে সন্ধি কারেছিলেন। হোদায়বিয়ার চুক্তিকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক আদেশ দিয়েছেন, যতক্ষণ তারা চুক্তির শর্ত মেনে চলে ততক্ষণ তোমরাও চুক্তি বলবৎ রাখ। কিন্তু কাফেররা চুক্তি বহাল রাখেনি; বরং বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। বণী খাজাআ গোত্রের বিরুদ্ধে বণী বকর গোত্রকে সাহায্য করেছে একারণে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে অভিযান করেছেন এবং মক্কা বিজয় হয়েছে। তাদেরকে চারমাসের অবকাশ দেয়া হয় এবং দু'টি বিষয়ের একটিকে অবলম্বন করার আদেশ দেয়া হয়। এ চার মাসের মধ্যে হয় মুসলমান হবে, অথবা মক্কা ছেড়ে যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে যাবে, অবশ্য চারমাসের মধ্যেই সমস্ত মক্কাবাসী ইসলাম কবুল করে।

সুদ্দী, কালবী এবং এবনে এছহাকের বর্ণনা হ'ল বণী খোজাইমা, বনী মুদলাজ, জুমরাহ এবং বনী ওয়ায়েল চুক্তি করে। এ চুক্তি ভঙ্গ করে কোরাইশ এবং বণী

ওয়ায়েল। বণী মুদলাজ জুমরাহ্ চুক্তি ভঙ্গ করেনি। তাই আলোচ্য আয়াতে যাদের সাথে চুক্তি বহাল রাখার আদেশ রয়েছে, তারা হ'ল বণী মুদলাজ জুমরাহ।১

এ আয়াত কবে নাজিল হয়েছে?

এ আয়াত মক্কা বিজয়ের পূর্বে নাজিল হয়েছে অথবা মক্কা বিজয় ও তাবুকের যুদ্ধের পর নাযিল হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ এ আয়াত সমূহ কোরাইশ সর্দারদের ব্যাপারে মক্কা বিজয়ের পূর্বেই নাজিল হয়েছে। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী ওলামায়ে কেরাম বলেছেনঃ এ আয়াত সমূহ মক্কা বিজয় ও তাবুকের যুদ্ধের পর নাজিল হয়েছে। আর ইহুদী সর্দারদের উদ্দেশ্যে এতে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে কেননা, তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মদীনায়ে মোনাওয়ারা থেকে বহিঃস্কার করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। আর তারাই পঞ্চম হিজরীতে অনুষ্ঠিত আহযাবের যুদ্ধে মক্কার কোরায়েশ ও আবু সুফিয়ানকে সাহায্য করেছিল।২

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, যারা মুসলমানদের সংগে কৃত অংগীকার রক্ষা করে তাদের সাথে যত্ন সহকারে অংগীকার রক্ষা কর। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, যারা পরহেজগারী অবলম্বন করে তাদেরকে আল্লাহ্ পাক পছন্দ করেন কথা দিয়ে কথা রক্ষা করা এবং অঙ্গীকর যত্নসহকারে পালন করা পরহেজগারী অবলম্বনের পূর্বশর্ত।

وَإِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ إِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ط

অর্থাৎ–যদি তারা তোমাদের উপর বিজয়লাভ করতে পারে, তবে তোমাদের ক্ষতিসাধনে তৎপর হয়, এমন অবস্থায় আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং তাদের অঙ্গীকারের প্রতিও তারা ভ্রুক্ষেপ করেনা।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড–৫, পৃষ্ঠা–১৮৯

(২) তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত–আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড–৩, পৃষ্ঠা–২৮৯

আলোচ্য আয়াতে إِلًّا শব্দটির অর্থ হ'ল আত্মীয়তার সম্পর্ক। হযরত আবদুলাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) إِلًّا শব্দটির এ ব্যাখ্যাই করেছেন। কাতাদা (রঃ) বলেছেনঃ এর অর্থ হ'ল অঙ্গীকার। আর ইয়ামান (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হ'ল আত্মীয়তা। আর সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ–প্রতিশ্রুতি।

আল্লামা বয়জাভী (রঃ) বলেছেন, إِلًّا শব্দটির অর্থ হ'ল প্রতিবেশী হওয়া। যাহোক, এ আয়াতে কাফেরদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে যে, খানিকটা সুযোগ পেলেই তারা মুসলমানদের উপর জুলুম অত্যাচার শুরু করে, এমন অবস্থায় তারা আত্মীয়তার কথাও ভুলে যায়, অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্কের খাতিরে জুলুম অত্যাচার করা উচিৎ নয় এ সত্য তারা ভুলে যায়।

এতদ্ব্যতীত, জুলুমের সুযোগ পেলে তাদের পূর্বেকৃত অঙ্গীকারের কথাও তারা ভুলে যেতে দ্বিধাবোধ করেনা।

এমন অবস্থায়, তাদের সঙ্গে কিভাবে, কি করে চুক্তি বলবৎ থাকতে পারে?

يُرْضُوْنَكُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ وَتَاْبٰى قُلُوْبُهُمْ

তারা মুখের কথা দিয়ে তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করতে চায়। অথচ তাদের অন্তরে সে সব কথা থাকেনা যা তারা মুখে প্রকাশ করে। মোনফেকী, ছল–চাতুরী, বেঈমানী, ধোকাবাজী, তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তারা মুখে তোমাদের সাথে অঙ্গীকারের কথা বলে কিন্তু অন্তরে তারা শত্রুতা গোপন রাখে, তারা চিন্তা করে যদি তাদের সুদিন আসে কোন প্রকার সাফল্য লাভ হয় এবং মুসলমানদেরকে কাবু করতে পারে তবে কৃত অঙ্গীকার এবং চুক্তির তারা বর খেলাফ করবে। মুসলমানদের প্রতি জুলুম অত্যাচার করবে এবং বিশ্বাসঘাতকতা করবে, নিজেদের প্রতিশ্রুতি বা প্রতিজ্ঞার কোন গুরুত্বই তাদের নিকট নেই, শুধু সুযোগের অপেক্ষা। তাই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاَكْثَرُهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝٨

আর তাদের অধিকাংশ লোকই পাপিষ্ঠ, বিশ্বাসঘাতক।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ তাদের সকলেই কাফের। কোফরী এবং নাফরমানী হ'ল সর্বাধিক ঘৃন্য এবং মন্দ কাজ। এমন অবস্থায় তাদেরকে 'ফাছেক' বলার তাৎপর্য কি?এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, কোন কোন কাফের, কাফের হওয়া সত্ত্বেও মিথ্যাবাদিতা, প্রতারণা, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি মন্দকাজকে পছন্দ করেনা। সংখ্যায় অতি সামান্য হলেও কাফেরদের মধ্যে

কিছুলোক এমন আছে যারা কথা দিলে কথা রাখতে চেষ্টা করে। কিন্তু এ কাফেরদের মধ্যে অধিকাংশই পাপাচারী; এদের মধ্যে মানবিক গুণ বলতে কিছুই নেই, তাই এ অর্থেই এরশাদ হয়েছে, তাদের অধিকাংশই পাপিষ্ঠ।

اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا

এই দূরাত্মা কাফেররা শুধু যে মুসলমানদের প্রতি জুলুম অত্যাচার করে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং প্রতারণা করে তাই নয়;

اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ

বরং আল্লাহ্র আয়াত সমূহের বিনিময়ে হীন মূল্য গ্রহণ করে এবং মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে। যারা পার্থিব স্বার্থের লোভে আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহকে বিক্রয় করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেনা, যারা পথভ্রষ্ট আদর্শচ্যুত, এমনকি অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করতে সচেষ্ট, অন্যদেরকে সরল সঠিক পথ থেকে বাধা দিতে থাকে তৎপর, তাদের ব্যাপারে অংগীকার রক্ষা করার আশা বৃথা। তারা দ্বীনের বদলে দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়েছে

وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ

আর তারাই সীমালংঘনকারী, ভদ্রতা, নম্রতা, উদারতা, আত্মীয় স্বজনের প্রতি মায়ামমতা, সত্যবাদীতা এসবই মানবিক গুণাবলী, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই এ সব গুণাবলী পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এই দুরাত্মা কাফেরদের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধনের কোন অনুভূতি নেই এবং তাদের নিজেদের কৃত অংগীকারের প্রতিও তাদের ভ্রুক্ষেপ নেই, তাই তারা সীমালংঘনকারী।

তফসীরকারগণ বলেছেন এ আয়াত মক্কার কোরাইশ সর্দারদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। যারা দুনিয়ার হীন স্বার্থের বশীভূত হয়ে পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা থেকে বিমুখ হয়েছে শুধু তাই নয় বরং তারা অন্যদেরকে দ্বীন ইসলাম গ্রহণে বাধা দিয়েছে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী আলেম বলেছেন, যে এ আয়াত নাজিল হয়েছে ইহুদীদের সম্পর্কে। কেননা তারা তৌরাতের আয়াত সমূহকে হীনও তুচ্ছ স্বার্থের বিনিময়ে বিক্রয় করতো এবং মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দিত তাদের পথভ্রষ্টতার এবং অন্যায় অনাচারের কোন সীমা ছিলনা তাই এরশাদ হয়েছে তারা সীমালংঘনকারী।[১]

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৫, পৃষ্ঠা-২৩১

তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রহঃ), খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৯০

وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক দ্বীনের ব্যাপারে যে সীমা নিদৃষ্ট করে দিয়েছেন তা তারা লংঘন করেছে এবং প্রতিশ্রুতি ও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য ঘোষণা করেছেন কিন্তু তারা সে কর্তব্য পালন করেনি, তাই তারা সীমালংঘনকারী।

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا
الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ ؕ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝١١
وَاِنْ نَّكَثُوْۤا اَيْمَانَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ
فَقَاتِلُوْۤا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ اِنَّهُمْ لَاۤ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ۝١٢
اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْۤا اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَ
هُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ اَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ
اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝١٣

তরজমা

(১১) অতঃপর তারা যদি তওবা করে নামাজ কায়েম করে, জাকাত আদায় করে তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই, আর জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি নির্দেশ সমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করি।

(১২) আর যদি অংগীকারাবদ্ধ হওয়ার পরও তারা প্রতিশ্রুতি ভংগ করে এবং তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে কলংক আরোপ করে তবে কাফেরদের প্রধানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর তাদের প্রতিজ্ঞা যে কিছুই নয়।

(১৩) তোমরা কি সেই সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করবে না? যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভংগ করেছে, রসূলকে বহিস্কারের সংকল্প করেছে, তারাই সর্ব প্রথম

তোমাদের সাথে শত্রুতার সূত্রপাত করেছে, তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর? অথচ আল্লাহ পাককেই তোমাদের সর্বাপেক্ষা ভয় করা উচিত যদি তোমরা মোমেন হও।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে সে সব লোকদের কথা বলা হয়েছে যারা মোমেনদের ব্যাপারে আত্মীয়তার বন্ধনের প্রতি লক্ষ্য রাখেনা এবং যারা তাদের কৃত অংগীকার ভংগ করে এবং সীমা লংঘন করে। আলোচ্য আয়াতে সে সব লোকের কথা বলা হয়েছে যারা এমন অন্যায় আচরণ থেকে তওবা করে নামাজ কায়েম করে ও জাকাত আদায় করে এরশাদ হয়েছে, যদি তারা তওবা করে যাবতীয় অন্যায় আচরণ পরিহার করে এবং নামাজ কায়েম করে তথা আল্লাহ পাকের হক আদায় করে আর জাকাত আদায় করে তথা বন্দার হক আদায় করে

فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ

তাহলে তারা হবে তোমাদের দ্বীনি ভাই, তারা যদি পূর্বোল্লিখিত শর্ত সমূহ পালন করে তবে তারা হবে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ এবং ইসলামী সংহতির অন্তর্ভূক্ত। মুসলমান হিসেবে তারা লাভ করবে সকল অধিকার এবং সম্মান, আর তাদের অতীতের সকল গুণাহ মাফ করা হবে।

وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

(আর জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি নির্দেশ সমূহ সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করি।) আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, যারা মুসলমানদের সংগে চুক্তি করেছে এবং যারা যাবতীয় অন্যায় আচরণ থেকে তওবা করেছে তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত বিধি-নিষেধের উপর চিন্তা করতে অনুপ্রাণিত করার জন্যেই স্বতন্ত্রভাবে এই বাক্যটি উচ্চারণ করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এই আয়াত আহলে কেবলাকে হত্যা করা হারাম করে দিয়েছে অর্থাৎ কোন দল বা গোষ্ঠি যদি কাবা শরীফের দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করে তাদের হত্যা করা জায়েজ নয়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, তোমাদেরকে নামাজ এবং জাকাতের আদেশ দেয়া হয়েছে যে ব্যক্তি জাকাত আদায় না করবে তার নামাজও গ্রহণযোগ্য নয়।

ইমাম বোখারী (রঃ) হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ)–এর হাদীস সংকলিত করেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এন্তেকালের পর যখন হযরত আবু বকর (রাঃ) খলিফা নিযুক্ত হলেন এবং যাকাত আদায়ে অস্বীকৃতি জানিয়ে যারা ইসলামকে অস্বীকার করলো তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) এমন মোরতাদদের বিরুদ্ধে জেহাদের ইচ্ছা করলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তখন বলেছিলেন, আপনি এই লোকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে ইচ্ছা করেছেন অথচ হযরত রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ "আমাকে মানুষের বিরুদ্ধে জেহাদ করার হুকুম প্রদান করা হয়েছে ততক্ষন পর্যন্ত, যতক্ষন তারা "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু" বলতে রাজী না হয়। যখন তারা কলেমায়ে তওহীদকে মেনে নেয় তখন তাদের জানমাল আমার তরফ থেকে সংরক্ষিত থাকবে। (তবে হক্কুল এবাদের ব্যাপারে সংরক্ষিত থাকবে না) আর মানুষের আন্তরিকতা বা মোনাফেকীর হিসাব আল্লাহ পাকের দায়িত্বে।" হযরত আবু বকর (রাঃ)–এর জবাবে বলেছেন যে ব্যক্তি নামাজ এবং জাকাতের ব্যাপারে পার্থক্য করবে আল্লাহর শপথ! আমি তার সাথে লড়াই করবো। জাকাত হলো সম্পদের হক (অর্থাৎ মালি এবাদত)

যদি লোকেরা একটি বকরির বাচ্চাও (হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে) আদায় করতো আর এখন আদায় না করে তবে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আল্লাহ পাক এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য হযরত আবু বকর (রাঃ)–এর মনের কপাট খুলে দিয়েছিলেন। (তখন আমি বুঝতে পরিনি) পরে উপলব্ধি করেছি ঐ সিদ্ধান্তই ছিল ঠিক। হযরত আনাস এবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন হযরত রসূলুল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে আমাদের ন্যায় নামাজ আদায় করে এবং আমাদের কেবলার দিকে মুখ করে এবং আমাদের জবেহ করা প্রাণীর গোশত খায় সে মুসলমান, যার দায়িত্ব আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূলের।[১]

তফসীরকারগণ বলেছেন যদি কোন কাফের কুফুরি থেকে তওবা করে এবং সকল অন্যায় আচরণ পরিহার করে ইসলামী আদর্শের অনুসরণ করে তবে সে মুসলমান হিসেবে পরিগণিত হবে, কিন্তু যদি কোন লক্ষণ এমন দেখা যায় যে তার ইসলামের দাবী শুধু মৌখিক, আন্তরিক নয়, লৌকিক বাস্তবিক নয় এমন অবস্থায় প্রকাশ্যে তাকে মুসলমান বলে গণ্য করা হলেও অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা অনুচিত।[২]

وَإِنْ نَّكَثُوٓا أَيْمَانَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড–৪, পৃষ্ঠা–১৯২

২। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা–২৪৪

আর যদি তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে তথা যদি সন্ধি ভংগ করে যেমন ৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ায় যে সন্ধি হয়েছিল তারপর বনু বকর গোত্র বনু খোজাআ গোত্রের প্রতি আক্রমন করে এবং কেরাইশরা এ ব্যাপারে বনু বকরকে সাহায্য করার মাধ্যমে বিশ্বাসঘাতকতা করে শুধু তাই নয় বরং তারা ইসলামের উপর কলংক আরোপ করতেও দ্বিধাবোধ করেনি, এমন লোকদেরকে রেহাই দিতে নেই বরং তাদের দলীয় প্রধানদের বিরুদ্ধে পূর্ন উদ্যেম এবং শক্তিতে যুদ্ধ করা তখন কর্তব্য হয়ে পড়ে, কেননা যারা অংগীকার ভংগ করে এবং তোমাদের দ্বীনকে বিদ্রুপ করে এবং দ্বীন ইসলামকে মিথ্যাজ্ঞান করে এমন লোকদের শাস্তি বিধান একান্ত জরুরী।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন এ আয়াত দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, যারা প্রকাশ্যে দ্বীন ইসলামের বিরোধীতা করে বা সমালোচনা করে তাদের সঙ্গে মুসলমানদের চুক্তি বহাল থাকেনা, কেননা এটি চুক্তি বিরোধী কাজ।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এই আয়াতের তফসীরে লিখেছেন যদি কেউ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে গাল মন্দ দেয় (নাউজুবিল্লাহ) বা দ্বীন ইসলামের দোষত্রুটির অন্বেষণ করে তথা দ্বীন ইসলামের ব্যাপারে অপমানজনক কথা বলে তবে তাদেরকে হত্যা করার বিধান রয়েছে। আর এমন অবস্থায় তাদের শপথ গ্রহণযোগ্য হয়না।[১]

فَقَاتِلُوٓا۟ أَئِمَّةَ ٱلْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَٰنَ لَهُمْ

অতএব, তোমরা কাফের প্রধানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। কেননা কাফেরদের অঙ্গীকার বা প্রতিজ্ঞার কোন গুরুত্বই নেই। এতে একথা প্রমাণিত হয়, যারা কুফর ও নাফরমানীর নেতৃত্ব দেয় তারা অমার্জনীয় অপরাধ করে। অতএব, তাদের হত্যা করাই যৌক্তিযুক্তি।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, কাফের প্রধান বলতে এখানে মোশরেকদের সরদারদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে অর্থাৎ তদানীন্তন মক্কাবাসী মোশরেকদের সরদারদের সম্পর্কে এই বাক্য উচ্চারিত হয়েছে। কেননা অন্যরা তাদের অনুসরণ করেই পথভ্রষ্ট হতো তাই, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার গুরুত্ব ছিল অত্যন্ত বেশী।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এই আয়াত নাজিল হয়েছে আবু সুফিয়ান এবনে হারব, হারেস এবনে হেসাম, হোসায়েল এবনে আমর, একরামা এবনে আবু জেহেল এবং অন্যান্য কোরায়েশদের সম্পর্কে। যারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিল, আর এরাই মুসলমানগণকে মক্কা শরীফ থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য করেছিল।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৯, প্রষ্ঠা-৩৭

إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ

অর্থাৎ–যখন তারা চুক্তি ভঙ্গ করেছে তখন চুক্তির শর্ত পালন করা তোমাদের উপরও কর্তব্য নয়।

لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ

হয়ত তারা বিরত হবে।

জেহাদের উদ্দেশ্য

কাফের মোশরেকদের সঙ্গে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য হলো তারা যেন শেরক থেকে বিরত হয় এবং মহান স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে প্রস্তুত হয়।

এখানে একথা স্মরণযোগ্য যে, যারা জালেম তদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য হলো মানুষের প্রতি জুলুম অত্যাচার করা। আর যারা রাজা বাদশাহ তাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য হলো মানুষের অর্থ–সম্পদ গ্রহণ করা। কিন্তু ইসলামী জেহাদের উদ্দেশ্য মানুষের প্রতি জুলুম অত্যাচার করা বা অর্থ–সম্পদ সংগ্রহ করা নয়; বরং আল্লাহর দ্বীন কায়েম করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা, বিশ্বমানবের কল্যাণসাধন করা, মানুষকে অন্যায় অসুন্দর পথ থেকে বিরত রাখা।

أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফের প্রধানদের সঙ্গে যুদ্ধ করার আদেশ ছিল, আর এই আয়াতে অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদের সাথে যুদ্ধ করতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ তোমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না? যারা তাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছে, যারা আল্লাহর রসূলের দেশত্যাগের ব্যাপারে ষড়যন্ত্র করেছে তারাই তোমাদের সাথে সর্ব প্রথম শত্রুতার সূত্রপাত করেছে তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর? অথচ তোমাদের সর্বাপেক্ষা অধিকতর ভয় করা উচিত আল্লাহ পাককে, যদি তোমরা প্রকৃত মোমেন হও।

এখানে যে কয়েকটি কথা বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য তা হলোঃ

(১) মক্কার কাফেররা সন্ধি ভঙ্গ করে বনু বকর গোত্রকে বনু খোজাআ গোত্রের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছে।

(২) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পরে হিজরত পর্যন্ত সুদীর্ঘ ১৩টি বছর তিনি মক্কায় অতিবাহিত করেন এ সময় তাঁর এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামের প্রতি কাফেররা যে অকথ্য নির্যাতন করে তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। তাদের সে জুলুম অত্যাচারের কারণেই তাঁকে এবং সাহাবায়ে কেরামকে হিজরত করতে হয়।

(৩) মুসলমানদের সঙ্গে শত্রুতার এবং জুলুম অত্যাচারের সূত্রপাত সর্ব প্রথম তারাই করে।

(৪) আবু সুফিয়ানের বানিজ্যিক কাফেলা যখন নিরাপদে মক্কায় ফিরে আসে তখন যুদ্ধ করার আর কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু দম্ভ ও অহংকারের প্রতীক আবু জেহেল ও তার সঙ্গীরা যুদ্ধ করার জন্যে বদরের রণাঙ্গনে হাজির হয়; অথচ মুসলমানগণ এ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। নিরস্ত্রপ্রায় মুসলমানদেরকে হামলাকারী কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়।

(৫) ৬ষ্ঠ হিজরীতে অনুষ্ঠিত হোদাইবিয়ার চুক্তিও তারাই ভঙ্গ করে।

এমনি অবস্থায় প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অষ্টম হিজরীতে মক্কা অভিযান করেন। তাঁর সঙ্গী ছিলেন দশ হাজার সাহাবায়ে কেরাম। অথচ আট বছর পূর্বে কাফেরদের দ্বারা নির্যাতীত অবস্থায় রাতের অন্ধকারে এক মাত্র সাথী হযরত আবু বকর (রাঃ)–কে নিয়ে এই মক্কা শরীক থেকে তাঁকে হিজরত করতে হয়। আর আট বছর পর আল্লাহ পাক তাঁকে মক্কা বিজয় দান করেন। তাই এ আয়াতে আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

পবিত্র কোরআনের আলোচ্য আয়াতে এই শিক্ষা রয়েছে যে, যখনই প্রথিবীতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এমন কার্যক্রম কেউ গ্রহণ করবে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা মুসলমানদের একান্ত কর্তব্য হয়ে পড়বে। এই পর্যায়ে কোন প্রকার দুর্বলতা বা কাপুরুষতার পরিচয় দেয়া যাবে না।

শত্রুপক্ষের অস্ত্র সম্ভার বা যুদ্ধ সামগ্রী যত বেশীই হোকনা কেন বা তাদের ধন বল জন বল যত বেশীই থাকুকনা কেন মুসলমানদেরকে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে হবে। কেননা জয় পরাজয় আল্লাহর হাতে। শক্তির মুল উৎস স্বয়ং আল্লাহ পাক। তিনি যাকে শক্তিশালী করেন এবং তিনি যাকে বিজয় দান করেন সে–ই বিজয়ী হয় তাই পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ পাক এই প্রশ্ন উথাপন করেছেন।

أَتَخْشَوْنَهُمْ

তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর?

فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ

অথচ তোমাদের সর্বাপেক্ষা অধিকতর ভয় করা উচিত আল্লাহ পাককে যদি তোমরা প্রকৃত মোমেন হও।

বস্তুতঃ যে প্রকৃত মোমেন সে আল্লাহ পাক ব্যতীত কাউকে ভয় করে না। কেননা যখন মর্দে মোমেনের অন্তরে আল্লাহর ভয় সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তখন সকল ভয় মোমেনের অন্তর থেকে দূরীভূত হয়। এমন অবস্থায় মানুষ ভয় করে আল্লাহর নাফরমানীকে, আত্মরক্ষা করে আল্লাহর নাফরমানী থেকে। অতএব, জয় পরাজয়, জীবন ও মৃত্যু যখন সবই আল্লহর হাতে তাই আল্লাহ পাকের প্রতি অটুট বিশ্বাস মানুষকে অন্য কিছুর ভয় থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

এখানে এ প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে যে, ইতিপূর্বে যে সব জাতি পৃথিবীতে আল্লাহর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়েছে আল্লাহ পাক তাদের হেদায়েতের জন্যে যুগে যুগে নবী রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। কিন্তু তারা নবী রসূলগণের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছে তখন আল্লাহ পাক তাদেরকে কোপগ্রস্থ করেছেন। এভাবে সত্য ও ন্যায়ের দুশমনদের মূলোৎপাটন করা হয়েছে। মক্কার কাফেররা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের প্রতি প্রায় এক যুগেরও বেশী সময় যাবৎ জুলুম অত্যাচার করেছে, তাদের শাস্তি বিধানের জন্যে আসমানী গজব কেন আসলনা? এর জবাবে তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন:

(১) পূর্ববর্তী উম্মতদের ন্যায় আল্লাহ পাক মক্কার কাফেরদেরকে নিপাত করার ইচ্ছা করেননি, বরং তাঁর প্রিয় বন্দাদের দ্বারা তাদের শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করেছেন।

(২ আল্লাহ পাক ইসলামের দুশমনদেরকে প্রকাশ্যে অপমানিত করার ইচ্ছা করেছেন।

(৩) আল্লাহর প্রিয় বান্দাদেরকে তাদের দুশমনদের বিরুদ্ধে বিজয় দান মঞ্জুর করেছেন।

(৪) যারা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়েছেন তাদেরকে আল্লাহ পাক সান্তনা দিতে চেয়েছেন।

(৫) দুশমনের পরাজয় দেখে মুসলমানদের ক্রোধ দূরীভূত হবে কেননা কাফেররা মুসলমানদেরকে নির্যাতন উৎপীড়নের মাধ্যমে ব্যথিত মর্মাহত করেছে, এখন বিজয় লাভের মাধ্যমে মুসলমানদের সে কষ্ট দূরীভূত হতে পারে।

(৬) আল্লাহ পাক চেয়েছিলেন যেন সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং মুসলমানদের বিজয় এবং প্রধান্য সুস্পষ্ট হয় যাকে দেখে অন্যরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র থেকে বিরত থাকতে পারে।[১]

এই আয়াত সম্পর্কে আল্লাম সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন এই আয়াত মদীনা শরীফের কাফেরদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। কেননা এই সূরা তাবুকের যুদ্ধের পর অবতীর্ণ হয়েছে আর তখন মক্কাবাসী মুসলমান হয়েছিল।[২] আর মদীনা শরীফের ইহুদী মোনাফেক তথা কাফেররা মদীনা শরীফ থেকে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বহিস্কার করার ষড়যন্ত্র করেছিল, কিন্তু সফল হয়নি।[৩] এ আয়াত সম্পর্কে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এই আয়াত দ্বারা এ কথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, প্রকৃত মোমেনের কর্তব্য হলো শুধু এক আল্লাহ পাককে ভয় করা; এবং আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে ভয় না করা।

---

(১) তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৯৫

২। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৫, পৃষ্ঠা-১৯২

৩। তফসীরে মাজেদী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৯৪

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَ
يُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٤﴾
وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ ۗ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ
عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٥﴾ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ
جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا
الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً ۗ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٦﴾

তরজমা

(১৪) তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর আল্লাহ পাক তোমাদের হাতেই তাদেরকে শাস্তি দেবেন এবং অপমানিত করবেন। তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে বিজয় দান করবেন এবং মোমেনদের হৃদয়কে প্রশান্ত করবেন।

(১৫) আর তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন, আর আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তার প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হন। আল্লাহ পাক সব কিছু জানেন, তিনি সুক্ষ্ম জ্ঞানী।

(১৬) তোমরা কি মনে কর আল্লাহ পাক তোমাদেরকে এমনিই ছেড়ে দেবেন? অথচ তিনি এ পর্যন্ত এ কথা প্রকাশ করেননি যে, তোমাদের মধ্যে কে মুজাহেদ? এবং কে আল্লাহ পাক, তাঁর রসূল ও মোমেনগণ ব্যতীত অন্য কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেনি? আর আল্লাহ পাক তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে মুসলমানদেরকে জেহাদের জন্যে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আর এ আয়াতে জেহাদের নির্দেশ প্রদান করে এ সু-সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ পাক মোমেনদের অন্তরকে প্রশান্তি দান করবেন বিজয় দানের মাধ্যমে এবং কাফেরদেরকে অপমানিত করবেন পরাজিত করার মাধ্যমে। এরশাদ হয়েছেঃ হে মোমেনগণ! তোমরা কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ কর আল্লাহ পাক তোমাদের হাত দিয়েই তাদেরকে শাস্তি দিবেন এবং তাদেরকে অপমানিত করবেন।

এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় এই যে, যুদ্ধের কারণে কাফেরদের হত্যা করা হয় অথবা বন্দী করা হয়, আর এ কাজকে আল্লাহ পাক আযাব বলে অভিহিত করেছেন। কেননা, কাফেরদের আযাব অবশ্যম্ভাবী। সে আযাব দুনিয়াতেও হতে পারে এবং আখেরাতে তো অবশ্যই হবে। আর আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হলে দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জাহানেই হবে।

তফসীরকারগণ এ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, পবিত্র কোরআনে অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ

" আর হে রসূল! আপনি যতক্ষণ তাদের মাঝে রয়েছেন আল্লাহ পাক তাদেরকে আযাব দিবেন না" অথচ এ আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক তোমাদের হাত দিয়ে তাদেরকে আযাব দেবেন।

এ প্রশ্নের জবাবে তফসীরকারগণ বলেছেনঃ

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ

এ আয়াতে যে আযাবের কথা বলা হয়েছে তা হলো– সেই আযাব যা কোন জাতির মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে আসমান থেকে নাজিল হয়েছে, যেমন ইতিপূর্বে আদ জাতি, সামুদ জাতি এবং ফেরাউনের জাতিকে চিরতরে ধ্বংস করা হয়েছে। কখনও শিলা বৃষ্টি, কখনও বজ্র গর্জন অথবা সমুদ্রে নিমজ্জিত করার মাধ্যমে অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ জাতিগুলোর প্রতি আযাব হয়েছে এবং সমগ্র জাতি এই আযাবে নিপতিত হয়েছে। যে পাপিষ্ঠ, আর যে পাপিষ্ঠ নয় সকলেই কোপগস্থ হয়েছে।

কিন্তু আলোচ্য আয়াতে যে আযাবের কথা বলা হয়েছে তা সামগ্রিক ভাবে সকলের জন্যে আযাব নয়; বরং যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসে বা যারা মুসলমানদের উপর হামলায় উদ্যত হয় তাদেরকে হত্যা বা বন্দী করা হয়। যারা হামলায় উদ্যত হয়না তারা এ আযাব বা শাস্তির অন্তর্ভূক্ত হয় না।[১]

১। তফসীরে কবীর, খন্ড–১৬, পৃষ্ঠা–৩

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আবু শেখ (রঃ) কাতাদা (রঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ আয়াত নাজিল হয়েছে বনু খাজাআ গোত্রের ব্যাপারে যারা মক্কায় বনু বকর গোত্রের লোকদের হত্যা করেছিল। একরামাও এ কথাই বলেছেন।

সুদ্দী (রঃ)ও এ মতই পোষণ করেছেন। বনু বকরকে হত্যার কারণে বনু খাজাআ গোত্র হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ করেছিল।

وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ

কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে আল্লাহ পাক তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দিবেন, তাদেরকে অপমানিত করবেন, তোমরা তাদেরকে হত্যা করবে, বন্দী করবে, গোলাম বাঁদী বানাবে এবং আল্লাহ পাক তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন। আর যখন মুসলমানগণ কাফেরদের উপর বিজয় লাভ করবে তখন তাদের হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ করবে এবং কাফেররা যুগে যুগে মুসলমানদের প্রতি নির্যাতনের কারণে মুসলমানদের মনে যে ব্যথা বেদনা ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হয়ে আছে তা বিজয় লাভের কারণে দূরীভূত হবে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ط

অর্থাৎ-তোমরা দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর আল্লাহ পাক তোমাদেরকে সাহায্য করবেন, ফলে তোমরা বিজয় লাভ করবে। আর তোমরা যখন দুর্বল ছিলে তখন কাফেররা তোমাদের প্রতি অকথ্য নির্যাতন করেছিল তোমাদের মনের সে ব্যথা দুশমনদের উপর বিজয় লাভের মাধ্যমে দূরীভূত হবে।

وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

আর আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে তওবা করার তৌফিক দান করেন। আর আল্লাহ পাক অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। তাঁর প্রতিটি কাজ হেকমতপূর্ণ, তাৎপর্যবহ।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে এ ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে কিছু লোক কোফর ও নাফরমানী থেকে তওবা করবে এবং আল্লাহ পাক তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের তওফিক দান করবেন। যেমন আবু সুফিয়ান, একরামা এবনে আবু জেহেল, সোহায়েল এবনে আমর প্রমুখ কোরায়েশ নেতা ইসলাম গ্রহণ

করেছিলেন। এমনিভাবে হযরত খালেদ এবনে ওয়ালিদ (রাঃ), হযরত আমর এবনে আস (রাঃ) সহ আরো বহু সাহাবায়ে কেরাম তওবা করে ইসলাম গ্রহণে ধন্য হয়েছেন। এ আয়াতে মুসলিম জাতিকে জেহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করে এরশাদ হয়েছেঃ যদি তোমরা নিজেদেরকে বিজয়ী ও সফলকাম দেখতে চাও এবং কাফের ও মোশরেকদেরকে অপমানিত লাঞ্ছিত অবস্থায় দেখতে ইচ্ছা কর তবে তোমাদের কর্তব্য হলো কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদে আত্মনিয়োগ করা। যারা একদিন তোমাদের প্রতি জুলুম অত্যাচার করেছে, তোমাদেরকে উপহাস করেছে আজ তোমাদের হাতেই যখন তারা লাঞ্ছিত অপমানিত হবে, তখন তারা সমুচিত শিক্ষা লাভ করবে। অত্যাচারীদের অপমান এবং দুর্দশা দেখে উৎপীড়িত অত্যাচারিতদের মনের কষ্ট দূর হবে এবং তারা এর দ্বারা শিক্ষা লাভ করে আত্মসংশোধনে সচেষ্ট হতে পারবে।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ

পূর্ববর্তী আয়াতে জেহাদের জন্যে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। আর এ আয়াতে জেহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য বর্ণনা করে জেহাদের ব্যাপারে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে।

মূলতঃ জেহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো খাঁটি এবং কৃত্রিমের মধ্যে পরীক্ষা করা। কে প্রকৃত, খাঁটি নির্ভেজাল মোমেন, আর কে কৃত্রিম এবং ভেজাল–এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় জেহাদের মাধ্যমে। যারা আল্লাহ পাকের প্রতি এবং তাঁর প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করে তাদেরকে জেহাদের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। আল্লাহর রাহে আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়ে নিজের খাঁটি নির্ভেজাল এবং পরিপূর্ণ ঈমানের কথা প্রমাণ করতে হয়, শুধু তাই নয়, বরং কথা আরো আছে এ কথাও পরীক্ষিত হয় যে, কে আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং মুসলমানদের ব্যতীত অন্য কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে না। এদিকে জেহাদ একটি কঠিন পরীক্ষা। আত্মত্যাগের এবং আত্মোৎসর্গের এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া মর্দে মোমেনের কর্তব্য। তাই যে আল্লাহ –প্রেমিক, যে প্রকৃত মর্দে মোমেন তার জীবন–যাত্রা নিস্কন্টক নয়; বরং তাকে প্রতি পদক্ষেপে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। কেননা, প্রেমের পথ আদৌ নিস্কন্টক নয়, বরং এখানে প্রতি প্রতি পদক্ষেপেই বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ পরীক্ষা অব্যাহত থাকে, তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ

অর্থাৎ–তোমরা কি এ কথা মনে করেছ যে এমনি ছাড় পেয়ে যাবে? অথচ আল্লাহ পাক প্রকাশ্য ভাবে জানবেন না যে তোমাদের মধ্য থেকে কে মুজাহেদ আর কে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল ও মোমেন ব্যতীত অন্য কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেনি?

وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

আর আল্লাহ পাক তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল অর্থাৎ আল্লাহ পাক তোমাদের নিয়ত তথা উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, কোন কোন মুসলমান যখন জেহাদকে কঠিন মনে করেন তখন আলোচ্য আয়াতে তাদেরকে সম্বোধন করে এ বক্তব্য পেশ করা হয় যাতে করে তারা আত্ম সংশোধনে প্রয়াসী হয়।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে মোনাফেকদেরকে এবং তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদেরকে মোমেন হওয়ার দাবীদার হওয়ার পর এমনি ছেড়ে দেয়া হবেনা, বরং জেহাদের আদেশের মাধ্যমে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে। এ পরীক্ষার তথা রণাঙ্গনে বাতিলের বিরুদ্ধে জেহাদে যারা শরীক হবে তারাই প্রকৃত মোমেন বলে প্রমাণিত হবে। আর যারা জেহাদের এ কঠিন পরীক্ষায় নিজেকে উত্তীর্ণ করতে পারবে না,তারা প্রকৃত মোমেন বলে প্রমাণিত হবে না।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমার উম্মতে এমন একদল লোক সর্বদা থাকবে যারা আল্লাহর বিধান সমূহ কায়েম করবে। যদি কেউ তাদের সাহায্য না করে এবং তাদের বিরোধীতা করে তবুও তাদের কোন ক্ষতি হবে না (অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাদের সাহায্যকারী হবেন কেউ তাদের বিরোধীতা করে কোন ক্ষতি করতে পারবে না) তারা এ অবস্থায়ই থাকবে। এমনকি, অবশেষে কেয়ামত কায়েম হবে। এ হাদীস বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে। হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ)ও এ হাদীস বর্ণনা করেছেন যা এবনে মাজাহ শরীফে সংকলিত হয়েছে।

এ হাদীস হযরত ওমর (রাঃ) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। হাকেম তার উদ্ধৃতি দিয়েছেন তবে এ বর্ণনার শেষ বাক্যগুলো হলো, আমার উম্মতের একদল সর্বদা হক্বের উপর কায়েম থাকবে। এমনকি, অবশেষে কেয়ামত আসবে অর্থাৎ কেয়ামত পর্যন্ত সর্বদা একদল লোক সত্যের উপর কায়েম থাকবে।[১]

কোন কোন তফসীরকার আলোচ্য আয়াতের এ অর্থও বর্ণনা করেছেন, তোমরা এ কথা মনে করো না যে, ইসলামের কথা প্রকাশ করলেই তোমরা আল্লাহ পাকের

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড–৫, পৃষ্ঠা–১৯৬
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড–১১, পৃষ্ঠা–৩৮

নিকট মুসলমান হিসেবে পরিগণিত হয়ে যাবে, বরং তোমাদের পরীক্ষা করা হবে, আর সর্বোত্তম পরীক্ষা হলো জেহাদ। যখন মানুষ আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য তাঁর রসূলের অনুসরণে স্বীয় আত্মীয়-স্বজন এবং নিজের সমাজ ও জাতির বিরুদ্ধে জেহাদ করে তখন তার পরীক্ষা হয়ে যায়।

وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

আর আল্লাহ পাক তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব বিষয় সম্পর্কেই সম্পূর্ণ অবগত। কিন্তু মোমেনদের নিকট তোমাদের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করার নিমিত্তেই এ পরীক্ষার ব্যবস্থা। আল্লাহ পাক তোমাদের সব বিষয়ে অবগত, তোমাদের পরীক্ষা করার তাঁর কোন প্রয়োজন নেই।[১]

আল্লামা আলূসী (রঃ) এ আয়াতটির ব্যাখ্যায় লিখেছেন আল্লাহ পাক তোমাদের যাবতীয় কৃত কর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, তোমরা যেমন কাজ করবে তেমন ফল পাবে। যদি ভাল কাজ কর তবে ভাল ফল পাবে, যদি মন্দ কাজ কর তবে পরিণামও মন্দ হবে।[২]

---

(১) তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৯২

২। তফসীরে রুহুল মাআনী, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-৬৪

مَا كَانَ
لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ؕ
اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۚۖ وَفِى النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿۱۷﴾ اِنَّمَا يَعْمُرُ
مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَ
اٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰۤى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ
الْمُهْتَدِيْنَ ﴿۱۸﴾ اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجٰهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ لَا
يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۹﴾
اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ
وَاَنْفُسِهِمْ ۙ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿۲۰﴾

তরজমা

(১৭) আল্লাহ পাকের মসজিদ আবাদ করা মোশরেকদের কাজ নয়। তারা নিজেরাই নিজেদের কুফরী স্বীকার করে, তারাই সে সব লোক যাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়েছে, আর তারা চিরদিন দোজখে থাকবে।

(১৮) আল্লাহর মসজিদ তো শুধু সেই ব্যক্তিই আবাদ করে যে ঈমান আনে আল্লাহ পাকের প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি এবং নামাজ কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কাউকে ভয় করেনা, তাদের সম্পর্কেই আশা করা যায় যে তারা হবে হেদায়েতপ্রাপ্ত লোকদের অর্ন্তভূক্ত।

(১৯) যারা হাজীদেরকে পানি সরবরাহ করে এবং মসজিদে হারামের দেখাশোনা করে তোমরা কি তাদেরকে তার সমতূল্য মনে করেছো? যে আল্লাহ পাকের প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান আনে এবং আল্লাহর রাহে জেহাদ করে আল্লাহ পাকের নিকট তারা সমান নয়, আর আল্লাহ পাক জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।

(২০) যারা ঈমান এনেছে হিজরত করেছে নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর রাহে জেহাদ করেছে, আল্লাহ পাকের দরবারে রয়েছে তাদের উচ্চ মর্যাদা, আর (জীবন সাধনায়) তারাই সফলকাম।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

এ সূরার শুরুতে মোশরেকদের ব্যাপারে আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টি এবং মুসলমানদের সাথে যাবতীয় সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এরপর তাদের অন্যায় আচরণের কিছু বিবরণ পেশ করা হয়েছে যাতে করে একথা সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে তাদের অন্যায় আচরণই তাদের সম্পর্কে এ চরম সিদ্ধান্তের কারণ। এতে একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে আল্লাহ পাকের দরবারে এই নাফরমানদের কোন স্থান নেই। তখন মক্কার মোশরেকরা নিজেদের ফজিলত এবং মর্তবা প্রমাণ করার জন্য স্বদম্ভে বলতে লাগলো, আমাদের মধ্যে অনেক গুণাবলী রয়েছে এবং আমরা অনেক ভাল কাজও করে থাকি। মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় হজ্জের জন্য যারা আগমন করে আমরা তাদের খেদমতে নিয়োজিত হই এবং তাদেরকে পানি সরবরাহ করি। মসজিদে হারামের মেরামতের কাজ, তার দেখাশোনাও আমরা করে থাকি। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।১

এ আয়াতে মক্কার কাফেরদের আস্ফালনের জবাব দেয়া হয়েছে যে তোমাদের এসব কাজ তখন গ্রহণযোগ্য হবে যখন তোমরা ঈমান আনবে। যেহেতু তোমরা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করনা সেজন্য তোমাদের এসব কাজের কোন গুরুত্বনেই।

শানে নজুল

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের শানে নজুল সম্পর্কে লিখেছেনঃ

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত আব্বাস (রাঃ) যখন বদরের যুদ্ধে বন্দী হয়ে আসেন তখন মুসলমানগণ তাকে কাফের থাকার কারণে বিশেষত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এত নিকট আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও ঈমান না আনার কারণে লজ্জা দেন। হযরত আলী (রাঃ) এ পর্যায়ে অত্যন্ত

(১) তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৯৮

তফসীরে কবীর, খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-৬

কঠোর ভাষা ব্যবহার করেন। তখন হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, তোমরা শুধু আমাদের মন্দ আচরণের কথাই উল্লেখ কর আমাদের দোষত্রুটির বিবরণই দিতে থাক, আমাদের গুণাবলীর কথা কেন উল্লেখ করনা? হযরত আলী (রাঃ) বললেন, তোমাদের মধ্যে কোন গুণ আছে কি? জবাবে হযরত আব্বাস (রাঃ) বললেন, আমরা মসজিদুল হারামের মেরামত কাজ সুসম্পন্ন করি, আমরা কাবা শরীফের দেখাশোনা করি এবং হাজীদেরকে পানি সরবরাহ করি। হযরত আব্বাস (রাঃ)–এর এই বক্তব্যের বাতুলতা ঘোষণা করে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে।১

এরশাদ হয়েছেঃ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللهِ

আল্লাহর ঘর মসজিদ আবাদ করা মোশরেকের কাজ নয়। যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করেনা তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেনা, তাদের মসজিদের খেদমত করা বা তাকে আবাদ করার কোন অধিকার নেই। মসজিদ পবিত্র স্থান যারা মোশরেক তারা অপবিত্র, তাই কোন মোশরেকের মসজিদে প্রবেশও নিষিদ্ধ।

মসজিদ আবাদ করার তাৎপর্য্য

আলোচ্য আয়াতে মসজিদ আবাদ করার তাৎপর্য কি? অধিকাংশ তফসীরকারগণের মতে, মসজিদ আবাদ করার তাৎপর্য হল মসজিদে আল্লাহ পাকের এবাদত করা। কাফের মোশরেকরা যেহেতু আল্লাহ পাকের একত্ত্ববাদে বিশ্বাসই করেনা তাই মসজিদে তাদের কোন উপাসনা করার অধিকারই নেই।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, মসজিদ আবাদ করার প্রকাশ্য অর্থই এখানে উদ্দেশ্য অর্থাৎ মসজিদ নির্মাণ বা মেরামত করা। কাফেরকে এই কাজের অনুমতিও দেয়া হবেনা, যদি সে এমন কাজের ইচ্ছা করে তবে তাকে বিরত রাখা হবে। আর যদি সে মসজিদ নির্মাণের ব্যাপারে কোন প্রকার ওসিয়ত করে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তবে তার এই ওসিয়তের উপর আমল করা হবেনা। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে মসজিদ আবাদ করার অর্থ হলো মসজিদে প্রবেশ করা এবং মসজিদে উপবেশন করা।

ইমাম আহমদ, তিরমীজি, এবনে হাব্বান এবং হাকেম হযরত আবু সাইদ খুদুরী (রাঃ)–এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড–৫, পৃষ্ঠা–১৯৬
তফসীরে কবীর, খন্ড–১৬, পৃষ্ঠা–৭
তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড–১০, পৃষ্ঠা–৬৫

ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন তোমরা কোন ব্যক্তিকে মসজিদ আবাদ করতে দেখ তখন তার মোমেন হওয়ার সাক্ষ্য দাও, কেননা আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন,

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ

শুধু সেই ব্যক্তিই আল্লাহর ঘর আবাদ করে যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে। হাসান বসরী (রহঃ) আলোচ্য আয়াতের এ অর্থ বর্ণনা করেছেনঃ মোশরেকদের এই অধিকার নেই যে মসজিদে হারামের ব্যাপারে তারা কোন ভূমিকা পালন করবে। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে مَسٰجِدَ اللّٰهِ শব্দ দ্বারা মসজিদে হারামকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর এক মসজিদের জন্য বহুবচন ব্যবহার করার কারণ হল এই মসজিদে হারাম সমস্ত মসজিদের কেবলা। আর এই মসজিদের নির্মাণ সকল মসজিদের নির্মাণ তুল্য। এই ব্যাখ্যাও হযরত হাসান বসরী (রহঃ)–ই করেছেন।

বিখ্যাত আরবী ব্যাকরণবিদ ফাররা বলেছেন, আরবগণ কখনও এক বচনের শব্দ দ্বারা বহুবচন অর্থ করেন। আর কখনও এক বচনের উদ্দেশ্যে বহু বচন ব্যবহার করেন। যেমন কোন ব্যক্তি যদি একটি অশ্বের উপর আরোহন করে বলে, আমি অশ্বগুলোর উপর আরোজন শুরু করে দিয়েছি। ঠিক এমনিভাবে যদি কোন সম্পদশালী ব্যক্তি বলে, আমার কাছে অনেক টাকা আছে, তখন তার এই কথা শুদ্ধ বলে বিবেচিত হয়। তাই আলোচ্য আয়াতে মসজিদের বহু বচন مَسٰجِدَ ব্যবহার করা হয়েছে।

شٰهِدِيْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ

অর্থাৎ তারা প্রকাশ্যে শেরক করে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মিথ্যাজ্ঞান করে। আয়াতের অর্থ হল এই মোশরেকরা দু'টি বিরোধী বিষয়কে একত্রিত করতে পারেনা। বায়তুল্লাহ শরীফ আবাদ করা এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুকে পূজা করা।

যাহ্যাক (রহঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)–এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাদের কাফের হওয়ার প্রমাণ হল এই যে, তারা মূর্তি পূজা করতো। বায়তুল্লাহ শরীফের দেয়ালের সাথে তারা মূর্তি স্থাপন করেছিলো যখন তারা নগ্ন অবস্থায় আল্লাহর ঘরে তওয়াফ করতো তখন প্রত্যেকবার মূর্তির সম্মুখে সেজদা করতো।

সুদ্দী (রহঃ) বলেছেন, কাফেরদের কুফরীর প্রমাণ এই যখন কোন খৃষ্টানকে

জিজ্ঞাসা করা হয় তুমি কে? তখন সে বলে আমি খৃষ্টান, এমনিভাবে যখন ইহুদীকে জিজ্ঞাসা করা হয় তখন সে বলে, আমি ইহুদী। আলোচ্য আয়াতে একথাই বলা হয়েছে যে তারা নিজেরাই তাদের কাফের হওয়ার উপর সাক্ষ্য দেয়।

أُولَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۚ

এরাই সে সব লোক যাদের আমল ব্যর্থ হয়েছে। তারা হাজীদেরকে পানি সরবরাহ করেছে অথবা বায়তুল্লাহ শরীফের দেখাশোনা এবং মেরামত করেছে। কিন্তু যেহেতু তারা কাফের তাই তাদের এসব কাজের কোন গুরুত্ব নেই। তাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত। এজন্যে তাদের পরিণাম ভয়াবহ।

وَفِي النَّارِ هُمْ خَٰلِدُونَ

তারা চিরদিন দোযখে থাকবে।১

ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেন, যদিও এ কাফেরদের দ্বারা কিছু ভাল কাজও হয়েছে যেমন তারা ক্ষুধার্ত মানুষকে খাবার দিত, মেহমানদারী করতো, হাজীদেরকে পানি পরিবেশন করতো। এসব ভাল কাজ তাদের জন্য অকেজো হয়ে গেছে, কেননা তারা কাফের। কুফরী ও নাফরমানীর শাস্তি এত বেশী যে ঐ ভাল কাজগুলোর সওয়াব তার কাছেও আসতে পারেনা। মূলতঃ কুফর ও নাফরমানীর কারণে তাদের কোন সওয়াব অবশিষ্ট থাকেনা। কেননা ঈমান হল আমল কবুল হওয়ার ভিত্তি। আর কাফেরদের সেই ভিত্তিই নেই। এ আয়াত দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানীগণ এ সত্য প্রমাণ করেছেন যে যারা মুসলমান কিন্তু ফাসেক, পাপী তারা চিরদিন দোযখে থাকবে না কেননা ঈমানের কারণে অবশেষে তাদের প্রতি আল্লাহ পাকের রহমত হবে এবং আল্লাহ পাকের খাস রহমতেই অবশেষে নাযাত পাবে।২

আয়াতের মর্মকথা

মক্কার কাফেরদের কোন হক্ব নেই পবিত্র কাবা শরীফের খাদেম হওয়ার। কেননা, আল্লাহ পাকের প্রতি তাদের ঈমান নেই। তাই আল্লাহর ঘরের খেদমত করার অধিকারও তাদের নেই। যারা নিজেদেরকে কাবা শরীফের মোতাওয়াল্লী বলে দম্ভ করে তারাই কাবা শরীফে মূর্তি রেখে দিয়েছে। অহরহ সেই মূর্তি পূজা করছে, উলংগ অবস্থায় তারা আল্লাহর ঘরের তওয়াফ করছে আর যারা আল্লাহর বন্দেগী করতে চায় তাদেরকে কাবা শরীফের কাছেও আসতে দেয়নি কাফেররা। তাই হাজীদেরকে পানি

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৯৭

২। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-৮-৯

তফসীরে মাজেদী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৯৭

পরিবেশন করে বা হরম শরীফে বাতি জ্বালিয়ে কাবা ঘরের মোতাওয়াল্লী হওয়া যায় না। তাদের সকল চেষ্টা প্রাণহীন। আর ঈমানই হল আমলের প্রাণ। তারা সেই ঈমান থেকে বঞ্চিত। তাই তাদের জীবনের সকল পূণ্য সাধনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত। যারা নিজেরাই নিজেদের কুফরী ও নাফরমানীর সাক্ষী, যারা মূর্তির উদ্দেশ্যে মানতকারী, দোযখেই হবে তাদের ঠাঁই এবং চিরদিন তারা দোযখে থাকবে।

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ

শুধু ঈমানদারগণই মসজিদ অবাদ করে

যারা প্রকৃত মুমেন, যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে যে অবশেষে একদিন আমাদেরকে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাজির হতে হবে এবং যাবতীয় কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে এবং যারা নিয়মিত নামাজ কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে আর আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভয় করেনা শুধু তারাই আল্লাহর ঘর আবাদ করে আর তাদেরই অধিকার রয়েছে মসজিদুল হারামের মোতাওয়াল্লী হওয়ার।

শুধু আল্লাহকে ভয় কর

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, কোন ভয়ংকর জিনিস দেখলে স্বভাবগত কারণেই মানব অন্তরে ভয়ের উদ্রেক হয়। তাই,

وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ

বাক্যটির অর্থ হ'ল দ্বীনি ব্যাপারে আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কাউকে ভয় করোনা।

অর্থাৎ অন্য কারো ভয়ে আল্লাহর হুকুম পালন বর্জন করোনা।

দ্বিতীয়তঃ আলোচ্য আয়াতে রসূলের প্রতি ঈমানের উল্লেখ নেই, শুধু আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমানের কথা বলা হয়েছে কেননা, রসূলের প্রতি ঈমান ব্যতীত আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন সম্ভবই নয়। আল্লাহর রসূলের মাধ্যমেই আল্লাহর প্রতি ঈমানের শিক্ষা লাভ হয়। তাই শুধু আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমানের কথা বলা যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। যারা ঈমানদার, মসজিদ আবাদ করা তাদেরই কাজ বলে আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস বোখারী শরীফ ও মুসলীম শরীফে সংকলিত হয়েছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমরা কি জান, এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের

তাৎপর্য কি? উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম জবাব দিলেন, আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূলই ভাল জানেন, তখন তিনি এরশাদ করলেন, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল, একথার সাক্ষ্য দেয়া।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) আরও লিখেছেনঃ এ আয়াতে মসজিদ আবাদ করার অর্থ হল সর্বদা এবাদত বন্দেগী করা, আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকা, পবিত্র কোরআনের শিক্ষা দেয়া প্রভৃতি কর্মসূচীর মাধ্যমে মসজিদকে আবাদ রাখা। হযরত আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমরা যখন দেখ কোন লোক মসজিদে আসা যাওয়া করে হাজিরীতে অভ্যস্ত হয়েছে তবে তার মুমেন হওয়ার সাক্ষ্য দাও কেননা, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ

এই আয়াত পাঠ করেন।

(তিরমীজি দারেমী)

মসজিদের গুরুত্ব ও ফজিলত

হযরত আবু হেরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি সকাল সন্ধায় মসজিদে গমন করে যতবার যায় আল্লাহ পাক (প্রত্যেকবারের বিনিময়ে) তার জন্যে জান্নাতে একটি বাড়ী নির্মাণ করেন।

হযরত আবু হোরাইরাহ (রাঃ) থেকে আরও বর্ণিত আছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যেদিন আল্লাহ পাকের ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না সেদিন আল্লাহ পাক সাত ব্যক্তিকে ছায়া দান করবেন। ঐ সাত ব্যক্তির মধ্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেই ব্যক্তির নাম অন্তর্ভূক্ত করেছেন যে মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর পুনরায় মসজিদে প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত তার অন্তর মসজিদে হাজিরীর জন্য ব্যাকুল থাকে।

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার গৃহে ভালভাবে অজু করে মসজিদে গমন করে সে আল্লাহ পাকের সাক্ষাতের জন্যে আগমনকারী। (তথা আল্লাহ পাকের মেহমান হয়) আর মেযবানের হক্ব হল তার মেহমানের ইজ্জত করা।

(তিবরানী বায়হাকী)

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেনঃ মসজিদ নির্মাণ করা, সুসজ্জিত করা, আলোকিত করা এবং তার হেফাজত করা মসজিদকে আবাদ করার অন্তর্ভূক্ত। এমনিভাবে মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করা এবং দুনিয়াদারীর কথাবার্তা থেকে মসজিদকে পবিত্র রাখাও কর্তব্য।

হযরত ওসমান (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি নিজে শুনেছি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে মসজিদ নির্মাণ করে আল্লাহ পাক তার জন্যে জান্নাতে গৃহ নির্মাণ করবেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য মসজিদ তৈরী করবে আল্লাহ পাক তার জন্য তেমনি একটি ঘর তৈরী করবেন।

(বোখারী মুসলিম, তিরমীজি, এবনে মাজা)

ইমাম আহমদ (রহঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য মসজিদ তৈরী করবে (তা যত ছোটই হোক) আল্লাহ পাক তার জন্য জান্নাতে ঘর তৈরী করবেন। হযরত আয়শা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আদেশ দিয়েছেন, তোমরা নিজেদের বাড়ীতে মসজিদ (অর্থাৎ নামাজের স্থান) তৈরী করে নিও এবং তাকে পরিচ্ছন্ন, পবিত্র ও খুশবুদার রেখ।

(আবুদাউদ, তিরমীজি এবনে মাজা)

হযরত আমর এবনে শোয়াইব (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদে কবিতা গানের মত করে পাঠ করতে, ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং নামাজের পূর্বে স্থানকে সংরক্ষিত করে বসতে নিষেধ করেছেন।

(আবুদাউদ তিরমীজি)

হযরত আবু হোরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যদি, তুমি কোন লোককে মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখ তবে বল আল্লাহ যেন তোমাকে ব্যবসায় লাভবান না করেন। আর যদি মসজিদে কোন লোককে তার হারানো উষ্ট্রের সন্ধান করতে দেখ (অর্থাৎ মানুষের নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে দেখ) তবে তুমি বল আল্লাহর মর্জি হোক তুমি যেন উষ্ট্রটি ফিরে না পাও কেননা এসব কাজের জন্য মসজিদ তৈরী হয়নি। আরও এরশাদ হয়েছেঃ

ان عمار بيوت الله هم اهل الله عز وجل

"যারা মসজিদ আবাদকারী, তারাই আল্লাহ ওয়ালা।"

এমনিভাবে আরও এরশাদ হয়েছেঃ

من الف المسجد الفه الله

"যে মসজিদের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করে আল্লাহ পাক তাকে বালবাসেন।" হযরত আবু হোরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে ব্যক্তি নামাজের জন্য মসজিদে গমন করে প্রত্যেক পদক্ষেপের বদলে আল্লাহ পাক তার একটি মর্তবা বলুন্দ করেন, আর একটি গুণাহ মাফ করে দেন। হযরত আবু হোরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যারা অন্ধকারে মসজিদের দিকে যায় তাদেরকে সুসংবাদ দাও কেয়ামতের দিন তাদেরকে নূরের মিম্বর দান করা হবে, সকল লোক সেদিন ভীত সন্ত্রস্থ হবে কিন্তু তারা ভীত সন্ত্রস্থ হবেনা।

অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের নেক আমলগুলো আমার সম্মুখে পেশ করা হয়েছে এমনকি মসজিদ পরিচ্ছন্ন করে তার ময়লা ফেলে দেয়া পর্যন্ত অর্থাৎ এটিও নেক কাজ সমূহের অন্তর্ভূক্ত।

আরো এরশাদ হয়েছেঃ যে ব্যক্তি মসজিদকে আলোকিত করে, আল্লাহর আরশবাহী ফেরেশতাগণ তার জন্যে এস্তেগফার করতে থাকে।

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছেঃ আল্লাহর আরশবাহী ফেরেশতাগণ তার জন্যে এস্তেগফার করতে থাকে।

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছেঃ আল্লাহ্ পাকের দরবারে সবচেয়ে প্রিয়স্থান হ'ল মসজিদ, আর সবচেয়ে অপছন্দনীয় স্থান হ'ল বাজার।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ এর কারণ বলেছেনঃ বাজারে আল্লাহর জিকির থেকে গাফলত হয়, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করা হয়না। অর্থ-সম্পদের অপচয় হয় এবং অহেতুক কথা ও কাজ হয়। মানুষের দৃষ্টি, কর্ণ, অন্তর অর্থ-সম্পদ এককথায় কোন কিছুই শরীয়তের নিষিদ্ধ কাজ থেকে রক্ষা পায়না।

অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমরা যখন জান্নাতের বাগানে গমন কর তখন বিচরণ করবে, সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জান্নাতের

বাগান কি? তিনি এরশাদ করলেন; মসজিদ সমূহ, তাঁরা এরপর আরজ করলেনঃ সেখানে বিচরণ করা কি? তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ সোবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবর বলা।

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেনঃ আমি ইচ্ছা করি বিশ্ববাসীর প্রতি আযাব নাযিল করব; কিন্তু যখন আমি পবিত্র কোরআনকে নিয়ে যে ব্যস্ত থাকে তাকে দেখি, আর মসজিদের খাদেমদেরকে দেখি, আর মুসলমানদের মাসুম শিশুদেরকে যখন দেখি, তখন আমার ক্রোধ দূরীভূত হয়।

ইবনে আকীল বলেছেনঃ মসজিদ হ'ল শয়তান থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি দুর্গ। যাদের জীবন মসজিদভিত্তিক, শয়তান তাদের উপর খুব কমই প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ মসজিদ সমূহ হ'ল আল্লাহর ঘর। আসমানের অধিবাসীগণ মসজিদ সমূহকে এমন নুরানী এবং আলোয়ঝলমল দেখতে পান যেভাবে বিশ্ববাসী নক্ষত্রপুঞ্জকে দেখে। সর্বপ্রথম মক্কায় হযরত আবুবকর (রাঃ) তাঁর গৃহের সম্মুখে একটি মসজিদ তৈরী করেন, সেখানে তিনি নামাজ আদায় এবং পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করতেন। কাফেররা এসে তাঁকে হুমকি ধমকি দিত কিন্তু তিনি সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করতেননা।

কাফেরের ধন-সম্পদ মসজিদে ব্যবহার যোগ্য নয়

আলোচ্য আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়, কোন কাফেরের ধন-সম্পদ মসজিদে ব্যবহারযোগ্য নয়। যদি কাফের কোন মসজিদ তৈরী করে বা তাতে অংশগ্রহণ করে তবে তা মসজিদ হবে না। এমনিভাবে, হারাম পন্থায় অর্জিত অর্থ দ্বারা মসজিদ তৈরী হলে তা-ও মসজিদ হবেনা, সেগুলো অন্য ঘরের ন্যায় ঘরই হবে। কেননা, কাফেরের কোন সৎকাজ আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হয়না। আর মুসলমানের হারাম পন্থায় উপার্জিত ধন-সম্পদ দ্বারা ভাল কাজ করলেও তা সওয়াবের যোগ্য হয়না। এজন্যে মুসলমানদের কর্তব্য হ'ল আল্লাহর ঘর মসজিদকে কাফেরের অর্থ-সম্পদ ও হারাম টাকা পয়সা থেকে রক্ষা করা।১

فَعَسٰٓى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ

অর্থাৎ যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, আখেরাতে বিশ্বাস করে এবং নামাজ কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কাউকে ভয় করেনা, তাদের সম্পর্কে এ আশা করা যায় যে, তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত লোকদের অন্তর্ভূক্ত হবে।

১। খোলাসাতুত্তাফাসীর, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২০৭-২০৮

তফসীরকারগন বলেছেনঃ عسى শব্দটির অর্থ আশা করা যায়। কিন্তু যেহেতু এটি আল্লাহ্ পাকের কালাম, তাই এ শব্দ দ্বারাই নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। পরমকরুণাময় আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যখন এ শব্দটি ব্যবহৃত হয় তখন তার দ্বারা নিশ্চয়তা বিধান উদ্দেশ্য করা হয়। অর্থাৎ যারা আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত গুণে গুণান্বিত হবে তারা নিশ্চয়ই বেহেশ্তে প্রবেশ করবে। মঞ্জিলে মকসুদে তারা অবশ্যই পৌছবে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে عسى শব্দ ব্যবহারের তথা এমনি বর্ণনার একাধিক কারণ রয়েছে।

(এক) যেহেতু কাফেররা নিজেদের জীবন ধারায় সন্তুষ্ট এবং সঠিক পথ লাভের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল তাই আলোচ্য আয়াতে এ শব্দটি ব্যবহার করে তাদের প্রতি কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ যারা এক আল্লাহ্ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেছে, আখেরাতের ব্যাপারেও তাদের একীন রয়েছে, এবং আল্লাহ পাকের বন্দেগীতে তারা জীবন অতিবাহিত করেছে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের অন্বেষণে রয়েছে মগ্ন, মুগ্ধ এবং আল্লাহ পাক ব্যতীত কাউকে ভয় করেনি তাদের সম্পর্কেই এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, হয়তো তারা সফলকাম হবে। সবকিছু নির্ভর করে এক আল্লাহ্ পাকের রহমতের উপর। যখন মুসলমানদেরই এ অবস্থা হয়, তখন তোমরা কোন্ যুক্তিতে আখেরাত সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে আছ। তোমরা তো কোন হিসেবেই নেই, অতএব, সতর্ক হও।

(দুই) আলোচ্য আয়াতে عسى শব্দটি ব্যবহার করে মুসলমানদেরকেও সতর্ক করা হয়েছে এ মর্মে যে, তোমরা তোমাদের আমলের উপর দম্ভ করোনা। কেননা, কোন আমল যতই ভাল হোক, যদি কোন কারণে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তা কবুল না হয়, তবে এমন নেক আমলের কোন গুরুত্বই নেই। তাই নেক আমল কর কিন্তু তার উপর ভরসা করোনা; বরং ভরসা কর এক আল্লাহ পাকের প্রতি এবং ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তাঁর রহমতের আশা রাখ।

আবু নাঈম হযরত আলী (রাঃ)-এর সূত্রে লিখেছেনঃ হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ তাআলা বণী ইসরাঈলের কোন পয়গম্বরের নিকট ওহী প্রেরণ করেছেন যে, তোমার উম্মতে আমার যে অনুগত বান্দা রয়েছে, তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, নিজেদের আমলের উপর মুগ্ধ হয়ে থেকোনা। কেননা, কেয়ামতের দিন আমি যখন কোন বান্দার হিসেব গ্রহণ করব এবং তাকে আযাব দিতে ইচ্ছা করব তখন আযাব দেব। (তার আমল সমূহ নাযাতের কারণ হতে পারবেনা।) আর তোমার উম্মতের নাফরমান লোকদেরও জানিয়ে দাও, তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিওনা। (আর নিরাশ হয়োনা) আমি বড় বড় গুণাহ

মাফ করে দেব, আর পরওয়া করবনা—অর্থাৎ একদিকে আল্লাহ পাকের রহমতের আশা করতে হবে অন্যদিকে আল্লাহর গজবকে ভয়ও করতে হবে, তাই বলা হয়েছে

الايمان بين الخوف والرجاء

ঈমান হ'ল আশা এবং ভয়ের মাঝখানে। বস্তুতঃ আল্লাহর রহমতের আশার কারণে নেক আমল করা সহজ এং সম্ভব হয়। আর আল্লাহ পাকের ভয়ের কারণে পাপাচার থেকে আত্মরক্ষা করা যায়। অতএব, আল্লাহর রহমতের আশা এবং গজবের ভয় উভয়টিই মোমেনের অন্তরে থাকে পাশাপাশি। আলোচ্য আয়াত দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয়।

শানে নজুল

মুসলিম, এবনে হাব্বান, আবু দাউদ বলেছেন, হযরত নোমান এবনে বশীর (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ আমি কয়েকজন সাহাবায়ে কেরামের সংগে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মিম্বরের নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। আমাদের মধ্যে একজন বললেন, ইসলাম গ্রহণের পর আমার আর কোন পরওয়া নেই যে আমি আল্লাহর জন্যে কোন কাজ করবো, আমি শুধু হাজীগণকে পানি পান করাবো আর এ কাজকে আমি সবচেয়ে বড় আমল মনে করি।

দ্বিতীয় এক ব্যক্তি বললেন, আমি মসজিদে হারামের খেদমতে নিয়োজিত থাকবো এটিই সবচেয়ে ভাল আমল।

তৃতীয় ব্যক্তি বললো, তোমরা যা কিছু বলেছো তার থেকে উত্তম কাজ হল আল্লাহর রাহে জেহাদ করা। তখন হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, তোমরা রসূলুল্লাহর মিম্বরের নিকট চিৎকার করোনা। এ ঘটনা জুমার দিন ঘটেছিলো হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন, জুমার নামাজের পর হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে তোমাদের ঝগড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবো। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেন, এ আয়াতের শানে নজুল সম্পর্কে আরও ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। মোশরেকরা ইহুদীদেরকে বলেছে, আমরা হাজীদেরকে পানি পরিবেশন করি, আমরা মসজিদুল হারামকে আবাদ রাখি, আমরা উত্তম না মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ? তখন ইহুদীরা বললো, তোমরা উত্তম। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২০০

এ সম্পর্কে আরও বর্ণিত আছে, হযরত আব্বাস (রাঃ) ইসলাম কবুল করার পর হযরত আলী (রাঃ) তাকে বললেন, হে চাচা! আপনি হিজরত করে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে কেন মিলিত হচ্ছেন না? হযরত আব্বাস (রাঃ) বললেনঃ আমি মসজিদে হারামকে আবাদ করার দায়িত্বে এবং কাবা শরীফের দেখাশোনার কাজে রয়েছি।

এভাবে এবনে জরীর মোহাম্মদ এবনে কাবের বর্ণনা থেকে লিখেছেন যে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত আলী (রাঃ), হযরত আব্বাস (রাঃ), তালহা এবনে শায়বা (রাঃ) সম্পর্কে। তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মতৎপরতা সম্পর্কে গৌরব করেছেন। তালহা বলেছেন, আমি কাবার মোতাওয়াল্লী, আমার হাতে রয়েছে কাবার চাবী। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি হাজীদেরকে পানি পান করাই, এটি আমার দায়িত্ব, আর এটি আমার অধিকার।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি জানিনা আপনারা কি করেন, তবে আমি কেবলার দিকে মুখ করে ছয় বছর নামাজ আদায় করেছি, অর্থাৎ সর্ব প্রথম, আর আমি মুজাহেদ, আল্লাহর রাহে আমি জেহাদ করেছি। তখন এ আয়াত নাযিল হয়েছে।১

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, হাজীদের পানি পরিবেশনকারী, মসজিদে হারামের দেখাশোনাকারীকে তোমরা কি তাদের সমতুল্য মনে করেছ যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর রাহে জেহাদ করেছে, আল্লাহর দরবারে দু'দল এক সমান হতে পারেনা কেননা, যারা মোশরেক তাদের কোন আমলই আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হয়না। মোশরেকদের যাবতীয় ভাল কাজ বরবাদ হয় ঈমানের অভাবে। আয়াতের এই অর্থ তখন হবে যখন মুসলমান এবং মোশরেকদের মধ্যে অনুষ্ঠিত বিতর্ককে আয়াতের শানে নজুল হিসেবে গ্রহণ করা হয়, যেমন হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে মোহাম্মদ এবনে কাব কারজীর সূত্রে বর্ণিত আছে।

আর যদি মুসলমানদের পারস্পরের মতভেদ সম্পর্কে যে বর্ণনা রয়েছে তাকে শানে নজুল হিসেবে গ্রহণ করা হয়, যেমন হযরত নোমান এবনে বশীর (রাঃ)-এর বর্ণনায় এ বিবরণ স্থান পেয়েছে, ইমাম মুসলিম যাকে সংকলন করেছেন, তবে মসজিদ আবাদ করার অর্থ হবে মসজিদ নির্মাণ করা, নামাজ এবং দোয়ার মাধ্যমে আবাদ করা অর্থ হবেনা। কেননা আল্লাহর জিকির জেহাদের চেয়েও উত্তম। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আজাবে এলাহী থেকে রক্ষাকারী আল্লাহর জিকিরের চেয়ে উত্তম কিছু নেই। এই হাদীস ইমাম মালেক (রহঃ), তিরমীজি (রহঃ), এবনে মাজা (রহঃ) হযরত মাআজ এবনে জাবাল (রাঃ)-এর সূত্রে সংকলন করেছেন।

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-১১

তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২০১

বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) এর সূত্রে এই হাদীস সংকলন করে এতটুকু কথা সংযোজন করেছেন, "সাহাবায়ে কেরাম আরজ করেছেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! জেহাদও আল্লাহর জিকির থেকে উত্তম নয়? তিনি এরশাদ করলেনঃ না, আল্লাহর রাহে জেহাদও আল্লাহর জিকির থেকে উত্তম নয় তবে হ্যাঁ যদি এমন ঘোরতর যুদ্ধ হয় যে তরবারী ভেঙ্গে যায়।"

হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমি কি তোমাদেরকে বলবো, তোমাদের মালিকের নিকট তোমাদের কোন্ আমল সবচেয়ে উত্তম, পবিত্র এবং উচ্চমর্তবা সম্পন্ন? যা আল্লাহর রাহে স্বর্ণ রৌপ্য ব্যয় করার চেয়েও উত্তম আর এ কথা থেকেও উত্তম যে তোমরা দুশমনের মোকবেলা করে তাদেরকে হত্যা কর এবং তারা তোমাদেরকে হত্যা করে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন অবশ্যই বলুন, তখন তিনি এরশাদ করলেন, "আল্লাহর জিকির " (আল্লাহর জিকির সমস্ত আমলের চেয়ে উত্তম)।

(আহমদ তিরমীজি এবনে মাজা)

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

আর আল্লাহ পাক জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।

অর্থাৎ যারা মুশরেক এবং যারা ইসলামের বিরোধীতায় তৎপর, তারা এভাবে মূলতঃ নিজেদের প্রতিই জুলুম করে আর এমন জালেমকে আল্লাহ পাক হেদায়েত করেন না। অতএব, এমন অবস্থায় তারা কি করে মুমেনের সমান হতে পারে।১ কেননা, তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছিলো আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তাঁর বন্দেগী করার জন্য। কিন্তু তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি; বরং কাফের হয়েই সন্তুষ্ট রয়েছে তাই তারা জালেম। এমনিভাবে, তারা মসজিদে হারামের প্রতি জুলুম করেছে কেননা মসজিদে হারাম নির্মাণ করা হয়েছে এক আল্লাহর বন্দেগীর জন্য অথচ তারা মসজিদ হারামে মূর্তি রেখেছে এবং মূর্তি পূজা করেছে তাই তাদেরকে জালেম বলা হয়েছে, আর এমন জালেমদেরকে আল্লাহ পাক হেদায়েত করেন না।২

জমজমের পানি পান করার ঘটনাঃ

ইমাম বোখারী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) সূত্রে লিখেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জমজমের পানি পান করার স্থানে আগমন করেন এবং জমজমের পানি দিতে বললেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) (তাঁর পুত্র) ফজলকে বললেন, তোমার আম্মার নিকট থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২০২

২। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-১৩

ওয়াসাল্লামের জন্যে পানি নিয়ে আস। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আমাকে এখান থেকেই পান করাও। হযরত আব্বাস (রাঃ) বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকেরা এ পানিতে হাতঢুকিয়ে দেয় তখনও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আমাকে এখান থেকে পান করাও। এরপর তিনি জমজমের কুপের নিকট তশরিফ নিয়ে গেলেন। সেখানে মানুষ পানি পান করছিল আর কিছুলোক কূপের ভেতর কাজ করছিল। তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন তোমরা কাজ করে যাও, এটি অত্যন্ত উত্তম কাজ। এরপর এরশাদ করলেনঃ যদি এ আশংকা না থাকত যে, তোমারা অসহায় হয়ে যাবে (অর্থাৎ আমাকে দেখে মানুষের ভীড় এত বেশী হবে যে, তোমরা তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে অসহায় হয়ে যাবে।) তাহলে, আমিও নীচে অবতরণ করে পানির পাত্রের রশি এখানে রেখে দিতাম। এরপর তিনি তার কাঁধের দিকে ইঙ্গিত করলেন। অর্থাৎ আমি নিজেও পানি তুলে নিতাম আর ঐ পানি পান করার জন্যে মানুষের ভীড় এত বেশী হতো যে তোমাদের পক্ষে তা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হতো না।১

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

পূর্ববর্তী আয়াতে হাজীদেরকে পানি পরিবেশন করা এবং মসজিদে হারামকে আবাদ করার উপর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন ও আল্লাহর রাহে জেহাদে অংশগ্রহণকে প্রাধান্য দেয়ার প্রতি ইংগিত ছিল, আলোচ্য আয়াতে বিষয়টিকে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে।

মূলতঃ সব আমল এক সমান নয়, ঠিক তেমনিভাবে যারা আমল করে তারাও এক সমান হতে পারেনা, কাজেই যারা আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান রাখে এবং আল্লাহর রাহে জেহাদ করে তারা এবং যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান ব্যতীত শুধু হাজীদেরকে পানি পান করায় এবং কাবাগৃহের দেখা শুনা করে তারা এক সমান হতে পারেনা। কাবা শরীফ যেহেতু মুশরেকদের নিকটও অত্যন্ত পবিত্র স্থান ছিল তাই পবিত্র কাবাগৃহের খেদমত করা এবং হাজীদের সেবাযত্ন করা জাহেলিয়তের যুগেও অত্যন্ত বড় নেক কাজ মনে করা হ'ত তাই মক্কার মোশরেকরা এ কাজটি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে করত এবং এ কাজ করে তারা গর্ববোধ করত। নিজেদেরকে কাবা শরীফের সেবক মনে করে গৌরবান্বিত হ'ত। কিন্তু যে সত্যটি তারা উপলব্ধি করতনা তা হ'ল এ ঘরের ফজিলত এবং মাহাত্ম আল্লাহ পাকের ঘর হওয়ার কারণেই, অথচ তারা আল্লাহ পাকের প্রতিই বিশ্বাস করত না; বরং পবিত্র কাবা শরীফে মূর্তি রেখে আল্লাহর নাফরমানী করত; মানবতার অবমাননা করত। তাই তাদের তরফ থেকে আল্লাহর ঘরের খেদমত এবং হাজীদের সেবাযত্ন করার কাজ আল্লাহ পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। যতভাল কাজই হোব, তা কবুল হওয়ার জন্যে ঈমান পূর্বশর্ত। আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছেঃ

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২০৩

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং এ ঈমানের কারণে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হিজরত করে এবং আল্লাহর রাহে জেহাদ করে জানমাল দিয়ে, আল্লাহ পাকের দরবারে তাদের জন্যে রয়েছে সর্বোচ্চ মর্তবা। আর তারাই হয় সফলকাম।

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ যারা এ চারটি গুণে গুণান্বিত হবে তারা হাজীদের পানি পরিবেশনকারী এবং মসজিদুল হারামের তত্ত্বাবধানকারীদের চেয়ে অনেক অনেক বেশী মর্যাদার অধিকারী হবে।

এ গুণগুলো হ'ল-(১) আল্লাহ্ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান, তাঁর প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান, আখেরাতের প্রতি ঈমান।

(২) ঈমানকে রক্ষা করার প্রয়োজনে আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হিজরত করা-নিজের বাড়ীঘর, ভিটে মাটি এমনকি দেশ পর্যন্ত ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়া।

(৩) আল্লাহর রাহে নিজের ধন-সম্পদ দিয়ে জেহাদ করা।

(৪) নিজের জীবন দিয়ে জেহাদ করা।

এ চারটি গুণ যারা অর্জন করে তারা আল্লাহ্ পাকের দরবারে সর্বোচ্চ মর্তবা লাভে ধন্য হয় এবং জীবন সাধনায় তারা সফলকাম হয়।

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا
نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿٢١﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ
عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ
إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ
وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ
كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ
فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

তরজমা

(২১) তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সু-সংবাদ দান করছেন স্বীয় রহমত, সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের, যেখানে রয়েছে তাদের জন্যে চিরকালীন সুখ শান্তি।

(২২) তারা সেখানে চিরকাল থাকবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাকের নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার।

(২৩) হে মুমিনগণ! তোমাদের পিতা এবং ভ্রাতা যদি ঈমানের চেয়ে কুফরীকে অধিক ভালবাসে তবে তোমরা তাদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করোনা, তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু রূপে গ্রহণ করে তারা জালেম।

(২৪) (হে রসূল!) আপনি বলে দিন, যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ পাক, তাঁর রসূল এবং আল্লাহর রাহে জেহাদ করা অপেক্ষা প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের পত্নি, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের

উপার্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বানিজ্য তোমরা যার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাড়ী-ঘর যা তোমরা অত্যন্ত পছন্দ কর তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ পাকের বিধান আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ পাক পাপীষ্ঠ সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেননা।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে তিনটি মহান নেক আমলের কথা বলা হয়েছে। ঈমান, হিজরত এবং জেহাদ। যারা এ সব নেক আমল করবে তাদের জন্য আলোচ্য আয়াতে তিনটি নেয়ামতের উল্লেখ রয়েছে। রহমত, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং আখেরাতের অনন্ত অসীম নেয়ামত। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন ঈমানের বিনিময়ে আল্লাহ পাকের রহমত প্রদাণের সু-সংবাদ দেয়া হয়েছে। কেননা ঈমান ব্যতীত আখেরাতে রহমত লাভ হয় না। জেহাদের বিনিময়ে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, কেননা, মোমেন জেহাদে নিজের জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করে, আর তা করে এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, তাই তাকে এর বিনিময়ে সন্তুষ্টি দানের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর হিজরতের বিনিময়ে চিরশান্তির কেন্দ্র জান্নাতের খোশ-খবরী দেয়া হয়েছে, কেননা তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিজেদের বাড়ীঘর ত্যাগ করেছে তাই তাদেরকে অনন্ত অসীম নেয়ামতের কেন্দ্র বেহেশতের মনোরম আবাস প্রদানের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। আর সেখানে চিরদিন তারা থাকবে একথারও নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে।১

ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেন,

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ

আলোচ্য আয়াতে রহমত অর্থ দুনিয়ার জীবনে সার্বিক কল্যাণ।

رِضْوَانٍ

অর্থ তাদের প্রতি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্ট হওয়া। এর পরে আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে জান্নাতের খোশ-খবরী দেয়া হয়েছে, আর জান্নাতে রয়েছে অনন্ত অসীম নেয়ামত। এরপর এরশাদ হয়েছেঃ

خَٰلِدِينَ فِيهَآ

১। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-২৪৬

তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৭০

অর্থাৎ তাদেরকে জান্নাতে সাময়িক ভাবে রাখা হবেনা বরং তারা হবে জান্নাতের চিরস্থায়ী অধিবাসী, তারা কোন দিন বাস্তহারা হবে না, জান্নাতে প্রদত্ত নেয়ামত কোন দিনও তাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবেনা।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন خلود শব্দটি কোন কোন সময় অধিক, কাল অবস্থানের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এরপর ابدا শব্দটি ব্যবহার করার মাধ্যমে সেই সম্ভাবনা নিরষণ করা হয়েছে, অর্থাৎ জান্নাতীগণ চিরকাল জান্নাতে বাস করবে, কোন দিন তাদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কার করা হবেনা এবং তাদের মৃত্যুও হবেনা।

একখানি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

من يدخل الجنة ....:

অর্থাৎ যে জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে কোন দিন চিন্তিত হবেনা। তার পোষাক পরিচ্ছদও কোন সময় পুরাতন হবেনা এবং তার যৌবনও কোন সময় বিদায় নেবেনা। জান্নাতের জীবনে যেখানে আরও অগনিত নেয়ামত থাকবে, সেখানে এই তিনটি নেয়ামতও সকল জান্নাতী ভোগ করবে।[১]

এই পর্যায়ে আল্লামা আলুসী (রঃ) অন্য একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেনঃ

يقول الله سبحانه يا اهل الجنة هل رضيتم فيقولون
كيف لا نرضى وقد باعدتنا عن نارك وأدخلتنا جنتك
فيقول سبحانه: لكم عندى أفضل من ذلك فيقولون:
وما أفضل من ذلك؟ فيقول جل شأنه: أحل لكم رضائ
فلا أسخط عليكم بعده أبدا

অর্থাৎ আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন হে জান্নাতবাসী! তোমরা জান্নাতের নেয়ামত পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছো? তারা বলবে, কিভাবে অসন্তুষ্ট হবো? কেননা, হে আল্লাহ! তুমি

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-১৫
১। খোলাসাতুত্তাফাসীর, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২১০

আমাদেরকে দোজখ থেকে দূরে রেখেছ এবং বেহেশত দান করেছ। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, তোমাদের জন্য আমার নিকট এর চেয়ে উত্তম নেয়ামত রয়েছে। লোকেরা বলবে, এর চেয়ে উত্তম আর কি হবে? তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করবেনঃ আমি তোমাদের জন্য দান করব আমার সন্তুষ্টি, এরপর আর কোন সময় আমি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবো না"।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতে ঘোষিত রহমত এবং রেজওয়ান শব্দ দু'টির ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, রহমত এবং সন্তুষ্টির দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায় পবিত্র কোরআনের সূরায়ে ওয়াল ফাজরের একটি আয়াতে। এরশাদ হয়েছেঃ

يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً

অর্থাৎ হে প্রশান্ত চিত্ত, তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে আস, সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। এর অর্থ যে বান্দা আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালনের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করেছে তার জন্যেই এ সুসংবাদ যে, নিজে সন্তুষ্ট অবস্থায় আল্লাহ পাকের সন্তোষভাজন হয়ে তাঁর নিকট ফিরে আস।

একবার হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহ পাকের মহান দরবারে এ আরজি পেশ করেছিলেন,

دلنى الى رضاءك

হে পরওয়ারদেগার! আমাকে তোমার সন্তুষ্টি লাভের পথ দেখাও। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করেছিলেন,

رضاءى برضائك فى قضاءى

"আমার বিধি-নিষেধের উপর তুমি সন্তুষ্ট হলেই তোমার প্রতি আমি সন্তুষ্ট হই।

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের যাবতীয় বিধি-নিষেধের উপর যে বান্দা সন্তুষ্ট থাকে আল্লাহ পাক তার উপর সন্তুষ্ট হন। অতএব, আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হতে হলে সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁর যাবতীয় বিধি-নিষেধ পালন করতে হবে। আর এভাবে জীবনের সকল সাধনা দ্বারা তার সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব হবে, তাই সূরায়ে ওয়াল ফাজরে আহবান করা হয়েছে "ফিরে আস সন্তুষ্ট অবস্থায়, সন্তোষভাজন হয়ে।" আর পরবর্তী বাক্যে বেহেশতে প্রবেশের আহবান জানান হয়েছে এভাবে-

১। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৭০

فَادْخُلِىْ فِىْ عِبٰدِىْ وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ

"আমার বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।"

এজন্যে ইমাম রাজী (রঃ) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ

والرحمة كون العبد راضيا بقضاء الله

আল্লাহ পাকের হুকুম সম্পর্কে বান্দার সন্তুষ্ট হওয়াই হ'ল আল্লাহ পাকের রহমত লাভ করা। যার মনের এ অবস্থা হয় আল্লাহ পাক তার প্রতি সন্তুষ্ট হন, সে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হয়, আর এ সন্তুষ্টির সুসংবাদ দেয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

পূর্ববর্তী আয়াতে বান্দাদের তিনটি গুণের উল্লেখ ছিল।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

অর্থাৎ যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, হিজরত করে এবং আল্লাহর রাহে জানমাল দিয়ে জেহাদ করে তাদের জন্যে রয়েছে আল্লাহর রহমত, তাঁর সন্তুষ্টি এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে আল্লাহর অনন্ত অসীম নেয়ামত।

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ

নিশ্চয়ই আল্লাহ পাকের নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার। এ আয়াতের দু'টি ব্যাখ্যা হতে পারে–

(এক) যে আমল সমূহের সওয়াব হিসেবে আখেরাতে এসব নেয়ামত হাসিল হবে সেই আমল সমূহের অনুপাতে এ নেয়ামত অতি মহান।

(দুই) দুনিয়ার নেয়ামত সমূহের বিনিময়ে আখেরাতের নেয়ামত অনেক বড়, অনেক বেশী।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ ؕ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পিতা এবং ভ্রাতা যদি ঈমানের চেয়ে কুফরকে অধিকতর ভালবাসে তবে তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করোনা।

কালবী (রঃ) আবু সালেহের সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মুসলমানদেরকে হিজরতের হুকুম দিলেন তখন কোন কোন লোকের পরিবারবর্গ তাদেরকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল আমাদেরকে ছেড়ে যেওনা। এ অবস্থায় তাদের মনও আকৃষ্ট হ'ল এবং তারা হিজরতের ইচ্ছা বাতিল করলেন, স্ত্রী পুত্র, পরিবারের সঙ্গে থাকার ইচ্ছা করলেন, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, এ আয়াত সেই ৯ ব্যক্তি সম্পর্কে নাজিল হয়েছে যারা মোরতাদ হয়ে চলে গিয়েছিল। আল্লাহ পাক এ আয়াতে মুসলমানদেরকে হেদায়েত করেছেন যে, তাদেরকে যেন মুসলমানগণ অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন যে, এ আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্কিত, যা হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত তালহা (রাঃ) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ

যখন আব্বাস(রাঃ)এবং তালহা(রাঃ)নিজেরদের কর্মতৎপরতার উপর গৌরব করেছিলেন এবং হিজরত করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন তখন এ আয়াত নাজিল হয়েছে।

আয়াতের মর্মকথা

পূর্ববর্তী আয়াতে জেহাদ এবং হিজরতের ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় পিতা, ভাই, আত্মীয়-স্বজন এবং প্রিয়জনদের প্রীতি ভালবাসা এ ফজিলতপূর্ণ কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আপনজনদের বাহুবন্ধন বা বিলাপ ক্রন্দনের কারণে হিজরতও করা যায় না, জেহাদেও যাওয়া যায়না। তাই এ আয়াতে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে যে, হে মোমেনগণ! তোমাদের পিতা ভাই, আত্মীয়-স্বজন যদি ঈমানের চেয়ে কুফরকে অধিকতর ভালবাসে তবে তাদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করোনা। কোন অবস্থাতেই তাদের সঙ্গে সম্প্রীতি রেখোনা। তাদের সহযোগিতা করোনা; যদি তা কর তবে তোমাদের সর্বনাশ অনিবার্য। তাই পরবর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾

তোমাদের মধ্যে যে কেউ তাদের সহযোগিতা করবে তাদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে তারাই হবে জালেম।

মূলতঃ যে এমন লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখবে, মুসলমানদের গোপন রহস্য তাদের নিকট ফাঁস করবে এবং হিজরত ও জেহাদ পরিত্যাগ করে তাদের সঙ্গে বসবাস করা পছন্দ করবে তাদের পরিণাম হবে শোচনীয়। পরবর্তী আয়াতে এ সম্পর্কে আরো সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছেঃ

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ

হে রসূল! আপনি সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিন যদি তোমাদের পিতা পুত্র, ভাই বেরাদর, পত্নী পরিজন তোমাদের আত্মীয় স্বজন, তোমাদের অর্থ-সম্পদ এবং তোমাদের ব্যবসা-বানিজ্য যা বিনষ্ট হওয়ার আশংকা তোমরা কর এবং তোমাদের মনের মত বাড়ী-ঘর সব কিছু যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ পাক, আল্লাহ পাকের রসূল এবং আল্লাহ পাকের রাহে জেহাদের চেয়ে অধিকতর প্রিয় হয়, তবে তোমরা অপেক্ষা কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ পাক তাঁর নির্দেশ প্রেরণ করেন।

বস্তুতঃ আপনজনদের বিরহ আত্মীয়-স্বজনের বিচ্ছেদ, বাড়ী-ঘর ছেড়ে যাওয়া, ধন-সম্পদের ক্ষতি করা, আরাম আয়েশ বিনষ্ট হওয়া এবং ব্যবসা-বানিজ্যের ক্ষতির আশংকা থাকার কারণে যদি তোমরা জেহাদ থেকে বিরত থাক, তবে তোমাদের শাস্তি অবধারিত; তোমরা অপেক্ষা কর, তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে শাস্তির আদেশ আসবে। এই আয়াতে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে, তাদের ব্যাপারে, যারা প্রিয়জনদের কারণে হিজরত পরিত্যাগ করেছে। তফসীরকারগণ এই পর্যায়ে লিখেছেন আত্মীয় স্বজন প্রিয়জনদের প্রীতি ভালবাসা আদৌ কোন নিষিদ্ধ কাজ নয়, তবে যদি আল্লাহর বিধান পালনের ক্ষেত্রে আত্মীয় স্বজনের তরফ থেকে বাধা আসে তবে এমন অবস্থায় তা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ইমাম কুরতবী (রঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ এই আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের মহব্বত ওয়াযেব বা অবশ্য কর্তব্য। হিজরত করলে সর্ব প্রথম যে কষ্টের আশংকা দেখা দিত তা হলো আত্মীয় স্বজন প্রিয়জন ছুটে যাবে। দ্বিতীয় আশংকা হতো এই যে হিজরত করলে ধন-সম্পদ হাতছাড়া হয়ে যাবে, ব্যবসায় বানিজ্য মন্দা হয়ে যাবে, বিষয় সম্পত্তি সবই হারাতে হবে। তৃতীয়তঃ মনের মত করে যে সব বাড়ী-ঘর তৈরী করা হয়েছে তাও ছেড়ে দিতে হবে।

এতো হ'ল হিজরতের কথা। হিজরতের চেয়েও কঠিনতর কাজ হ'ল জেহাদ। মুসলমান মাত্রকে ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে জেহাদের জন্যে সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকতে হয়। যারা মোমেন হওয়ার পরও প্রয়োজনে হিজরত এবং আল্লাহর রাহে জেহাদের ব্যাপারে গাফলত করে তাদের উদ্দেশ্যেই আলোচ্য আয়াতে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

فَتَرَبَّصُوا

অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হিজরত এবং জেহাদ করতে প্রস্তুত না হও তবে আল্লাহ পাকের আদেশের অপেক্ষা কর।

صيغته صيغة امرو معناه التهديه

ইমাম কুরতবী লিখেছেনঃ এ বাক্যটিতে রয়েছে বিশেষ সতর্কবাণী।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তী (রঃ) লিখেছেন যে,

حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ

আলোচ্য বাক্যে امر শব্দটির ব্যাখ্যা হ'ল আল্লাহ পাকের শাস্তির সিদ্ধান্ত।

তফসীরকার আতা (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে امر শব্দটির ব্যাখ্যা হ'ল দুনিয়া এবং আখেরাতে শাস্তির ফয়সালা। আর তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) এবং মুকাতেল (রঃ) বলেছেন, এ বাক্যটি দ্বারা আল্লাহ পাক মক্কা বিজয়কে উদ্দেশ্য করেছেন অর্থাৎ তোমরা অপেক্ষা কর এমন একদিন আসবে যখন মুসলমানগণ মক্কা বিজয় করবে, তখন আর হিজরতের প্রয়োজন থাকবেনা, এমন অবস্থায় হিজরতের সওয়াব থেকে তোমরা বঞ্চিত হবে।[২] যেহেতু আত্মীয়-স্বজনের আকর্ষণের কারণে কোন কোন মোমেনের পক্ষে মক্কা থেকে হিজরত করা সম্ভব হচ্ছিলনা, এজন্যে তাদের উদ্দেশ্যে আলোচ্য বাক্যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

হযরত থানভী (রঃ) এ বাক্যের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এ আয়াত দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, বান্দার সাথে সম্পর্কের চেয়ে আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্ক অধিকতর গুরুত্বের অধিকারী। আল্লাহ পাকের সম্পর্কের প্রতি প্রাধান্য দিলে হিজরত করা সহজ হয় আর মানুষের সাথে সম্পর্কের উপর প্রাধান্য দিলে হিজরত করা কঠিন হয়।[৩]

১। তফসীরে মাজেদী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৯৭

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২০৬

তফসীরে বয়ানুল কোরআন, পৃষ্ঠা-৩৯২

আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, আত্মীয়-স্বজন প্রিয়জনের প্রতি ভালবাসা যদি আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের চেয়ে অধিকতর হয় তবে আল্লাহর আযাবের আদেশ জারী হবার অপেক্ষা কর।

তফসীরকারগণ বলেছেনঃ প্রীতি ও ভালবাসা দু' প্রকার।

(এক) যে ভালবাসা মানুষের স্বভাবগত হয়, যা মানুষের ইচ্ছাশক্তির আওতার বাইরে থাকে।

(দুই) আরেকটি প্রীতি ভালবাসা হ'ল মানুষের ইচ্ছাকৃত।

আলোচ্য আয়াতে যে ভালবাসার কথা বলা হয়েছে তা মানুষের ইচ্ছাকৃত, আর স্বভাবগত ভালবাসা মানুষের জন্মগত। এজন্যে এমন ভালবাসা থেকে নিজেকে দূরে রাখা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়না।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বলেছেনঃ পরিপূর্ণ ঈমান হ'ল মানুষের স্বভাব, মেজাজ, রুচি সম্পূর্ণ শরীয়তের অনুগত হওয়া অর্থাৎ মানুষের মেজাজের চাহিদা তাই হওয়া যা শরীয়তের বিধান।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে ভালবাসে আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে দুশমনী করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই দান করে, আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই দান করা থেকে বিরত থাকে সে-ই তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করল। (তিরমিজী)

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকৃত মোমেন হতে পারবেনা যে পর্যন্ত তার নিকট আমি তার পিতা পুত্র এবং সমস্ত লোকের চেয়ে অধিকতর প্রিয় না হই।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তিনটি কথা এমন যার মধ্যে এ তিনটি কথা পাওয়া যাবে সে ঈমানের স্বাদ পাবে।

(এক) আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার নিকট সবচেয়ে প্রিয় হবে।

(দুই) কারো সাথে যদি তার মহব্বত থাকে তবে তা শুধু আল্লাহ পাকের জন্যে থাকবে, আর কারো সাথে যদি শত্রুতা থাকে তবে তাও হবে শুধু আল্লাহ পাকের জন্যে।

(তিন) যখন আল্লাহ পাক তাকে কুফরী থেকে নাজাত দিয়েছেন তখন পুনরায় কুফরীতে প্রত্যবর্তন করা এত মন্দ জানে যেমন অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে বিপদজনক জানে। ঈমানের স্বাদ লাভের তাৎপর্য হ'ল যেমন মানুষের মন অনেক সুস্বাদু বস্তু খেতে চায়, খেতে পারলে স্বাদ পায় ঠিক তেমনিভাবে ঈমানের কারণে মানবাত্মা শান্তি, তৃপ্তি এবং স্বাদ লাভ করে। এ অবস্থা তখন হয় যখন পুন্যাত্মা লোকদের সান্নিধ্য নছীব হয়। মানুষ যখন আধ্যাত্মিক সাধনা করে আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে সর্বাত্মক চেষ্টা করে এবং বিরত রাখে।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ পাকের বিধান সমূহ পালনে সর্বদা তৎপর থাকে এবং উভয় কাজে পরিপূর্ণ অনুসরণ করে প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনিন্দ-সুন্দর আদর্শের, তখন তার অন্তর পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন হয়। এ পথে সাধনা যত বৃদ্ধি পাবে অন্তরের পবিত্রতা ততই বৃদ্ধি পাবে। তার পাশাপাশি লাভ হবে আধ্যাত্মিক শক্তি। এভাবে আল্লাহর পথের সাধক আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ করবে। আল্লাহ্ পাকের নৈকট্যের কোন সীমা নির্দিষ্ট নেই। তাঁর রহমত অনন্ত, তাঁর নেয়ামত অসীম, তাঁর নৈকট্যও সীমাহীন। তাই এ সাধনার শেষ নেই। আল্লাহ পাক যাকে যতখানি তৌফিক দান করেন সে ততমঞ্জিল পার হতে পারে। এ পর্যায়ে সর্বোচ্চ এবং শীর্ষ স্থানে রয়েছেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যেখানে তাঁর অবস্থান, সেখানে আর কেউ পৌছতে পারে নাই। তাই তিনি বলেছেনঃ

لِيْ مَعَ اللّٰهِ وَقْتٌ لَا يَسَعُهُ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ

আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে আমার একটি বিশেষ সময় রয়েছে যখন নৈকট্য- ধন্য কোন ফেরেশতা বা কোন নবী রসূলও দরবারে হাজির হতে পারেননা।

মূলতঃ এটি এমনি একটি অবস্থান যার বিবরণ দেয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক এবং তাঁর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামই অবগত।

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ

আর আল্লাহ পাক নাফরমান সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।

অর্থাৎ যারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য, নাফরমান তাদেরকে আল্লাহ পাক তাঁর মারেফাতের পথ প্রদর্শন করেননা।

ইমাম রাজী (রঃ) ও অন্যান্য তফসীরকারগণ বলেছেনঃ এ আয়াতেও নাফরমানদের জন্যে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

ইমাম বয়জাভী (রঃ) এ আয়াত সম্পর্কে বলেছেনঃ এতে রয়েছে বিশেষ সতর্কবাণী এবং খুব কম সংখ্যক লোকই এমন অন্যায় থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে।[১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আলুসী (রঃ) বলেছেনঃ মোশরেকদের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ অমান্যকারীদেরকে তিনি পথ প্রদর্শন করেন না। অথবা, এ আয়াতে সকল ফাছেক বা পাপীষ্ঠদের সম্পর্কেই রয়েছে সতর্কবাণী যে, আল্লাহ পাক সে সব লোককে সরল সঠিক পথের তৌফিক দান করেন না যারা অবাধ্য, নাফরমান।

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ۙ وَّيَوْمَ
حُنَيْنٍ ۙ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْـًٔا وَّضَاقَتْ
عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ ۚ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ اَنْزَلَ
اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا
لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٦﴾
ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٧﴾

তরজমা

(২৫) নিশ্চয় আল্লাহ পাক অনেক ক্ষেত্রেই তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন এবং হোনাইনের যুদ্ধের দিনেও, যখন তোমরা তোমাদের সংখ্যা গরিষ্ঠতায় উৎফুল্ল হয়েছিলে। কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসে নাই এবং বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-১৯

১। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৭১

পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং পরে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে।

(২৬) অতঃপর আল্লাহ পাক তাঁর রসূল এবং মোমেনদের উপর শান্তি নাজিল করেন এবং এমন সেনা বাহিনী অবতরণ করেন যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি এবং তিনি কাফেরদেরকে শাস্তি দেন, আর এটিই কাফেরদের কর্মফল।

(২৭) অতঃপর আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে তওবার সৌভাগ্য দান করবেন আর আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদের কথা বলা হয়েছে, এমনকি যদি সত্যের জন্যে, ন্যায়ের জন্যে, ইসলামের জন্যে স্ত্রী, পুত্র পরিবার, বাড়ী-ঘর, ব্যবসা-বানিজ্য ছেড়ে দিতে হয় তবুও অকুণ্ঠচিত্তে এমন ত্যাগ তিতিক্ষার পরিচয় দেয়া মর্দে মোমেনের কর্তব্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এর দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, পার্থিব জীবনের লোভনীয় বিষয় সমূহ যারা দ্বীনের প্রয়োজনে পরিত্যাগ করে আল্লাহ পাক তাদেরকে দ্বীন দুনিয়া উভয়টিই দান করেন।

পক্ষান্তরে, যখন মানুষ দুনিয়ার দ্রব্য সম্ভারের উপর ভরসা করে তখন দ্বীন দুনিয়া উভয়টিই তার বিনষ্ট হয়। যেমন হোনায়েনের যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল বার হাজার, ইসলামের ইতিহাসে এত অধিক সংখ্যক লোক ইতিপূর্বে কোন দিনও মুসলিম বাহিনীতে শরীক হয়নি। তাই মুসলমানদেরকে এই অভূতপূর্ব দৃশ্য উৎফুল্ল করে। আর আল্লাহ পাকের প্রতি নির্ভরতার স্থলে সংখ্যা-নির্ভরতার ভাব পরিলক্ষিত হয় যা আল্লাহ পাক পছন্দ করেননি। তাই মুসলমানদেরকে সতর্ক করার জন্যে আল্লাহ পাক অল্পক্ষণের মধ্যেই কাফেরদের মোকাবেলায় মুসলমানদেরকে বিপদগ্রস্থ করেন। সংখ্যায় অধিক থাকা সত্ত্বেও কাফেরদের অতর্কিত তীর বর্ষণের কারণে মুসলমানদের পক্ষে রণাঙ্গনে টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। শুধু প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর নৈকট্য-ধন্য অল্প সংখ্যক সাহাবায়ে কেরামই রণাঙ্গনে অটল অবিচল ছিলেন। আলোচ্য আয়াতে এই ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।[১]

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-২০

মূলতঃ মোমেন আশা করে শুধু আল্লাহ পাকের কাছে, তার ভরসা শুধু এবং শুধু আল্লাহ পাকের প্রতিই। অন্য কারো প্রতি আশা ভরসা করারতো প্রশ্নই ওঠেনা, যদি সে নিজের ওপরও নির্ভর করতে চায় বা নিজেদের সংখ্যা গরিষ্ঠতায় গর্বিত হয় তবুও সাফল্যের আশা সুদূর পরাহত। মোমেন সফলকাম হয় তার ধনবল, জনবল বা অস্ত্র বলে নয়; বরং একমাত্র আল্লাহ পাকের সাহায্য সহায়তায়। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক বিশ্ব মুসলিমকে এই শিক্ষাই দিয়েছেন। হোনায়েনের যুদ্ধের ঐতিহাসিক ঘটনা পবিত্র কোরআনের এই মহান শিক্ষার জীবন্ত স্বাক্ষর।

অতএব, মুসলমান তার জনবল বা অস্ত্র বলের দিকে নজর দিবে না; বরং তার নজর থাকবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের প্রতি, হোনায়েনের যুদ্ধে দশ হাজার আনসার ও মোহাজেরীন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন যে দু' হাজার মক্কাবাসী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এই নও-মুসলিমগণও হোনায়েনের যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। বার হাজার লোকের মধ্যে কারো মুখ থেকে এই বাক্যটি উচ্চারিত হয়েছিল-

لن نغلب اليوم من قلة

"আজ আমরা সংখ্যা লগিষ্ঠতার কারণে পরাজিত হবোনা"-এ কথাটি আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় হয়নি। কেননা আল্লাহ পাকের রহমত এবং সাহায্যের প্রতি লক্ষ্য করা হয়নি, বরং নিজেদের সংখ্যা গরিষ্ঠতাই তখন লক্ষ্যনীয় ছিল। যাহোক, যখন যুদ্ধ শুরু হলো তখন মুসলমানগণ দুশমনের মুষলধারে বৃষ্টির ন্যায় নিক্ষিপ্ত তীরের আঘাত সহ্য করতে পারলেন না, নও-মুসলিমগণ ছিলেন সম্মুখে তারা যখন পিছু হটতে লগলেন, তখন তাদের পেছনে যারা ছিলেন তারাও পিছ পা হলেন। ঐ সময় হযরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে দুশমনের মোকাবেলা করলেন তিনি তখন বলেছিলেন-

انا النبى لا كذب انا ابن عبد المطلب

"আমি সত্য নবী, আর আমি আবদুল মোত্তালিবের পৌত্র।" হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে আদেশ দিয়েছিলেন মুসলমানদেরকে ডাক দেয়ার জন্যে। হযরত আব্বাস (রাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট ডাক দিলেন। হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর ডাক শ্রবণ করে সাহাবায়ে কেরাম প্রত্যাবর্তন করলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট। পূর্বে যে ভুল হয়েছিল তার জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হলেন, এরপর সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাকের সাহায্য এবং রহমত নাজিল হল।

মুসলমানদের পরাজয় আল্লাহ পাকের রহমতে বিজয়ে পরিণত হলো। ছয় হাজার মহিলা এবং শিশু বন্দী হয়ে আসলো, ৪০ হাজারের চেয়েও বেশী বকরী এবং ২০ হাজার উষ্ট্র এবং আরো অন্যান্য অনেক দ্রব্য সম্ভার মুসলমানদের হস্তগত হলো। তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ۙ

নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তোমাদেরকে অনেক ক্ষেত্রেই সাহায্য করেছেন। যেমন বদর, ওহোদ, আহযাব, খায়বর রণাঙ্গনে এবং মক্কা বিজয়ে আল্লাহ পাকের সাহায্যের কারণেই তোমরা বিজয় লাভ করেছ।

وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ

আর হোনায়েনের দিনেও আল্লাহ পাক তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন, যখন তোমরা তোমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় উৎফুল্ল ছিলে। কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি। নিজের প্রসার সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়ে যায় এবং তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে সরে যাও।

হোনায়েনের ঘটনা

হোনায়েন মক্কায়ে মোয়াজ্জমা এবং তায়েফের মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি স্থানের নাম। অষ্টম হিজরীর রমজান মাসে যখন আল্লাহ পাক মক্কা বিজয় দান করলেন,তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সংবাদ পেলেন যে, হাওয়াজেন এবং সাকিফ গোত্রের কাফেররা হোনায়েন নামক স্থানে একত্রিত হচ্ছে। তারা মনে করেছে মক্কা বিজয়ের পর হয়ত মুসলমানগণ তাদের ওপর আক্রমন করবেন। মালেক এবনে আওফ বিভিন্ন গোত্রের সঙ্গে পরামর্শ করে লোকদেরকে একত্রিত করে। (মালেক এবনে আওফ অবশ্য পরে ইসলাম গ্রহণ কারেন) তাদের সঙ্গে বণী সাকিফ, নজর এবং জসম গোত্রও একত্রিত হয়। আর বণী হেলাল গোত্রের কিছু লোক তাদের সঙ্গে শরীক হয়। হাওয়াজেন গোত্রের বণী কাব এবং বণী কেলাব আসেনি।

এবনে আবি বরা তাদেরকে এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছে। সে বলেছে, প্রাচ্যে এবং প্রতীচ্যে যে কেউ মোহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বিরোধীতা করবে সে পরাজিত হবে। (অতএব, তার মোকাবেলা করা নিরর্থক) বণী জসম গোত্রের সরদার ছিল দারিদ এবনে সুম্মা। তার বয়স হয়েছিল ১৬০ অথবা ১২০ বছর। সে বিখ্যাত কবি এবং অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিল। গোত্রের লোকেরা তাকেই

সেনাপতি বানাবার ইচ্ছা করলো। কিন্তু সে বললো দেখ, আমার দৃষ্টি শক্তি চলে গেছে। আমি যান বাহনের উপর সঠিকভাবে বসতেও পারিনা। তবুও তোমাদেরকে পরামর্শ দেয়ার জন্যে আমি সঙ্গে থাকবো। কিন্তু শর্ত হলো এই তোমরা আমার বিরোধীতা করবেনা। যদি তোমরা আমার পরামর্শের বরখেলাফ কাজ কর তবে আমি তোমাদের সঙ্গে যাবনা। তখন হাওয়াজেন গোত্রের সরদার ৩০ বছর বয়স্ক যুবক মালেক এবনে আওফ একথার জবাব দিয়ে বললো আমরা আপনার পরামর্শের বিরোধীতা করবো না।

এদিকে মালেক এবনে আওফের নির্দেশক্রমে সকলে তাদের স্ত্রী-পুত্র পরিবারবর্গ এমনকি উষ্ট্র বকরীসহ রওয়ানা হলো। তখন দারিদ এবনে সুম্মা বললো আমি শিশুদের ক্রন্দন শব্দ শ্রবণ করছি এর সঙ্গে উষ্ট্র, বকরী গাভীর চিৎকারও শ্রবণ করছি এর কারণ কি? লোকেরা বললো মালেকের আদেশক্রমে আমরা এসব একত্রিত করেছি। তখন দারিদ মালেককে জিজ্ঞাসা করলো তুমি এ সব কেন একত্রিত করেছ?

সে বললো, আমি মনে করেছি প্রত্যেকের পরিবারবর্গ সঙ্গে থাকলে তাদের হেফাজতের খাতিরে সকলেই প্রানপনে যুদ্ধ করবে, কেউ পলায়ন করবে না। তখন দারিদ বললোঃ যুদ্ধে তোমাদের পুরুষদের তরবারি এবং বর্শাই উপকারী হবে। পরিবারবর্গ কোন কাজে আসবে না। অতএব, তোমরা এদেরকে সঙ্গে নিয়ে যেয়োনা, বরং কোন সংরক্ষিত স্থানে তাদেরকে রেখে যাও। যদি যুদ্ধে জয় হয় তবে তারা তোমাদের সঙ্গে এসে একত্রিত হবে। আর যদি পরাজিত হও তবুও তাদের কোন ক্ষতি হবেনা, তারা হেফাজতে থাকবে, আর এতদসত্ত্বেও যদি তোমরা তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাও, তবে তোমরা পরাজিত হলে 'এরা গোলাম বাঁদীরূপে পরিণত হবে।

কিন্তু হাওয়াজেন গোত্রের সরদার মালেক একথা মানলো না। সে বললো আপনি বুড়ো হয়েছেন, আপনার বুদ্ধিও বুড়ো হয়ে গিয়েছে। এরপর মালেক বললো এতদভিন্ন আপনার কাছে অন্য কোন পরামর্শ আছে কিনা? দারিদ বললো তোমার সৈন্যদের কিছু অংশ কোথাও গোপন করে রাখো, যুদ্ধ শুরু হলে যেন তারা দুশমনের পেছন থেকে হামলা করে। তোমরা তোমাদের দলবল নিয়ে সম্মুখে থেকে যুদ্ধ করবে। দারিদের পরামর্শ মোতাবেক কিছু সৈন্যকে সে গোপন করে রাখলো। এদিকে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অষ্টম হিজরীর ৬ই শাওয়াল, রোজ শনিবার মক্কা শরীফ থেকে রওয়ানা হলেন। হযরত সোহায়েল এবনে হানযালা (রাঃ) বর্ণনা করেন, (পথিমধ্যে) একজন অশ্বারোহী হাজির হয়ে আরজ করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমি অমুক পাহাড়ের উপর আরোহন করে দেখেছি হাওয়াজেন গোত্র তাদের স্ত্রী পুত্র পরিজনসহ উষ্ট্র এবং বকরী নিয়ে একত্রিত হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ খবর শ্রবণ করে মুসকি হেসে বললেনঃ এ সবই

মুসলমানদের মালে গনিমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) হবে, এরপর এরশাদ করলেনঃ আজ রাত্রে প্রহরী কে হবে? তখন হযরত আনাস এবনে মালেক (রাঃ) বললেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমি এ দায়িত্ব পালন করবো। তখন তিনি এরশাদ করলেন, তুমি এই ঘাটির উপরে চলে যাও। সেখানে প্রহরায় রত থাক। তোমার সামনে যারা রয়েছে তাদের ব্যাপারে গাফেল হয়োনা। সকালে যখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাজ সুসম্পন্ন করেন, তখন হযরত আনাস (রাঃ) এসে বললেনঃ আমি রাতের প্রহরার দায়িত্ব পালন করেছি, সকালে আমি চতুর্দিকে লক্ষ্য করেছি, কিন্তু সেখানে কোন লোক নেই, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ তোমার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব হয়েছে। এরপর যদি তুমি কোন আমল না-ও কর তবুও কোন ক্ষতি হবে না। (অর্থাৎ এই রাত্রে তুমি যে দায়িত্ব পালন করেছ তার কারণে তুমি জান্নাতের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে)

(আবু দাউদ, নেসায়ী।)

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ নামক এক ব্যক্তিকে হাওয়াজেন গোত্রের অবস্থা জানার জন্যে প্রেরণ করলেন। তিনি দুশমনদের সঙ্গে মিশে গেলেন এবং হাওয়াজেন গোত্রের সরদার মালেককে একথা বলতে শুনেছেন যে, মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কোন যুদ্ধবাজ সম্প্রদায়ের সঙ্গে লড়াই করেননি। যারা যুদ্ধে পারদর্শী ছিলনা এমন লোকদের সঙ্গেই তাঁর মোকাবেলা হয়েছে। এজন্যে তিনি জয়ী হয়েছেন। সকালে তোমরা তোমাদের স্ত্রী এবং শিশুদেরকে তোমাদের পেছনে কাতার বন্দী করে দেবে এবং তোমরা ২০ হাজার তরবারি নিয়ে দুশমনের উপর এক সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

আবু নাইম এবং বায়হাকী বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ১০ই শাওয়াল মঙ্গলবার হোনায়েন পৌছেন।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোযেজা

মালেক এবনে আওফ হাওয়াজেন গোত্রের তরফ থেকে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সঙ্গীদের অবস্থা জানার জন্যে তিনজন লোক প্রেরণ করলো। যখন তারা মুসলমানদের অবস্থা দেখে প্রত্যাবর্তন করলো তখন তাদের অবস্থা এমন হলো যেন তাদের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একটি থেকে অন্যটি বিচ্ছিন্ন হতে চায়। তারা অত্যন্ত দুর্বল এবং ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে পড়লো। এই অবস্থা দেখে হাওয়াজেন গোত্রের সরদার মালেক এবনে আওফ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলো,

তোমাদের কি হয়েছে? তারা বললোঃ আমরা কিছু গৌর বর্ণের লোক দেখেছি, যারা ধূসর বর্ণের অশ্বে আরোহী ছিল। তাদেরকে দেখার পর আমরা সম্পূর্ণ শক্তিহীন হয়ে পড়েছি, আমাদের এ অবস্থা হয়েছে যা তোমরা দেখছ। আল্লাহর শপথ! আমাদের যুদ্ধ জমিনবাসীর সঙ্গে হবেনা, আমাদেরকে আসমানবাসীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। মালেক বললোঃ আমাদের সৈন্য বাহিনীর মধ্যে তোমরা সবচেয়ে বেশী কাপুরুষ। এরপর সে তাদেরকে বন্দী করে রাখলো যেন তাদের কারণে সৈন্য বাহিনীর মধ্যে ভয় ভীতি সঞ্চারিত না হয়। অতঃপর সে বললো, আমাকে একজন সাহসী ব্যক্তি দাও যে দুশমনের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আমাদেরকে ওয়াকেফহাল করবে।

এক ব্যক্তি নির্বাচিত হয়ে প্রেরিত হলো। সে-ও প্রত্যাবর্তন করে একই কথা বললো আর তারও অনুরূপ অবস্থা হলো।

মোহাম্মদ এবনে ওমর বর্ণনা করেন, রাতের শেষ প্রহরে হোনায়েন রণাঙ্গনে মালেক এবনে আওফ তার সৈন্যদেরকে দাড় করিয়ে দেয়। এদিকে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হয়ে রণাঙ্গণে আগমন করেন এবং মুসলমানদেরকে বিজয়ের খোশ খবরী দেন এই শর্তে যে, সকলে অটল অবিচল হয়ে যুদ্ধ করবে।

এবনে মরদবীয়া হযরত আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হোনায়েনের যুদ্ধের দিন মক্কা শরীফ এবং মদীনা শরীফের লোকেরা যখন একত্রিত হলেন তাদের সংখ্যাধিক্যের প্রতি লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন আজ একটা যুদ্ধ হবে। একজন আনসারী যুবক বললেনঃ "আজ আমাদের সৈন্য সংখ্যা কম হওয়ার কারণে আমরা পরাজিত হবো না। যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুশমন পলায়নে বাধ্য হবে।" হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ কথা পছন্দ করেননি। তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا

অর্থাৎ তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোন কাজে আসেনি তথা দুশমনের মোকাবেলায় তোমাদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা উপকারী হয়নি। তোমাদের জন্য এ পৃথিবী যেন সংকীর্ণ হয়ে পড়ে; এরপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন কর।

এবনে এসহাক ইমাম আহমদ এবং এবনে হাব্বান হযরত জাবের (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত জাবের (রাঃ) বলেনঃ আমরা যখন হোনায়েনের রণাঙ্গনে উপস্থিত হই আমরা উপর থেকে নিচের দিকে যেতে থাকি। পথ ছিল

সংকীর্ণ, দুশমনের লোকেরা পূর্বাহ্নেই গোপন স্থানে ওঁৎ পেতে বসেছিল। আমরা যখন সেখানে উপস্থিত হই তখন দুশমনেরা অতর্কিতভাবে আমাদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। যখন বণী সলিম গোত্রের সম্মুখ ভাগের লোকেরা পলায়নপর হলো, তখন যারা তাদের পেছনে ছিল তারাও পলায়ন করলো। এভাবে মুসলমানদের শৃংখলা বিনষ্ট হলো। আর বালু এভাবে উড়তে লাগলো যে, আমরা কেউ আমাদের নিজের হাত পর্যন্ত দেখতে পারছিলাম না। ঐ সময় হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এ কথা বলে ডাক দিলেনঃ "হে লোক সকল! তোমরা আমার দিকে আস, আমি আল্লাহর রসূল, আমি মোহাম্মদ এবনে আবদুল্লাহ।"

বোখারী এবনে আবি শায়বা এবনে মরদবীয়া এবং বায়হাকী এবনে এসহাকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি হযরত বরা এবনে আজেবকে জিজ্ঞাসা করেছিল হে আবু আমারা! আপনি কি হোনায়েনের যুদ্ধ থেকে পলায়ন করেছিলেন?

হযরত বরা বললেনঃ না। আল্লাহর শপথ! হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেননি। তবে কিছু সাহাবায়ে কেরাম যাদের কাছে অস্ত্র শস্ত্র ছিলনা এবং যুদ্ধ হয়েছে ঘোরতর এমনি অবস্থায় দুশমন যখন প্রাণপন হামলা করে তখন কিছু লোক পলায়ন করে। আর কিছু লোক যুদ্ধ লব্ধ সম্পদের দিকে আকৃষ্ট হয়, এ সময়ে দুশমন তীর ধনুক নিয়ে সম্মুখে এসে হাজির হয়, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন সাদা বর্ণের খচ্চরের ওপর আরোহী ছিলেন। আবু সুফিয়ান তাঁর খচ্চরের লাগাম ধরেছিল। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অশ্বের পৃষ্ঠ থেকে নীচে অবতরন করলেন এবং আল্লাহ পাকের সাহায্যের জন্য দোয়া করতে থাকলেন।

এবনে এসহাক বর্ণনা করেন যখন মুসলমানগণ এদিক সেদিক চলে গেলেন তখন যে সব লোক প্রকাশ্যে মুসলমান হয়েছিল কিন্তু তাদের অন্তরে ইসলামের শত্রুতা ছিল তারা আপত্তিকর মন্তব্য করতে লাগলো।

এবনে সাদ এবনে এসহাকের এবং আবদুল মালেক এবনে ওবায়দুল্লাহর সূত্রে, নাইম একরামার সূত্রে বর্ণনা করেন, শায়বা এবনে ওসমান বলেছেনঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের পর হোনায়েনের জেহাদে গমন করলেন। আমি চিন্তা করলাম আমার এ সময় হাওয়াজেনের দিকে অগ্রসর হওয়া উচিত। যখন মুসলমানগণ হাওয়াজেন গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধরত হবে এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে গাফলতে থাকবে তখন আমি তাঁর ওপর আক্রমন করবো। আমার পিতা ওসমানকে হামজা হত্যা করেছিল সে কথা আমি ভুলতে পারিনি। আমি মনে মনে বললাম, আজ আমি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে প্রতিশোধ নেব। যদি সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষও তাঁর অনুসারী হয় তবুও আমি তাঁর অনুসরণ করবো না। যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়াসাল্লামের লোকজন পলায়ন করলো তখন আমি সুযোগের সন্ধান করতে লাগলাম। আমি তাঁর ডান দিকে গমন করে দেখলাম সেদিকে আব্বাস (রাঃ) অত্যন্ত চমৎকার যুদ্ধাস্ত্র পরিধান করে দন্ডায়মান রয়েছেন। আমি ভাবলাম তিনিতো মোহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) পিতৃব্য। কাজেই তিনি অবশ্যই তাঁর সাহায্য করবেন। আমি বাঁ দিকে চলে গেলাম যেখানে আবু সুফিয়ান এবনে হারেস উপস্থিত ছিলেন। তিনিও তাঁর পিতৃব্য পুত্র। অতএব, তাঁকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। এরপর আমি তাঁর পশ্চাতে হাজির হলাম। সেখানে কোন বাধা ছিল না। আমি হামলায় উদ্যত হলাম। কিন্তু আমি দেখলাম সেখানে বিদ্যুতের ন্যায় অগ্নি শিখা বের হচ্ছে। আমার ভয় হলো যে, অগ্নি শিখা আমার ওপর পড়বে, আমার মনে হলো যে, আমি আমার দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলবো। তাই আমার হাত নয়ন যুগলের ওপর রাখলাম এবং পিছ পা হলাম। আর এ সত্য উপলব্ধি করলাম যে, (আল্লাহর তরফ থেকে) তাঁর হেফাজত হচ্ছে। এরপর তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে এরশাদ করলেনঃ শায়বা এখানে আস। আমি তাঁর নিকটবর্তী হলাম। তখন তিনি তাঁর হাত মোবারক আমার বক্ষে রেখে বললেনঃ হে আল্লাহ! এর নিকট থেকে শয়তানকে দূর করে দাও। আমি সঙ্গে সঙ্গে মাথা উত্তোলন করলাম। তখন তাঁর আকৃতি আমার কাছে আমার কর্ণ, চক্ষু এবং অন্তর থেকেও প্রিয় মনে হলো। এরপর তিনি এরশাদ করলেনঃ "শায়বা কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ কর।"

তখন আমি সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হলাম এবং ঐ মূহুতে আমার অন্তরে এ আকাংখা হলো যে সকল প্রকার কষ্ট থেকে তাঁকে রক্ষা করার জন্যে আমি আমার প্রান উৎসর্গ করি যখন হাওয়াজেন গোত্র পরাজিত হলো এবং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বস্থানে আগমন করলেন তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ আল্লাহ পাকের শোকর, যিনি তোমাকে কল্যাণ দানের ইচ্ছা করেছেন (অর্থাৎ যিনি তোমাকে খাঁটি ঈমান দান করেছেন।) এরপর তিনি সে কথা বর্ণনা করেছেন যার ইচ্ছা আমি করেছিলাম।

মোহাম্মদ এবনে ওমর বর্ণনা করেন যে, হযরত নজর এবনে হারেস বলেছেন, আল্লাহ পাকের দরবারে শোকর যে তিনি আমাদেরকে ইসলাম গ্রহণের তৌফিক দিয়ে সম্মানিত করেছেন এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করে আমাদের প্রতি এহসান করেছেন, আর আমরা সে অবস্থায় (শেরক অবস্থায়) মৃত্যু বরণ করিনি যে অবস্থায় আমাদের পিতা পিতামহের মৃত্যু হয়েছে। হযরত নজর (রাঃ) বলেছেন, আমি কোরায়েশের কয়েকজন লোকের সঙ্গে ছিলাম যারা নিজেদের ধর্মে কায়েম ছিল। তাদের মধ্যে আবু সুফিয়ান এবনে হারব, এবনে উমাইয়া, এবনে আমর ছিল। আমাদের ইচ্ছা ছিল যে, যদি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরাজয় হয় তবে আমরা তাদের সঙ্গে থাকবো যারা পরাজিত লোকদেরকে লুণ্ঠন করবে। আমরা মোশরেকদের মতাবলম্বী ছিলাম। যখন দু'দলে যুদ্ধ শুরু হলো,

হাওয়াজেন গোত্র অতর্কিতভাবে আক্রমণ পরিচালনা করলো আমরা মনে করলাম মুসলমানগণ এ আক্রমণ সইতে পারবেনা আমরা সৈন্যদের সঙ্গে মিশে ছিলাম। আমার ইচ্ছা মোহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ব্যাপারেই ছিল, যার পরিকল্পনা আমি করেছিলাম। এই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করতে যখন আমি উদ্যত হলাম তখন দেখি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটি সাদা খচ্চরের উপর আরোহন করে মোশরেকদের সম্মুখে দন্ডায়মান রয়েছেন। এবং কয়েকজন গৌর বর্ণের চেহারা বিশিষ্ট লোক তাঁর চারিপার্শে রয়েছেন। আমি আমার ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্যে যখন মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দিকে অগ্রসর হই তখন ঐ লোকেরা চিৎকার দিয়ে বলে ওদিকেই থাক, এদিকে অগ্রসর হবে না। তাদের চিৎকার শ্রবণ করে আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কম্পন শুরু হলো, আমি মনে মনে বললাম এ অবস্থাতো বদরের দিনও হয়েছিল। এরপর আমি উপলব্ধি করলাম যে, এ ব্যক্তি সত্যের ওপর সু-প্রতিষ্ঠিত, (গায়েব থেকে) তাঁর হেফাজত করা হয়। ঐ মুহূর্তে আল্লাহ পাক আমার অন্তরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করে দিলেন। আর আমি আমার পূর্ববর্তী ইচ্ছা বাতিল করলাম।

মোহাম্মদ এবনে ওমর হযরত আবু কাতাদা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন দ্রুতগামী কিছু লোক ২৪ ঘন্টার মধ্যে মক্কায় পৌছে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পয়াজয়ের কথা মক্কাবাসীকে জানালো। হযরত আত্তাব (রাঃ) তখন মক্কার শাসনকর্তা ছিলেন, আর তাঁর সঙ্গে ছিলেন হযরত মা'আজ এবনে জবল (রাঃ)। তাঁরা এ খবর শ্রবণ করে অত্যন্ত চিন্তিত হলেন তখন মক্কায় এমন লোকও ছিল যারা এ খবরে আনন্দিত হয়েছে। এক ব্যক্তি বললো এখন আরববাসী পুনরায় তাদের পূর্ব পুরুষের ধর্মের দিকে ফিরে আসবে যখন মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মৃত্যু হয়েছে তখন তাঁর লোকজনও এদিক সেদিক হয়ে যাবে। হযরত আত্তাব বলেন, যদি হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শাহাদত বরণ করে থাকেন তবে তিনি যাঁর বন্দেগী করতেন তিনিতো জীবিত আছেন। তাঁর মৃত্যু নেই, দিন এভাবেই অতিবাহিত হলো। সন্ধার দিকে খবর আসলো যে, হাওয়াজেন গোত্র পরাজিত হয়েছে। এ খবর শ্রবণ করে হযরত আত্তাব (রাঃ) এবং হযরত মা'আজ এবনে জবল (রাঃ) অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। আর পূর্বেকার সংবাদ পেয়ে যারা আনন্দিত হয়েছিল আল্লাহ পাক তাদেরকে অপমানিত করলেন।

মোহাম্মদ এবনে ইউসুফ সালেহী বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুশমনের মোকাবেলায় রণাঙ্গনে একা ছিলেন কিছু লোক তাঁর পেছনে ছিলেন। আবু সুফিয়ান এবনে হারেস এবং হযরত আব্বাস (রাঃ) তাঁর খচ্চরের লাগাম ধরে ছিলেন। তিনি দুশমনের মোকাবেলা করছিলেন অটল অবিচল অবস্থায়।

সেদিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট কজন সাহাবী সুদৃঢ় এবং অটল ছিলেন এ সম্পর্কে একাধিক বর্ণনা পাওয়া যায়। হযরত আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে, সে কঠিন মুহূর্তে প্রায় ১০০ জন সাহাবায়ে কেরাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কাছে ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে, মোহাজের ও আনসারদের মধ্যে তখন ৮০ জন সাহাবায়ে কেরাম উপস্থিত ছিলেন।

আল্লামা নববী (রঃ) লিখেছেন, যারা সেদিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পার্শে অটল অবিচল ছিলেন তাঁদের সংখ্যা ছিল বারজন। আর হযরত আব্বাস এবনে আবদুল মোত্তালেব তাঁর এক কবিতায় উল্লেখ করেছেন, তাঁরা ছিলেন তখন দশজন, কবিতাটি হলো এই-

نصرنا رسول الله فى الحرب تسعة * وفرمن قد فرعنه فاقشعوا

وعاشرنا لا فى الحمام بنفسه * لمامسه فى الله لايتوجع

আমরা ন'জন সেদিন আল্লাহর রসূলের সাহায্য করেছি। আর যারা তাঁকে ছেড়ে পলায়ন করেছে তারা পলায়নপর হয়েছে। আমাদের দশম ব্যক্তি প্রাণপন মোকাবেলা করেছে মৃত্যুর। আল্লাহর রাহে সে যে কষ্ট পেয়েছে তা সে প্রকাশ করেনি।

সালেহী লিখেছেন, এই সংখ্যাটিই হয়ত সঠিক। যারা এর চেয়ে বেশী সংখ্যা লিখেছেন, তারা হয়ত সে সব লোককেও এ গননায় শামিল করেছেন যারা পলায়নের পর অনতিবিলম্বে প্রত্যাবর্তন করেছেন। এখানে উল্লেখ্য, সেদিন চার জন মহিলাও দুশমনের মোকাবেলায় অটল অবিচল ছিলেন। তাঁরা হলেন উম্মে আম্মারা, উম্মে সোলায়েত, উম্মে হারেস এবং উম্মে সলিম।[১]

শিক্ষনীয় বিষয়

হোনায়েনের যুদ্ধের এই ঘটনায় শিক্ষনীয় বিষয় হলো এই-মুসলমানদের এক আল্লাহ পাকের প্রতিই ভরসা করা উচিত। সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে, দুশমনের মোকাবেলা করার প্রয়োজনে যাবতীয় যুগপোযগী অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করা অবশ্যই কর্তব্য। কিন্তু অস্ত্র বল বা জন বলের ওপর কোন অবস্থাতেই ভরসা করা উচিত নয়।

এমনকি এসব বিষয়ে গুরুত্বআরোপ করাই উচিত নয়। কেননা জয় বা পরাজয় আসে এক আল্লাহ পাকের তরফ থেকে। আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমেই বিজয় লাভ হয়। আর যে আচরণ আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টির কারণ হয় তা পরাজয় বয়ে

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২০৭-১৭
তফসীরে এবন কাসীর (উর্দু) খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৪২-৪৪

আনে। অতএব, আল্লাহর সন্তুষ্টির অন্বেষণে সচেষ্ট থাকা হলো মুসলমান মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য।

দ্বিতীয়ত, যে কোন অবস্থায় হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপুর্ণ অনুসরণ একান্ত জরুরী। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর অনুসরণ না করা হলে জয় পরাজয়ে পরিণত হতে পারে। তার দৃষ্টান্ত রয়েছে ওহোদের যুদ্ধে। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ না করার কারণে তৃতীয় হিজরীতে অনুষ্ঠিত ওহোদের যুদ্ধে মুসলমানদেরকে দারুন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে। হোনায়েনের যুদ্ধেও এই একই কথা, যুদ্ধের প্রারম্ভেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েছিলেন এবং এজন্য শর্তারোপ করেছিলেন রণাঙ্গনে অবিচলিত থাকার। তাঁর প্রদত্ত এ শর্ত যথাযথভাবে পালন করা হলে এবং নিজেদের সংখ্যা গরিষ্ঠতার প্রতি লক্ষ্য না করে এক আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করলে এই অবস্থা হতো না। এটিই আলোচ্য আয়াতের মহান শিক্ষা। এখানে আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রানিধানযোগ্য, পবিত্র কোরআন সর্বকালের সকল মানুষের জন্যে শিক্ষনীয়।

পবিত্র কোরআনের আবেদন বিশ্বজনীন, পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা চিরন্তন, ঠিক এমনিভাবে প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিশ্বনবী, তাঁর মহান আদর্শ সর্বকালের মানুষের জন্যে। এমন নয় যে, তাঁর জীবদ্দশায় যারা তাঁর অনুসরণ করেছে তাঁরাই সফলকাম হবে, বরং এ পৃথিবী যত দিন আছে, আর এ পৃথিবীতে যতদিন মানুষের পদচারনা হবে ততদিনের জন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নবী এবং তাঁর মহান আদর্শ কেয়ামত পর্যন্ত একমাত্র গ্রহণযোগ্য, অনুসরণীয়, অনিন্দ-সুন্দর আদর্শ। যে যেখানে যতখানি তাঁর অনুসরণ করবে সে ততখানি সাফল্য লাভ করবে। বিশ্ব মানবের শান্তি, মুক্তি সার্বিক কল্যাণ এবং পরম সাফল্য নিহিত রয়েছে পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণে।

যিনি ছিলেন অটল অবিচল

হোনায়েনের যুদ্ধের সেই কঠিনতম বিপদময় পরিস্থিতিতে যখন বার হাজার সৈন্য এদিক সেদিক চলে গেলেন তখন যিনি দুশমনের বিরুদ্ধে একা অটল অবিচল হয়ে মোকাবেলা করলেন তিনি হলেন স্বয়ং হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। সেদিন তাঁর অদ্বিতীয় বীরত্ব ও সাহসিকতা, আল্লাহ পাকের প্রতি তাঁর অসাধারন নির্ভরতা দুশমনের মোকাবেলায় অবিচলতা এবং অদমনীয়তার এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়।

একদিকে চার হাজার শত্রুর আক্রমন, চারদিক থেকে তাদের তীর বৃষ্টি, আপন সঙ্গী সাহীদের পলায়ন নিঃসন্দেহে কষ্টদায়ক ছিল। কিন্তু এতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কর্ম তৎপরতা এতটুকু বাঁধা প্রাপ্ত হয়নি। কেননা তাঁর ভরসা ছিল একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের প্রতি। তাই দুর্ধর্ষ হাওয়াজেন গোত্রের অতর্কিত আক্রমণের সে কঠিন মুহূর্তে সকলে বিদায় নিলেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একা চার হাজার সৈন্য বাহিনীর মোকাবেলায় নির্ভিক চিত্তে দাড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন–

انا النبى لا كذب انا ابن عبد المطلب

"আমি সত্য নবী, আমি আবদুল মোত্তালিবের পৌত্র।" তাই আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে ক্ষণিকের মধ্যেই শান্তি এবং সান্তনা দান করলেন এবং পরাজয়কে বিজয়ে পরিণত করলেন। পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ

এরপর আল্লাহ পাক তাঁর রসূল এবং মোমেনদের ওপর শান্তি বর্ষন করেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে "সাকীনা" অর্থ আল্লাহর রহমত যার ফলে মুসলমানগণ জেহাদে সুদৃঢ় হন এবং সংরক্ষিত থাকেন, আর "আল মোমেনীন" শব্দ দ্বারা সেসব মুসললমানদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যারা কাফেরদের অতর্কিত আক্রমণের পর রণাঙ্গন থেকে এদিক সেদিক চলে গিয়েছিলেন।

তফসীরকারগণ একথাও বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে রসূলের উল্লেখ এজন্য করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যে শান্তি নাজিল হয়েছে তা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বরকতে এবং তাঁর উসিলাতেই হয়েছে।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে "মোমেনীন" বলতে সেসব মুসলমানকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যারা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পার্শে অটল অবিচল ছিলেন।

বায়হাকী দালায়েলে এবং তেবরানী, হাকেম ও আবু নাইম হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হোনায়েনের যুদ্ধের দিন আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম।। যখন লোকেরা তাঁকে ছেড়ে পলায়ন করে তখন আমিও ৮০ জন আনসার মোহাজেরের সঙ্গে অটল অবিচল ছিলাম, যদিও প্রায় ৮০ কদম চলেছি কিন্তু আমরা দুশমনকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিনি। ঐ ৮০ ব্যক্তির উপরই আল্লাহ পাক শান্তি তথা রহমত নাজিল করেছেন।

হযরত এবনে আকাবা বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খচ্চরের দু' রেকারের মধ্যে কদম মোবারক রেখে দন্ডায়মান অবস্থায় দু' হাত তুলে এভাবে মোনাজাত করলেন—হে আল্লাহ! আমি তোমাকে সেই ওয়াদার কথা বলছি যা তুমি আমার সাথে করেছ। হে আল্লাহ! আমাদের উপর তাদেরকে বিজয়ী করোনা। এরপর হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ হে আনসারের দল! হে বৃক্ষ তলে বয়য়াতকারীগণ! হযরত আব্বাস (রাঃ) অত্যন্ত উচ্চ কণ্ঠী ব্যক্তিছিলেন। তিনি বলেন যখন আমি এ বাক্যগুলো উচ্চ কণ্ঠে উচ্চারণ করলাম তখন আনসারগণ আমার আওয়াজ শ্রবণ করলেন। আল্লাহর শপথ! তারা এভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরে এলেন যেভাবে শিশুরা মায়েদের কাছে আসে।

ওসমান এবনে শায়বার বর্ণনায় রয়েছে। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আব্বাস (রাঃ)—কে এভাবে মোহাজেরীনদেরকে ডাক দেয়ার জন্যে বললেনঃ"যারা ষষ্ঠ হিজরীতে অনুষ্ঠিত হোদাইবিয়ার চুক্তির দিন বৃক্ষতলে বয়য়াত করেছিলেন", এভাবে আনসারগণকেও ডাক, "যারা মোহাজেরীনদেরকে এবং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সাহায্য করেছিলেন।"

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক মুষ্ঠি সাদা কংকর কাফেরদের প্রতি নিক্ষেপ করে বলেনঃ কাবা শরীফের প্রতিপালকের শপথ! তারা পরাজিত হয়েছে। সেদিন হযরত আলী (রাঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্মুখে অত্যন্ত বীর বীক্রমে যুদ্ধ করেন।

এবনে সাদ, এবনে আবি শায়বা, আহমদ এবং বগভী এবং আবু আবদুর রহমান ইয়াজিদ ফাহরীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন বলেছিলেনঃ হে লোক সকল! আমি আল্লাহর বন্দা এবং রসূল, এরপর তিনি অশ্ব থেকে অবতরণ করে দুশমনদের ভিতরে প্রবেশ করেন এবং এক মুষ্ঠি মাটি নিয়ে দুশমনদের চেহারার দিকে নিক্ষেপ করলে তাদের চেহারা বিকৃত হয়েযায়।

ইয়ালা এবনে আতা বর্ণনা করেন, যারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোকাবেলায় ছিল তাদের সন্তানেরা আমাদেরকে বলেছে, আমাদের পিতাগণ বলেছিলেন, আমাদের প্রত্যেকের চোখ এবং মুখ মাটি দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যায়। কোন তস্তরীর লৌহখন্ডে নিক্ষিপ্ত হলে যেমন শব্দ হয় আসমানের দিক থেকে আমরা এমনি শব্দ শ্রবণ করেছি। এভাবে আল্লাহ পাক হোনায়েনের রণাঙ্গনে দুশমনদেরকে পরাজিত করেছেন।

وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا

আর আল্লাহ পাক এমন সৈন্য অবতরণ করেন যা তোমরা দেখনা। সে সৈন্য বাহিনী ছিল ফেরেশতাদের। সাঈদ এবনে জোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করেন, হোনায়েনের দিন আল্লাহ পাক তাঁর রসূলের সাহায্য করেছেন পাঁচ হাজার ফেরেশতা প্রেরণের মাধ্যমে,যাঁরা ছিলেন চিহ্ন বিশিষ্ট।

এবনে এসহাক, এবনুল মুনজের, এবনে মরদবীয়া, আবু নাইম এবং বায়হাকী হযরত জোবায়ের এবনে মোতয়েমের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। শত্রু পক্ষের পরাজয়ের পূর্বে যখন লোকেরা যুদ্ধ রত ছিল আমি দেখলাম আসমানের দিক থেকে একটি কালো চাদর এসে মানুষের সামনে পড়ে গেল। সে চাদরের ভেতর থেকে অনেক পিপিলিকা বের হলো। আর তা সংখ্যায় এত বেশী ছিল যে ময়দানটি পিপিলিকা দ্বারা পুর্ণ হলো। আমি তখন ধারণা করলাম হয়ত এরা ফেরেশতা হবে। একটু পরেই দুশমন পরাজিত হলো।

মোহাম্মদ এবনে ওমর এহিয়া এবনে আবদুল্লাহর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আমরা সেদিন কালো চাদরের ন্যায় একটি জিনিস আসমান থেকে পড়তে দেখি। এরপর দেখি অনেক পিপিলিকা হোনায়েন রণাঙ্গনে ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা কাপড় দ্বারা পিপিলিকা গুলোকে ঝাড়তে লাগলাম। একটু পরেই দেখি যে আল্লাহ পাকের সাহায্যে আমরা বিজয় লাভ করেছি।

বায়হাকী এবং এবনে আসাকের আবদুর রহমানের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন তিনি বলেন, হোনায়নের যুদ্ধে একব্যক্তি মোশরেক অবস্থায় শরীক হয়েছিল। সে আমাকে বলেছে আমাদের মোকাবেলা যখন সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে হয়েছিল তখন তারা বেশীক্ষণ টিকতে পারেননি। হঠাৎ দেখি যে খচ্চরের উপরে আরোহী এক ব্যক্তি মোকাবেলায় আসলেন। তিনি ছিলেন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, আমাদের এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মধ্যে কিছু গৌর বর্ণের লোক বাধা হয়ে দাড়ায়, যারা আমাদেরকে বলে চেহারা বিকৃত হয়েছে, ফিরে যাও, আমরা সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসি। কিন্তু তারা আমাদেরকে গ্রেফতার করে।

এবনে মরদবীয়া, বায়হাকী এবং এবনে আসাকের বর্ণনা করেছেন, আমি হোনায়েনের দিন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গী হয়ে এসছিলাম। এজন্য নয় যে, আমি মুসলমান হয়েছি, বরং এ জন্যে যে হাওয়াজেন গোত্র কোরায়েশদের উপর বিজয়ী হোক তা আমার পছন্দনীয় ছিলনা। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পার্শে দন্ডায়মান ছিলাম। আমি ধুসর বর্ণের অশ্বের

উপর কিছু আরোহীকে দেখলাম। তখন আমি বললাম ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি ধূসর বর্ণের অশ্ব দেখছি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন এরশাদ করলেনঃ শায়বা, এ দৃশ্যতো শুধু কাফেররা দেখে। এরপর তিনি আমার বক্ষের ওপর দস্তে মোবারক দ্বারা আঘাত দিয়ে বললেনঃ হে আল্লাহ! শায়বাকে হেদায়েত করো। তিনি এভাবে তিনবার করলেন। আল্লাহর শপথ, তিনি যখন দ্বিতীয়বার আমার বক্ষে হাত রাখলেন তখনই আমার নিকট সমগ্র বিশ্বের মধ্যে তিনি সর্বাধিক প্রিয় মনে হয়। যাহোক, মুসলমানদের সঙ্গে কাফেরদের মোকাবেলা হয় যাদের শহীদ হওয়ার তারা শহীদ হয়। এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অগ্রসর হলেন তখন হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর খচ্চরের লাগাম ধরে ছিলেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) রেকাব ধরেছিলেন।

তিনি উচ্চ কণ্ঠে ডাক দিচ্ছিলেনঃ মোহাজেরগণ কোথায়?

আল্পক্ষণের মধ্যেই মুসলমানগণ একত্রিত হয়ে কাফেরদের মোকাবেলা করলেন।

وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ

আল্লাহ পাক কাফেরদেরকে শাস্তি দেন আর এটিই তাদের কর্মফল।

একদিকে মুসলমানগণ দ্রুতবেগে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট সমবেত হন, অন্যদিকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একমুষ্ঠি মাটি কাফেরদের দিকে নিক্ষেপ করেন যা আল্লাহ পাকের কুদরতে তাদের চোখে মুখে পতিত হয়। মুসলমানগণ এ সুযোগে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এর পাশাপাশি মুসলমানদের সাহায্যের জন্যে আল্লাহ পাক ফেরেশতা প্রেরণ করেন, ফলে মুসলমানদের মনবল শতগুনে বৃদ্ধি পায় ক্ষনিকের মধ্যে দৃশ্যের পরিবর্তন ঘটে। কাফেররা অপমানজনক শাস্তি ভোগ করে, আর তারা শুধু পরাজয় বরণই করে নি বরং তাদের ৭০ জন নিহত হয়েছে হাজার হাজার বন্দী হয়েছে। তন্মধ্যে শুধু স্ত্রী লোকই ছিল ছয় হাজার। এভাবে আল্লাহ পাক তাদেরকে শাস্তি দিয়েছেন। আর এটি তাদের কর্মফল ব্যতীত আর কিছুই নয়, কেননা কুফর ও নাফরমানীর শাস্তি হলো পরাজয়, অবমাননা।[১]

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২১৮-২০
তফসীরে মাজেদী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪০০

এবনে এস্‌হাক এবং মোহাম্মদ এবনে ওমর বর্ণনা করেন, পরাজিত হওয়ার পর মালেক এবনে আওফ এবং হাওয়াজেন গোত্রের কিছু লোক তায়েফে চলে আসে, এবং কিছু লোক আওতাছ নামক স্থানে অবস্থান করে, আর কিছু লোক নাখলায় গমন করে।

আল্লামা বগভী বর্ণনা করেন, মোশরেকরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করে "আওতাছ" নামক স্থানে পৌঁছে, সেখানে তাদের পরিবারবর্গ এবং গৃহপালিত পশু ছিল। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবু আমের নামক এক ব্যক্তিকে নেতা নির্বাচন করে মুসলমানদের এক দলকে আওতাছে প্রেরণ করেন, তাঁদের সঙ্গে মোশরেকদের লড়াই হয়। দারিদ এবনে সুম্মাহ নিহত হয়, মুসলমানগণ তাদের পরিবারবর্গকে বন্দী করে। মালেক এবনে আওফ পলায়ন করে তায়েফে চলে যায়, সেখানে সে দূর্গে আশ্রয় নেয় এবং তার পরিবারবর্গ বন্দী হয়। মুসলমানদের আমীর আবু আমের শাহাদত বরণ করেন। মক্কাবাসী যখন দেখলো যে, আল্লাহ পাক তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বিজয় দান করেছেন এবং তাঁর দ্বীনকে প্রাধান্য দিয়েছেন, তখন অনেক লোক ইসলাম কবুল করে। মালে গনীমত তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যা একত্রিত করা হয় সেগুলোকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জেয়েররানা নামক স্থানে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এ আদেশ বাস্তবায়িত হয়, তায়েফ থেকে অবসর পেয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামও জেয়েররানা আগমন করেন।

এই পর্যায়ে হযরত আবু হোরায়রাহর (রাঃ) বর্ণনা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেনঃ (হোনায়েনের যুদ্ধের পর হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে তায়েফ গমন করেন। তায়েফবাসী দূর্গে একত্রিত হয়, মুসলমানগণ দূর্গ অবরোধ করেন। যখন তায়েফের অবরোধে পনেরো দিন অতিবাহিত হয় তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত নওফেল এবনে মাবিয়া দহিলীর সঙ্গে পরামর্শ করেন এবং বলেন নওফেল! এ স্থানে অবস্থানের ব্যাপারে তোমার কি অভিমত? নওফেল আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আপনি এখানে আবস্থান করেন তবে একদিন অবশ্যই আপনি তাদেরকে করতলগত করতে পারবেন, আর যদি ছেড়ে দেন তবুও তারা আপনার ক্ষতিসাধন করতে সক্ষম হবেনা।

হযরত ওমর (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, যখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তায়েফ অবরোধ করেন (এবং দূর্গ এখনো মুসলমানদের হস্তগত হয়নি) তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ আমরা ইন্‌শাল্লাহ আগামীকাল প্রত্যাবর্তন করবো। সাহাবায়ে কেরামের জন্য এ সিদ্ধান্ত একটু কষ্টকর হলো, তাঁরা আরজ করলেন এভাবেই চলে যাবেন, অথচ আমরা এ দূর্গটি

এখনো জয় করতে পারিনি। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ "আচ্ছা কাল সকালে বের হবে।" পরদিন সকালে সাহাবায়ে কেরাম বের হলেন এবং দুশমনের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধে অনেক হতাহত হলো। (কিন্তু দূর্গের বিজয় হলোনা) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, ইনশাআল্লাহ আগামীকাল সকালে আমরা ফিরে যাব। তখন লোকেরা অত্যন্ত খুশি হলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ দৃশ্য দেখে মুচকি হাসলেন। সালেহী উল্লেখ করেছেন, তায়েফ দূর্গ অবরোধ কালে ১২ জন সাহাবা শাহাদত বরণ করেন।

হযরত ওরওয়া (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আদেশ দিয়েছেনঃ "আগামীকাল বিচরনের জন্য উট ছাড়বে না," যখন সকাল হলো তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম রওয়ানা হলেন। যান বাহনে আরোহন করে তিনি দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! তাদেরকে হেদায়েত কর এবং আমাদেরকে কষ্ট থেকে রক্ষা কর। (অর্থাৎ তাদেরকে ঈমানের তৌফিক দান কর, যেন তারা আমাদের উপর আক্রমন না করে। আমাদেরও তাদের বিরুদ্ধে আক্রমন পরিচালনা না করতে হয়)

ইমাম তিরমিজি হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণিত এই হাদীস সংকলন করেছেন যে, সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ইয়া রসূলাল্লাহ! সাকীফ গোত্রের তীর আমাদেরকে চরম কষ্ট দিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করুন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য এভাবে দোয়া করলেনঃ হে আল্লাহ! সাকীফ গোত্রকে হেদায়েত কর, তাদেরকে ঈমানদার হওয়ার তৌফিক দান কর।

এবনে এসহাকের বর্ণনায় রয়েছে, তায়েফের অবরোধ ত্রিশ রাত বা তার কাছাকাছি হয়েছিল। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে বিশ রাত বা তার চেয়ে কিছু বেশী এই অবরোধ ছিল। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এই অবরোধ ছিল দশ দিনের চেয়েও কিছু বেশী। এবনে হাজম বলেছেন, এটিই সঠিক অভিমত।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, শাওয়াল মাসের অবশিষ্ট দিনগুলো অবরোধ করা হয়। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জেয়েররানা নামক স্থানে গমন করেন, সেখান থেকে তিনি ওমরার এহরাম বাঁধেন।

ثُمَّ يَتُوبُ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ

এরপর আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে তওবা করার তৌফিক দান করবেন, আর আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াময়।

এবনে এসহাক ইউনুস এবনে ওমরের সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমরের

বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ আমি হোনায়েনে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট ছিলাম। হাওয়াজেন গোত্রের ধন–সম্পদ এবং পরিবার বর্গের উপর যে বিপদ আপতিত হওয়ার কথা ছিল তা হয়েছে। তাদের এক প্রতিনিধি

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়। এই দলে ১৪ জন লোক ছিল। এদের মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেজায়ী পিতৃব্য বুইয়ারকানও ছিল। (প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দুগ্ধমাতা ছিলেন হালিমা সাদিয়া। সেদিক থেকে বুইয়ারকান তাঁর রেজায়ী পিতৃব্য।)

এই প্রতিনিধি দলের নেতা ছিল জোহায়ের এবনে সরদ। এরা সকলেই পরবর্তী কালে ইসলাম গ্রহণ করেন। বুইয়ারকান আরজ করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের গোত্রের মূল উৎস একই। আর যে বিপদ আমাদের উপর আপতিত হয়েছে তা আপনার অজানা নয়, আমাদের প্রতি দয়া করুন, আল্লাহ পাক আপনার প্রতি দয়া করবেন। জোহায়ের দন্ডায়মান হয়ে বললেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে সব মহিলারা বন্দী হয়ে এসেছেন তারা আপনার নিকট আত্মীয় স্বজন অর্থাৎ দুগ্ধ মাতার দিক থেকে কেউ ফুফু, কেউ খালা। এরা (শৈশব কালে) আপনার খেদমত করেছেন। যদি আজ সিরিয়া বা ইরাকের রাজার তরফ থেকে আমাদের ওপর এমন বিপদ আসতো তবে তারাও আমাদের প্রতি দয়া করতো। অথচ হে আল্লাহর রসূল! আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ অভিভাবক। অতঃপর সে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে একটি কবিতার কিছু অংশ পাঠ করে শুনাল।

তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ আমার এবং আবদুল মোত্তালিবের বংশধরদের যুদ্ধ লব্দ সম্পদে যে অংশ রয়েছে তা তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও। কোরায়েশগণ এ কথা শ্রবণ করে বললেনঃ যুদ্ধ লব্ধ সম্পদে আমাদের যে অংশ রয়েছে তা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের জন্যে। আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর অংশ ফেরৎ দিয়েছেন আমাদের অংশও আমরা ফেরৎ দিলাম। আর আনসারগণও একই কথা বললেন অর্থাৎ গনিমতের মাল হিসেবে যা পেয়েছিলেন তা ফেরৎ দিলেন।

ইমাম বোখারী (রঃ) মারোয়ান এবং মেসওয়ার এবনে মাখরামার সূত্রে এই ঘটনার বিবরণ এভাবে পেশ করেছেন। যখন হাওয়াজেন গোত্রের লোকেরা মুসলমান হয়ে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলেন এবং তাদের মালপত্র এবং বন্দীদেরকে ফেরৎ দেয়ার আরজি পেশ করলেন তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আমার সঙ্গে যে লোকজন আছে তা তোমরা দেখছ। আমার কাছে সে কথাই ভাল লাগে যা সত্য, আর সত্য এবং সুস্পষ্ট কথা হলো এই যে, তোমরা দুটি জিনিসের একটি ফেরৎ নিয়ে নাও অর্থাৎ বন্দী অথবা ধন–সম্পদ।

তারা বললোঃ আমরা বন্দীদেরকে ফেরৎ নেয়া পছন্দ করি। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ভাষণ দেওয়ার জন্য দন্ডায়মান হয়ে আল্লাহ পাকের প্রতি হামদ ও সানা পেশ করার পর বললেনঃ "এখন তোমাদের ভাইয়েরা তওবা করে তোমাদের কাছে এসেছে। আমি তাদের বন্দীদেরকে ফেরৎ দিতে চাই। যে ব্যক্তি সন্তুষ্টচিত্তে ফেরৎ দিতে চায় সে তা করুক, আর যে তার অংশ নেয়া পছন্দ করে তাকে আমি তার অংশের বিনিময় সে সম্পদ থেকে আদায় করবো যা আল্লাহ পাক গনিমতের সম্পদ হিসেবে আমাদেরকে দান করবেন।" লোকেরা বললো "আমরা অকুণ্ঠ চিত্তে সকলের অংশ ফেরৎ দিলাম " অর্থাৎ কোন বিনিময়ের শর্ত ব্যতীত সন্তুষ্ট চিত্তে আমরা আমাদের অংশ ছেড়ে দিলাম। তখন হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ এ কথা আমার জানা হলো না যে, তোমাদের মধ্যে কে তার অংশ ফেরৎ দেওয়ার অনুমতি দিল, আর কে দিলনা। অতএব তোমরা ফেরৎ যাও এবং তোমাদের প্রতিনিধিগণ এসে আমার নিকট তোমাদের মত বর্ণনা করুক। তখন লোকেরা চলে গেল এবং তাদের সরদারদের সঙ্গে কথা বললো। তারা এসে আরজ করলো সকলে সন্তুষ্ট চিত্তে বন্দী এবং সম্পদ ফেরৎ দেয়ার অনুমতি দিয়েছে।

প্রিয়নবী (দঃ)—এর সমীপে তাঁর দুগ্ধ মাতা পিতা

আবু দাউদ, বায়হাকী এবং আবু ইয়ালা বর্ণনা করেন, হযরত আবু তোফায়েল বলেছেন, আমি দেখলাম হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যেয়েররানা নামক স্থানে গোশত বিতরণ করছেন (হয়ত গোশত বলতে বকরী দুম্বা ইত্যাদি উদ্দেশ্য করেছেন) এমন সময় একজন গ্রাম্য মহিলা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য নিজের চাদর বিছিয়ে দিলেন এবং তিনি তাতে উপবিষ্ট হলেন। আমি লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলামঃ এই মহিলা কে? লোকেরা বললো ইনি হলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দুগ্ধমাতা।

আবু দাউদ হযরত আমর এবনে শায়বার সূত্রে বর্ণনা করেছেন একদিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় তাঁর দুগ্ধ-পিতা আসলেন তিনি তাঁর জন্য নিজের কাপড়ের একটি অংশ বিছিয়ে দিলেন, দুগ্ধ-পিতা তার ওপর উপবিষ্ট হলেন। এরপর তাঁর দুগ্ধমাতা আসলেন, তিনি তাঁর জন্যে ঐ কাপড়েরই দ্বিতীয় অংশ বিছিয়ে দিলেন, তিনিও বসলেন। এরপর তাঁর দুগ্ধ-ভ্রাতা আসলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দন্ডায়মান হয়ে নিজের সামনে তাকে বসিয়ে দিলেন।

মোহাম্মদ এবনে ওমর বর্ণনা করেন হোনায়েনের মোশরেকরা যখন পরাজিত

হলো, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের পশ্চাদ্ধাবনের আদেশ দিলেন এবং এরশাদ করলেন যদি বণীসাদ গোত্রের বজাদ নামক ব্যক্তি ধরা পড়ে তবে তাকে ছাড়বে না। এ ব্যক্তি অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ করেছে। সে একজন মুসলমানকে ধরে নিয়ে তাঁর দেহের এক একটি অঙ্গকে কেটে অগ্নি দ্বারা জ্বালিয়ে ফেলেছে, ঐ ব্যক্তি তার অপরাধ সম্পর্কে সজাগ ছিল। তাই সে পলায়ন করেছে। মুসলিম আশ্বারোহীগণ তাকে অবশেষে পাকড়াও করে নিয়ে আসেন এবং হারেস এবনে আবদুল ওজ্জার কন্যা সীমার সঙ্গে এনে বন্দী করেন।

সীমা ছিলেন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দুগ্ধ-ভগ্নি। সীমা বললেনঃ আল্লাহর শপথ। আমি তোমাদের সরদারের ভগ্নি। লোকেরা তার কথা বিশ্বাস করলোনা। তাই তাকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির করলো। সীমা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বললো হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। আমিতো তোমার ভগ্নি।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমার এ দাবীর সমর্থনে প্রমাণ স্বরূপ কোন নিদর্শন আছে কি? সীমা তখন তার আঙ্গুল দেখিয়ে দিলেন যাতে কেটে যাওয়ার চিহ্ন ছিল। সীমা বললো তুমি যে আমার আঙ্গুল কেটেছিলে এটি তারই চিহ্ন। আমি তোমাদের এবং আমার পিতা মাতার গৃহ পালিত পশুগলো ওয়াদিয়ে সরব নামক ময়দানে চরাতাম। আমি তোমাকে কোলে নিতাম, তুমি আমার আঙ্গুল কেটে দিয়েছিলে, মায়ের দুধ পানের ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া হতো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সে চিহ্নটি চিনে ফেলেছিলেন। তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে দাড়িয়ে গেলেন এবং সীমার জন্য নিজের চাদর বিছিয়ে দিয়ে বললেন এর উপর বস। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে মারহাবা বললেন, তখন তাঁর নয়নযুগলে অশ্রু দেখা গিয়েছিল। এরপর তিনি তাকে দুগ্ধ-মাতা পিতার খবর জিজ্ঞাসা করলেন। সীমা বললেনঃ তাঁদের এন্তেকাল হয়েছে।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন তাঁকে বললেনঃ যদি তুমি এখানে থাকতে চাও তবে পূর্ণ সম্মান এবং মর্যাদার সঙ্গে রাখা হবে। আর যদি তুমি তোমার সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করতে চাও তবে পূর্ণ নিরাপত্তার সঙ্গে তোমাকে পৌছানো হবে। সীমা বললেনঃ আমি আমার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে যেতে চাই। এরপর সীমা মুসলমান হলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে তিনটি বাঁদী গোলাম দিলেন। একটি কি দুটি উষ্ট্রও দেয়ার আদেশ দিয়ে বললেনঃ তুমি জেয়েররানা গমন করে তোমার সম্প্রদায়ের সঙ্গে থাক। আমি এখন তায়েফ যাব। সীমা জেয়েররানা প্রত্যাবর্তন করলো। (এরপর তায়েফ থেকে ফিরে এসে) জেয়েররানায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর সঙ্গে মোলাকাত করলেন এবং তাঁর পরিবারের অন্য লোকদেরকে উষ্ট্র এবং বকরী দান করলেন। সীমা

বজাদকে ক্ষমা করার দরখাস্ত করলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর দরখাস্ত কবুল করলেন।

এবনে এসহাক ইউনুস এবনে ওমরের সূত্রে লিখেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন হাওয়াজেন গোত্রের বন্দীদেরকে ফেরৎ দিয়ে দিলেন তখন তিনি উষ্ট্রের ওপর আরোহন করে রওয়ানা হলেন। লোকেরা তাঁর পেছনে আসতে লাগলো এবং বললোঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদেরকে গনিমতের মাল দান করুন। তখন এত লোকের ভীড় হলো যে তিনি বাধ্য হয়ে একটি বৃক্ষের সঙ্গে দাড়িয়ে গেলেন। তখন লোকেরা তাঁর চাদর টান দিল। তিনি বললেন, হে লোক সকল! শপথ সে আল্লাহ পাকের, যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ। যদি তোহামা নামক স্থানের বৃক্ষগুলোর সংখ্যার সমান আমার নিকট উষ্ট্র থাকতো তবে তাও আমি তোমাদের মাঝে বিতরণ করে দিতাম। ভখন তোমরা আমাকে বখিল বা মিথ্যাবাদী পেতে না।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত হাকিম এবনে হেজাম (রাঃ) বর্ণনা করেন, হোনায়েনে আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট ১০০টি উষ্ট্রের আবেদন করি। তিনি আমাকে দান করেন। এরপর পুনরায় আরো ১০০টি চেয়েছি তাও তিনি দান করেন। এরপর এরশাদ করেছেন হাকিম, এ সম্পদ অত্যন্ত মিষ্টি মধুর যে চিত্তের বদান্যতা নিয়ে তা গ্রহণ করে তার জন্য এ সম্পদে বরকত হয়। আর যে মনের লোভ লালসা নিয়ে তা গ্রহণ করে তার সম্পদে বরকত হয়না। যেমন কোন ব্যক্তি আহার করে (আর যতই আহার করুক) কিন্তু তার উদর পূর্ণ হয়না (তথা সে তৃপ্তি পায়না)

(মনে রেখো) "উপরের হাত নিচের হাত থেকে উত্তম।" তুমি যাদের অভিভাবক, তাদের থেকে দান করা শুরু করো। হাকিম আরজ করলেন শপথ সে আল্লাহ পাকের, যিনি আপনাকে সত্য নবী করে প্রেরণ করেছেন, আপনার পর আর কারো নিকট কিছু চেয়ে নিজেকে অপমানিত করবো না। তাই হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে হযরত হাকিম (রাঃ)-কে তাঁর অংশ দেয়ার জন্য তলব করলেন। কিন্তু হযরত হাকিম (রাঃ) তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন। হযরত ওমর (রাঃ) বললেনঃ হে লোকসকল তোমরা সাক্ষী থাক, আমি হাকিমকে তার অংশ দিতে চাই কিন্তু সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে।

এবনে আবি জিয়াদ বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে হযরত হাকিম (রাঃ) প্রথম যে উটগুলো নিয়েছিলেন তা রেখে দিয়েছিলেন। আর দ্বিতীয়বার যে উটগুলো নিয়েছিলেন সেগুলো ফেরৎ দিয়েছিলেন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সোহায়েল এবনে ওমরকে ১০০টি উট দিয়েছিলেন আর আবু সুফিয়ান এবনে হারবকে ১০০ উট এবং নির্দৃষ্ট পরিমান রূপা দিয়েছিলেন। মাবিয়া এবনে আবু সুফিয়ানকে ১০০ উট এবং নির্দৃষ্ট পরিমান রূপা দিয়েছেন। এমনিভাবে ইয়াজিদ এবনে আবু সুফিয়ানকে ১০০ উট এবং নির্দৃষ্ট পরিমান রূপাদিয়েছেন।

বর্ণিত আছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মালেক এবনে আওফ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন (হোনায়েনের যুদ্ধে সে ছিল কাফেরদের সেনাপতি) তখন তাঁর খেদমতে আরজ করা হলো মালেক এবনে আওফ সাকিফ গোত্রের সঙ্গে দূর্গে অবস্থান নিয়েছে। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে বলেন, সে যদি মুসলমান হয়ে আমার নিকট আসে তবে তার হারানো সম্পদ এবং পরিবারবর্গ সবই সে ফিরে পাবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মালেকের পরিবারবর্গকে মক্কায়ে মোয়াজ্জামায় উম্মে আবদুল্লাহ বিনতে আবু উমাইয়ার বাড়ীতে অবস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন। মালেক এবনে আওফ যখন সংবাদ পেল যে, তার পরিবারবর্গ সম্পূর্ণ হেফাজতে রয়েছে তখন সে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে খাঁটি মুসলমান হলো, তার পরিবারবর্গ ও তার সঙ্গে একত্রিত হলো। দুসগোত্র, হাওয়াজেন গোত্র, সাকিফ এবং সামার গোত্রের যে সব লোক ইসলাম কবুল করেছিলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মালেক এবনে আওফকে তাদের নেতা নির্বাচন করলেন, সে কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করলো, এমনকি সকিফ গোত্রের যেসব লোক তখনও কাফের ছিল তাদের বিরুদ্ধেও সে লড়াই করলো এবং যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হস্তগত হতো তার এক পঞ্চমাংশ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দারবারে প্রেরণ করতে লাগলো। এবনে এসহাক ইউনুসের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবম হিজরীর রমজান মাসে সাকিফ গোত্রের এক প্রতিনিধি ফল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এই ঘটনা তাবুকের যুদ্ধের পর ঘটে। তাই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

ثُمَّ يَتُوبُ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ

এরপর আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে তওবার তৌফিক দান করবেন।

মালেক এবনে আওফ ছিল কাফেরদের সেনাপতি। এখন সে মুসলিম ফৌজের সেনাপতি হয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। এটিই আল্লাহ পাকের তৌফিকের ফলশ্রুতি।[১]

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৩১

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অর্থাৎ যারা তওবা করে আল্লাহ পাক তাদের ক্ষমা করেন, আর যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে তিনি তাদের জন্য অত্যন্ত দয়াবান।১

আল্লামা আলূসী (রঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল অর্থাৎ ইতিপূর্বে তারা যত নাফরমানী করেছে, পাপাচারে লিপ্ত হয়েছে আল্লাহ পাক ইসলাম গ্রহণের কারণে সব কিছু মাফ করে দিয়েছেন এবং যেহেতু তিনি অত্যন্ত দয়াবান তাই তার ওপর সওয়াবও দান করবেন।২

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ
الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ۚ وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ
اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۤ اِنْ شَآءَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۲۸﴾ قَاتِلُوا الَّذِيْنَ
لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ
اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿۲۹﴾

তরজমা

(২৮) হে ঈমানদারগণ! যারা মোশরেক তারা নাপাক, অতএব, এ বছরের পর যেন তারা মসজিদুল হারামের কাছেও না আসে, আর যদি তোমরা দারিদ্রের আশংকা কর তবে জেনে রাখ আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে অচিরেই তাঁর দয়ায় তোমাদেরকে ধনী করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক সবকিছু জানেন, তিনি প্রজ্ঞাময়।

১। তফসীরে কবীর, খন্ড–১৬, পৃষ্ঠা–২৩

২। তফসীরে রুহুল মা'আনী, খন্ড–১০, পৃষ্ঠা–৭৫

(২৯) যারা আহলে কিতাব তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ পাকের প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান আনে না এবং আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল যা হারাম করেছেন তারা তা হারাম জানেনা এবং সত্য দ্বীনের অনুসরণ করে না তারা যে পর্যন্ত অপমানিত অবস্থায় যিজিয়া আদায় না করে সে পর্যন্ত তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর।

তফসীরুল কোরআন

এই আয়াত নাজিল হয় নবম হিজরীতে যখন আল্লাহ পাকের বিশেষ দনে মক্কা বিজয় হয় এবং সারা আরব থেকে লোকেরা দলে দলে এসে ইসলাম গ্রহণ করে! আরব ভূ-খন্ডে মুসলমানদের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, সর্বত্র ইসলামী পতাকা উড্ডীন হয় তখন আলোচ্য আয়াতের ফরমান জারি হয়। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

হে মুমিনগণ। মোশরেকেরা অপবিত্র। তাই এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল হরামের ধারে কাছেও না আসে,কেননা মোশরেকদের দেহমন অপবিত্র। যেহেতু তারা অপবিত্র থাকে আর এই অপবিত্রতা মলমূত্র থেকেও জঘন্য ঘৃণ্য তাই কাফেরদের মসজিদের ন্যায় পবিত্র স্থানে প্রবেশাধিকার নেই, আর এ জন্যে কাফেরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব বৈধ নয়। যাহ্‌হাক ও আবু উবায়দা (রাঃ) বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে "নাযাছুনের ব্যাখ্যা হলো নাপাকি। আল্লামা বগভী লিখেছেন এর অর্থ হলো তাদের কুফর ও নাফরমানির অপবিত্রতার কারণে তাদেরকে অপবিত্র বলা হয়েছে। ইমাম কাতাদা (রঃ) লিখেছেনঃ মোশরেকরা এজন্যে অপবিত্র যে, তারা পবিত্র হতে পারেনা। যখন তাদের উপর গোসল ফরজ হয় তখন তারা সে গোসল করেনা, এমনকি, তারা ওজুও করেনা। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, কুকুর এবং শুকরের ন্যায় তারা অপবিত্র, এজন্যে যাকে কোন মোশরেক স্পর্শ করবে তার উপর অজু কর্তব্য।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন,

من صافح مشركا فليتوضاء

যে কোন মোশরেকের সঙ্গে করমর্দন করে তার অজু করে নেয়া কর্তব্য।

(আবুশ শেখ এবনে মরদবিয়া)

واخرج ابن مردويه عن هشام بن عروه عن ابيه عن جده

قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم

جبرئيل عليه السلام

হিশাম তার পিতা ওরওয়াহ এবনে জুবায়ের থেকে এবং ওরওয়াহ হযরত জোবায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার পথে হযরত জীব্রাঈল (আঃ)–এর সঙ্গে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোলাকাত হয়। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মোছাফেহা করার জন্যে তাঁর হাত বাড়িয়ে দেন। কিন্তু জীব্রাঈল (আঃ) মুছাফেহা করতে অস্বীকার করেন এবং কারণ স্বরূপ বলেন, আপনি একটু পূর্বেই এক ইহুদীর সঙ্গে করমর্দন করেছেন, এজন্যে আমি এমন হাতের সঙ্গে হাত মেলাতে পছন্দ করলামনা যা কাফেরের হাতকে স্পর্শ করেছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখনই পানি আনিয়ে ওজু করলেন এবং জীব্রাঈল (আঃ)–এর সঙ্গে মুছাফেহা করলেন।[১]

فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ۚ

তারা যেন মসজিদে হরমের সীমানায় না আসে। মজহাবে হানফিয়া মোতাবেক এর অর্থ তারা যেন হজ্ব বা ওমরাহ না করে। মসজিদে হারাম হ'ল তৌহিদের পুতঃ পবিত্র কেন্দ্র, তাই এ পবিত্র স্থানে কোন কাফের মোশরেকের প্রবেশাধিকার থাকতে পারেনা এবং এ পবিত্র স্থানে উপস্থিত হওয়ার যোগ্যতাই তাদের মধ্যে নেই।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ)–এর মতে, মসজিদে হারাম বলে সমগ্র এলাকায় কাফেরদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। যেভাবে সূরায়ে বণী ইসরাইলের প্রথম আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

سُبْحٰنَ الَّذِىْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

১। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড–১০, পৃষ্ঠা–৭৬
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন; কৃত–আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড–৩, পৃষ্ঠা–৩০৬

এই আয়াতে মসজিদে হারাম বলে সমস্ত হরম এলাকাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা, শবে মেরাজে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে হযরত উম্মে হানীর বাড়ী থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, (কাবা শরীফ থেকে নয়)

(১) আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হরম শরীফের এলাকায় কোন কাফেরের প্রবেশ বৈধ নয়, সে যে-ই হোক এটিই আলোচ্য আয়াতের অর্থ যদি মুসলিম রাষ্ট্রনায়ক বা আমিরুল মুসলিমীন হরম এলাকায় থাকেন, আর কোন অমুসলিম রষ্ট্রের দূত তাঁর নিকট কোন পয়গাম নিয়ে আসে এমন অবস্থায়ও তাকে হরম এলাকায় প্রবেশ করার অনুমতি দেয়া যাবে না, বরং আমিরুল মুমলিমীন হরমের বাইরে তাঁর নির্বাচিত লোক প্রেরণ করবেন, তিনি কাফের রাষ্ট্রদূতের পয়গাম গ্রহণ করবেন।

(২) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে নির্দেশ দিয়েছিলেন

اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب

তোমরা ইহুদী ও নাসারাদেরকে আরব ভূ-খন্ড থেকে বের করে দাও।

খলিফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি আমি জীবিত থাকি তবে ইনশাআল্লাহ আরব ভূ-খন্ড থেকে ইহুদী ও নাসারাদেরকে বের করে দেব। মুসলমান ব্যতীত আর কাউকে এখানে থাকতে দেবনা। কিন্তু এ কাজ করার পূর্বেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হয়ে যায়। তাই তিনি ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্তে উপরোল্লিখিত অসিয়ত করেন।

এরপর প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ) এ কাজ করে যেতে পারেননি। হযরত ওমর (রাঃ) সকল অমুসলিমকে আরব ভূ-খন্ড থেকে বের করে দিয়েছিলেন। অবশ্য অমুসলিম ব্যবসায়ীরা আসলে তাদেরকে তিন দিন অবস্থানের অনুমতি প্রদান করতেন।

এজন্য আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, যদি ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে কোন কাফের আরব ভূ-খন্ডে প্রবেশ করতে চায় তবে তাকে অনুমতি দেয়া যেতে পারে, কিন্তু তিন দিনের বেশী অবস্থানের অনুমতি দেয়া যায় না।

আরব ভূ-খন্ড

দৈর্ঘে এডেনের শেষ প্রান্ত থেকে ইরাকের সবুজ প্রান্ত পর্যন্ত, আর প্রস্থে জেদ্দা এবং সমুদ্র তীর থেকে সিরিয়া পর্যন্ত।

(৩) অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিমরা জিম্মী হিসেবে অথবা ভিসা নিয়ে থাকতে পারে কিন্তু মসজিদ সমূহে মুসলমানদের অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করতে পারবেনা।

بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا

(এ বছরের পর) অর্থাৎ যখন সূরায়ে তওবা নাজিল হয় এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমিরুল হজ্জ করে পাঠিয়ে ছিলেন। আর হযরত আলী (রাঃ)-কে প্রেরণ করেন সূরায়ে বরাআত এর ঘোষণার জন্যে। এই ঘটনা হয় নবম হিজরীতে।১

আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের মসজিদুল হারামের প্রবেশের উপর যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তার ব্যাখ্যায় তত্ত্বজ্ঞানীগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর মতে, এর অর্থ হলো কাফেররা হজ্জ, ওমরা বা তওয়াফ করবে না।

ইমাম শাফেয়ী এবং মালেক (রঃ)-এর মতে, কাফেররা কোন অবস্থাতেই মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে না।

এতদ্ব্যতীত ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মতে, আলোচ্য আয়াতে মসজিদুল হারাম বলতে বিশেষভাবে কাবা শরীফকে বুঝানো হয়েছে। আর ইমাম মালেক (রঃ)-এর মতে, সমস্ত মসজিদকে বুঝানো হয়েছে। কেননা তাযিমের দিক থেকে সমস্ত মসজিদই সমান মর্যাদার অধিকারী।২

وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً

শানে নজুল

এবনে আবি হাতেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের কথার এবং এবনে জরীর ও আবু শায়েখ, সাইদ এবনে জোবায়ের, একরামা, আতীয়া, যাহ্যাক এবং কাতাদার কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, যখন কাফেরদের মক্কা শরীফে প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় তখন মক্কাবাসী চিন্তিত হলেন যে, প্রয়োজনীয় খাদ্য-দ্রব্য এবং অন্যান্য জরুরী দ্রব্য সম্ভার কাফেররা মক্কা শরীফে নিয়ে আসতো এবং মক্কা শরীফের অধিবাসীগণ তাদের প্রয়োজনের আয়োজন করতেন। কিন্তু কাফেরদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৩৩, ২৩৪

২। খোলাসাতুত্তাফাসীর, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২১৪

দ্বিতীয়ত, ব্যবসা বানিজ্যের সুযোগ বন্ধ হওয়ায় আর্থিক কষ্ট শুরু হবে। বিশেষত, হজের সময় অগনিত মানুষের সমাগমে সেখানকার ব্যবসা বানিজ্য প্রসার লাভ করে। কাফেরদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে অর্থনৈতিক ক্ষতির আশংকা অস্বাভাবিক নয় তাই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। এরশাদ হয়েছে (হে মক্কাবাসী মুসলমানগণ!) যদি তোমরা অভাব অনটন বা দারিদ্রের ভয় কর তবে জেনে রাখ তোমাদের এ ভয় অমূলক। কেননা দারিদ্র বা স্বাচ্ছন্দ সবই আল্লাহ পাকের হাতে। তিনি ইচ্ছা করলে অচিরেই তোমাদেরকে ধন-সম্পদের অধিকারী করতে পারেন। এটি সম্পূর্ন তাঁর মর্জির ব্যাপার। অদূর ভবিষ্যতে যখন পৃথিবীর এক বিরাট অংশ মুসলমানদের করতলগত হবে তখন সেখানকার যিজিয়া (অমুসলিম কর) এবং জেহাদের ফলশ্রুতিতে যে মালে গনিমত পাওয়া যায় তা যখন আসবে তখন তোমরা উপলব্ধি করবে যে আল্লাহ পাকের কোন নির্দেশই অযৌক্তিক নয়। আর মোশরেকদের ওপর এই নিষেধাজ্ঞা তোমাদের দুশ্চিন্তার কারণ নয়।

ইতিহাস সাক্ষী। অবশেষে তাই হয়েছিল। পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার বাস্তবায়ন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনিন্দ-সুন্দর আদর্শের পরিপূর্ণ অনুসরণের কারণে পৃথিবীর প্রায় এক চতুর্থাংশ মুসলমানদের করতলগত হয়। আল্লাহ পাক মুসলিম জাতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানিত এবং সমৃদ্ধশালী জাতিতে পরিণত করেন।

فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক অচিরেই তোমাদেরকে ধনী করে দেবেন, যদি তিনি ইচ্ছা করেন।

আশা শুধু আল্লাহ পাকের কাছে

আলোচ্য আয়াতে ধনী বা সমৃদ্ধশালী হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ পাকের ইচ্ছা এবং মর্জির ওপর নির্ভরশীল বলে ঘোষণা করা হয়েছে যেন মানুষ শুধু আল্লাহ পাকের কাছেই আশা করে কেননা তিনি মহান দাতা। তার মর্জি হলেই এবং তিনি দান করলেই মানুষ পায়। আর আল্লাহ পাকের মর্জি না হলে শত চেষ্টা করেও মানুষ ব্যর্থ হয়। সাফল্য এবং ব্যর্থতার সিদ্ধান্ত আল্লাহ পাকই করেন। অতএব, চাওয়া একমাত্র আল্লাহর সমীপে এবং পাওয়া শুধু আল্লাহর নিকট থেকে। কোন কোন সময় লক্ষ্য করা যায় দুনিয়ার নেয়ামত সব কাফের মোশরেকরা ভোগ করে, আর মুসলমানগণ কষ্ট সহ্য করে। আর এমনও দেখা যায় নেককার মুসলমান অভাব অনটনে থাকে, যারা সওয়াব ও গুণাহর পরওয়া করেনা, এমনকি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও হালাল

হারামের মধ্যে পার্থক্যও করে না অথচ আল্লাহর দানে তারাই সম্পদশালী হয়। কোন কোন সময় এসব প্রশ্ন মানব মনকে দোলা দেয়। আর এজন্যই আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِى الْبِلَادِ
مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَأْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ

যারা কাফের দেশে দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন তোমাকে কিছুতেই বিভ্রান্ত না করে। এ–তো সামান্য ভোগ মাত্র, এরপর জাহান্নাম তাদের আবাস, আর তা কত নিকৃষ্ট বিশ্রামাগার।

বর্ণিত আছে, একবার ফেরেশতাগণ আল্লাহ পাকের দরবারে এই বলে আরজী পেশ করলেনঃ হে আল্লাহ! আপনি কাফেরদের জন্যে দুনিয়ার নেয়ামতের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, আর বিপদাপদের দুয়ার তাদের জন্য বন্ধ করে দিয়েছেন। (অথচ তারা আপনার দুশমন, অবাধ্য নাফরমান)

অন্যদিকে মুসলমানগণ (যারা আপনার আপন প্রিয় বন্দা) দুনিয়ার জীবনে অভাব অনটনের কারণে তাদের জীবন দুর্বিসহ, বিপদাপদ তাদের ওপর সর্বদা আপতিত হয়। (এর হেকমত কি?)

আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ কেয়ামতের দিন কাফেরদের যে শাস্তি দেয়া হবে, আর মোমেনদেরকে যে অনন্ত অসীম নেয়ামত দেয়া হবে তা দেখ, এরপর কথা বল।

ফেরেশতাগণ মোমেনদের জন্য যে নেয়ামত তৈরী আছে তা দেখলেন এবং কাফেরদেরকে যে শাস্তি দেয়া হবে তাও দেখলেন অতঃপর আরজ করলেনঃ হে পরওয়ারদেগার! আখেরাতের শাস্তির বিনিময়ে দুনিয়াতে যে আনন্দ উল্লাস তারা পাচ্ছে তার কোন গুরুত্বই নেই। এমনিভাবে জান্নাতে যে অনন্ত অসীম নেয়ামত রয়েছে তার মোকাবেলায় দুনিয়াতে যে কষ্ট হচ্ছে তা মূলতঃ কিছুই নয়।

إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। তিনি বিজ্ঞানময় কাকে কত খানি দেয়া উচিত তা তিনি খুব ভালভাবেই জানেন।

তফসীরকার একরামা (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে মোমেনদেরকে সমৃদ্ধশালী করার যে ওয়াদা আল্লাহ পাক করেছেন তা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পুরা করেছেন। এরপর আল্লাহ পাকের রহমতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ার ফলে ফসল অত্যন্ত ভাল এবং অধিক হয়।

মোকাতেল (রঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, জেদ্দা, সানায়া এবং অন্যান্য এলাকার অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং প্রয়োজনীয় খাদ্য-দ্রব্য মক্কা শরীফে নিয়ে এসেছেন, ফলে মক্কাবাসীর মন থেকে অভাব অভিযোগের ভয় দূরীভূত হয়।

তফসীরকার যাহ্যাক এবং কাতাদা (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক কাফেরদের থেকে যিজিয়া (অমুসলিম কর) আদায় করার তৌফিক দান করেছেন। এভাবে মক্কার মুসলমানদেরকে সমৃদ্ধশালী করে দিয়েছেন।[১]

আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো আল্লাহ পাক তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। কাকে দেয়ার মধ্যে কল্যাণ রয়েছে, আর কাকে না দেয়ার মধ্যে কল্যাণ রয়েছে সে সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল।[২]

আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আল্লাহ পাক তাঁর সমস্ত বিধি-নিষেধের কল্যাণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল। তিনি তোমাদের দারিদ্র অবশ্যই দূরীভূত করবেন।

ইমাম কুর্তবী (রঃ) আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে লিখেছেন, এই আয়াত দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, রিজিক হলো নিতান্ত আল্লাহ পাকের দান, আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা এবং যত ইচ্ছা দান করে থাকেন।[৩]

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, পার্থিব জীবনের কোন কল্যাণ দ্বীনি ও পরকালীন জিন্দেগীর কল্যাণের পথে কোন বাঁধা হওয়া উচিত নয়। যদি ক্ষেত্র বিশেষে এমনটি হয় তবে এক আল্লাহ পাকের প্রতিই ভরসা করা উচিত তথা দ্বীনি কল্যাণকে প্রাধান্য দেয়া উচিত।[৪]

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে মোশরেকদের বিরুদ্ধে জেহাদের এবং তাদেরকে আরব ভু-খন্ড

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৩৫
২। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৭৭
৩। তফসীরে মাজেদী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪০০
৪। তফসীরে বয়ানুল কোরআন, পৃষ্ঠা-৩৯৪

থেকে বহিস্কার করার আদেশ ছিল। আর এ আয়াতে আহ্‌লে কিতাব তথা ইহুদী ও নাসারাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার নির্দেশ রয়েছে।১ আর এ জেহাদ কত দিন চলবে তার একটি সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। যতদিন তারা অপমানিত হয়ে অমুসলিম কর আদায় না করে ততদিন পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ অব্যাহত থাকবে, আরবের মোশরেকদের ব্যাপারে বিধান হলো হয় ইসলাম গ্রহণ করবে, অথবা তরবারি দ্বারা মীমাংসা করা হবে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন আরবদের সঙ্গে জেহাদ শেষ করলেন তখন আল্লাহ্ পাক আহ্‌লে কিতাবদের সঙ্গে জেহাদ করার নির্দেশ দিলেন। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরবদের সঙ্গে জেহাদ করেন আর তাদের নিকট থেকে ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করেননি তবে আহলে কিতাবদের বিরুদ্ধে জেহাদের সময় তাদের থেকে যিজিয়াও গ্রহণ করেছেন। যিজিয়া হলো অমুসলিম কর। সর্বপ্রথম নাজরানবাসী যিজিয়া আদায়ের প্রস্তাব গ্রহণ করে। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনেনা, আখেরাতের প্রতিও বিশ্বাস করেনা, তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ কর।

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেনঃ যখন রুমীদের সাথে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জেহাদের আদেশ দেয়া হয়, তখন এ আয়াত নাজিল হয়। এ আয়াত নাজিল হওয়ার পরই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাবুকের যুদ্ধে তশরীফ নিয়েযান।২

আহলে কিতাব তথা ইহুদী নাসারাদের মধ্যে যখন চারটি দোষ পাওয়া যায় তখন তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে।

(এক) لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

তারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে না, কেননা তারা ঈসা (আঃ) ও ওজায়ের (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে দাবী করে (নাউজুবিল্লাহ্) এটি ঈমান বিরোধী কাজ,

(১) তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩০৮
তফসীরে কবীর, খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-২৭

(২) তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩০৮
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৩৫

আল্লাহ পাকের একত্ববাদে তারা বিশ্বাস করে না।

(দুই) وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ

আর তারা আখেরাতের প্রতিও বিশ্বাস করেনা। ইহুদীরা মনে করে তারাই জান্নাতে যাবে, আর নাসারারা মনে করে জান্নাতের অধিকারী একমাত্র তারাই। ইহুদীরা দাবী করে সামান্য কয়েক দিন দোজখ তাদেরকে স্পর্শ করবে, এরপর তারা নাজাত পাবে। আর ইহুদী নাসারারা এ কথাও বলে যে, জান্নাতের নেয়ামত দুনিয়ার নেয়ামতের ন্যায়ই হবে। তাদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, জান্নাত চিরস্থায়ী না সাময়িক, এসব কারণে আখেরাতের প্রতি তাদের ঈমান নেই এ কথাই প্রমাণিত হয়।

(তিন) وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে সব বিষয়কে হারাম ঘোষণা করেছেন তারা সেগুলোকে হারাম মনে করেনা।

এ বাক্যটির দু'টি অর্থ হতে পারে–

(ক) পবিত্র কোরআনে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শে যা হারাম বলে ঘোষিত হয়েছে তারা সেগুলোকে হারাম বলে মনে করেনা।

(খ) তৌরাত ইঞ্জিলে যা হারাম বলে ঘোষিত হয়েছে তারা সেগুলোও মানেনা; বরং তৌরাত ইঞ্জিলে তারা পরিবর্তন করেছে এবং নিজেদের ইচ্ছা মত বিধান তৈরী করেছে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে رسوله শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে সেই রসূল, যাঁর অনুসরণের দাবী করে তারা, অথচ সে রসূলেরও অনুসরণ তারা করে না, কেননা হযরত মুসা (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ) আদেশ দিয়ে গেছেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করতে, কিন্তু তারা তা করেনা।

(চার) وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ

অর্থাৎ তারা সত্য ধর্মকে গ্রহণ করেনা। ইমাম কাতাদা (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের "হক্ব" শব্দটি দ্বারা আল্লাহ পাককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এমন অবস্থায় এর অর্থ হবে যারা আল্লাহর দ্বীন তথা সত্য ধর্মকে গ্রহণ করেনা। কেননা অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ

"আল্লাহ পাকের নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম হলো ইসলাম," আর তারা ইসলাম গ্রহণ করেনা।

مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ

সে সব লোক যাদেরকে খেতাব দেয়া হয়েছে ইহুদী এবং নাসারা,(তারা যে পর্যন্ত অপমানিত অবস্থায় যিজিয়া তথা অমুসলিম কর আদায় না করে, সে পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে)।

যিজিয়া ও খেরাজ

যিজিয়া বলা হয় সে কর কে যা কাফেরদের জীবনের বদলে আদায় করা হয়। যিজিয়া শব্দটি "যাজা" থেকে নিস্পন্ন অর্থাৎ তুমি মৃত্যুদন্ডের উপযুক্ত অপরাধী ব্যক্তি। কিন্তু তোমাকে এ সুযোগ দেয়া হচ্ছে যে, তোমার উপর এ দন্ড জারী হচ্ছে না এবং দারুল ইসলামে নিরাপত্তার সঙ্গে অবস্থানের অনুমতি দেয়া হয়েছে। তোমাকে হত্যাও করা হয়নি এবং তোমাকে গোলামও বানানো হয়নি। যেভাবে মুক্তি পণ আদায় করলে মৃত্যুদন্ড বাতিল হয়ে যায় ঠিক তেমনিভাবে যিজিয়া আদায় করলেও হত্যার বিধান কার্যকর হয় না।

দ্বিতীয়ত, ইসলামী রাষ্ট্র আর একটি উপকার করে তা হলো, ঠিক মুসলমানদের ন্যায় তোমাদের জানমাল, ইজ্জত আবরুর হেফাজতের দায়িত্ব গ্রহণ করে। আর শরীয়তের দৃষ্টিতে জান মালের হেফাজত মুসলিম অমুসলিম সকলের ব্যাপারে সমভাবে করা হয়, এটি ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আর ইসলামী রাষ্ট্র সে রাষ্ট্রকে বলা হয় যার সংবিধান ইসলামী শরীয়তের ভিত্তিতে তৈরী হয়, যাতে ইসলামী আইন কানুন কার্যকর হয়। আর খেরাজ হলো সে কর যা অমুসলিম প্রজাদের জমিনের উপর ধার্য করা হয়।[১]

حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ

অর্থাৎ–আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা ঈমান আনে না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না তারা অপমানিত অবস্থায় যিজিয়া বা অমুসলিম কর আদায় করে। আলোচ্য আয়াতে– عَنْ يَّدٍ

"আন্ ইয়াদীন" শব্দ দ্বারা আনুগত্য বুঝানো হয়েছে অথবা এর অর্থ হলো

(১) তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত–আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড–৩, পৃষ্ঠা–৩০৯–১০

অমুসলিমরা এ যিজিয়া স্বহস্তে আদায় করবে অন্য কারো হাতে নয়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ মতই পোষণ করেছেন। এজন্যে যিজিয়া আদায়ের ব্যাপারে আদায় কারীর নিজের কোন প্রতিনিধি নিযুক্ত করা বৈধ নয়। অথবা এ বাক্যটির অর্থ হলো বাধ্য হয়ে অত্যন্ত অপমানিত অবস্থায় যিজিয়া আদায় করা।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এর অর্থ হলো নগদ আদায় করা, বাকী না রাখা। আর তফসীরকাদের মধ্যে কেউ এ কথাও বলেছেন যে, এর অর্থ হলো মুসলমানদের নিকট কৃতজ্ঞ হয়ে যিজিয়া আদায় করা এই মর্মে যে, মুসলমানগণ তাকে হত্যা করেনি, কিছু অর্থ-সম্পদ নিয়ে ছেড়ে দিয়েছে।

صٰغِرُوْنَ

এর অর্থ হলো অপমানিত এবং পরাজিত অবস্থায় যিজিয়া আদায় করা। এজন্য তফসীরকার একরামা বলেছেন, এর অর্থ হলো যে যিজিয়ার অর্থ গ্রহণ করবে সে উপবিষ্ট থাকবে, আর যে প্রদান করবে সে দন্ডায়মান অবস্থায় থাকবে।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেছেন, অমুসলিমদের ব্যাপারে ইসলামী বিধান কার্যকর করাই তাদের জন্য অবমাননা।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর মতে, আহলে কিতাবদের থেকে যিজিয়া গ্রহণ করা হবে, আরব হোক বা অনারব এবং অনারব মোশরেকদের নিকট থেকেও যিজিয়া গ্রহণ করা হবে সে মূর্তি পুজক হোক বা অগ্নিপূজক। তবে মোরতাদ (ধর্ম ত্যাগী) লোকদের থেকে যিজিয়া গ্রহণ করা হবে না, এমনিভাবে কোরায়েশের মোশরেকদের থেকেও জিজিয়া গ্রহণ করা হবেনা।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেছেন, যিজিয়া ধর্মের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয় ব্যক্তিত্বের ভিত্তিতে নয়। এজন্যে শুধু আহলে কিতাবদের থেকে যিজিয়া গ্রহণ করা হবে সে আরব হোক বা অনারব।

ইমাম মালেক (রঃ) মুয়াত্তায় এবং ইমাম শাফেয়ী (রঃ) আল উম্মে বর্ণনা করেছেন। জাফর এবনে মোহাম্মদ বলেছেন, আমাকে আমার পিতা বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন, আমি জানিনা অগ্নিপূজকদের সম্পর্কে কি করবো?

তখন হযরত আবদুর রহমান এবনে আওফ বলেছেন, আমি সাক্ষ্য দেই যে, আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, "তাদের সাথে আহলে কিতাবদের ন্যায় ব্যবহার কর।"

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, আমাকে সুফিয়ান সাঈদ এবনে মরজবানের সূত্রে বলেছেন, ফারেয়া এবনে নওফল এই মন্তব্য করেন যে, অগ্নি পূজকদের থেকে কোন্ ভিত্তিতে যিজিয়া গ্রহণ কর, অথচ তারাতো আহলে কিতাব নয়, এ মন্তব্য শ্রবণ করে "মোস্তাওরাদ" রাগান্বিত হয়ে দন্ডায়মান হলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর দুশমন! তুমি হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ) এবং আমিরুল মোমেনীন হযরত আলী (রাঃ)-এর প্রতি দোষারোপ করছ, তাঁরা অগ্নি পূজক থেকে যিজিয়া গ্রহণ করেছেন। এরপর মোস্তাওরাদ খলিফাতুল মুসলেমিন হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকট হাজির হন এবং বলেন, আমি অগ্নি পূজকদের অবস্থা সর্বাধিক জানি তাদের নিকট দ্বীনি এলম এবং কিতাব ছিল যা তারা পাঠ করতো।

একবার তাদের বাদশাহ মাতাল অবস্থায় তার কন্যা বা মাতার সঙ্গে কুকর্মে লিপ্ত হয়। তার এ ঘৃন্য কাজ কেউ দেখে ফেলে। যখন তার জ্ঞান ফিরে আসে তখন লোকেরা তাকে কিতাবে এই অন্যায়ের যে শাস্তি আছে তা দিতে চায়। তখন সে তার প্রজাসাধারণকে একত্রিত করে বলে, আদমের দ্বীনের চেয়ে কোন উত্তম দ্বীন হতে পারে কি? আদমতো নিজের পুত্রদের সঙ্গে তার কন্যাদের বিয়ের ব্যবস্থা করতেন। আমি আদমের ধর্ম গ্রহণ করেছি। তোমাদেরও এ ধর্ম পরিত্যাগ করার কোন কারণ নেই। এ কথা শ্রবণ করে লোকেরা তাদের বাদশাহর ধর্ম গ্রহণ করল। আর যে বিরোধীতা করল তাকে হত্যা করল। এর পরিণাম স্বরূপ একই রাত্রে সমস্ত আলেমদের দিল থেকে এলম বিদায় নিল।

এর দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, অগ্নি পূজকরা আহলে কিতাব। হযরত রসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) তাদের থেকে যিজিয়া গ্রহণ করেছেন। এ ঘটনা এবনে জওজী তাঁর আততাহকীক নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।[১]

ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) কিতাবুল খেরাজে সুফিয়ান এবনে উয়াইনার সূত্রে লিখেছেন, হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ) অগ্নি পূজকদের থেকে যিজিয়া গ্রহণ করেছেন। আমি তোমাদের সকলের মধ্যে অগ্নি পূজকদের অবস্থা সম্পর্কে অধিকতর অবগত, এরা আহলে কিতাব ছিল। তারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করতো। শরীয়তের শিক্ষাও তারা দিত, কিন্তু তাদের নিকট থেকে আল্লাহর দ্বীনের এলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এই আদেশ-"অগ্নি পূজকদের সংগে আহলে কিতাবদের ন্যায় ব্যবহার করা।" এই হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয়না যে, অগ্নি পূজকরা আহলে কিতাব। কেননা অগ্নি পূজকদের সংগে বিবাহ বৈধ নয়, তাদের জবেহ করা প্রানীর গোশত

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৩৭-৩৮

হারাম। আর এ সম্পর্কে সমগ্র উম্মত একমত। আর পূর্বোল্লিখিত হাদীসের অর্থ হল, যে ভাবে আহলে কিতাবদের থেকে যিজিয়া গ্রহণ কর, ঠিক তেমনি ভাবে অগ্নি পূজকদের থেকেও যিজিয়া গ্রহণ কর। অগ্নি পূজকদের পূর্ব পুরুষ যদিও আহলে কিতাব ছিল এবং আল্লাহর কিতাব পাঠ করতো কিন্তু যখন থেকে তারা আল্লাহর দ্বীন পরিত্যাগ করে আল্লাহর কিতাবের উপর আমল করা বর্জন করে তখন থেকে আল্লাহ পাক তাদের অন্তর থেকে এলম তুলে নিয়েছেন। এরপর ইবলিস অগ্নি পূজকদের জন্য নিয়ম কানুন তৈরী করে দেয় তখন থেকে তারা আহলে কিতাব নয়[১]

কাফেরদের সম্পর্কে নীতি

সোলায়মান এবনে বোরায়দা (রাঃ) তাঁর পিতার সুত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখনই কোন ব্যক্তিকে কোন সৈন্য বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করে প্রেরণ করতেন তখন বিশেষভাবে কয়েকটি নসিহত করতেন "আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাকবে, মুসলমানদের সংগে ভাল ব্যবহার করবে।" এরপর এরশাদ করেছেনঃ "আল্লাহর পাকের নাম নিয়ে আল্লাহর রাহে জেহাদ করবে। যে আল্লাহ পাকের প্রতি অবিশ্বাসী তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, পরাজিত হবেনা, অংগিকার ভংগ করবে না, কারো নাক কান কর্তন করবে না, কোন শিশুকে হত্যা করবে না। দুশমনের মুখোমুখি হয়ে তাকে তিনটি কথার প্রতি আহবান জানাবে।"

(১) তাকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানাবে, যদি সে এই আহবানে সাড়া দেয় তবে তুমিও তার কথা মেনে নিও এবং তার সংগে যুদ্ধ পরিত্যাগ করবে। এরপর তাকে বলবে তুমি নিজের বাড়ী–ঘর ছেড়ে মদীনা শরীফ চল সেখানে অন্য মোহাজেরদের ন্যায় তুমিও থাকবে তাদের লাভ তোমার লাভ, তাদের ক্ষতি তোমার ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত হবে। যদি তারা হিজরত করতে অস্বীকৃতি জানায় তবে তাদেরকে বলবে মদিনা শরীফের বাহিরের অন্য মুমিনদের মধ্যে তারা সামিল হবে। অন্য মুসলমানদের সংগে যে নীতি তাদের সাথেও সে নীতি গ্রহণ করা হবে। যেমন যদি তারা জেহাদে শরীক না হয় তবে যুদ্ধলব্ধ সম্পদে তাদের কোন অংশ থাকবেনা।

আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়, তবে তাদের থেকে যিজিয়া (অমুসলিম কর) দাবী করবে। যদি যিজিয়া আদায় করে তবে গ্রহণ করবে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না। অবশেষে যদি যিজিয়া আদায় করতেও অস্বীকৃতি জানায় তবে আল্লাহ পাকের দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করবে এবং তাদের সংগে যুদ্ধ করবে।

(মুসলিম শরীফ)

হযরত আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আরববাসী আহলে কিতাব থেকে যিজিয়া নেয়া বৈধ। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড–৫, পৃষ্ঠা–২৬৯.

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খালেদ এবনে ওয়ালিদ (রাঃ)-কে দওমাতুল বন্দলের শাসনকর্তা আকিদরের নিকট প্রেরণ করেন। হযরত খালেদ এবনে ওয়ালীদ (রাঃ) তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে আশ্রয় দেন এবং যিজিয়া আদায় করার শর্তে তার সংগে চুক্তি করেন।

(আবু দাউদ শরীফ)

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বলেছেন, হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরব দেশেই জীবন যাপন করেছেন। আরবী ভাষায়ই পবিত্র কোরআন নাজিল হয়েছে, আর আরববাসী তাঁর অনেক মোযেজা প্রত্যক্ষ করেছে। এজন্যে আরবের মূর্তি পূজকদের জন্যে দু'টি পন্থা ছিল, হয় তারা ইসলাম গ্রহণ করবে, অন্যথায় তারা যুদ্ধ করবে। এই অবস্থা মোরতাদদেরও (ধর্ম ত্যাগী)। মোরতাদ হেদায়েত লাভের পর, ইসলামের সৌন্দর্য এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর ইসলামকে পরিত্যাগ করে। ইসলাম সম্পর্কে সে জানেনা এমন ওজর আপত্তির কোন সুযোগ তার নেই। এজন্যে ইসলাম গ্রহণ অথবা যুদ্ধ, এতদ্ব্যতীত কোন বিকল্প নেই, তাদের থেকে যিজিয়া গ্রহণ করা যায় না। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্নিত আছে যে, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আরবের মোশরেকদের ব্যাপারে দু'টি পথই উন্মুক্ত, হয় তারা ইসলাম গ্রহণ করবে, না হয় যুদ্ধ করবে, আর তাদের পরিবারবর্গকে গোলাম-বাঁদী বানানো হবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বণী আওতাস এবং হাওয়াযিন গোত্রের লোকদেরকে গোলাম-বাঁদী বানিয়েছিলেন। এরা আরব মোশরেক ছিল। এমনিভাবে বণী মুস্তফার পরিবারবর্গকেও তিনি গোলাম-বাঁদী বানিয়েছিলেন। আর যখন বনু হানিফা গোত্রের লোকেরা মোরতাদ হল, তখন হযরত আবুবকর (রাঃ) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন এবং তাদের পরিবার বর্গকে গ্রেফতার করে গোলাম বাঁদী বানিয়ে মুজাহেদদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন।

আরব ভূ-খন্ড থেকে মোশরেকদেরকে বহিস্কার করো

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তিনটি কথার নসিহত করেছিলেন, মোশরেকদেরকে আরব ভূ-খন্ড থেকে বের করে দাও। (বিদেশী কাফেরদের) প্রতিনিধি দলকে এভাবেই অনুমতি দান কর যেভাবে আমি দিয়ে থাকি। আর তৃতীয় কথার ব্যাপারে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিরব ছিলেন, অথবা আমি ভুলে গেছি।

হযরত জাবের এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত ওমর (রাঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে শ্রবণ করেছেন যে হুজুর

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমি ইহুদী নাসারাদেরকে অবশ্যই বের করে দেব, এমনকি এখানে মুসলমান ব্যতীত আর কাউকে থাকতে দেবনা।

(মুসলিম শরীফ)

ইমাম মালেক (রহঃ) মুয়াত্তায় জুহরীর সূত্রে হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আরব ভূ-খন্ডে দু'টি ধর্ম একত্রিত হবেনা। আর হযরত আবু ওবায়দা এবনুল জাররাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ যে কথাটি বলেছিলেন তা হলো ইহুদীদেরকে হেযাজ থেকে আর নাজরান বাসীকে আরব ভূ-খন্ড থেকে বের করে দাও। ইমাম আহমদ (রহঃ) ও বায়হাকী এই হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

যিজিয়ার পরিমান সম্পর্কে–

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর মতে, পরস্পরের সন্তুষ্টির মাধ্যমে যিজিয়ার পরিমান নিদৃষ্ট হওয়া উচিত। এ ব্যাপারে কোন নিদৃষ্ট সংখ্যা নেই।

হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম (ইয়েমেনের) নাজরানীদের থেকে দু' হাজার জোড়া কাপড় আদায়ের শর্তে মীমাংসা করেছিলেন। ইমাম আবু দাউদ হযরত এবনে আব্বাসের (রাঃ) সূত্রে লিখেছেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নাজরানবাসী থেকে দু' হাজার জোড়া কাপড় আদায়ের শর্তে মীমাংসা করেছিলেন, যার অর্ধেক সফর মাসে, আর অবশিষ্ট অর্ধেক রজব মাসে আদায় করার কথা ছিল।

ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) লিখেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নাজরানবাসীকে একটি লিখিত দলীল দিয়েছিলেন, তাতে লিখা ছিল নাজরানবাসী দু' হাজার জোড়া পোশাক আদায় করবে।

ইসলামের উদার নীতি

ইসলাম উদারতা, মহানুভবতার শিক্ষা দেয়। তাই ইসলামী বিধানেও রয়েছে এই বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন। ইমাম আবু হানিফা (রঃ), ইমাম মালেক (রঃ) এবং ইমাম আহমদ (রঃ)-এর মতে, বেরোজগার দারিদ্র-প্রপীড়িত অমুসলিমদের থেকে যিজিয়া আদায় করা হবে না। ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-ও একটি সূত্র মতে এ মত পোষণ করতেন। আর একটি বর্ণনায় রয়েছে, তাঁর (সাফেয়ী (রঃ)) মতে, এমন লোকদের থেকে যিজিয়া আদায় করা কর্তব্য, তবে যিজিয়া আদায়ের দাবী তখন করা হবে যখন সে স্বচ্ছল হবে।

বর্ণিত আছে, একজন অমুসিলম বৃদ্ধকে হযরত ওমর (রাঃ) ভিক্ষা করতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কেন ভিক্ষা কর?

সে বললো–আমার নিকট অর্থ–সম্পদ নেই, অথচ আমাকে যিজিয়া আদায় করতে হয়।

হযরত ওমর (রাঃ) তখন বললেনঃ আমরা তোমার প্রতি সুবিচার করিনি। তোমার যৌবনের রোজগার আমরা খেয়েছি। এখন (এই বৃদ্ধ কালে) তোমার থেকে যিজিয়া গ্রহণ করা হচ্ছে। এরপর তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নামে একটা ফরমান জারী করলেন যে, বৃদ্ধ লোকদের নিকট থেকে যিজিয়া গ্রহণ করো না।

(বায়হাকী)

ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) হেশাম এবনে ওরওয়া এবনে জোবায়ের এবনে আওয়ামের সূত্র থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন কালে একটি স্থান অতিক্রম করলেন। সেখানে তিনি দেখলেন কিছু লোককে রোদ্রে দাড় করিয়ে রাখা হয়েছে এবং তাদের মাথা থেকে তেল পড়ছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কি হয়েছে?

লোকেরা বললোঃ এদের উপর যিজিয়া ওয়াজেব, কিন্তু তারা আদায় করছে না। এজন্য তাদের সঙ্গে এ ব্যবহার করা হচ্ছে।

হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ যিজিয়া আদায় করার ব্যাপারে তাদের অসুবিধা কি? লোকেরা বললোঃ এরা তাদের দারিদ্রের কথা বলছে।

হযরত ওমর (রাঃ) তখন বললেনঃ এদেরকে ছেড়ে দাও। আর মানুষকে তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত কষ্ট দিওনা। আমি শ্রবণ করেছি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের, এরশাদ করেছেনঃ তোমরা মানুষকে কষ্ট দিওনা যারা দুনিয়াতে মানুষকে কষ্ট দেবে আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন তাদেরকে আযাব দেবেন। এরপর তিনি তাদেরকে ছেড়ে দেয়ার আদেশ দিলেন।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) লিখেছেন, আমি একজন বৃদ্ধ ব্যক্তির নিকট এই হাদীস শ্রবণ করেছি যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আরকামকে যিম্মিদের থেকে যিজিয়া উসুল করার দায়িত্ব অর্পন করলেন। আবদুল্লাহ যখন দায়িত্ব পালনের জন্য রওয়ানা হলেন তখন তাকে ডাক দিয়ে তিনি বললেনঃ শ্রবণ কর যে এমন কোন ব্যক্তির ওপর জুলুম করবে যার সঙ্গে আমাদের চুক্তি রয়েছে অথবা কোন লোককে তার সাধ্যাতীত কষ্ট দেবে আর তার সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য না করবে তবে কেয়ামতের দিন আমি তার পক্ষে ঐ ব্যক্তির তরফ থেকে ঝগড়া করবো।১

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড–৫, পৃষ্ঠা–২৪৭–৪৮

ইসলামী শরীয়ত এ সম্পর্কে এ সিদ্ধান্তও ঘোষণা করেছে যে, শিশু, পাগল এবং মহিলাদের উপর যিজিয়া ওয়াজেব নয়। কেননা এরা কোন শাস্তির যোগ্য নয়। তাই তাদের প্রতি যিজিয়া নেই। ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) কিতাবুল খেরাজে লিখেছেন, আমার নিকট ওবায়দুল্লাহ নাফের সূত্রে আসলামের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) (তাঁর তহশীলদারদেরকে) লিখেছিলেন, যিজিয়া শুধু সাবালক লোকদের নিকট থেকে গ্রহণ করবে মহিলা এবং শিশুদের থেকে গ্রহণ করবে না। এমনিভাবে গোলামদের উপরও যিজিয়া নেই। কেননা গোলাম সে যে কোন প্রকারেরই গোলাম হোকনা কেন,সে সম্পদের মালিক হয়না।

আবু ওবায়দা কিতাবুল আমওয়ালে ওরওয়ার বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইয়েমেনবাসী সম্পর্কে লিখে পাঠায়েছিলেন যে, কোন ইহুদী বা খৃষ্টানকে তার ধর্ম ত্যাগে যেন বাধ্য না করা হয়; তবে প্রত্যেক সাবালকের উপর যিজিয়া তথা অমুসলিম কর ধার্য কর।

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ
عُزَيْرُ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ۭ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ
بِاَفْوَاهِهِمْ ۚ يُضَاهِـُٔوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ۭ قٰتَلَهُمُ
اللّٰهُ ۚ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٣٠﴾ اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا
مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا
اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٣١﴾ يُرِيْدُوْنَ
اَنْ يُّطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلَّآ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ
وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٣٢﴾ هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ
دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ﴿٣٣﴾

তরজমা

(৩০) আর ইহুদীরা ওযায়েরকে আল্লাহর পুত্র এবং খৃষ্টানরা মসীহকে আল্লাহর পুত্র বলে। এসব তাদের মুখের কথা। তারা পূর্ববর্তী কাফেরদেরই অনুকরণ করে, আল্লাহ পাক তাদেরকে ধ্বংস করুন, তারা কিভাবে সত্য বিমুখ হয়।

(৩১) তারা আল্লাহ পাককে বাদ দিয়ে তাদের পন্ডিত ও সংসার ত্যাগী সাধুদেরকে খোদা মনে করেছে এবং মরিয়ম পুত্র মসীহকেও, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল তারা যেন শুধু এক মাত্র মাবুদেরই বন্দেগী করে, তিনি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নাই, তারা যাকে শরীক করে তা থেকে তিনি পবিত্র।

(৩২) তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহ পাকের নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়, আল্লাহ পাক কিন্তু তাঁর নূর অবশ্যই পূর্ণ করবেন কাফেরদের তা যত অপছন্দনীয়ই হোকনা কেন।

(৩৩) তিনিই আল্লাহ পাক, যিনি তাঁর রসূলকে হেদায়েত এবং সত্য ধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন সকল ধর্মের উপর সত্য ধর্মের প্রভাব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে, আর তাতে মোশরেকদের যতই গাত্রদাহ হোকনা কেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে মোশরেকদের মন্দ আচরণের বিবরণ ছিল, আর আলোচ্য আয়াতে আহলে কিতাবদের বাতিল আকিদা এবং পথভ্রষ্টতা ও শেরেকী কীর্তি কলাপের বর্ণনা রয়েছে। আর এ কথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, মোশরেকদের ন্যায় আহলে কিতাবরাও পথভ্রষ্ট এবং আদর্শ চ্যুত, আল্লাহর অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ।

পূর্বে ঘোষণা করা হয়েছে যে, "আহলে কিতবরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না" আখেরাতের প্রতিও বিশ্বাস করে না এবং সত্য দ্বীন গ্রহণ করেনা। এ কথাগুলোর কিছু রিস্তারিত বিবরণ আলোচ্য আয়াত সমূহে রয়েছে।

সর্ব প্রথম ইহুদীদের কথা বলা হয়েছে যে, তারা হযরত ওযায়ের (আঃ)–কে আল্লাহর পুত্র বলে দাবী করতো। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেনঃ এ বাতিল আকিদায় সকল ইহুদী বিশ্বাসী ছিলনা বরং তাদের মধ্যে কিছু লোকে এ কথায় বিশ্বাস করতো। যেমন মদীনা শরীফের ইহুদী বনু কোরায়জা এবং সিরিয়ার কিছু ইহুদীও এ কথা বলতো। আলোচ্য আয়াতে তাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, সাল্লাম এবনে মাসকাম নোমান এবনে

আওফা এবং আবু উনুস এবং শাস এবনে কায়েশ হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেছিলঃ

كيف نتبعك

আমরা কিভাবে আপনার অনুসরণ করবো, অথচ আপনি আমাদের কেবলাকে পরিত্যাগ করেছেন (বায়তুল মোকাদ্দাস) এবং আপনি ওযায়েরকে আল্লাহর পুত্র বলে মনে করেন না। এর দ্বারা এ কথা জানা যায় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে যারা মদীনা শরীফে বাস করতো তাদের মধ্যেও কিছু লোক এই বাতিল আকিদায় বিশ্বাসী ছিল যে, ওযায়ের (আঃ) আল্লাহর পুত্র। (নাউজুবিল্লাহ মিন জালেক)

এবনে জওজী (রঃ) লিখেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে একদল লোক বর্তমান ছিলো যারা এমন অন্যায় কথা বিশ্বাস করতো।[১]

এজন্যই যখন এ আয়াত নাজিল হয়, তখন কোন ইহুদী এর প্রতিবাদ করেনি।

ইমাম আবু বকর রাজী (রঃ) আহকামুল কোরআন গ্রন্থে লিখেছেন, ইহুদীদের একটি ফেরকা হযরত ওযায়ের (আঃ) সম্পর্কে এ আপত্তিকর কথায় বিশ্বাস করতো।[২]

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেও এই অভিমতই বর্ণিত আছে। ইহুদী এবং নাসারারা শুধু যে হযরত ওযায়ের (আঃ) এবং হযরত মসীহ (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বানাবার ধৃষ্ঠতা দেখিয়েছে তাই নয়, বরং তাদের ধর্ম যাযক এবং সাধুদেরকেও এই মর্যাদায় আসীন করেছে, এই মর্মে যে, তাদের ধর্ম যাজকরা যে আদেশ দিত সে আদেশ তারা আল্লাহ পাকের আদেশের সমান মর্যাদা দিত। আর তাদের জারী করা বিধি-নিষেধকে আল্লাহর বিধি-নিষেধের স্থলাভিসিক্ত মনে করতো। ধর্ম যাজকরা যা বলতো তাই তারা মানতো, আর যা নিষেধ করতো তা থেকে বিরত থাকতো।

আলোচ্য আয়াতে ইহুদী ও খৃষ্টানদের অমার্জনীয় অপরাধের যে বিবরণ পেশ করা হয়েছে তন্মধ্যে সর্ব প্রথম হলো তারা আল্লাহ পাকের প্রতি এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনেনি, আল্লাহ পাকের বিধানকে অমান্য করেছে।

(১) তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩১১-১২
তফসীরে কবীর, খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-৩৩

২। আহকামুল কোরআন, কৃত ইমাম জাস্সাস (রঃ), খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১০৩

দ্বিতীয় অপরাধ হলো, ইহুদীরা হযরত ওযায়ের (আঃ)–কে এবং নাসারারা হযরত ঈসা (আঃ)–কে আল্লাহর পুত্র বলে দাবী করেছে।

আর তৃতীয় অপরাধ হলো তারা তাদের ধর্ম যাজকদেরকে হালাল ও হারাম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দেয়ার অধিকারী করেছে। আল্লাহর বিধানকে অমান্য করে তার স্থলে তাদের ইচ্ছানুযায়ী শরীয়ত তৈরী করার অধিকার দিয়েছে তাদের ধর্ম যাজকদেরকে, অথচ তাদের প্রতি আদেশ হয়েছে যেন তারা এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, কিন্তু তারা তাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ

(আর ইহুদীরা বলে ওযায়ের আল্লাহর পুত্র)

হযরত ওযায়ের (আঃ) সম্পর্কে ইহুদীদের বাতিল আকিদার ইতিহাস

আল্লামা বগভী আতিয়া উফির সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)–এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, ইহুদীদের মধ্যে হযরত ওযায়ের (আঃ)–কে আল্লাহর পুত্র বানাবার যে বাতিল আকিদা প্রচলিত হয়েছে তা এভাবে শুরু হয়, যখন হযরত ওযায়ের (আঃ) বর্তমান ছিলেন তৌরাতও ছিল, আর ইহুদীদের নিকট তাবুতও ছিল তখন ইহুদীরা তৌরাতের উপর আমল করা বর্জন করলো। তারা তৌরাত হারিয়ে ফেললো। পরিণামে আল্লাহ পাক তৌরাতকে সরিয়ে দিলেন এবং তাবুতকে উঠিয়ে নিলেন। এ অবস্থা দেখে হযরত ওযায়ের (আঃ) অত্যন্ত ব্যথিত হলেন এবং আল্লাহ পাকের দরবারে ক্রন্দনরত অবস্থায় দোয়া করলেন। তখন আল্লাহ পাক তাঁর দোয়া কুবল করলেন এবং তৌরাত তাঁর নিকট ফিরিয়ে দিলেন অর্থাৎ ভুলে যাওয়া তৌরাত তিনি আবার স্মরণ করতে পারলেন। এরপর তিনি বণী ইসরাইলকে জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ পাক দয়া করে আমাকে তৌরাত ফিরিয়ে দিয়েছেন। চতুর্দিকে থেকে লোক এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরলো এবং তৌরাত পাঠ করতে লাগলো। এরপর অনেক সময় অতিবাহিত হলো। তখন আল্লাহ পাক তাবুতও ফেরৎ দিলেন। তাবুতের মধ্যে তৌরাত বন্ধ ছিল। হযরত ওযায়ের (আঃ) যে তৌরাতের শিক্ষা দিয়েছেন তার সঙ্গে তাবুতে যে তৌরাত এসেছে তাকে মিলিয়ে দেখলেন যে, একই তৌরাত। তখন লোকেরা বলতে লাগলো ওযায়েরকে যে দ্বিতীয়বার তৌরাত দেয়া হয়েছে তার কারণ হলো ওযায়ের হলেন আল্লাহর পুত্র। (নাউজুবিল্লাহে মিন জালেক)

এ পর্যায়ে কালবী (রঃ) উল্লেখ করেছেন, বখত নসর যখন বণী ইসরাইলদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করলো তখন সে এমন সমস্ত লোকদেরকে হত্যা করলো যারা তৌরাত পাঠ করতো। হযরত ওযায়ের (আঃ) সে সময় শিশু ছিলেন, তাই তাঁকে

হত্যা করলো না। ৭০ বা ১০০ বছর পর বণী ইসরাইল যখন বায়তুল মোকাদ্দাসে পুনরায় আসলো তখন তৌরাত কারোই স্মরণ ছিলনা। আল্লাহ পাক ওযায়ের (আঃ)-কে প্রেরণ করলেন যেন তিনি বণী ইসরাইলকে নতুন করে তৌরাতের শিক্ষা দেন। তিনিই যে ওযায়ের (আঃ) এ কথার প্রমাণ স্বরূপ তিনি লোকদেরকে তৌরাত শুনিয়ে দেন। কেননা ১০০ বছর মৃত অবস্থায় থাকার পর আল্লাহ পাক তাঁকে পুনর্জীবন দান করেছিলেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে সূরায়ে বাকারায় আলোচনা হয়েছে।

বর্ণিত আছে যে, একজন ফেরেশতা একটি পাত্রে পানি এনে হযরত ওযায়ের (আঃ)-কে পান করালেন। এর সঙ্গে সঙ্গে ওযায়ের (আঃ)-এর অন্তরে তৌরাত স্থান পেল। এরপর হযরত ওযায়ের (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট এসে বললেন, আমি ওযায়ের, লোকেরা তাঁকে মিথ্যাজ্ঞান করলো এবং বললো যদি তুমি সত্য নবী হও তবে আমাদেরকে তৌরাত লিপিবদ্ধ করে দাও। হযরত ওযায়ের (আঃ) তৌরাত লিপিবদ্ধ করে দিলেন।

এর কিছু দিন পর এক ব্যক্তি এসে বললো, আমাকে আমার পিতা আমার পিতামহের কথা বলেছেন যে, তৌরাতকে একটি বড় পাত্রের ভেতরে রেখে আঙ্গুর বৃক্ষের গোড়ায় দাফন করা হয় যেন বখত নসরের আক্রমনের সময় তৌরাতের একটি কপি সংরক্ষিত থাকে। এ ব্যক্তির সংবাদের ভিত্তিতে লোকেরা নির্দৃষ্ট স্থানে গমন করে সেখান থেকে তৌরাত বের করে আনলো। তখন হযরত ওযায়ের (আঃ)-এর লিপিবদ্ধ কপি প্রাচীন কপির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা গেল যে, একটি অক্ষরেরও পার্থক্য নেই। তখন লোকেরা আশ্চযন্বিত হলো যে, একই ব্যক্তির অন্তরে পূর্ণ তৌরাত আল্লাহ পাক অবতরণ করেছেন, তারা বলতে লাগল এর একমাত্র কারণ হলো এই ব্যক্তি আল্লাহর পুত্র। তখন থেকেই ইহুদীরা ওযারের (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলতে থাকে।১

وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ

আর নাসারারা বলে মসীহ আল্লাহর পুত্র।

হযরত ঈসা (আঃ) কে পুত্র বানাবার বাতিল আকিদা কিভাবে প্রচলিত হলো–

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, হযরত ঈসা (আঃ)-কে আসমানে উত্তোলনের পর ৮১ বছর পর্যন্ত হযরত ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীরা সঠিক ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এরপর ইহুদী এবং নাসারাদের মধ্যে লড়াই শুরু হলো, ইহুদীদের মধ্যে পুলুস

১। তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-৩, পৃঃ৫৩
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃঃ ২৭৭

নামক এক ব্যক্তি ছিল। সে ঈসা (আঃ)–এর সংগীদের এক দলকে হত্যা করে। সে নাসারাদের অত্যন্ত জঘন্য শত্রু ছিল। তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্যে সে একটি ষড়যন্ত্র করলো।

একদিন সে ইহুদীদেরকে বললো, যদি ঈসা (আঃ) সত্য নবী হন তবে আমাদের কাফের এবং দোজখী হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকে না, আর যদি নাসারারা জান্নাতে যায় আমরা দোজখে গমন করি তবে আমরা বড়ই ক্ষতিগ্রস্থ হবো। তাই আমি চাই এমন কোন ষড়যন্ত্র করি যার দ্বারা তারা পথভ্রষ্ট হয় এবং আমাদের সংগে তারাও দোজখে যায়। এরপর সে তার সে অশ্বটির উপর আরোহন করে, যার উপর আরোহী হয়ে সে যুদ্ধ করতো, সে তার মাথার উপর মাটি রাখে এবং অত্যন্ত লজ্জিত অনুতপ্ত হয়ে তওবার কথা প্রকাশ করে, ক্রন্দন রত অবস্থায় নাসারাদের মজলিশে উপস্থিত হয়। লোকেরা জিজ্ঞাসা করে তুমি কে? সে বলে আমি তোমাদের শত্রু পুলুস। আমি আসমান থেকে এ বাণী পেয়েছি যে, যে পর্যন্ত তুমি নাসারা না হবে সে পর্যন্ত তোমার তওবা কবুল হবেনা। তাই আমি ইহুদী ধর্ম পরিত্যাগ করে তোমাদের নিকট চলে এসেছি। তারা তাকে গির্জায় নিয়ে নাসারা বানিয়ে নেয় এবং একটি কক্ষে থাকতে দেয়। এক বছর সে ঐ কক্ষে অতিবাহিত করে এবং ইঞ্জিল গ্রন্থের শিক্ষা লাভ করে। এক বছর পর সে বলে আসমান থেকে আমি এ বাণী পেয়েছি যে, আল্লাহ্ পাক আমার তওবা কবুল করেছেন।

নাসারারা তার এ কথা বিশ্বাস করে এবং তাদের অন্তরে তার জন্য অত্যন্ত ভক্তি মহব্বত সৃষ্টি হয়। তারা তাকে অত্যন্ত মর্যাদা সম্পন্ন মনে করতে থাকে। তখন সে বায়তুল মোকাদ্দাস গমন করে। সেখানে সে গোপনে তিনটি লোককে নির্বাচন করে যারা তার শিক্ষার প্রচারের কাজ করবে। এ তিন ব্যক্তির নাম ছিল নাস্তুর, ইয়াকুব, মালাকান। নাসতুরকে এ শিক্ষা দেয় যে, ঈসা, মরিয়ম এবং খোদা এভাবে তিন খোদা (নাউজুবিল্লাহে মিন জালেক) আর ইয়াকুবকে এ শিক্ষা দেয় যে, ঈসা মূলতঃ মানুষ ছিলেন না, তিনি ছিলেন আল্লাহর পুত্র। (নাউজুবিল্লাহ)

আর মালাকানকে এ শিক্ষা দেয় যে, ঈসাইতো প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ। তিনি সর্বদা আছেন এবং থাকবেন। (নাউজুবিল্লাহ) এরপর প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ডেকে বলে তুমি আমার বিশেষ বন্ধু এবং দূত। তুমি অমুক দেশে যাও এবং মানুষকে এ শিক্ষা দান কর। আর ইঞ্জিল কিতাবের দিকে মানুষকে ডাকো। সে বলেঃ আমি ঈসা (আঃ)–কে স্বপ্নে দেখেছি। তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন। এরপর সে বললো, আমি ঈসার নামে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করবো। এ কথা বলে সে আত্মহত্যা করে এবং তার তিন শিষ্য তিন দেশে চলে যায়। একজন রোমে, একজন বায়তুল মোকাদ্দাসে, আর একজন অন্যত্র। আর তারা প্রত্যেকে সে বাতিল আকিদা প্রচার করতে থাকে যা পুলুস

তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে। এভাবে নাসারাদের মধ্যে তিনটি ফেরকার সৃষ্টি হয়।১

ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ

এই আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, এই আয়াত সমূহে আল্লাহ পাক মোমেনদেরকে কাফের, মোশরেক, ইহুদী এবং নাসারাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার জন্যে অনুপ্রাণিত করেছেন। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ তোমরা লক্ষ্য কর যে, ইহুদী এবং নাসারারা আল্লাহ পাকের শানে কত বেয়াদবি করছে, ইহুদীরা ওযায়েরকে আল্লাহর পুত্র বলে দাবী করছে। আর নাসারারা ঈসাকে আল্লাহর পুত্র বলে বেড়াচ্ছে: এসব হলো তাদের মৌখিক, ভিত্তিহীন বাজে কথা। ইতিপূর্বে কাফেররা যেভাবে এ সম্পর্কে ভিত্তিহীন, বানোয়াট কথা বার্তা বলতো, এরাও তেমনি বানোয়াট এবং বাজে কথা বলে। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুক, কত মন্দ কথা তারা বলে, আর কিভাবে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

ইহুদীরা কিভাবে হযরত ওযায়ের (আঃ)-কে এবনুল্লাহ বলতে শুরু করে এ সম্পর্কে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) অন্য একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন।

বখতে নসর তথা আমালেকা জাতি যখন বণী ইসরাইলকে পরাজিত করলো তখন তাদের গুণী জ্ঞানী এবং ধর্ম যাজকদেরকে হত্যা করলো। তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকেও বন্দী করলো। জ্ঞানী লোকদের নিহত হওয়ার কারণে জ্ঞানের চর্চা বন্ধ হয়ে গেল। বণী ইসরাইল জাতি চরম ধ্বংসের সম্মুখীন হল। এই অবস্থায় হযরত ওযায়ের (আঃ) অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

একদিন তিনি ক্রন্দন রত অবস্থায় একটি ময়দান অতিক্রম করছিলেন, তখন দেখলেন একজন মহিলা একটি কবরের কাছে বসে ক্রন্দন করছে এবং বলছে হায়! এখন আমার খাবার ও পোষাকের কি ব্যবস্থা হবে?

হযরত ওযায়ের (আঃ) মহিলার এ অবস্থা দেখে তার নিকট দন্ডায়মান হলেন, যার জন্য তুমি ক্রন্দন করছ তার আগে কে তোমার পানাহারের ব্যবস্থা করতো? কে তোমার পোষাক সরবরাহ করতো? সে বললোঃ আল্লাহ তাআলা। তখন তিনি বললেনঃ আল্লাহ পাকতো এখনও জীবিত আছেন। সর্বদাই জীবিত থাকবেন। তাঁর উপরতো কোন সময় মৃত্যু আসবেনা। এ কথা শ্রবণ করে মহিলা বললেনঃ হে ওযায়ের! আমার একটি প্রশ্নের জবাব দিন, বণী ইসরাইলের পূর্বে আলেমদেরকে কে এলম শিক্ষা দিত?

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৫৬-২৫৭
তফসীরে কবীর, খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-৩৪
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩১৪-১৫

তিনি বললেনঃ আল্লাহ তাআলা। তখন সে বললোঃ তা হলে আপনার এ ক্রন্দন কেন? তখন তিনি উপলব্ধি করলেন যে, তাঁকে সতর্ক করার জন্য আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। তাকে এ কথাও বললেন যে, তুমি অমুক নদীতে নেমে গোসল করে সেখানে দু রাকায়াত নামাজ আদায় কর। সেখানে তোমার সঙ্গে এক ব্যক্তির দেখা হবে, সে তোমাকে যা আহার করাতে চায় তা আহার কর।

হযরত ওযায়ের (আঃ) নির্দৃষ্ট স্থানে পৌছে গোসল শেষে নামাজ আদায় করলেন। তিনি দেখলেন এক ব্যক্তি তাকে বলছে, মুখ খোল, তিনি মুখ খুললেন, তখন সে তিনবার কোন জিনিস তার মুখে ঢেলে দিল। আর তখনই আল্লাহ পাক তার মনের কপাট খুলে দিলেন। তৌরাত সম্পূর্ণ তাঁর অন্তরে এসে গেল। তিনি তৌরাতের সবচেয়ে বড় আলেম হয়ে গেলেন। এরপর তিনি বণী ইসরাইলের নিকট গমন করে বললেন, আমি তোমাদের নিকট তৌরাত নিয়ে এসেছি। তারা বললো, আপনি আমাদের সকলের নিকট সত্যবাদী, আপনি একই সঙ্গে সম্পূর্ণ তৌরাত লিপিবদ্ধ করে দিন।

এদিকে যুদ্ধকালীন অবস্থায় তৌরাতের যে কপিটি জঙ্গলে গোপন করা হয়েছিল তা লোকেরা বের করে আনলো এবং হযরত ওযায়ের (আঃ) যে কপি লিপিবদ্ধ করেছেন প্রাচীন কপির সংগে তা মিলিয়ে দেখা গেল যে, উভয় কপির মধ্যে একটি অক্ষরেরও পার্থক্য নেই। তখন কিছু মূর্খ লোকের অন্তরে শয়তান এই ওয়াস ওয়াসা দিল যে, যেহেতু ওযায়ের (আঃ) আল্লাহর পুত্র তাই তাঁর পক্ষে এই কাজ সম্ভব হয়েছে। তখন থেকে ইহুদীরা তাঁকে আল্লাহর পুত্র বলতে থাকে।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক তাদের এ ভিত্তিহীন বানোয়াট কথার প্রতিবাদ করে এরশাদ করেছেনঃ

ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ

এগুলো হলো তাদের মুখের কথা মাত্র। এসব কথার কোন দলিল নেই, ভিত্তিহীন এবং বাজে কথা। ইতিপূর্বে কাফেররাও এমন কথা বলেছে। আল্লাহর লানত হোক এসব লোকদের উপর।১

يُضَاهِـُٔوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৪৭-৪৮

ইতিপূর্বে কাফেররা যে সব কথা বলতো এই ইহুদী নাসারারাও অনুরূপ কথাই বলছে।

মুজাহেদ (রঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, ইহুদী নাসারাদের এ কথা মোশরেকদের কথার ন্যায়। কাতাদা এবং সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, নাসারাদের এ কথা ইহুদীদের কথার ন্যায়ই। ইহুদীরা ওযায়ের (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলতো, আর ঈসায়ীরাও ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলতো।

হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, ঈসায়ীদের এ কথা কাফেরদের কুফরী কালামের ন্যায়। আর কোতাইবা (রঃ) বলেছেন, এই আয়াতের অর্থ-হলো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগের ইহুদী এবং নাসারাদের কথাও তাদের পূর্ব পুরুষের কথার ন্যায় অর্থাৎ তাদের এ কুফর ও নাফরমানী অনেক পুরাতন। এতে নতুনত্ব কিছু নেই।

قَٰتَلَهُمُ ٱللَّهُ ۚ

এতে রয়েছে বদদোয়া। আল্লাহ পাক তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। আর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ বাক্যের অর্থ বলেছেন, আল্লাহ পাক তাদের প্রতি লানত করেছেন। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেনঃ এতে বদাদোয়া নয়; বরং বিস্ময়ের প্রকাশ রয়েছে।

أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ۝

তোমরা কোন্ দিকে যাচ্ছ? অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি ঈমানের ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ এবং জ্বলন্ত নিদর্শন সমূহ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তোমরা সত্যকে বর্জন করে কোন দিকে যাচ্ছ?

ٱتَّخَذُوٓا۟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ

তারা তাদের ধর্ম যাজক এবং সাধুদেরকে তাদের প্রতিপালক বানিয়ে ফেলেছে অর্থাৎ অকৃতজ্ঞ হয়েছে এবং তাদের ধর্ম যাজকদের কথা মেনে চলছে।

মসনদে আহমদ এবং তিরমিজি শরীফের একখানি হাদীস সংকলিত হয়েছে। যখন আদি এবনে হাতেমের নিকট হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে তখন সে সিরিয়া পলায়ন করে। সে জাহেলিয়াতের যুগেই নাসারা হয়ে গিয়েছিল, তার বোন এবং আরো লোকজন বন্দী

হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর স্বভাবগত মহানুভবতার কারণে তার বোনকে আজাদ করে দিলেন। তার বোন সরাসরি ভাইয়ের নিকট পৌঁছল এবং তাকে ইসলাম গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করলো এবং তাকে বললো, তুমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হও। সে তার গোত্রের সরদার ছিল তাই সে মদীনা শরীফ আসলো। এতদ্ব্যতীত তার পিতা ছিল বিশ্ব বিখ্যাত দানবীরব্যক্তি।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট লোকেরা তার খবর দিলে তিনি নিজেই তার নিকট আসেন। তখন তার গলায় ক্রুসেডের চিহ্ন ঝুলন্ত ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করলেন। তিনি আদি কে নির্দেশ দিলেন এ মূর্তিটি গলা থেকে ফেলে দাও। আদি বলে আমি সঙ্গে সঙ্গে ক্রুসেডের চিহ্নটি ফেলে দিলাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যেহেতু আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করছিলেন, তাই আমি আরজ করলামঃ আমরাতো ধর্ম যাজকদের পূজা করি না তথা তাদেরকে আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা দেইনা। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যে বস্তু হালাল ছিল তোমাদের ধর্ম যাজকরা তাকে হারাম বলতো। এমনিভাবে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে কোন বস্তু হারাম ছিল কিন্তু তোমাদের ধর্ম যাজকরা তাকে হালাল করেছে তোমরা কি তাদের কথা মেনে নিয়েছ?

তখন আদি বললো হ্যাঁ, এমনতো হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আলোচ্য আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ পাকের কথা বাদ দিয়ে তোমাদের ধর্ম যাজকদের কথাটি মেনে নিচ্ছ এটিই তাদের এবাদত।[১]

এজন্য তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, হযরত মুসা (আঃ)-এর জমানায় ইহুদীদের যে ধর্ম বিশ্বাস ছিল পরবর্তীকালে তা রয়নি। এমনিভাবে হযরত ঈসা (আঃ)-এর যুগে নাসারাদের যে বিশ্বাস ছিল তাঁরপরে তারা সবই বর্জন করেছে। এভাবে তারা পথভ্রষ্ট এবং আদর্শচ্যুত হয়েছে। ধর্মের নামে অধর্মে বিশ্বাস করেছে। তাদের ধর্ম যাজকরা হীন আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে তৌরাত ইঞ্জিলের বিধান পরিবর্তন করেছে। তওহিদের মূল আকিদা তারা ভুলে গেছে। অথচ তওহিদ বা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানিয়েছেন সমস্ত নবী রসূলগণ। আর এ উদ্দেশ্যেই নাজিল হয়েছে আসমানী কিতাব সমূহ, এভাবে ইহুদী নাসারারা ইসলামের মূল আকিদা তওহিদের উপরই আঘাত হেনেছে। পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, ইহুদীরা যে ওযায়ের (আঃ)-

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৪৭-৪৮
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৫৮

কে 'এবনুল্লাহ' বা আল্লাহর পুত্র বলেছে, আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে–

وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا
إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ

আর নাসরারা মরিয়ম পুত্র মসীহকে প্রতিপালক বানিয়েছে অথচ তাদেরকে শুধু এ আদেশই দেয়া হয়েছে যেন তারা এক প্রতিপালকের বন্দেগী করে, এক আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, তারা যা কিছুকে তাঁর সাথে শরীক করে তিনি তা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ

অর্থাৎ কাফেরদের একান্ত আকাংখা এই যে, তারা আল্লাহর নূরকে নিস্প্রভ করে দেবে তথা আল্লাহর হেদায়েত এবং সত্য দ্বীনকে ও সত্যের আলোকে নির্বাপন করবে। তা কি সম্ভব? কোন ব্যক্তি যদি এই চেষ্টা করে যে, তার মুখের ফুৎকারে সূর্যের আলোকে নিভিয়ে দেবে তা যেমন কোন দিনও সম্ভব হবেনা ঠিক তেমনিভাবে দ্বীন ইসলামের রবির উদয়ের পর তাকেও অস্তমিত করা যাবে না। কেননা সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের সিদ্ধান্ত হলো তিনি তাঁর নূরকে পরিপূর্ণ করবেন, তাঁর দ্বীনকে তিনি সু-প্রতিষ্ঠিত করবেন, কাফেরদের নিকট তা যত অপ্রিয়ই হোকনা কেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে নূর অর্থ হলো তওহীদের সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ সমূহ, অথবা পবিত্র কোরআন অথবা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত ও রেসালত।

بِأَفْوَاهِهِمْ

অর্থাৎ তাদের তওহিদ বিরোধী মিথ্যা কথা বার্তা। ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে নূর অর্থ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের দলিল সমূহ, যেমন তাঁর বিখ্যাত মোযেজা সমূহ যা তাঁর নবুওয়তের দলিল।

দ্বিতীয়ত, পবিত্র কোরআন যা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠ মোযেজা। তিনিতো জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের মাঝেই জীবন যাপন করেছেন। তিনি কোন মানুষের নিকট কোন কিছু শিক্ষা গ্রহণ করেননি, কোন দিন কোন গ্রন্থ পাঠ করেননি, অথচ সকল জ্ঞানের মূল উৎস পবিত্র কোরআন যা বিশ্ববাসী তাঁর মাধ্যমেই উপহার পেয়েছে।

তৃতীয়ত, তাঁর শরীয়তের মূল কথা হলো–আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এবং আনুগত্য প্রকাশ করা। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার মায়া–মোহ, লোভ–লালসা পরিত্যাগ করা। আখেরাতের চির কালীন জিন্দেগীর কল্যাণ লাভে সচেষ্ট হওয়া।

এতদ্ব্যতীত তিনি মানব জাতির জন্য যে জীবন বিধান নিয়ে এসেছেন তা যুক্তি সঙ্গত, পরিপূর্ণ বাস্তবের অগ্নি পরীক্ষায় শতবার পরীক্ষিত। অতএব, ইহুদী নাসারাদের মুখের ফুঁৎকারে নবুওয়তের সূর্যের আলো কোন দিনও নিষ্প্রভ হবে না।১ যতদিন এ পৃথিবী থাকবে ততদিন পৃথিবীতে চিরসত্য ইসলামও থাকবে। ইহুদী নাসারা বা কাফেরদের সকল ষড়যন্ত্র পূর্বেও ব্যর্থ হয়েছে, ইনশা আল্লাহ ভবিষ্যতেও ব্যর্থ হবে।

প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ পৃথিবীতে কোন কাঁচা বা পাকা বাড়ী এমন থাকবে না যেখানে আল্লাহ পাক ইসলামকে পৌঁছাবেন না। আর তা মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিকে সম্মান দিবে, আর অপমানিতকে অপমানিত করবে অর্থাৎ যাকে সম্মানিত করা আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হবে তাকে ইসলাম নসীব করবেন, আর যাকে অপমানিত করার ইচ্ছা হবে সে ইসলাম থেকে বঞ্চিত হবে।

هُوَ الَّذِىٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى

তিনিই সে আল্লাহ পাক যিনি তাঁর রসূলকে হেদায়েত এবং সত্য দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন যেন সকল ধর্মের উপর দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করেন।

আলোচ্য আয়াতে بِالْهُدٰى শব্দটির ব্যাখ্যা হলো পবিত্র কোরআন যা মানুষকে হালাল হারাম সহ অন্যান্য যাবতীয় বিধান সম্পর্কে অবগত করে এবং জান্নাত লাভের ও দোজখ থেকে আত্মরক্ষার পথ প্রদর্শন করে, আর دِيْنِ الْحَقِّ (দ্বীনে হক) হলো ইসলাম।

আয়াতের মর্মকথা

আল্লাহ পাক তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলকে সমগ্র বিশ্ব মানবের হেদায়েতের লক্ষ্যে প্রেরণ করেছেন। তিনি বিশ্ব–গ্রন্থ পবিত্র কোরআন নিয়ে এসেছেন এবং পেশ করেছেন সত্য ধর্ম, সর্বকালীন মানুষের মুক্তির মহাসনদ, পূর্ণ পরিণত জীবন বিধান ইসলাম, যেন অন্যান্য ধর্মের উপর স্বভাব ধর্ম ইসলাম প্রাধান্য বিস্তার করে। যুক্তি প্রমাণের দিক থেকে বিচার করলে ইসলামের প্রভাব এবং প্রাধান্য সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত। আর হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে যে, কেয়ামতের পূর্বে এমন একটি সময় আসবে

১। তফসীরে কবীর, খন্ড–১৬, পৃষ্ঠা–৩৮–৩৯

যখন ইসলাম ব্যতীত পৃথিবীতে আর কোন ধর্মের অস্তিত্বই থাকবে না। এই অবস্থা তখন হবে যখন হযরত ঈসা (আঃ) পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন। তবে তিনি নবী হিসেবে নয়, বরং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উম্মত হিসেবেই আসবেন। তিনিই দাজ্জালকে নিপাত করবেন। যখন পৃথিবীতে অন্য কোন ধর্ম থাকবেনা। অতএব, যুক্তি তর্কের ক্ষেত্রে ইসলামের প্রভাব সর্ব কালেই সুপ্রতিষ্ঠিত। আর কার্যক্ষেত্রে ইসলামের প্রাধান্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে হয়েছে এবং কেয়ামতের প্রাক্কালে পুনরায় হবে।[১]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, অন্য ধর্মের উপর ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের যে কথা বলা হয়েছে তার সত্যতার জ্বলন্ত প্রমাণ হলো বিগত ১৪শ' বছরের ইতিহাস। ইহুদী নাসারা এবং পৌত্তলিকরা ইসলামের ক্ষতিসাধনের কত অপচেষ্টা করেছে, কত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে এবং কতভাবে ইসলামের মূলোৎপাটনের অপচেষ্টা করেছে। কিন্তু ইসলাম তার নিজস্ব জৌলুস নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। ইসলামকে বাধা দিতে পারে এমন কোন শক্তি পৃথিবীতে এখনও সৃষ্টি হয়নি। খৃষ্টান মিশনারীরা এ কথা স্বীকার করে যে, অগাধ টাকা পয়সা ব্যয় করার পরও ইসলামের বিরোধীতায় তাদের মিশন ব্যর্থ হচ্ছে।[২]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন যে, হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, ইসলামের সার্বিক প্রাধান্য বিস্তারের সময় হবে হযরত ঈসা (আঃ)-এর পরে যখন পৃথিবীর সমস্ত মানুষ ইসলাম গ্রহণ করবে।

হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) যখন পুনরায় দুনিয়ায় আগমন করবেন তখন (প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উম্মত হয়ে) ইসলাম ব্যতীত সকল ধর্ম শেষ হয়ে যাবে।

হযরত মেকদাদ (রাঃ)-এর বর্ণনা এ কথার সমর্থন করে। তিনি বর্ণনা করেছেন, আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি (তিনি বলেছেন) এই পৃথিবীতে এমন কোন বাড়ী বা তাঁবু থাকবে না যেখানে ইসলাম প্রবেশ করবেনা। সম্মানিত ব্যক্তির সম্মানের সঙ্গে অথবা অপমানিত ব্যক্তির অপমানের সঙ্গে অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের কারণে আল্লাহ পাক মানুষকে সম্মানিত করবেন। আর ইসলামকে অস্বীকার করার কারণে মানুষ অপমানিত হবে। তখন বাধ্য হয়ে অনুগত হবে। হযরত মেকদাদ (রাঃ) বলেনঃ আমি বললাম, তখন সর্বত্র আল্লাহর দীন সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

(১) ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-২৪৮

(২) তফসীরে মাজেদী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪০২

তফসীরকারগণ বলেছেন, আল্লাহ পাক তাঁর এ ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। পৃথিবীর অধিকাংশ এলাকার বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক মুসলমানদের অনুগত হয়েছে। আর এমনও সময় হয়েছে যখন মুসলমানগণ সমগ্র বিশ্বের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, এ প্রাধান্য সর্বদা কায়েম থাকবে। কেননা হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, রাত দিনের এই পরিক্রমা শেষ হবে না (এমন এক সময় আসবে যখন সারা পৃথিবীতে) লাত ও ওজ্জার পূজা হবে। তখন আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আলোচ্য আয়াত নাজিল হওয়ার পর আমি মনে করেছি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। (আর কখনও কুফর প্রাধান্য বিস্তার করবে না) তিনি এরশাদ করলেনঃ ইসলাম প্রাধান্য বিস্তার করবে, আর যতদিন আল্লাহ পাকের মর্জি হবে ততদিন সে প্রাধান্য থাকবে। এরপর একটি পবিত্র বাতাস বয়ে যাবে যার অন্তরে কণা পরিমাণও ঈমান থাকবে তার রুহ কবজ করা হবে তখন মন্দ লোক ব্যতীত আর কেউ থাকবে না। সমস্ত লোক তাদের পূর্ব পুরুষের ধর্ম শেরকের দিকে ফিরে যাবে।[১]

হুজুর (দঃ)—এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য

এই আয়াতে আল্লাহ পাক হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে এরশাদ করেছেনঃ সকল ধর্মের উপর দ্বীন ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের লক্ষ্যেই আল্লাহ পাক তাঁর রসূলকে প্রেরণ করেছেন। আলোচ্য আয়াতের এই বক্তব্য পবিত্র কোরআনে আরো দু'টি স্থানে পেশ করা হয়েছে আর তা হলো সূরায়ে ফাতেহ এবং সূরায়ে সফ। শব্দের পার্থক্য থাকলেও কথা একই। সূরায়ে ফাতহে, এভাবে এরশাদ হয়েছেঃ

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ

وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا

আর সূরা সফে রয়েছেঃ

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ

وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ -

(১) তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৬০

আলোচ্য আয়াত সহ তিনটি স্থানেই ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক তাঁর রসূলকে হেদায়েত এবং সত্য ধর্ম নিয়ে প্রেরণ করেছেন যেন তিনি সকল বাতিল ধর্মের উপর দ্বীন ইসলামের প্রাধান্য বিস্তার করেন যদিও তাতে মোশরেকদের গাত্রদাহ হয়।

দ্বীন—ইসলামের প্রভাব বিস্তারের তাৎপর্য

দ্বীন ইসলামের প্রভাব বিস্তার হতে পারে দুটি পন্থায়–

(১) দ্বীন ইসলামের সত্যতার উপর এমন সুস্পষ্ট অকাট্য দলিল প্রমান উপস্থাপিত করা যার ফলে দ্বীন ইসলামের সত্যতা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট এবং প্রতিভাত হয়।(২)প্রাধান্য বিস্তারের আর একটি পন্থা হলো দ্বীন ইসলামের শক্তির সম্মুখে অন্য ধর্ম দুর্বল হয়ে যায় এবং ইসলামের আইন কানুন প্রবর্তিত হয়।

বস্তুতঃ আলোচ্য আয়াতে উভয় পন্থায়ই ইসলামের প্রাধান্যের কথা বলা হয়েছে। প্রথম পন্থা তথা যুক্তি প্রমাণের দ্বারা ইসলামের প্রাধান্য সর্বদাই রয়েছে। কেননা ইসলামের সত্যতা বাস্তবের অগ্নি পরীক্ষায় বহুবার পরীক্ষিত হয়েছে। সকল ধর্মের উপর ইসলামের প্রভাব অনস্বীকার্য। ইসলামের প্রাধান্য এই পর্যায়ে নিঃসন্দেহে সর্বদা থাকবে, এজন্যই অমুসলিম চিন্তাবিদরাও ইসলামের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

দ্বিতীয় পন্থায় ইসলামের প্রাধান্য ধারাবাহিকভাবে হয়েছে। হিজরতের পর প্রথম জেহাদ হলো বদরের রণাঙ্গনে। সর্ব প্রথম মজলুমকে অনুমতি দেয়া হলো জালেমের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে। বদরের যুদ্ধে আল্লাহ পাক নিরস্ত্র প্রায় মুসলমানদেরকে বিজয় দান করলেন। তৃতীয় হিজরীতে ওহোদের যুদ্ধ, পঞ্চম হিজরীতে খন্দকের যুদ্ধ, ষষ্ঠ হিজরীতে হোদাইবিয়ার চুক্তি সম্পাদিত হলো। দুশমন মুসলমানদিগকে অপরাজেয় শক্তি হিসেবে মেনে নিল। শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে হেজাজ, নাজদ্ এবং ইয়েমেনের সমস্ত এলাকার উপর ইসলামী হুকুমত কায়েম হলো। মক্কা বিজয়ের পর হোনায়েনের যুদ্ধে ইসলামের বিজয় হলো যার বিবরণ এই সূরার শুরু থেকে স্থান পেয়েছে। এই সূরায় জেহাদের আলোচনা এবং অমুসলিম কর আদায়ের আদেশ দেয়া হয়েছে। সূরায়ে ফাতহে মক্কা বিজয়ের কথা রয়েছে এবং সূরায়ে সাফ-এ জেহাদের উল্লেখ রয়েছে। এই তিনটি সূরার তিনটি আয়াতে একই কথা ঘোষণা করা হয়েছে, আর তা হলো–

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ

যেন সকল বাতিল ধর্মের উপর দ্বীন ইসলামের প্রাধান্য বিস্তার করা হয়।

এই বাক্যটির ব্যাকরণের দিক থেকে লক্ষ্য করলেও দেখা যায় যে, ইসলামের প্রাধান্য ধারাবাহিকভাবে হতে থাকবে, যার অর্থ হলো আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এই সুসংবাদ দিয়েছেন যে, আপনার দ্বীন অবশেষে সকল ধর্মের উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে। আর এটিই আপনার আবির্ভাবের মহান উদ্দেশ্য, যার মর্ম হলো এই–আল্লাহ পাক ইসলামকে এমন শক্তি এবং প্রভাব দান করবেন যার সম্মুখে সকল শক্তি পরাজিত হবে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্বর্ণ যুগে পৃথিবীতে দু'টি শক্তি ছিল। একটি পারস্য সম্রাজ্য অপরটি ছিল রোমক সম্রাজ্য। এ দু'টি শক্তিই পরস্পর হাজার বছর ধরে যুদ্ধ রত ছিল। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সুমহান নেতৃত্বে ইসলামী শক্তির যে অভ্যুদয় ঘটলো তার সম্মুখে তদানীন্তন কালের দু'টি মহাশক্তির কোনটিই টিকতে পারলোনা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের মাত্র দশ বছরের মধ্যে পারস্য এবং রোমক সাম্রাজ্য ইসলামের সামনে ভূ-লুণ্ঠিত হলো।

দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ)–এর যুগেই আলোচ্য আয়াতের এ ঘোষণা বাস্তব ঘটনায় পরিণত হয়। আরব দেশে তখন মূর্তি পূজার হিড়িক চলছিল এবং সামান্য খৃষ্টান এবং ইহুদীও ছিল। আর ওদিকে রোমে খৃষ্টানদের এবং পারস্যে অগ্নি পূজকদের ক্ষমতা ছিল। কিন্তু ইতিহাস এ বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে যে কিভাবে ইসলাম দিকে দিকে প্রভাব বিস্তার করে।

আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এ ঘোষণা সর্ব প্রথম বাস্তবে পরিণত হয় মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দস্তে মোবারকে। এরপর এই বিজয় অব্যাহত থাকে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও,যখন তদানীন্তন পৃথিবীর দু'টি মহাশক্তি রোম এবং পারস্য মুসলমানদের করতলগত হয়। এভাবে তখন অগ্নি পূজক, ইহুদী–নাসারারাও পরাজিত হয় এবং ইসলাম একটি অজেয় শক্তি হিসেবে প্রমাণিত হয়।

কোরআনে করীমে আল্লাহ পাক যে ওয়াদা করেছেন তা পূর্ণ করার কোন সময় নিদৃষ্ট করা হয়নি। কোন কোন সময় এমন ওয়াদা নবীর যুগে না হয়ে নবীর খলিফাদের যুগেও হতে পারে। যেমন হযরত মুসা (আঃ)–এর সঙ্গে আল্লাহ পাক সিরিয়া বিজয়ের ওয়াদা করেছিলেন তা তাঁর খলিফা হযরত ইউশা এবনে নুনের যুগে পূর্ণ করেছেন। ঠিক এভাবে আল্লাহ পাক দ্বীন ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের যে ওয়াদা করেছিলেন তা সার্বিকভাবে পূর্ণতা লাভ করে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে। তাঁরা যা করেছেন তা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদেশ এবং আদর্শ

মোতাবেকই করেছেন, এভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য সফল হয় আর এ আয়াতের মর্মবাণী বাস্তবায়িত হয়।[১]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ
الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ
وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ
تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

তরজমা

(৩৪) হে মোমেনগণ! আহলে কিতাবদের অনেক পন্ডিত পাদ্রি মানুষের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে গ্রাস করে এবং মানুষকে আল্লাহর পথে বাধা দেয়, আর যারা স্বর্ণ, রৌপ্য পুঞ্জিভূত করে রাখে এবং আল্লাহর রাহে ব্যয় করেনা তাদেরকে মর্মান্তিক শাস্তির সুসংবাদ জানিয়ে দাও।

(৩৫) যেদিন দোজখের অগ্নিতে তা উত্তপ্ত করা হবে, এরপর তা দ্বারা দাগ দেয়া হবে ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে, সেদিন বলা হবে এ হল সে ধন-সম্পদ যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জিভূত করে রেখেছিলে। অতএব, তার স্বাদ উপভোগ কর।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, ইহুদী নাসারারা তাদের ধর্মযাজকদের

(১) তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩১৮

প্রতিপালক বানিয়েছে, আর এই আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, এই ধর্ম যাজকদের লোভ লালসার কোন সীমা নেই। অর্থ লিপ্সায় তারা মত্ত, অর্থ এবং পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে তারা আল্লাহর বিধান পরিবর্তন করতেও দ্বিধা বোধ করেনা। অবৈধভাবে মানুষের অর্থ–সম্পদ তারা গ্রাস করে। জনসাধারণকে ফাঁকি দেয়া এবং তাদের থেকে ঘুষ নিয়ে আল্লাহর বিধান পরিবর্তনের ন্যায় জঘন্য আচরণ করতে তারা ছিল অভ্যস্থ। এমনকি, তারা স্বহস্তে কোন কিছু লিপিবদ্ধ করতো, এরপর দাবী করতো যে, এটিই আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যে গুণাবলীর উল্লেখ তৌরাত ইঞ্জিলে রয়েছে তারা সেগুলো গোপন করতো। তাদের দুশ্চিন্তা ছিল যে, যদি লোকেরা এসব বিষয়ে অবগত হয় তবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি তারা বিশ্বাস করবে এবং মানুষের কাছে প্রকাশ করবে যে, তৌরাত ইঞ্জিলে তাঁর গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে। এভাবে তাদের ভক্তদের সংখ্যা কমে যাবে এবং তারা আর্থিক যে সুবিধা লাভ করে আসছে তা বন্ধ হয়ে যাবে। পবিত্র কোরআন আলোচ্য আয়াতে তাদের এ অপকর্মের গোপন রহস্য ফাঁস করে দিয়েছে এবং মোমেনদেরকে এমন অর্থলোভী লোকদের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ

হে ঈমানদারগণ! আহলে কিতাবদের অধিকাংশ ধর্মযাজকরা (ইহুদী বা খৃষ্টানরা) মানুষের অর্থ–সম্পদ অবৈধভাবে গ্রাস করে এবং মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে। হে ঈমানদারগণ! যখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে দ্বীন ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে আর তার উপর তোমাদের পরিপূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে, অতএব, তোমরা আহলে কিতাবদের ধর্মযাজকদের বিরোধীতার পারোয়া করোনা; বরং দ্বীন ইসলামের উপর সুদৃঢ় থাক। যারা নিজেদের অর্থ লিপ্সা চরিতার্থ করার হীন উদ্দেশ্যে সত্যকে গোপন করে, নিজেদের নেতৃত্ব বজায় রাখার জন্যে মানুষকে সত্য পথ থেকে বিরত রাখে তাদের পরিণাম সম্পর্কে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্মযাজকরা খুব ভালভাবেই জানতো যে, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের সত্য নবী, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তাঁর অনেক নিদর্শন তারা তৌরাত ইঞ্জিলে পাঠ করেছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও শুধু অর্থ লিপ্সা ও মর্যাদা হারানোর আশংকায় তারা ইসলামের বিরোধীতা করতো, মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখতো। তাই পরবর্তী আয়াতে আরো কঠোর ভাষায় তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছেঃ

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ

যারা স্বর্ণ রৌপ্য পুঞ্জিভূত করে রাখে আর তা আল্লাহর রাহে ব্যয় করেনা তাদেরকে মর্মান্তিক শাস্তির সুঃসংবাদ শুনিয়ে দাও।

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ

যারা স্বর্ণ রৌপ্য সঞ্জীবিত করে রাখে অর্থাৎ সেই ধর্মযাজক ব্যক্তিরা যাদের কথা ইতিপূর্বে এরশাদ হয়েছে যে তারা মানুষের অর্থ–সম্পদ অবৈধভাবে গ্রাস করে এবং তারা স্বর্ণ রৌপ্য সঞ্জীবিত করে রাখে। এভাবে তারা তাদের অর্থ লিপ্সা চরিতার্থ করে তাদের জন্য মর্মান্তিক শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

হাসান বসরী (রহঃ) বলেছেন, কোন কোন সাহাবীর মতে, এ আয়াতের সতর্কবাণী শুধু আহলে কিতাবদের জন্য নয়, বরং সকলের জন্য। হযরত আবু যর (রাঃ)–এর মতে–

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ

আয়াত থেকে স্বতন্ত্র বক্তব্য, পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক নেই। এ উম্মতের যারাই স্বর্ণ রৌপ্য মওজুদ করে রাখবে এবং তার হক্ব তথা যাকাত আদায় করবেনা তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। তাই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

আর তারা এই স্বর্ণ রৌপ্য থেকে আল্লাহর রাহে ব্যয় করেনা।

আল্লাহর রাহে ব্যয় করার কথাটির মধ্যে যাকাত সদকাহ এবং সাধারণ দান খয়রাত সবই অন্তর্ভূক্ত। হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি সওয়াবের আশায় নিজের পরিবারবর্গের জন্য ব্যয় করে তা তার জন্য সদকাহ। (এমন ব্যয়ের জন্য সে সওয়াব পাবে)

(বোখারী, মুসলিম)

হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহে

ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সেই স্বর্ণমুদ্রা যা তুমি আল্লাহর রাহে (জেহাদে) ব্যয় কর, আর সেই একটি স্বর্ণ মুদ্রা যা তুমি একটি গোলাম আযাদ করতে ব্যয় কর, সেই স্বর্ণ মুদ্রা যা তুমি একটি মিসকিনকে খয়রাত কর, আর সেই একটি স্বর্ণ মুদ্রা যা তুমি তোমার সন্তান সন্তুতির জন্য ব্যয় কর। এর মধ্যে সেই একটি দিনার যা তুমি তোমার সন্তান সন্তুতির জন্য ব্যয় করেছ তা দ্বারা অধিকতর সওয়াব লাভ হবে।

(মুসলিম শরীফ)

হযরত সওবান (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সবচেয়ে বেশী সওয়াব পাওয়া যায় সেই স্বর্ণমুদ্রায় যা মানুষ তার সন্তান সন্তুতির প্রয়োজনে ব্যয় করে। আর সেই দিনার যা আল্লাহর রাহে কোন য়ানবাহনের জন্য ব্যয় করা হয়, আর সেই দিনার যা জেহাদের উদ্দেশ্যে,অথবা কোন সাথীর জন্য ব্যয় করা হয়।

হযরত উম্মে সালমা(রাঃ)বর্ণনা করেন, আমি আরজ করলাম ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আবু সালমা, (সাবেক স্বামী) এর তরফ থেকে যে সন্তান সন্তুতি রয়েছে তাদের জন্য যদি আমি ব্যয় করি তবে কি আমি সওয়াব পাবো? তিনি এরশাদ করেন, তাদের জন্য ব্যয় করলেও তুমি সওয়াব পাবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর স্ত্রী জয়নাব বর্ণনা করেন, আমি এবং আর একজন মহিলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, আমরা যদি আমাদের স্বামীর জন্য ব্যয় করি তবে কি আমরা সওয়াব পাবো? তখন তিনি এরশাদ করলেন, তোমরা দ্বিগুণ সওয়াব পাবে, দান করার এবং আত্মীয় স্বজনদের জন্য ব্যয় করার।

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

অর্থাৎ তাদেরকে কঠোর কঠিন শাস্তির সুসংবাদ দাও, যারা অবৈধভাবে মানুষের অর্থ-সম্পদ গ্রাস করে এবং তাদেরকেও কঠিন শাস্তির সংবাদ দাও যারা স্বর্ণ রৌপ্য জমা করে রাখে অথচ তা থেকে আল্লাহর রাহে ব্যয় করেনা।

আলোচ্য আয়াতে দু'টি মন্দ কাজের পরিণতিস্বরূপ শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। একটি হ'ল অর্থ-সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখা, অপরটি হ'ল আল্লাহর রাহে ব্যয় না করা, তাই এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে, আল্লাহর রাহে ব্যয় করার অবশ্য কর্তব্য পালন করলে অর্থ-সম্পদ সঞ্চয়ে কোন গুনাহ নেই। অর্থাৎ যদি জাকাত সদকাহ যথা নিয়মে আদায় করা হয়, প্রত্যেকটি মানুষের সম্পদে সমাজের দারিদ্র্য প্রপীড়িত মানুষের যে হক্ব রয়েছে তা যদি বিধি-মোতাবেক আদায় করা হয় তবে অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় করার মধ্যে শরীয়ত অনুযায়ী কোন অপরাধ নেই।

তেবরানী আল-আওসাতে, এবনে আদি আল-কামেলে, এবনে মরদবীয়া এবং বায়হাকী সুনানে হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে সম্পদের জাকাত আদায় করা হয় তা (كنز) এ সে সঞ্চয় নয় যার ব্যাপারে শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ মুজাহেদ (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত চিন্তিত হযে পড়েন এবং এ আদেশটিকে অত্যন্ত কঠিন মনে করেন কেননা, নিজের সন্তান সন্তুতিদের জন্যে কোন সম্পদ না রেখে যাওয়া সকলের জন্যে কষ্টকর মনে হয়। সাহাবায়ে কেরামের এ উপলব্ধির কথা হযরত ওমর (রাঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে পেশ করলেন। তখন তিনি এরশাদ করলেন, আল্লাহ পাক এ জন্যেইতো জাকাত ফরজ করেছেন যেন অবশিষ্ট সম্পদ পবিত্র হয়। (অর্থাৎ যথানিয়মে জাকাত আদায়ের পর যে সম্পদ থাকবে তা পবিত্র হবে, আর এমন সম্পদ থাকা অবৈধ নয়।)

(আবু দাউদ শরীফ)

বায়হাকীও হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ)-এ বিবরণের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাঁর বিবরণে আরো একটি কথা সংযোজিত হয়েছে, উত্তরাধিকারের বিতরণের যে বিধান জারী হয়েছে তোমাদের পরে যারা আসবে তারা যেন উত্তরাধিকারী হিসেবে সে সম্পদ লাভ করে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন, যদি আমার নিকট ওহোদ পাহাড়ের সমান স্বর্ণ সঞ্চিত হয় আর আমি যথানিয়মে তার যাকাত আদায় করি এবং আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক আমল করি তবে আমার কোন পরওয়া হবেনা।

হযরত আবু জর (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলাম, তখন তিনি কাবা শরীফের ছায়ায় উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি আমাকে দেখে বললেন, "কাবার প্রতিপালকের শপথ। তারা বড় ক্ষতিগ্রস্থ।" আমি আরজ করলাম, আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কোরবান, কারা ক্ষতিগ্রস্থ? তিনি এরশাদ করলেনঃ বড় বড় সম্পদশালী লোকেরা। তবে সে সব সম্পদশালী লোক নয় যারা এভাবে এবং ওভাবে দান করে থাকে। (অর্থাৎ যারা ডানে বামে, অগ্র পশ্চাতে দান করে থাকে)

(বোখারী ও মুসলিম শরীফ)

আলোচ্য আয়াতে মানব জাতির অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান রয়েছে; সৃষ্টির

প্রথম দিন থেকে অর্থনৈতিক সমস্যা মানব জাতিকে বিব্রত এবং চিন্তিত করে রেখেছে। বিশেষতঃবিগত শতাব্দী থেকে এ সমস্যাটি মানব জীবনের শ্রেষ্ঠতম এবং জটিলতম সমস্যায় পরিণত হয়েছে। যান্ত্রিক সভ্যতার এ যুগে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের অভাব, মানুষের স্বার্থপরতা এবং অনুদার মানোভাবের প্রভাব এ সমস্যাটিকে কঠিনতর হতে সাহায্য করেছে। এই সমস্যার সমাধানে বর্তমান পৃথিবীতে দুটি মতবাদ কার্যকর রয়েছে একটি পুঁজিবাদ, আর একটি সমাজবাদ। পুঁজিবাদ মানুষের রক্ত শোষণ করেছে, আর সমাজবাদ মানুষের স্বাধীনতা হরণ করেছে, এতে যে কথাটি সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয় তা হলো মানব জাতির জটিলতম সমস্যার সমাধানে মানুষের তৈরী করা উভয় মতবাদই ব্যর্থ। অতএব, এই সমস্যার সত্যিকার সমাধান পেতে হলে স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাক প্রদত্ত বিধনে অনুসন্ধান করতে হবে। আলোচ্য আয়াতে সর্ব প্রথম সমস্যাটি চিহ্নিত করা হয়েছেঃ

لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ

তারা অবৈধভাবে মানুষের অর্থ-সম্পদ গ্রাস করে। (এটি পুঁজিবাদী চরিত্র)

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ 'এবং যারা স্বর্ণ রৌপ্যকে সঞ্জীবিত করে

আর আল্লাহর রাহে তা ব্যয় করে না।'পরবর্তী আয়াতে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তির ঘোষণা। অন্যায়ভাবে মানুষের অর্থ-সম্পদ গ্রাস করা, অবৈধ পন্থায় অর্থ-সম্পদ আহরণ করা যেমন সুদখোরী, মজুদদারী জুয়া, আমানতে খেয়ানত, ওজনে ফাঁকী, মিথ্যা শপথের মাধ্যমে ব্যবসা, প্রতারণা, ছল চাতুরী প্রভৃতি অন্যায়, অসুন্দর পন্থা অবৈধ। ঠিক তেমনিভাবে হালাল পন্থায় অর্থ-সম্পদ উপর্জন করেও যদি তার জাকাত বিধি মোতাবেক আদায় না করা হয় তবে তা-ও আল্লাহ পাকের অপছন্দনীয় কাজ। এজন্যে কঠোর শাস্তির ঘোষনা রয়েছে পবিত্র কোরআনে। আমরা যদি বিষয়টিকে আরো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করি তবে তা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আধুনিক বিশ্বে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে মানব রচিত পুঁজিবাদ এবং সমাজবাদ মানুষকে কি দিয়েছে?

আর পবিত্র কোরআন এ সমস্যার সমাধান কিভাবে করেছে, তা উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজনীয়। সমাজবাদের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হ'ল সম্পদের সম-বন্টন ও বিতরণ। এ উদ্দেশ্যে সর্ব প্রকার জুলুম-অত্যাচার, নির্যাতন উৎপীড়ন চালাতে হলেও তা বৈধ বলে বিবেচিত। আর পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য হল, যে কোন মূল্যে সম্পদ বৃদ্ধি করা এবং যথেচ্ছা উপভোগ করা। প্রয়োজন হলে লক্ষ-কোটি ক্ষুধার্ত মানুষের হাহাকার আর্তনাদের বিনিময়েও সম্পদ বৃদ্ধি করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা। এটি নিঃসন্দেহে দানবীয় চরিত্র, মানবীয় নয়।

ইসলামেরদৃষ্টিতে

আর ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থ-সম্পদ আহরণ করা ও জীবিকা উপার্জন করা প্রতিটি মানুষের একান্ত করণীয় কাজ। পবিত্র কোরআনে এ জন্য মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। সুরায়ে জুমআ'য় এরশাদ হয়েছেঃ

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

—"যখন নামাজ সুসম্পন্ন হয়, তখন তোমরা ছড়িয়ে পড় সমগ্র পৃথিবীতে এবং আল্লাহ্‌র দানের (জীবিকার) অন্বেষণ কর। আর আল্লাহ পাককে স্মরণ কর অধিক পরিমাণে, হয়ত তোমরা জীবন-সংগ্রামে সাফল্যমন্ডিত হবে।"

এমনিভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ হালাল জীবিকা উপার্জন অন্যতম ফরজ।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে আরও এরশাদ করেছেনঃ উপার্জন-সচেষ্ট ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক ভালবাসেন।

জীবিকা উপার্জনে অনুপ্রাণিত করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ করেছেনঃ ফজরের নামাজের পর জীবিকা অন্বেষণের সময় তোমরা ঘুমিয়ে পড়োনা। সেইসঙ্গে জীবিকা অর্জনের নিশ্চয়তা বিধান করে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেনঃ নিজের জন্য বরাদ্দ পরিমাণ জীবিকা যতক্ষণ না মানুষ সম্পূর্ণভাবে ভোগ করেছে, ততক্ষণ সে মৃত্যুমুখে পতিত হবে না। মৃত্যু যেমন মানুষের পিছু পিছু ছুটে, জীবিকা বা রিজিকও ছুটে তেমনিভাবে মানুষের পিছু পিছু।

এতে এ কথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, এ জীবন যেমন সত্য, মৃত্যু যেমন অবধারিত, তেমনিভাবে এ জীবনে জীবিকা লাভও সুনিশ্চিত। তবে সে বরাদ্দকৃত জীবিকা উপার্জনের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে। নিশ্চেষ্ট হয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে যদি আকাঙ্খা করা হয় যে, জীবিকা আমার মুখে এসে হাজির হবে, তবে তা নিতান্ত বোকামি বৈ আর কিছুই নয়। এজন্য ইসলাম এ নীতি সমর্থন করে না-করতে পারে না। এজন্যই পবিত্র কোরআনে জীবিকা অন্বেষণে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। সংগে সংগে এ কথাও বলা হয়েছে যে, অর্জিত অর্থ-সম্পদ কি উদ্দেশ্যে ব্যয় করবে?

কোথায়, কিভাবে ব্যয় করবে? আর কোথায় কিভাবে অর্থ–সম্পদ ব্যয় করা থেকে বিরত থাকবে? তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَابْتَغِ فِيمَآ اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ

(সুরায়ে কাসাস্)

–"এবং তোমাকে আল্লাহ পাক যা কিছু দান করেছেন, তা দ্বারা পরকালীন জীবনে শান্তি কামনা কর। আর এ পৃথিবীতে তোমার যে অংশ রয়েছে, তা ভুলে যেয়োনা এবং মানুষের প্রতি এহ্সান কর, যেমন আল্লাহ পাক তোমার প্রতি এহ্সান করেছেন, আর পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করোনা।"

এ আয়াতে আল্লাহ পাক সম্পদের মালিকানা এবং সম্পদ ব্যয়ের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন। বৈধভাবে অর্থ–সম্পদ আহরণে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং মানুষের মধ্যে সে সম্পদ বন্টন ও বিতরণের তাগিদ করা হয়েছে। অর্থ–সম্পদ দ্বারা যেন অন্যায়, অকল্যাণ এবং অশান্তি সৃষ্টি না করা হয়, তজ্জন্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

সম্পদের মালিকানা

সর্ব প্রথম পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছে, পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদের একমাত্র মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। মানুষের অস্তিত্ব তথা জীবন তাঁর দান, তেমনিভাবে জীবিকার অফুরন্ত ভান্ডারও তাঁরই হাতে। মানুষকে যখন ইচ্ছা, যতখানি ইচ্ছা, তিনিই দান করে থাকেন। বিশ্বের বিশাল ভান্ডার তিনি মানুষের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। জীবিকা বৃত্তি অবলম্বনের ও জীবিকা উপার্জনের দ্বার সকলের জন্যই সমভাবে উন্মুক্ত রয়েছে। মানুষকে এ পর্যায়ে সংগ্রাম সাধনা করে অর্জন করতে হবে তার জন্য বরাদ্দ জীবিকা। একটা নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত প্রতিটি মানুষকে এ পৃথিবীতে ভোগ সম্পদের অধিকার প্রদান করা হয়েছে। এবারে পবিত্র কোরআনের ভাষায় প্রতিটি কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করুন।

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

—"আসমান ও জমিনের বিশাল ভান্ডারের একমাত্র মালিক আল্লাহ পাক।" পবিত্র কোরআনের সুরায়ে ইব্রাহীমে এরশাদ হয়েছেঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِىَ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ج وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ـ

—"আল্লাহ পাকই আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আসমান থেকে বারি বর্ষণ দ্বারা মাটিকে সুজলা–সুফলা করে তোমাদের জন্য রকমারি খাদ্য দ্রব্যের ব্যবস্থা করেছেন। এমনিভাবে তিনি তোমাদের জন্য প্রবহমান পানির ব্যবস্থা করে তোমাদের কল্যাণ সাধন করেছেন; উত্তাল তরঙ্গময় সমুদ্রের উপর তোমাকে এমন ক্ষমতা ও অধিকার দান করেছেন যে, তোমরা তাতে তরীসমূহ ভাসিয়ে জীবিকার সন্ধানে দেশ–দেশান্তরে ছুটে বেড়াও। আর আল্লাহ্ পাক তোমাদের চলাফেরা ও আমদানী–রফতানীর সুযোগ–সুবিধার জন্য নদী–নালা সৃষ্টি করেছেন।" আল্লাহ পাক আরো ঘোষণা করেছেন যে, তিনি সারা পৃথিবীর স্রষ্টা ও পালনকর্তা। একটা বীজকে মহীরূহে পরিণত করা তাঁরই কাজ, মৃত থেকে জীবিতকে বের করে আনা তাঁরই কুদরত, তিনিই সব কিছুর অধিপতি। এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ اللّٰهَ فٰلِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَىِّ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ـ

(সুরায়ে আন্‌য়াম)

—"নিশ্চয় আল্লাহ পাক মাটিতে বিক্ষিপ্ত বীজকে অংকুরিত করে আশানুরূপ বৃক্ষে পরিণত করেন। তিনিই মৃতকে জীবিত এবং জীবিতকে মৃতে পরিণত করেন। এই বিস্ময়কর ও বিচিত্র লীলা–খেলার তিনিই আধার; তিনিই তোমাদের স্রষ্টা আল্লাহ পাক। অতএব, কোন্ দিকে বিমুখ হয়ে চলে যাচ্ছে?

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ

مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ -

(সুরায়ে ফাতের)

–"সেই আল্লাহ পাকই তোমাদের প্রতিপালক, সমগ্র বিশ্বের মালিকানা এবং ক্ষমতা শুধু তাঁরই। তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা এ পৃথিবীর সামান্য বস্তুরও মালিক নয়।"

এমনিভাবে পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছে যে, বিশ্ব–জগতের বিশাল ভান্ডারের যেমন তিনি একমাত্র মালিক, তেমনিভাবে মানুষের রিজিকদাতাও তিনিই, জীবন ও মৃত্যুর ক্ষমতাও তাঁরই। এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ (الاية)

–"হে রসূল! আপনি জিজ্ঞাসা করুন, কে তোমাদেরকে আসমান ও জমিন থেকে রিজিক দান করে?"

এমনিভাবে সুরায়ে মু'মেনুনে এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ - سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ - قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ - سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ - قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ - قُلْ مَنْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ - سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ -

–"হে রসূল! আপনি জিজ্ঞাসা করুন, এ পৃথিবী ও তাতে যা কিছু রয়েছে, এর মালিক কে? যদি তোমরা জান, তবে বল! তারা অচিরেই বলবে, এসব কিছুর মালিক আল্লাহ পাক। হে রসূল! জিজ্ঞাসা করুন, তবে তোমরা কেন চিন্তা কর না? কেন উপদেশ গ্রহণ কর না? হে রসূল! আপনি মানুষকে জিজ্ঞাসা করুন, কে সপ্ত আসমানের মালিক? কে মহান আরশের মালিক? অচিরেই তারা জবাব দেবে, এ সব কিছুর মালিক আল্লাহ পাক। হে রসূল! আপনি বলুন! তবে কেন তোমরা ভয় কর না?

হে রসূল! আপনি মানুষকে জিজ্ঞাসা করুন, বিশ্ব–বস্তুর মালিকানা এবং ক্ষমতা কার হাতে? আর তিনিই আশ্রয় দেন, তাঁর বদলে কারও আশ্রয় নেই। যদি তোমরা এ সম্পর্ক অবগত হও, তবে বল! তারা অবশ্যই বলবে, একমাত্র আল্লাহ পাকই সব কিছুর স্বত্বাধিকারী। হে রসূল! আপনি বলুন, তবে কেন তোমরা হতবুদ্ধি হয়ে আছ?"

এমনিভাবে অন্য এক আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ - (الاية)

(সুরায়ে হজ্জ)

–"লোকেরা আল্লাহ পাক ব্যতীত যাদেরকে ডাকে, তাদের অবস্থা এত শোচনীয় যে, তারা সকলে সমবেত হয়ে একটা মাছি পর্যন্ত সৃষ্টি করার শক্তি রাখে না। আর তারা এত দুর্বল যে, যদি তাদের থেকে মাছি কোন কিছু উড়িয়ে নিয়ে যায়, তবে তারা মাছি থেকে তা ছিনিয়ে নিতেও অক্ষম।" বস্তুতঃ বিজ্ঞানের এ চরম উন্নতির যুগে সারা পৃথিবীর সকল বিজ্ঞানীদের জন্য পবিত্র কোরআন একটি চ্যালেঞ্জ দিয়েছে যে, তোমরা নব নব সৃষ্টিতে মশগুল রয়েছ, অগনিত বিস্ময়কর বস্তুসমূহ এ পর্যন্ত আবিস্কারও করেছ। বর্তমানে এ পৃথিবী নিয়েও তোমরা শান্ত ও তৃপ্ত নও, তাই নভোমন্ডলে চন্দ্রের পৃষ্ঠদেশে আবাস রচনার সাধনায় ব্যস্ত রয়েছে। কিন্তু তার পূর্বে একটা মাছি, একটা পিপীলিকার ন্যায় হীন ও ক্ষুদ্রতম প্রাণী সৃষ্টি কর, যদি তোমরা সক্ষম হও।

বস্তুতঃ সারা পৃথিবীর সকল বিজ্ঞানীদের সমবেত প্রচেষ্টা যে এ পর্যায়ে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে, একথা সন্দেহাতীতরূপে বলা চলে। তবে বিজ্ঞানীদের কৃতিত্ব শুধু এখানে যে, আল্লাহর বিভিন্ন সৃষ্টির সংমিশ্রণের মাধ্যমে তারা নতুন কিছু উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন। এটি গৌরবের বিষয়, এত সন্দেহ নেই মোটেও। কিন্তু সর্ব প্রথম মেনে নিতে হবে, আল্লাহর সৃষ্টি ব্যতীত বিজ্ঞানীদের করণীয় কিছুই নেই। মেনে নিতে হবে আল্লাহ পাকের সর্বময় ক্ষমতা, মালিকানা, প্রভুত্ব ও কৃতিত্ব।

সম্পদের মূল মালিক আল্লাহ পাক

এ সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এ সত্যই প্রমাণিত হচ্ছে যে, সম্পদের মালিকানা একমাত্র আল্লাহ পাকের। মানুষ শুধু সামান্য সময়ের জন্য সম্পদ ব্যবহারের অধিকার লাভ করে। কিন্তু মানুষ যেহেতু লোভী, তাই সে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সংগ্রহ করতে চায় এবং নিজের কাছেই সব কিছু কুক্ষিগত করে রাখতে চায়। অন্য মানুষের

রক্ত শোষণ করে এবং তাদের বঞ্চিত করে স্বীয় অর্থ-লিপ্সা পরিতার্থ করতে প্রয়াস পায়। বস্তুতঃ এটিই হ'ল পুঁজিবাদ। আর এ পুঁজিবাদের যাঁতাকল থেকে মানুষকে রক্ষা করার নামে যে সমাজবাদ এবং সাম্যবাদের সৃষ্টি হ'ল, সে সর্বপ্রথম বিশ্ব-মানবকে বলল, তোমার ঈমান, বিশ্বাস নৈতিকতা এবং স্বাধীনতা-এ সবকিছু আমার নিকট অর্পন কর; আমি দান করব তোমাকে দু'বেলা অন্ন। তোমার বাসস্থানের ব্যবস্থাও করব। বলা বাহুল্য, এ উভয় নীতিই যে অস্বাভাবিক, অযৌক্তিক এবং অসুন্দর অকল্যাণকর, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। কোন সমাজ এবং জাতির অর্থনীতিকে তখনই সার্থক বলা চলে, যখন সেজাতির প্রতিটি মানুষ সুখী-সমৃদ্ধিশালী হয়, যখন দেশের সম্পদ দ্বারা প্রত্যেকেই উপকৃত এবং লাভবান হয়, দেশের সম্পদ সম্পর্কে কারও কোন প্রকার ন্যায্য অভিযোগ না থাকে।

পক্ষান্তরে, যদি দেশ ও জাতির সমগ্র সম্পদ কয়েকটি ব্যক্তি বা শ্রেণীর কুক্ষিগত হয়ে তাদের একচেটিয়া অধিকারে এসে পড়ে এবং দেশের আপামর জনসাধারণ দেশের সম্পদ থেকে সামগ্রিক অথবা আংশিকভাবে বঞ্চিত হয়, তবে সেই দেশকে কোন অবস্থাতেই উন্নত এবং প্রগতিশীল বলা চলে না। এমন দেশের অর্থনীতিকে সার্থক বলে মনে করার কোন ন্যায্য কারণও থাকে না। কেননা, মুষ্টিমেয় লোকের উন্নতিকে গোটা দেশ ও জাতির উন্নতি বলা চলে না। কয়েকটি ব্যক্তি অথবা শ্রেণীবিশেষ ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে আত্মহারা হয়ে থাকবে, আর লক্ষ-কোটি দারিদ্র-পীড়িত মানুষ হবে নিঃস্ব, সর্বহারা, দারিদ্রের কষাঘাতে তাদের জীবন হবে দুর্বিসহ; ইসলামের দৃষ্টিতে এ দৃশ্য মর্মন্তুদ এবং এ চিত্র সম্পূর্ণ অসহনীয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যখন পুঁজিবাদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে সাধারণ মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে, তখন পুঁজিবাদের রাহুগ্রাস থেকে মুক্তিলাবের জন্য সমাজবাদের সৃষ্টি হয়। পুঁজিবাদে যেখানে ব্যক্তিই ছিল সম্পদের মালিক, সেখানে সমাজবাদ এসে বলল, ব্যক্তিগত মালিকানাই হ'ল জুলুম-অত্যাচারের মূল উৎস। অতএব, জুলুম-অত্যাচারের মূলোৎপাটনের জন্য ব্যক্তিগত মালিকানা বাতিল করতে হবে। দেশের সকল সম্পদ, কল-কারখানা, জায়গা-জমিন তথা সর্বস্বের একমাত্র স্বত্বাধিকারী হবে সর্বহারাদের দ্বারা নির্বাচিত কমিটি। ব্যক্তিগতভাবে কেউ মালিক থাকবে না; সকলেই কাজ করবে দেশের জন্য, দেশ তাদের পানাহার এবং বাসস্থানের দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

আপতদৃষ্টিতে প্রস্তাবটি বড়ই মধুর ও মনোহর লাগল। শ্রেণী সংঘর্ষে লিপ্ত এবং অস্থির ও অশান্ত-চিত্ত দৈন্যগ্রস্থরা ক্ষণিকের জন্য শান্ত হ'ল। কিন্তু সমাজবাদের এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য নিকৃষ্টতম একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'ল, শ্রেণী বিশেষকে ডিক্টেটর মেনে নিতে হল, মানুষের স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত চিন্তাধারার পথ চিররুদ্ধ হ'ল স্বাধীনতা সম্পূর্ণ ভাবে হরণ করে মানুষকে চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় মনে করা হ'ল।

অধিকন্তু তাকে ধর্ম বিশ্বাস এবং নৈতিকতা বর্জনে বাধ্য করা হ'ল, মানবাত্মার অস্তিত্ব অস্বীকৃত হ'ল, মানব দেহের প্রতিই শুধু গুরুত্ব আরোপ করা হ'ল।

এমনি অবস্থায় মানব-সভ্যতায় এবং মানব-কল্যাণে যারা বিশ্বাসী তাদেরকে অবশ্যই সে সরল সঠিক পুণ্য পন্থা গ্রহণ করতে হবে, যা স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ, তাঁর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বাস্তবায়িত এবং পবিত্র কোরআনে আজও সম্পূর্ণ সংরক্ষিত রয়েছে। এখন প্রশ্ন হ'ল, ইসলাম এমন কি পরিকল্পনা পেশ করেছে, যা পুঁজিবাদের বিষদাঁত ভেঙ্গে দিয়েছে এবং সমাজবাদের রাহুগ্রাস থেকে বিশ্ব মানবকে উদ্ধার করতেও সক্ষম। শুধু তাই নয়, বরং যে পরিকল্পনা মানব কল্যাণের রক্ষাকবচ হবে এবং যা এ বিংশ শতাব্দীর মানুষের সকল সংশয় ও সন্দেহ নিরসন করে অশান্ত ও অতৃপ্ত মানুষকে শান্তি এবং সান্ত্বনা দিতে পারে।

ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত মালিকানা

ইসলাম এ পর্যায়ে কয়েকটি পন্থা গ্রহণের আহব্যন জানিয়েছে। প্রথমতঃ ইসলাম ব্যক্তিগত মালিকানার অনুমতি দিয়েছে এবং জীবিকা উপার্জনে সকলকে সমান অধিকার দিয়েছে। মানুষ মেহনত-মজদুরি করবে, অথচ অর্জিত সম্পদে তার মালিকানা থাকবে না-এমন অন্যায় কথা ইসলাম বলে না, বলতে পারে না; বরং দুনিয়ার সকল মানুষকে জীবিকা আহরণের সমান অধিকার দিয়ে ইসলাম তাদের ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার স্বীকার করেছে।

মূলতঃ যে সব অন্যায়-অবৈধ পন্থায় পুঁজিবাদ তার জুলুম-অত্যাচার সম্প্রসারিত করে, সে সব পন্থা বন্ধ করার আদেশ দিয়েছে ইসলাম। যেমন-সূদ, জুয়া এবং মওজুদদারী প্রভৃতি। পুঁজিবাদ শুধু যে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে; তাই নয়, বরং কয়েকটি বিশেষ হস্তে সম্পদকে সংকুচিত, পুঞ্জীভূত এবং কুক্ষিগত করে রাখতে চায়। এজন্য ইসলাম সূদ, জুয়া এবং মওজুদদারিকে অবৈধ কাজ বলে ঘোষণা করেছে। যা কিছু এ পৃথিবীতে রয়েছে সবই মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের দান আর মানুষ হিসেবে এতে সকলের ভাগই সমান। অতএব, ব্যক্তি বিশেষ অথবা শ্রেণী বিশেষ ধন-সম্পদকে কুক্ষিগত করে রাখবে ইসলাম এর অনুমতি দেয় না। আর সূদ, জুয়া, বা মওজুদদারী চিরকালই মানুষের কাছে ঘৃণ্য এবং নিন্দনীয় পন্থা। এ পর্যায়ে পবিত্র কোরআন সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ـ

—"হে মোমেনগণ! তোমরা একে অন্যের অর্থ-সম্পদকে অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করো না। তবে যা ব্যবসায়ের মাধ্যমে পরস্পরের সন্তুষ্টির সাথে হয় তা তোমাদের জন্যবৈধ।"

মূলতঃ ইসলাম জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রে এমন কোন বৃত্তি অবলম্বনের অনুমতিই দেয় না, যাতে মানুষের জন্য ক্ষতিকর বা অকল্যাণকর কিছু রয়েছে এবং যা মানবতার কণ্ঠরোধ করে। সুদ এবং জুয়ার মধ্যে যে অমানবিক এবং পৈশাচিক অর্থ-লিপ্সার বহিঃ প্রকাশ হয়, এর মাধ্যমে যেভাবে সমাজ জীবনকে পর্যুদস্ত করা হয় এবং অন্যকে নিঃস্ব-সর্বস্বান্ত করে নিজে সমৃদ্ধশালী হবার যে দানবীয় চরিত্র প্রকাশ পায়, তা কোন মানুষের পক্ষে সমর্থন করা সম্ভব নয়। কঠোরতা, নিষ্ঠুরতা এবং নির্দয়তাই হ'ল পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য; আর এই বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখার পন্থা হল, সুদ, জুয়া এবং মওজুদদারী । বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব এবং মমত্ববোধের, আর সহানুভূতি এবং সদ্ভাবের তা'লীম দিয়েছে ইসলাম। তাই সুদ, জুয়া এবং মজুদ্‌দারীকে ইসলাম কঠোর হস্তে দমন করতে চায়।

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ

যে দিন দোজখের অগ্নিতে এই স্বর্ণ রৌপ্যকে উত্তপ্ত করা হবে, আর এর দ্বারা তাদের ললাট, পাঁজরে এবং পৃষ্টদেশে দাগ দেয়া হবে আর তাদেরকে বলা হবে যা দিয়ে এখন তোমাদের দেহে দাগ দেয়া হচ্ছে তা হলো তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা তোমাদের জন্যে পুঞ্জিভূত করে রেখেছিলে। অতএব, তোমাদের সে সম্পদের স্বাদ এখন গ্রহণ কর।

এই আয়াতের তফসীরে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে স্বর্ণ রৌপ্যের মালিক তার হক্ব আদায় না করবে তথা যথা রীতি জাকাত আদায় না করবে কেয়ামতের দিন ঐ স্বর্ণ রৌপ্যকে দোজখের অগ্নিতে উত্তপ্ত করে উক্ত ব্যক্তির ললাটে, পাঁজরে এবং পিঠে দাগ দেয়া হবে। যদি ঐ স্বর্ণ রৌপ্যগুলো একটু ঠান্ডা হয়ে পড়ে তবে পুনরায় উত্তপ্ত করে দাগ দেয়া হবে। আর এ দাগ দেয়া সারা দিন অব্যাহত থাকবে। ঐ একদিন দুনিয়ার ৫০ হাজার বছরের সমান হবে। অবশেষে যখন বন্দাদের ব্যাপারে মীমাংশা হয়ে যাবে তখন ঐ ব্যক্তিকে পথ প্রদর্শন করা হবে। যদি সে জান্নাতের যাত্রী হয় তবে জান্নাতে যাবে, আর যদি দোজখের যাত্রী হয় তবে দোজখে যাবে।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করা হলো,

যে ব্যক্তির উষ্ট্র রয়েছে তার কি অবস্থা হবে? তিনি এরশাদ করলেনঃ উষ্ট্রের মালিক যদি তার হক্ব তথা জাকাত আদায় না করে, আর পানি পান করার দিন দুগ্ধ দোহন করে মিসকিনদের মধ্যে দুগ্ধ বিতরণ করাও একটি হক্ব, তবে কেয়ামতের দিন একটি সমতল ভূমিতে উষ্ট্রগুলোর সম্মুখে তাদের মালিককে শায়িত অবস্থায় রাখা হবে। তাদের সমস্ত উষ্ট্র সেখানে বর্তমান থাকবে, এমনকি একটি উষ্ট্রের বাচ্চাও কম হবে না। উষ্ট্রগুলো ঐ ব্যক্তিকে পদদলিত করবে এবং মুখ দ্বারা তাকে আঘাত করবে। প্রথমে সম্মুখের ভাগ পদদলিত করবে এরপর পেছনের ভাগ পদদলিত করতে থাকবে। আর এ অবস্থা সারা দিন অব্যাহত থাকবে, যা দুনিযার ৫০ হাজার বছরের সমান হবে। অবশেষে যখন বন্দাদের ফয়সালা হবে তখন তাকে পথ প্রদর্শন করা হবে, জান্নাতের দিকে অথবা দোজখের দিকে। তখন আরজ করা হলো গাভী, মহিষ, দুম্বা এবং বকরীর সম্পর্কে কি আদেশ?

তিনি এরশাদ করলেনঃ এগুলোর মালিক যদি জাকাত আদায় না করে থাকে তবে উম্মুক্ত ময়দানে এই জন্তুগুলোর সম্মুখে তাকে শায়িত অবস্থায় রাখা হবে। এ জন্তুগুলো তাদের শিং দ্বারা তাকে আঘাত করবে এবং পদদলিত করবে। এ আযাব সারা দিন হতে থাকবে, আর সে দিন সমান হবে দুনিয়ার ৫০ হাজার বছরের।

অবশেষে যখন মানুষের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে তখন তাকে জান্নাত অথবা দোজখের পথ দেখানো হবে। (মুসলিম শরীফ)

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ এই হাদীস খানিই প্রকৃত পক্ষে এ আয়াতের তফসীর। তবে এই হাদীসে যে সম্পদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে তা হলো সে সম্পদ যার জাকাত যথারীতি আদায় করা হয় নাই।

হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, আল্লাহ পাক যাকে ধন-সম্পদ দিয়েছেন সে যদি উক্ত সম্পদের জাকাত আদায় না করে তবে সে সম্পদ কেয়ামতের দিন সর্পের আকৃতি ধারণ করে তার গলায় জড়িয়ে ধরবে, তাকে দংসন করে বলবে আমি তোর সম্পদ, আমি তোর রসম্পদ।১

(বোখারী শরীফ)

হযরত আবু জর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তির উষ্ট্র, গাভী, মহিষ দুম্বা বা বকরী থাকে আর সে ঐ সম্পদের জাকাত আদায় না করে তবে কেয়ামতের দিন সে জন্তু গুলোকে অত্যন্ত মোটা তাজা করে হাজির করা হবে এবং সে জন্তু গুলো তাদের মালিককে পদদলিত করবে এবং শিং দ্বারা আঘাত করবে। এই শাস্তি অব্যাহত থাকবে

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৬৭

কেয়ামতের দিন মানুষের বিচার মীমাংশা হওয়া পর্যন্ত।

(বোখারী ও মুসলিম শরীফ)

তফসীরকারগণ বলেছেন, যে কৃপন সে স্বেচ্ছায় আল্লাহর রাহে দান করে না। যদি তাকে আল্লাহর রাহে দান করার জন্য অনুরোধ করা হয় তখন সে চেহারাকে এদিক সেদিক করে এবং কপাল কুঞ্চিত করে। যদি অধিক পরিমানে তাকে অনুরোধ করা হয় তবে সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে স্থান ত্যাগ করে, তাদের অনুরূপ আচরণের শাস্তিই হবে এভাবে যে তাদের কপালে পাঁজরে এবং পৃষ্ঠদেশে সেই উত্তপ্ত স্বর্ণ রৌপ্য দ্বারা দাগ দেয়া হবে।

আলোচ্য আয়াতের তফসীরে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সাহাবায়ে কেরাম একাধিক মত পোষণ করেছেন। অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামের মতে, এর অর্থ হলো সে সম্পদ যার জাকাত আদায় করা হয়নি। আর জাকাত আদায় না করার কারণেই শাস্তির ঘোষণা করা হয়েছে।

হযতর ওমর (রাঃ) বলেছেন, যে সম্পদের জাকাত আদায় করা হয়েছে তা "কানৃজ" নয়, যার শাস্তির কথা আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে।

আর হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বলেছেনঃ যে সম্পদের জাকাত আদায় করা হয়েছে তা 'কানৃজ' নয়, যদিও তা সাত জমিনের সমান হয়, আর যার জাকাত আদায় করা হয় নাই তা 'কানজ' যার শাস্তির ঘোষণা আলোচ্য আয়াতে হয়েছে।

হযরত যাবের (রাঃ) বলেছেন, যখন তুমি তোমার সম্পদের জাকাত আদায় করে দিলে তখন তার অকল্যাণ দূর করে দিলে, আর এমন অবস্থায় তা 'কানৃজ' রইলনা।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ

وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অর্থাৎ তারা সে সম্পদকে আল্লাহর রাহে ব্যয় করে না। এর অর্থ হলো তারা নিজেদের সম্পদের জাকাত আদায় করে না আর যাকাত আদায় না করার শাস্তির ঘোষণা রয়েছে এই আয়াতে।[১]

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-৪৪
তফসীরে এবন কাসীর (উর্দু) খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৫১

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ
اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَٰلِكَ
الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ
كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ
الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ
كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ
اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٧﴾

তরজমা

(৩৬) যেদিন আল্লাহ পাক আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন সেদিন থেকে আল্লাহর নিকট আল্লাহর বিধানে মাসের সংখ্যা বারো। তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস, এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন। অতএব, এর মধ্যে নিজেদের প্রতি জুলুম করোনা। আর যেভাবে মোশরেকরা সর্বাবস্থায় তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তোমরাও তেমনিভাবে সকল অবস্থায় তাদের সাথে যুদ্ধ কর, আর নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ পাক পরহেজগার লোকদের সঙ্গে রয়েছেন।

(৩৭) এই যে মাসকে পিছিয়ে দেয়ার প্রথা তা কুফরী যুগে পরিবর্ধিত প্রথা, কাফেররা তাতে প্রথভ্রষ্ট হয়।

তারা উক্ত মাসকে এক বছর হালাল, আর এক বছর হারাম করে লয়।

আল্লাহ পাক যা সম্মানের জন্য রেখেছেন তারা তার গণনা পূর্ণ করতে চায়। ফলে আল্লাহ পাক যে মাস হারাম করেছেন তা তারা হালাল করতে চায়। তাদের দৃষ্টিতে তাদের অসৎ আচরণ অতি সুন্দর করে দেখানো হয়েছে। আর আল্লাহ পাক কাফের সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে আহলে কিতাবদের বিরুদ্ধে জেহাদের আদেশ ছিল। এরপর ঐ জেহাদের কারণ বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাদের চারিত্রিক দুর্বলতার বিবরণও স্থান পেয়েছে। তারা অর্থ লিপ্সা চরিতার্থ করার লক্ষ্যে আল্লাহ পাকের বিধান পর্যন্ত পরিবর্তন করতো। এভাবে তারা নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে দ্বীন দুনিয়া উভয়টিই বরবাদ করে। আলোচ্য আয়াতে আরবের মোশরেকদের কয়েকটি মূর্খতার বিবরণ দেয়া হয়েছে। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে বছর বারো মাসে শেষ হয়। তন্মধ্যে চারটি মাস বিশেষভাবে সম্মানিত যথা–

(১) জিলকদ, (২) জিলহজ্জ , (৩) মহররম এবং (৪) রজব।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং হযরত ইসমাইল (আঃ)–এর সময় থেকে বছরে বারো মাসের মধ্যে চার মাসকে সম্মানিত মনে করে এই মাস সমূহে হত্যা এবং যুদ্ধ বিগ্রহ অবৈধ মনে করা হতো। আরব দেশে এ চার মাস সর্ব প্রকার হত্যা কান্ড সম্পূর্ণ বন্ধ থাকতো। লোকেরা এই চার মাসকে নিরাপত্তার মাস মনে করতো, শান্তি এবং নিরাপত্তা সর্বত্র বজায় থাকতো। মানুষ নিঃসংক মনে নির্বিঘ্নে সর্বত্র ভ্রমন করতো। এমনকি যদি কেউ তার নিজের প্রাণের দুশমন বা তার পিতার ঘাতককেও হাতের কাছে পেত তবুও কিছু বলতো না।

কিন্তু এ নিয়মের মধ্যেও একটি অনিয়ম শুরু হলো যে, যদি কোন শক্তিশালী গোত্র মহররম মাসে যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করতো তবে তাদের সরদার এভাবে ঘোষণা করতো যে, এ বছর আমরা মহররমকে নিষিদ্ধ মাস থেকে বের করে দিলাম তার স্থলে সফর মাসকে নিষিদ্ধ মাস হিসেবে গ্রহণ করা হলো।

পরবর্তী বছর এ কথা বলতো আগের প্রথানুযায়ী মহররম মাস নিষিদ্ধ থাকবে এবং সফর মাস হালাল থাকবে। এভাবে আরবরা মাসকে তাদের খেয়াল খুশি মোতাবেক আগে পরে করতো। আর বছরে চার মাস নিষিদ্ধ হিসেবে মেনে নিত। তবে এই চার মাস কোন্‌টি তা তারা তাদের প্রয়োজন মোতাবেক নিদৃষ্ট করতো, আর যখন ইচ্ছা তাতে পরিবর্তন করতো। কোন সময় এক মাসকে হালাল বলতো, আবার এক বছর পরে সে মাসকে হারাম বলতো। আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে এই মূর্খতা পরিহার করার নির্দেশ দিয়েছেন এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ

অর্থাৎ–আল্লাহ পাকের নিকট মাসের সংখ্যা বারো, আল্লাহ পাকের হুকুম মোতাবেক, তন্মধ্যে চারটি মাস সম্মানের এটিই সঠিক দ্বীন, তাতে তোমরা জুলুম করো না।[১]

এই আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) একখানি সুদীর্ঘ হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যা মসনদে আহমদে সংকলিত হয়েছে। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর বিদায় হজের খুৎবায় এরশাদ করেছেনঃ জমানা ঘুরে ফিরে নিজের আসল অবস্থায় এসে গেছে। বারো মাসে বছর হয়। তন্মধ্যে চার মাস সম্মানিত এরপর তিনটি মাস একাধারে যথা জিলকদ জিলহজ্জ, মহররম, আর চতুর্থ হলো রজব। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন এটি কোন্ দিন? আমরা আরজ করলাম আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূলই জানেন। তিনি নিরব হলেন। আমরা মনে করলাম হয়ত তিনি এ দিনের অন্য কোন নামকরণ করবেন। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ এটি কি কোরবানীর দিন নয়?

আমরা বললামঃ জি–হ্যাঁ। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন এটি কোন্ মাস? আমরা বললাম আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূলই জানেন। তিনি তখন নিবরতা পালন করলেন। আমরা ধারণা করলাম হয়ত তিনি এর অন্য কোন নামকরণ করবেন।

এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ এটি কি জিলহজ্জ নয়? আমরা আরজ করলামঃ জি–হ্যাঁ। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন এটি কোন্ শহর? আমরা আরজ করলামঃ আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলই (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ভাল জানেন। এরপর তিনি নিরব হলেন। আমরা ধারণা করলাম হয়ত তিনি এর কোন নতুন নামকরণ করবেন।

এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ এটি কি মক্কা নয়? আমরা আরজ করলাম অবশ্যই।

এরপর তিনি এরশাদ করলেনঃ তোমরা মনে রেখো তোমাদের রক্ত তোমাদের ধন–সম্পদ এবং তোমাদের ইজ্জত সম্মান তোমাদের পরস্পরের মধ্যে এমনি নিষিদ্ধ এবং পবিত্র যেমন আজকের দিন সম্মানিত এবং পবিত্র। অবশেষে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সংগে মোলাকাত করবে এবং তিনি তোমাদের থেকে আমলের হিসাব নিবেন। মনে রেখো আমার পরে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যেয়ো না যে একে অন্যকে হত্যা করা শুরু করো। এরপর তোমরা বল আমি কি তোমাদের নিকট আল্লাহ পাকের বাণী পৌছিয়ে দিয়েছি?

তোমরা শ্রবণ কর তোমাদের মধ্যে যে এখানে রয়েছে তার কর্তব্য হলো যে নেই

(১) তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত–আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড–৩, পৃষ্ঠা–৩২৬–২৭

তাকে এ বাণী পৌছিয়ে দেয়া, হয়ত যাকে সে পৌছাবে সে অধিকতর সংরক্ষনকারী হবে।১

প্রাক ইসলামিক যুগে আরবদের কলহ-দ্বন্দ্ব পরস্পরের সংঘর্ষ চরম পর্যায়ে পৌছে। কিন্তু নিষিদ্ধ ও সম্মানিত চার মাসে তাদের পাশবিকতা বাধাপ্রাপ্ত হতো, তাই সম্মানিত মাসেও যুদ্ধ করার একটি অপকৌশল তারা নিজেরাই আবিস্কার করে। তারা নিজেরাই মাস পরিবর্তন করে। যখন তারা মহররম মাসে যুদ্ধ করার ইচ্ছা করতো তখন তাদের গোত্রীয় প্রধানরা বলতোঃ এ বছর আমরা মহররম মাস পরে পালন করবো। এ ঘোষণার মাধ্যমে মহররম আর মহররম রইলনা। তাই মহররম মাসে যুদ্ধ করাও আর নিষিদ্ধ রইল না, পরবর্তী বছর মহররম মহরমই থাকলো।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ কুপ্রথা প্রচলিত হয় সর্ব প্রথম কেনানা সম্প্রদায়ের প্রধান গুলমুস নামক এক ব্যক্তির মাধ্যমে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) জাহ্যাক (রঃ), কাতাদা (রঃ) মুজহেদ (রঃ)-এর অভিমত হলো এই কুপ্রথা প্রচলনকারী হলো মলেক এবনে কেনানা গোত্রের তিন ব্যক্তি। আবু সামাসা, জানাদা এবনে আওফ, এবনে উমাইয়া কানানী।

কালবী (রঃ) বলেছেন, সর্ব প্রথম এ কুপ্রথা চালু করে নাইস এবনে সালাবা কেনানী। এ ব্যক্তি আমিরুল হজ্জ হয়ে আসতো। যখন হজ্জ শেষ হতো তখন সে দন্ডায়মান হয়ে বক্তৃতা করতো এবং বলতো আমি যা সিদ্ধান্ত করি তার প্রতিবাদ চলবে না। আমার সিদ্ধান্তের সমালোচনা করা যাবেনা। সকলে তার কথায় রাজী হতো। এমন অবস্থায় সে যদি বলতো এ বছর মহররমের স্থলে সফর মাসকে নিষিদ্ধ মাস হিসেবে গ্রহণ করা হলো তখন সকলে তার ঘোষণা মেনে নিত। আর যদি সে বলতো এ মাস হালাল তখন লোকেরা তাও মেনে নিত এবং তার পরে লুণ্ঠন শুরু করতো। নাইস এবনে সালাবার পর জানাদা এবনে আওফ নামক এক ব্যক্তি আমিরুল হজ্জ হয়। সে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগ পেয়েছিল। তারপর বণী কানানার যে ব্যক্তি আমিরুল হজ্জ হলো সে হলো গুলমুস। সে কেনানী কবি ছিল। তার নেতৃত্বেই মোশরেকরা হজ্জ করতে আসতো।

জাহ্যাক (রঃ) হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এই কুপ্রথার বাণী হলো আমর এবনে নাহি এবনে কুমআ এবনে খন্দফ।

ইমাম মুসলিম (রঃ) হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস লিখেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, এই বণী কাব গোত্রের পূর্ব পুরুষ আমর এবনে নাহি এবনে কুমআ এবনে খন্দফকে আমি দোজখের

১। তফসীরে এবন কাসীর (উর্দু), খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৫৪
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৭১

ভেতর দেখিছি সে নিজের নাড়িভুড়ি টেনে ফিরছিল।[১]

ইমাম মোহাম্মদ এবনে এসহাক (রঃ) তাঁর "আস্‌সীরত" গ্রন্থে লিখেছেন, এ কুপ্রথা সর্ব প্রথম চালু করে গুলমাস হোজায়ফা এবনে আয়েদ। এরপর কাসীম এবনে আদি এবনে আমের এবনে সালাবা এবনে হারেস এবনে মালেক এবনে কানানা এবনে খোজায়মা এবনে মুদরেকা এবনে ইলিয়াস এবনে মুজের এবনে নাজায় এবনে সাদ এবনে আদনান। এরপর তার পুত্র ওব্বাত এরপর তার পুত্র কালাহ, এরপর তার পুত্র উমাইয়া, এরপর তার পুত্র কালাহ, এরপর তারপুত্র উমাইয়া, এরপর তার পুত্র আওফ এবং এরপর তার পুত্র আবু সোমাসা জানাদা এবং তার যুগেই ইসলামের প্রচার আরম্ভ হয়।[২]

فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ

অর্থাৎ এসব মাসের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহর বিধান অমান্য করে নিজেদের ক্ষতি করোনা।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এই আয়াতের তফসীরে হযরত কাতাদা (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এই সম্মানিত মাস সমূহে গুণাহর কাজের শাস্তি বৃদ্ধি পায়। যদিও জুলুম বা অন্যায় সকল অবস্থায়ই জুলুম। জুলুম হওয়ার ব্যাপারে তাতে কোন পার্থক্য হয়না। তবে আল্লাহ পাক যে বিষয়কে ইচ্ছা করেন বৃদ্ধি করে দেন দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে আল্লাহ পাক তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে যা ইচ্ছা তাকে পছন্দ করেছেন। এমনিভাবে মাসগুলো থেকে রমজান মাসকে এবং উল্লেখিত এ চার মাসকে পছন্দ করেছেন। এমনিভাবে দিনগুলোর মধ্যে জুমআ'র দিনকে এবং রাত গুলোর মধ্যে লায়লাতুল কদরকে পছন্দ করেছেন। অতএব, মানুষের একান্ত কর্তব্য হলো আল্লাহ পাক যাকে যে মর্যাদা দিয়েছেন সে মর্যাদা রক্ষা করা এবং তার তাজিম করা। সম্মানিত মাসগুলোর সম্মান রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য। পক্ষান্তরে, এর আদব রক্ষা না করা হারাম। অতএব, আল্লাহ পাক যাকে হারাম করেছেন তাকে তোমরা হালাল করো না, আর যাকে তিনি হালাল করেছেন তাকে হারাম মনে করো না। যেমন মোশরেকরা করতো।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে জুলুম শব্দটির তাৎপর্য হলো হারামকে হালাল বানানো এবং এ নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ বিগ্রহকে বৈধ মনে করা। মোহাম্মাদ এবনে এসহাক এবনে ইয়াসার বলেছেনঃ এ আয়াতের অর্থ হলো হালাল মাসকে হারাম, আর হারাম মাসকে হালাল মনে করো না। যেমন মোশরেকরা তাই করতো। মহররমের মাসকে হালাল বানিয়ে তারা সফরের মাসকে হারাম বলে সিদ্ধান্ত করতো। এ কাজকে 'নাসী' বলা হয়।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৭১

২। তফসীরে এবন কাসীর (উর্দু), খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৫৮

অর্থাৎ এক মাসের আদেশকে অন্য মাসে বদলী করা।[১]

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً

হে মোমেনগণ! তোমরা সকলে একত্রিত হয়ে কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ কর অর্থাৎ দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে তোমরা ঐক্যবদ্ধ থাক। পরস্পরের মধ্যে কলহ-দ্বন্দ্ব করো না; বরং এক, অভিন্ন, অবিচ্ছেদ্য থাক। কাফেরদের সঙ্গে জেহাদ অবশ্য কর্তব্য। এই কর্তব্য পালনের ব্যাপারে কোন সময় বা মাস নির্দৃষ্ট নেই। অতএব, তোমরা কাফেরদের সঙ্গে সম্মানিত মাস সমূহে অথবা অন্য সময়ে জেহাদ কর! যেভাবে তারা তোমাদের সঙ্গে লড়াইয়ের ব্যাপারে কোন সময় নির্দষ্ট করে না, ঠিক তেমনিভাবে কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ব্যাপারে তোমরাও নির্দষ্ট মাসের জন্যে অপেক্ষা করবে না।

এই আয়াতের তফসীরে হযরত শাহ্ আবদুল কাদের (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত দ্বারা এ সত্য প্রমাণিত হয় যে, কাফেরদের সঙ্গে সর্বদা যুদ্ধ করা বৈধ, যেমন স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিলকদ মাসে তায়েফ অবরোধ করেছিলেন। এই অবরোধ ৪০ দিন স্থায়ী হয়। তিনি তাবুকের অভিযানে গমন করেছিলেন রজব মাসে।

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۝

আর নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ পাক মোমেনদের সঙ্গে রয়েছেন। এ কথার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, মোশরেকদের ধন বল বা অস্ত্র বলের কারণে মুসলমানদের ভয়ের কোন প্রয়োজন নেই। কেননা আল্লাহ পাকের সাহায্য মুসলমানগণই লাভ করবে।[২]

আল্লামা আলুসী (রঃ)-এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এ আয়াতের অর্থ হলো, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে আল্লাহ পাক তোমাদের সঙ্গে সাহায্যকারী হিসেবেরয়েছেন।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৬৯
২। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪০৩

আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এতে আল্লাহ পাকের সাহায্যের সুসংবাদ এবং নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। তবে তাকওয়া পরহেজগারীর শর্তে অর্থাৎ যারা আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের এবং তাঁর নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাকে তারা আল্লাহ পাকের সাহায্য লাভে ধন্য হবে।১

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এই আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, এই আয়াতে মোত্তাকী পরহেজগারদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে যে, তারা আল্লাহ পাকের নৈকট্য ধন্য হবেন, আর আল্লাহ পাক তাদেরকে শক্তিশালী করে বিজয়ী করবেন।২

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا

এখানে 'নাসী' শব্দটির অর্থ হলো মাস পরিবর্তনের প্রথা। এই প্রথা কুফরীর যুগেই পরিবর্ধিত হয়। কাফেররা তাতে পথভ্রষ্টতায় হারিয়ে যায়। তারা নিষিদ্ধ মাস সমূহের মধ্যে এক মাসকে কোন বছর হালাল বলে, আবার কোন বছর ঐ মাসকেই হারাম বলে। আল্লাহ পাক যাকে সম্মানের জন্য রেখেছেন তারা তার গণনা পূর্ণ করতে চায়। তাই আল্লাহ পাক যে মাসকে হারাম ঘোষণা করেছেন তাকে তারা হালাল করে। তাদের অসৎ আচরণ তাদের চোখে সুন্দর এবং মনোরম মনে হয়। আল্লাহ পাক এমন কাফের সম্প্রদায়কে হেদায়েত দান করেন না।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, জাহিলিয়াতের যুগে 'নাসী' বা মাস বদলের এ কুপ্রথা বহু দিন ধরে প্রচলিত ছিল। এক বছর তারা যে মাসে হজ্জ করতো পরবর্তী বছর অন্য মাসে হজ্জ করতো।

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, তারা দু' বছর, একই ভাবে হজ্জ করতো। ঘটনাক্রমে বিদায় হজ্জের পূর্বের বছর অর্থাৎ যে বছর হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর নেতৃত্বে মুসলমানগণ হজ্জ সুসম্পন্ন করেছেন সে বছর হজ্জ হয় জেলকদ মাসে, আর জেলকদের হিসেবে এটি ছিল দ্বিতীয় বছর। এর পরবর্তী বছর যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হজ্জ করেন, যা বিদায় হজ্জ নামে খ্যাত তা জিহলজ্জ মাসেই হয়। সম্পূর্ণ ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক এই হজ্জ হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ আরফার ময়দানে ওকুফ করেন, এখানেই তিনি তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন। ১০ তারিখ মিনায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে

১। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৯৩
তফসীরে কবীর, খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-৫৫
২। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৬৯

ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেন যে, "নসী" বা মাস বদলের কু প্রথা বাতিল করা হলো, আর বর্ষ পরিক্রমায় হজ্জের সময় সেখানেই আসলো যেখানে আল্লাহ পাক আসমান জমিন সৃষ্টির সময় মাস এবং দিনের সময় নির্দৃষ্ট করেছিলেন।

এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হজ্জের এ সময় এবং নিয়ম যথাযথভাবে পালনের নির্দেশ প্রদান করেন যেন পরবর্তীকালে কোন সময় এ নিয়মের বরখেলাফ না করা হয়। বিদায় হজ্জের দিন থেকে আজ পর্যন্ত এর বরখেলাফ করা হয়নি।

يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

অর্থাৎ-এর দ্বারা কাফেরদেরকে পথভ্রষ্ট করা হয়, আর সে পথভ্রষ্টতা হলো এই-

يُحِلُّوْنَهٗ عَامًا وَّيُحَرِّمُوْنَهٗ عَامًا

তারা এক বছর এক মাসকে হালাল বলে, আর দ্বিতীয় বছর ঐ মাসকেই হারাম বলে এটি বিবেক বুদ্ধির বিকৃতি ব্যতীত আর কি হতে পারে?

لِّيُوَاطِـُٔوْا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ

তারা তা এজন্য করতো যেন আল্লাহ পাকের নিষিদ্ধ চার মাসের গননা পূর্ণ করে, অথচ যে মাসকে আল্লাহ পাক সম্মানিত করেছেন সে মাসের সম্মান তারা রক্ষা করতো না, তাই-

فَيُحِلُّوْا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ

যে মাসকে আল্লাহ পাক হারাম ঘোষণা করেছেন তাকেই তারা হালাল বলতো।

زُيِّنَ لَهُمْ سُوْٓءُ اَعْمَالِهِمْ

মূলতঃ তাদের দৃষ্টিতে তাদের যাবতীয় মন্দ আচরণ বড়ই সুন্দর এবং মনোরম মনে হতো। শয়তান তাদের দৃষ্টিতে মন্দ কাজকে সুসজ্জিত করে প্রদর্শন করতো।

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ

আল্লাহ পাক এমন কাফের সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না। কেননা যারা বিকৃত মস্তিস্ক, যাদের অপকীর্তি চিরবর্জনীয়, যারা আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধকে অমান্য করে, যারা হালাল হারামের মধ্যে পার্থক্য করেনা, যারা যা ইচ্ছা তা করে, যেমন ইচ্ছা তেমন জীবন যাপন করে তারা কিভাবে হেদায়েত লাভ করবে? তাই আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, এমন সম্প্রদায়কে আল্লাহ পাক হেদায়েত করেন না। কেননা,তারা নিজেরাই হেদায়েতের পথে আসতে চায়না, হেদায়েত লাভের কোন অণ্বেষণই তাদের নেই।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, শয়তানের সবচেয়ে বড় ধোকা হলো এই যে, সে পাপাচারকে মানুষের সম্মুখে কল্যাণকর কাজরূপে প্রকাশ করে তাই সূরায়ে ফাতেহাতে আল্লাহ পাক মানুষকে এই দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

"হে পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করো." 'সীরাতুল মুস্তাকীম'-এর দিকে হেদায়েত করো। মূলতঃ আল্লাহ পাকের তওফিক ব্যতীত শয়তানের ধোকা থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ পাক আপন বন্দাদেরকে হেদায়েত লাভের জন্য দোয়া করার শিক্ষা দিয়েছেন, যারা যত্ন সহকারে এই দোয়া করে আল্লাহ পাক তাদেরকে হেদায়েত দান করে থাকেন এবং শয়তানের ধোকা থেকে রক্ষা করেন।

যে চার মাসে যুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিল বর্তমানে এ সময়ে জেহাদ জায়েজ কি গুণাহ-এ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের একাধিক মত রয়েছে। তাবেয়ীনদের মধ্যে কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী এ মত পোষণ করেন যে, এ চার মাসে এখনও যুদ্ধ হারাম। যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ

অর্থাৎ এ চার মাসে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করা অবৈধ। কিন্তু কাফেররা যদি যুদ্ধ শুরু করে তবে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে যুদ্ধ অবৈধ নয়; বরং অবশ্য কর্তব্য। আতা এবনে আবি রবাহ এ মত পোষণ করেছেন। আর অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে, এ আদেশ বাতিল হয়েছে।

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً

আয়াত দ্বারা এই আদেশ মনসুখ হয়েছে। হাদীস শরীফেও এই অভিমতের সমর্থন পাওয়া যায়। কেননা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তায়েফ অবরোধ করেছিলেন জিলকদ মাসে, আর তাবুকের অভিযানও হয়েছিল রজব মাসে।

চাঁদের হিসাবের গুরুত্ব

আলোচ্য আয়াত সমূহে চাঁদের হিসাবের গুরুত্ব রয়েছে। সমস্ত এবাদতের সময় যথা রোজা, হজ্জ, জাকাত চাঁদের হিসেবেই নির্ধারিত হয়। শরীয়তের যাবতীয় বিধি-নিষেধ চাঁদের হিসাবের ভিত্তিতেই প্রনীত। তাই চাঁদের হিসাবের হেফাজত করা মুসলিম জাতির কর্তব্য বা ফরজে কেফায়া। যদি সকল মুসলমান চাঁদের হিসাব পরিত্যাগ করে অন্য হিসাবের ধারা গ্রহণ করে আর চাঁদের হিসাব বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে সমগ্র মুসলিম জাতি গুণাহগার হবে। আর যদি চাঁদের হিসাব সংরক্ষিত থাকে তবে অন্য হিসাবের ধারা গ্রহণ অবৈধ নয়।[১]

(১) তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩২৯
তফসীরে মাজেদী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪০০

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ
لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ
الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا
قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا
غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾
إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ
اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ
مَعَنَا ۖ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ
كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾

তরজমা

(৩৮) হে মোমেনগণ! তোমাদের কি হয়েছে যে, যখন তোমাদেরকে বলা হয় তোমরা আল্লাহ পাকের রাহে অভিযান কর, তখন তোমরা যেন মাটিতে লুটিয়ে পড়, তোমরা কি আখেরাতের বদলে এ ক্ষণস্থায়ী জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট হয়েছ? (জেনে রেখো) পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপভোগ অতি সামান্য।

(৩৯) যদি তোমরা (আল্লাহর রাহে) বের না হও তবে আল্লাহ পাক তোমদেরকে কঠিন শাস্তি দেবেন, তোমাদের স্থলে অন্য জাতিকে নিয়ে আসবেন, অথচ তোমরা তাঁর কোন ক্ষতিই করতে পারবেনা, আর আল্লাহ পাক সর্বোপরি সর্বশক্তিমান।

(৪০) যদি তোমরা রসূলের সাহায্য না কর তবে (জেনো রাখো) আল্লাহ পাক তাঁকে সাহায্য করেছেন, যেদিন কাফেররা তাঁকে (মক্কা থেকে) বহিস্কার করেছিল, দু'জনের এক জন ছিলেন তিনি, যখন তারা (সওর নামক) গুহায় ছিলেন, তখন তাঁর সাথীকে তিনি বলতেছিলেন, চিন্তিত হয়োনা, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক আমাদের সাথে

রয়েছেন, ফলে আল্লাহ পাক তাঁর প্রতি সান্তনা নাজিল করেন এবং তাঁর সাহায্যে এমন সৈন্য প্রেরণ করেন যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনা এবং আল্লাহ পাক কাফেরদের কথাকে নীচ করে দেন। আর আল্লাহ পাকের মহান বাণী যে চির উর্ধ্বে এবং আল্লাহ পাক মহা পরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

সূরার শুরু থেকে মোশরেকদের বিরুদ্ধে জেহাদের কথা ছিল। এই পর্যায়ে মক্কা বিজয় এবং হোনায়েনের উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর আহলে কিতাবদের বিরুদ্ধে জেহাদের আদেশ রয়েছে। আলোচ্য আয়াত সমূহে তাবুকের যুদ্ধের বিবরণ স্থান পেয়েছে এতে রোমের বাদশাহ কায়সারের মোকাবেলায় অভিযান করা হয়।১

শানে নজুল

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াত সমূহ তাবুকের যুদ্ধ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। সিরিয়ার রাজা রোমের সম্রাটের সহযোগিতায় মদীনা মোনাওয়ারা আক্রমনের পায়তারা করছে, এই খবর যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট পৌছল তখন তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, হামলায় উদ্যত শত্রুকে তার দেশেই মোকাবেলা করা উচিত। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেনঃ হানাদার দুশমন মদীনা মোনাওয়ারা পৌছার পূর্বেই তাবুক নামক স্থানে গমন করে তাদের মোকাবেলা করবেন। অথচ তিনি মক্কা বিজয় এবং হোনায়েনের যুদ্ধ শেষ করে সবে মাত্র মদীনা মোনাওয়ারা প্রত্যাবর্তন করেছেন। কিন্তু যারা প্রাণের মদীনা আক্রমন করার প্রস্তুতি গ্রহণ করছে তাদের মোকাবেলা করা যে একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। তাই তিনি সাহাবায়ে কেরামকে তাবুক অভিযানের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের আদেশ দিলেন। এটি নবম হিজরীর ঘটনা। সাহাবায়ে কেরামের নিকট কয়েকটি কারণে এই জেহাদ কঠিন মনে হলো–

(১) তখন ছিল গ্রীষ্মকাল, প্রচন্ড গরম ছিল।

(২) মদীনা শরীফে অভাব অনটন ছিল।

(৩) মদীনা শরীফ থেকে তাবুকের দূরত্বও অনেক বেশী ছিল। সুদীর্ঘ সফর, দূর্গম পথ।

(১) তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৩১

(৪) তখন মদীনা শরীফে খেজুর বাগানের খেজুর প্রায় পেকেছে, খেজুর কাটার সময় ঘনিয়ে এসেছে।

(৫) রোমের কায়সারের সুসজ্জিত বিরাট বাহিনীর সঙ্গে মোকাবেলা করা–এসব কারণে এমন অবস্থায় জেহাদ স্বাভাবিক কারণেই কঠিনতর মনে হয়। তখন জেহাদের জন্যে বের হওয়া তাঁদের পক্ষেই সম্ভব যাঁদের ঈমান সুদৃঢ়, যাঁদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করা, অন্যের পক্ষে এ অভিযানে অংশ গ্রহণ নিঃসন্দেহে কষ্টকর। এ সময় জেহাদে অনুপ্রানিত করে আলোচ্য আয়াত সমূহ নাজিল হয়।[১]

একদিকে জেহাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য আসবাব পত্র ছিল অনেক কম। অন্যদিকে, রোমের কায়সারের সৈন্যবাহিনী ছিল বিরাট, আর তার শক্তি ছিল অনেক। তাই প্রকৃত মোমেনগণের মধ্যেও অনেকে চিন্তিত হলেন, আর মোনাফেকরা প্রকাশ্যে বলতে লাগল এই নিরস্ত্রপ্রায় মুসলমানরা অর্ধেক পৃথিবীর অধিকারী রোমক সম্রাটের বিরুদ্ধে কিভাবে যুদ্ধ করবে, তাই মোনাফেকরা বিভিন্ন ওজর আপত্তির কথা বলে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ থেকে আত্মরক্ষা করতে লাগল, আর আল্লাহর নামে শপথ করে যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করতে লাগল। ∴ আলোচ্য আয়াত সমূহে জেহাদের জন্য বিশেষ ভাবে অনুপ্রানিত করা হয়েছে, আর যারা জেহাদ থেকে বিরত থাকার কথা চিন্তা করছিলেন তাদের ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে এবং সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, যদি তোমরা এই মুহূর্তে আল্লাহর রসুলের সাহায্য না কর, তবে এর দ্বারা আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূলের কোন ক্ষতি হবে না। আল্লাহ পাক ইতিপূর্বে অত্যন্ত কঠিন সময়ে (হিজরতের সফরে) তাঁর প্রিয় রসূলকে সাহায্য করেছেন যখন তাঁর সঙ্গে একমাত্র সাথী হযরত আবু বকর (রাঃ) ব্যতীত আর কেউ ছিল না, ঠিক এভাবে ভবিষ্যতেও আল্লাহ পাক তাঁর সাহায্য করবেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তন করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রোমের কায়সারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন। তখন ছিল বড় অভাব অনটনের সময় ও দারুন গরমের মওসুম, খেজুর পাকার সময়ও হয়েছিল। লোকেরা খেজুর বাগানের শান্ত শীতল ছায়ায় অবস্থান করা পছন্দ করছিল। এমন সময় সফর করা কঠিন মনে হচ্ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিয়ম ছিল এই–জেহাদের উদ্দেশ্যে কোন্ এলাকায় গমনের ইচ্ছা, নির্দৃষ্ট করে সে স্থানের নাম উল্লেখ করতেন না। কিন্তু তাবুকের জেহাদের ব্যাপারে সুস্পষ্ট ভাবে সব

১। তফসীরে কবীর, খন্ড–১৩, পৃষ্ঠা–৫৯
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত–আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড–৩, পৃষ্ঠা–৩৩১

কথা প্রকাশ করলেন, যেন লোকেরা পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। কেননা পথ ছিল সুদীর্ঘ এবং দূর্গম, সময় ছিল অত্যন্ত কঠিন, আর প্রতিপক্ষ শুধু গাচ্ছানের রাজাই ছিল না, বরং রোমের সম্রাট কায়সারও ছিল। এরশাদ হয়েছেঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ
لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ

হে মোমেনগণ! তোমাদের কি হয়েছে? যখন তোমাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা আল্লাহর রাহে অভিযান কর তখন তোমরা মাটিতে লুটিয়ে পড় অর্থাৎ দুশমনের মোকাবেলায় প্রস্তুত হওনা এবং অভিযানের উদ্দেশ্যে বের হওনা। তোমরা কি আখেরাতের অনন্ত অসীম নেয়ামতের পরিবর্তে দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী জীবনকে পছন্দ করেছ? অথচ আখেরাতের অনন্ত অসীম নেয়ামতের মোকাবেলায় দুনিয়ার আরাম আয়াস অতি নগন্য। যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ

(হে রসূল!) আপনি বলুন, দুনিয়ার সামগ্রী অতি সামান্য, আরো এরশাদ হয়েছেঃ

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (আর আখেরাত উত্তম ও চিরস্থায়ী)

প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি আল্লাহ পাকের দৃষ্টিতে দুনিয়ার মর্তবা একটা মশার ডানার সমানও হতো তবে তিনি কোন কাফেরকে এক ঢোক পানিও পান করতে দিতেন না। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর শাহাদতের আঙ্গুলের দিকে ইশারা করে বলেছেনঃ এ আঙ্গুলটিকে সমুদ্রে ডুবিয়ে বের করলে সমুদ্রের পানির অনুপাতে যতখানি পানি আসবে আখেরাতের মোকাবেলায় দুনিয়ার অবস্থা ততখানিই।

হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ)-কে এক ব্যক্তি বললেনঃ আমি শুনেছি আপনি এ হাদীস বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ পাক একটি নেকীর বদলে এক লক্ষ নেকীর সওয়াব দানকরেন।

তিনি বললেনঃ আমি তো হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে দু'লক্ষের ফরমানও শ্রবণ করেছি। এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করে বললেনঃ দুনিয়া যা অতীত হয়েছে আর যা অবশিষ্ট রয়েছে সব মিলিয়ে আখেরাতের মোকাবেলায় অত্যন্ত নগন্য।

বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল আজিজ এবনে মারওয়ান ইন্তেকালের সময় তাঁর কাফন আনিয়ে নিলেন। ঐ কাফন দেখে তিনি বললেনঃ বিশাল পৃথিবী থেকে এটুকুই আমার অংশ, আমি এতটুকুই পৃথিবী থেকে নিয়ে যাচ্ছি। এরপর পৃষ্ঠ পরিবর্তন করে ক্রন্দনরত অবস্থায় বললেনঃ হায় দুনিয়া! তোমার যা বেশী তাও অনেক কম, তোমার কমতো সত্যিই অনেক কম। হায় আক্ষেপ! আমরা প্রতারিত অবস্থায়ই রয়েছি।

আলোচ্য আয়াতে জেহাদ পরিত্যাগ করার ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। একটি গোত্রকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জেহাদের জন্য আহবান করলেন।, তারা প্রস্তুত হলো না, তখন আল্লাহ পাক তাদের উপর বৃষ্টি বন্ধ করে দিলেন।[১]

إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

যদি তোমরা জেহাদের জন্য বের না হও তবে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে অত্যন্ত যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি দেবেন। আল্লাহ পাক তাঁর দ্বীন এবং রসূলের সাহায্যের জন্যে অন্য লোক নিয়ে আসবেন। তোমরা আল্লাহ পাকের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না, কেননা আল্লাহ পাক কারো মুখাপেক্ষী নন, আর আল্লাহর রসূল স্বয়ং আল্লাহর আশ্রয়ে রয়েছেন এবং আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি যা ইচ্ছা তা করেন। অতএব, তোমাদের স্থলে অন্যদেরকে হাজির করা তাঁর পক্ষে কোন কঠিন কাজ নয়। তোমরা যদি আল্লাহর রসূলের সাহায্য না কর, তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে জেহাদে অংশ গ্রহণ না কর তবে আল্লাহ পাকের কোন ক্ষতি হবেনা, ক্ষতি হবে তোমাদের, তোমরা সওয়াব থেকে মাহরুম হবে এবং দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে।

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ

যদি তোমরা আল্লাহর রসূলকে সাহায্য না কর, তবে জেনে রাখো আল্লাহ পাক তাঁকে সাহায্য করেছেন সে সময়ে যখন কাফেররা তাঁকে মক্কা থেকে বের করে দিয়েছিলো এমন অবস্থায় যে, তিনি দু'জনের একজন ছিলেন অর্থাৎ সেখানে শুধু

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৫৮-৫৯

দু'জন মানুষ ছিলেন, একজন ছিলেন তিনি, আর তাঁর সঙ্গে আর এক ব্যক্তি ছিলেন। অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে আবু বকর (রাঃ) ছিলেন। অথবা এর অর্থ হলো, যদি তোমরা তাঁর সাহায্য না কর, আল্লাহ্ পাক তাঁর সাহায্যকে অবশ্য কর্তব্য করে নিয়েছেন। এমনকি যখন তাঁর সঙ্গে একজন সাথী ব্যতীত কেউ ছিল না তখনও আল্লাহ্ পাক তাঁকে সাহায্য করেছেন, তাই ভবিষ্যতেও আল্লাহ্ পাক তাঁকে আরো সাহায্য করবেন। কাফেররা যখন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মক্কা থেকে বহিষ্কারের পরামর্শ করে এবং ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় তখনও আল্লাহ্ পাকই তাঁকে সাহায্য করেছিলেন।

إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ

যখন তাঁরা উভয়ে মক্কার অদূরে সওর নামক গুহায় অবস্থান করছিলেন।

إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ

যখন পয়গম্বর তাঁর সাথীকে বলেছিলেন–

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

চিন্তিত হয়োনা, আল্লাহ্ পাক আমাদের সাথে রয়েছেন।

আলামা বগভী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে ওমরের (রাঃ) বর্ণনার সূত্রে লিখেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ)–কে বলেছিলেনঃ তুমি আমার গারে সওরের সাথী এবং হাউজে (কাউসারেও) আমার সাথী থাকবে।

ইমাম মুসলিম হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে মাসউদ (রাঃ)–এর বর্ণিত হাদীস লিখেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি আমি (আল্লাহ্ পাক ব্যতীত আর) কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম তবে আবু বকরকে গ্রহণ করতাম। কিন্তু এখন তিনি আমার ভাই এবং সাথী। আর আল্লাহ্ পাক তোমাদের সাথীকে (অর্থাৎ আমাকে) বন্ধু বানিয়ে নিয়েছেন।

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড–৫, পৃষ্ঠা–২৬৭

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁর পবিত্র কালামে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সে কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যা তিনি "গারে সওরে" তাঁর একমাত্র সাথী হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর উদ্দেশ্যে বলেছিলেনঃ

لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا

"চিন্তিত হয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক আমাদের সাথে রয়েছেন।" এই আয়াত সম্পর্কে হযরত মির্জা মাজহার জানে জানা (রঃ) বলেছেন, এই বাক্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ কথা বলেননি যে, আল্লাহ পাক "আমার" সঙ্গে রয়েছেন; বরং বলেছেনঃ আল্লাহ পাক "আমাদের" সঙ্গে রয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ পাক সঙ্গে থাকার ব্যাপারে হযরত আবু বকর (রাঃ)-কেও অন্তর্ভূক্ত করেছেন। আর হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর জন্যে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ ফজিলত। অতএব, যে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর সর্বোচ্চ মর্যাদাকে অস্বীকার করে সে এ আয়াতকে অস্বীকার করে আর যে এ আয়াতকে অস্বীকার করে, সে কাফের।[১]

এতদ্ব্যতীত, হযরত আবু বকর (রাঃ) নিজের জন্য চিন্তিত ছিলেন না। তিনি চিন্তিত ছিলেন হযরত রসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে। তিনি ভেবেছিলেন, যদি আমার মৃত্যু হয় তবে একটি মানুষের মৃত্যু হবে, যদি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে শহীদ করা হয় তবে উম্মত ধ্বংস হয়ে যাবে, এটিই ছিল হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর দুশ্চিন্তার কারণ।

হিজরতের ঘটনা

বোখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর যে বর্ণনা সংকলিত হয়েছে তা হলো এই-যখন থেকে আমার জ্ঞান হয়েছে আমি দেখেছি আমার পিতা-মাতা একই দ্বীনের অনুসারী ছিলেন। এমন কোন দিন অতিবাহিত হতো না যে, সকাল এবং সন্ধ্যায় হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের গৃহে আগমন করতেন না। যখন (মক্কায়) মুসলমানদের উপর চরম নির্যাতন এবং উৎপীড়ন হচ্ছিল তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছিলেনঃ আমি স্বপ্নে তোমাদের হিজরতের স্থান দেখেছি। সেখানে অনেক খেজুরের বৃক্ষ রয়েছে। এরপর মুসলমানগণ মদীনা তৈয়্যবায় হিজরত করেন। আর যারা মক্কা থেকে আবিসিনিয়ায় গিয়েছিলেন তারাও মদীনা শরীফ পৌছেন। এ সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) মদীনায় হিজরত করার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলেন। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেনঃ একটু অপেক্ষা কর, (এখনও আমার জন্য অনুমতি হয়নি) আশা আছে যে, আমার জন্যেও (হিজরতের) অনুমতি হবে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃঃ ২৭৭

হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেনঃ আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কোরবান হোক। আপনারও অনুমতির আশা আছে। তিনি এরশাদ কররেনঃ হ্যাঁ। হযরত আবু বকর (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সফরের উদ্দেশ্যে নিজের হিজরত মূলতবী রাখলেন। তিনি দুটি উষ্ট্র ক্রয় করলেন। চার মাস পর্যন্ত উষ্ট্র গুলোকে লালন-পালন করলেন। আমরা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ঘরে ঠিক দুপরের সময় বসেছিলাম তখন হযরত আসমা বললেনঃ আব্বা, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আগমন করছেন। তিনি তখন মাথায় কাপড় রেখে এমন সময় আগমন করছিলেন যে সময় সাধারণতঃ তাঁর আগমন হতো না।

হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেনঃ আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কোরবান হোক, এ সময় যে আপনি আগমন করেছেন এর অর্থ হলো (হিজরতের) অনুমতি হয়ে গেছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি নিলেন। ঘরে প্রবেশ করে হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে বলেলনঃ যারা তোমার নিকট রয়েছে তাদেরকে সরিয়ে দাও। হযরত আবু বকর (রাঃ) আরজ করলেনঃ এখানে খবর প্রকাশ করার মত কেউ নেই, শুধু আমার দুটি মেয়েরয়েছে।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আমাকে এখান থেকে বের হওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। হযরত আবু বকর (রাঃ) আরজ করলেনঃ আমাকে সঙ্গী হওয়ার অনুমতি দান করুন। তিনি এরশাদ করলেনঃহ্যাঁ তুমি আমার সঙ্গে যাবে। হযরত আবু বকর (রাঃ) তখন ক্রন্দন করতে লাগলেন, এ ক্রন্দন ছিল আনন্দের, ইতিপূর্বে আমি কাউকে খুশি বা আনন্দের জন্য কাঁদতে দেখিনি।

হযরত আবু বকর (রাঃ) তখন আরজ করলেনঃ হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কোরবান হোক। আমার এ দু'টি উষ্ট্রীর মধ্যে একটি আপনি গ্রহণ করুন। তিনি এরশাদ করলেনঃ মূল্য আদায় করে গ্রহণ করবো। আর যে উষ্ট্রী আমার হবে না তার উপর আমি আরোহণ করবো না। তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) আরজ করলেনঃ এ উষ্ট্রটি আপনার।

তিনি এরশাদ করলেনঃ কিন্তু যে মূল্যে তুমি ক্রয় করেছ, হযরত আবু বকর (রাঃ) আরজ করলেন এত মূল্যে আমি খরিদ করেছিলাম। তিনি এরশাদ করলেনঃ আমি এই মূল্যে তোমার থেকে গ্রহণ করলাম। হযরত আবু বকর (রাঃ) তখন বললেনঃ এটি আপনার হয়ে গেল।

ইমাম বোখারী (রঃ) "গাজওয়ায়ে রাজীর" বর্ণনায় লিখেছেন, এটি ছিল জাদআ নামক উষ্ট্রী। ওয়াকেদী এর মূল্য লিখেছেন ৮০০ দেরহাম। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা দু'টি উষ্ট্রীর জন্যে উত্তম আসবাবপত্র সহ একটি বাটিতে খাবার এবং একটি পানির পাত্রও দিয়ে দেই।

মোহাম্মদ ইউসুফ সালেহী বর্ণনা করেন, হযরত আসমা (রাঃ) তাঁর কোমরবন্দের কাপড়কে টুকরা করে এক টুকরা দিয়ে পাথেয় বেধে দেন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর (রাঃ) বণী ওয়ায়েল গোত্রের এক ব্যক্তিকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পথ প্রদর্শক নিযুক্ত করেন। এই ব্যক্তি তখন কাফের ছিল, পরে মুসলমান হয়। সে অভিজ্ঞ পথ প্রদর্শক ছিল। তাকে উষ্ট্রী দু'টি দিয়ে দেয়া হয় এবং নির্দেশ দেয়া হয় যে, তিন দিন পর গারে সওরে হাজির থোকো। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলী (রাঃ)-কে তাঁর সফরের ব্যাপারে অবগত করে এ নির্দেশ দেন যে,আমার স্থলে তুমি এখানে থাকবে। মানুষের যে সব আমানত আমার নিকট রয়েছে তা মানুষকে পৌছিয়ে দেবে। এরপর তুমি আমার নিকট চলে আসবে। (মক্কাবাসী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে শত্রুতা করতো এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামের প্রতিও চরম জুলুম অত্যাচার করতো তাদের অন্যায় অনাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সাহাবায়ে কেরামকে একে একে মাতৃভূমি ছেড়ে হিজরত করতে হয়েছে। অবশেষে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকেও মদীনা মোনাওয়ারায় হিজরত করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু কি বিস্ময়কর বিষয় এতদসত্ত্বেও) মক্কাবাসী কোন মূল্যবান জিনিসের হেফাজত করার ইচ্ছা হলে তা আমানত করতো হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট।

মক্কাবাসীদের পূর্ণ আস্থা ছিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সততা এবং আমানতদারীর উপর। তাদের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন সত্যবাদী এবং আমানতদার।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) সওর নামক পাহাড়ের সে গুহায় পৌছেন। বায়হাকী হযরত ওমর (রাঃ)-এর সূত্রে লিখেছেন, তাঁরা রাত্রি কালে রওয়ানা হয়েছিলেন।

আবু নাইম আয়শা বিনতে কোদামা'র সূত্রে লিখেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সর্ব প্রথম আমার সম্মুখে আবু জেহেল এসেছে। কিন্তু আল্লাহ পাক তাকে অন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাই সে আমাকে এবং আবু বকরকে দেখতে পারেনি।

হযরত আসমা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর সমস্ত নগদ তথা পাঁচ হাজার দেরহাম সঙ্গে নিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সওর পাহাড়ের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন, তখন পথে আবু বকর (রাঃ) কখনও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সামনে, কখনও ডানে কখনও বামে থেকে চলতে লাগলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি আরজ করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! যখন আমার আশংকা হয় যে, দুশমন সম্মুখে ওঁৎ পেতে আছে তখন আমি সম্মুখে চলে যাই। আর যখন

দুশ্চিন্তা হয় যে, হয়ত পেছন থেকে হামলা হবে তখন পেছনে চলে যাই, আর এ কারণেই ডানে-বামে থাকি। যখন তাঁরা সওর নামক গুহার মুখে পৌছলেন তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) আরজ করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সে আল্লাহ পাকের শপথ। যিনি আপনাকে সত্য নবী করে পাঠিয়েছেন, আপনি গুহার ভেতর তশরীফ নেবেন না। আপনার পূর্বে আমি গমন করে দেখি যদি সেখানে কোন কষ্টদায়ক প্রাণী থাকে তবে তার প্রথম হামলা আমার উপর হবে। এ কথা বলে হযরত আবু বকর (রাঃ) গুহার ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং হাত দিয়ে তদারক করে যেখানে গর্ত লক্ষ্য করলেন সেখানে তাঁর কাপড় দিয়ে গর্তের মুখ বন্ধ করলেন। এভাবে সবগুলো গর্তের মুখ বন্ধ হলো।

কিন্তু একটি মুখ উন্মুক্ত রইল। কেননা তা বন্ধ করার মত কাপড় তাঁর নিকট ছিলনা, তাই এ গর্তের মুখে তিনি তাঁর পা রেখে দিলেন। এরপর হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সওর গুহায় প্রবেশ করলেন। এদিকে গর্তের বিষাক্ত সর্প হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর পায়ে দংশন করতে লাগলে। কিন্তু তিনি গর্তের মুখ থেকে পা সরালেন না। (কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর উরুর উপর মাথা মোবারক রেখে আরাম করছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) পা সরালে সে আরামে ব্যাঘাত হবে) কিন্তু বিষাক্ত সর্পের দংশনের কষ্টে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর নয়ন যুগল থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো।

(বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর অশ্রুর ফোটা যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গন্ড মোবারক স্পর্শ করলো তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ আবু বকর! তুমি কাঁদছ? তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) সর্পের দংশনের কথা বললেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর জবান মোবারক থেকে একটু থু-থু দান করলেন সর্পের দংশনের স্থানে ব্যবহার করার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ব্যথা দূরীভূত হলো।)

আবু নইম হযরত আনাস (রাঃ)-এর সূত্রে লিখেছেন, সকাল হলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমার কাপড়টি কোথায়? তিনি রাত্রের ঘটনা বর্ণনা করলেন। কিভাবে কাপড়টি ব্যবহার করা হয়েছে। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দু' হাত তুলে দোয়া করলেন। হে আল্লাহ! আবু বকরকে জান্নাতে আমার মর্তবায় আমার সাথী করো। আল্লাহ পাক ওহী প্রেরণ করলেন যে,"আপনার দোয়া কবুল হয়েছে।"

রাজীনের বর্ণনা হলো এই- যখন হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর আলোচনা হয় তখন হযরত ওমর (রাঃ) ক্রন্দন করতে থাকেন এবং বলেনঃ আমার মনে যে কথাটি অত্যন্ত পছন্দনীয় তাহলো আমার সারা জীবনের আমলের সমষ্টি আবু বকর (রাঃ)-এর এক দিন এবং এক রাতের সমান হোক, সে রাত-যে রাতে হযরত আবু বকর

(রাঃ) হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সওর গুহায় অতিবাহিত করেছেন, এরপর তিনি পূর্বোল্লেখিত ঘটনা বর্ণনা করেন। এই বর্ণনায় তিনি এই কথাটুকু সংযোজন করেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বরকতে সর্পের দংশনের ব্যথা তখনকারমত দূরীভূত হয়। কিন্তু শেষ বয়সে ঐ বিষাক্ত সর্পের ব্যথা পুনরায় অনুভূত হয়, আর তা-ই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়।

আর দিন হলো সে দিন যেদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এন্তেকাল হয়। আরববাসী মোরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয় এবং তারা এ কথা বলতে থাকে যে, আমরা জাকাত আদায় করবো না। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন, যদি তারা উট বাধার রশি যা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে দিত তা আদায় করতে অস্বীকার করে তবে আমি ঐ রশিটির জন্যও তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করবো।

আমি আরজ করলামঃ হে আল্লাহর রসূলের খলিফা! মানুষকে মিলে মিশে থাকতে দিন এবং তাদের সঙ্গে বিনম্র ব্যবহার করুন। তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেনঃ তুমি জাহেলিয়াতের যুগে অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলে, আর ইসলামের যুগে এসে দুর্বল হয়ে পড়েছ। ওহী অবতরণ বন্ধ হয়ে গেছে, দ্বীন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, আমাদের জীবদ্দশায় কি দ্বীনের ব্যাপারে কোন ত্রুটি হতে পারে?

কাবা শরীফের কবুতরের ইতিহাস

এবনে সাদ, আবু নঈম, বায়হাকী এবং এবনে আসাকের আবু মাসআব মক্কীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আবু মাসআব বলেছেনঃ আমি হযরত আনাস এবনে মালেক (রাঃ), হযরত জায়েদ এবনে আরকাম (রাঃ) এবং হযরত মগিরা এবনে সো'বা (রাঃ)-কে পেয়েছি এবং তাঁদের সকলকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সওর গুহায় প্রবেশ করলেন তখন গুহার মুখের উপর আল্লাহ পাক একটি বৃক্ষ পয়দা করলেন যা গুহার মুখটিকে গোপন করে দিল। আল্লাহ পাকের নির্দেশ মোতাবেক গুহার মুখে মাকড়সা জাল বেঁধে দিল। আর দু'টি জংলী কবুতর গুহার মুখে বাসা বেঁধে নিল। (এসব অল্পক্ষণের মধ্যেই হলো) যখন কোরায়েশী যুবকরা সকল দিক থেকে লাঠি তলোয়ার নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলো তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে তাদের দূরত্ব রইল মাত্র ৪০ গজ। এক ব্যক্তি সওর গুহার দিকে দৃষ্টিপাত করে বললোঃ দু'টি কবুতর দেখা যাচ্ছে। সে উপলব্ধি করলো যে, সওর গুহায় কেউ নেই। তার এ কথাটি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শ্রবণ করলেন। এরদ্বারা তাঁর বিশ্বাস হলো যে, আল্লাহ পাক এ বিপদ দূর করে দিয়েছেন, আর কবুতর দু'টির জন্য তিনি দোয়া করলেন এবং তাদের দ্বারা যে ভাল কাজ হয়েছে তার বদলা নির্দৃষ্ট করে দিলেন। তাই ঐ কবুতর

জোড়া হরম শরীফে পৌঁছে গেল এবং সেখানেই তাদের বংশ বৃদ্ধি হতে লাগলো, আর হরম শরীফের সমস্ত কবুতর ঐ কবুতর জোড়ারই বংশধর।

ইমাম আহমদ (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পদচিহ্নের অনুসরণে মোশরেকরা পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছে, কিন্তু পাহাড়ের উপর পদচিহ্ন অস্পষ্ট হয়ে যায়। তারা পাহাড়ের উপর আরোহন করে সওর নামক গুহার উপরে মাকড়সার জাল দেখে বলে, যদি এর ভেতরে কেউ গমন করতো তবে মাকড়সার জাল এভাবে থাকতো না। যাহোক, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেখানে তিন রাত অতিবাহিত করেন।

কাজী হাফেজ আবু বকর এবনে সাইদ হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কোরায়েশরা যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসন্ধানে সওর নামক গুহার নিকটে পৌঁছে, গুহার মুখে মাকড়সার জাল দেখে তারা বলতে থাকে যদি এর মধ্যে কেউ প্রবেশ করতো তবে গুহার মুখে মাকড়সার জাল থাকতো না। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দন্ডায়মান অবস্থায় নামাজ আদায় করছিলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) প্রহরায় রত ছিলেন। তিনি আরজ করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা আপনার অনুসন্ধানে এসে গেছে। আল্লাহর শপথ! আমার নিজের জন্য কোন চিন্তা নেই, চিন্তা হলো শুধু এর জন্যে যে, আপনার ব্যাপারে কোন দুর্ঘটনা না ঘটে যায়, তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আবু বকর, কোন চিন্তা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক আমাদের সাথে রয়েছেন।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেছেন, আমি আরজ করলামঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা গুহার মধ্যে আছি, আর কোরায়েশরা উপরে আছে, যদি তাদের কেউ নিজের পায়ের দিকে তাকায় তবে আমাদেরকে দেখে ফেলবে। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আবু বকর, সে দু' ব্যক্তির সম্পর্কে তোমার কি ধারণা যাদের তৃতীয় জন হলেন স্বয়ং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন (অর্থাৎ আল্লাহ পাক আমাদের সাথেই আছেন)

আবু নইম আতা এবনে মায়সারার সূত্রে লিখেছেন, মাকড়সা আল্লাহর নবীদের হেফাজতের ব্যাপারে দু'বার জাল বুনেছিল। একবার হযরত দাউদ (আঃ)-এর হেফাজতের জন্যে যখন তালুত সম্প্রদায় তাঁর অনুসন্ধান করছিল। আর একবার হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হেফাজতের জন্যে যখন তিনি সওর

নামক গুহায় অবস্থান করছিলেন। মোশরেকেরা আলকামা এবনে কুরজ এবনে হেলাল খাজায়ী নামক এক ব্যক্তিকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সংগে নিয়েছিল। সে তখন কাফের ছিল। অবশ্য মক্কা বিজয়ের বছর মুসলমান হয়েছিল। এ ব্যক্তি পদচিহ্ন চিনবার ব্যাপারে পারদর্শী ছিল। আলকামাই মক্কার মোশরেকদেরকে নিয়ে সওর গুহা পর্যন্ত পৌছে। এখানে এসে সে বললোঃ আমি বুঝতে পারি না তারা ডান দিকে গেল না বাঁ দিকে। এরপর তারা পাহাড়ের উপর আরোহন করলো। উমাইয়া এবনে খালফ্ বললোঃ এখানে তো মোহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) জন্মেরও পূর্ব থেকে মাকড়সার জাল রয়েছে।

বায়হাকী হযরত ওরওয়ার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যখন মোশরেকেরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে পেলো না তখন তাঁর অনুসন্ধানে যানবাহনে আরোহন করে চতুর্দিক লোক দৌড়াতে লাগলো। যারা তাঁর সন্ধান দিতে পারবে তাদের জন্য পুরুস্কার ঘোষণা করা হলো। এমনকি তারা সে পাহাড়ের উপর এসে পড়লো যেখানে সওর নামক গুহা ছিল এবং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যেখানে ছিলেন, তাঁরা কাফেরদের কথার শব্দ শ্রবণ করলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) ভীত হয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে বললেনঃ আবু বকর চিন্তা করো না, আল্লাহ পাক আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। আর এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَأَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক নিজের তরফ থেকে তাঁর রসূলের প্রতি সান্তনা নাজিল করলেন, আর তিনি হযরত আবু বকরকে বললেনঃ চিন্তা করোনা নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। (বালাজরী)

এবনে আবু হাতেম, আবু শেখ, এবনে মরদবিয়া, বায়হাকী এবং এবনে আসাকের হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, عليه এর এই সর্বনামটি দ্বারা হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ পাক হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর প্রতি সান্তনা নাজিল করেছেন। কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছেনঃ হে আবু বকর চিন্তা করো না আল্লাহ পাক আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। এ কথার কারণে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর মনে সান্তনা এসেছে। কেননা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অন্তর তো পূর্বেই ছিল শান্ত নিশ্চিন্ত, তাঁর কথার কারণে হযরত আবু বকর (রাঃ)-ও নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا

"আর আল্লাহ পাক তাদেরকে সাহায্য করেছেন এমন সৈন্য বাহিনী দ্বারা যাঁদেরকে তোমরা দেখতে পাওনা।" অর্থাৎ ফেরেশতাদের ফৌজ প্রেরিত হলো যাঁরা কাফেরদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে দিল।

আবু নইম হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ)-এর সূত্রে লিখেছেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) এক ব্যক্তিকে দেখলেন সে গুহার দিকে চেয়ে আছে। তিনি আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! এই লোকটি আমাদেরকে দেখে ফেলবে। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ কোন অবস্থাতেই দেখতে পারবে না। কেননা, ফেরেশতাগণ তাঁদের ডানা দিয়ে তার সম্মুখে আড়াল করে দিবেন। একটু পরই দেখা গেল ঐ লোকটি ওখানে বসে প্রশ্রাব করছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকরকে বললেনঃ হে আবু বকর! যদি সে আমাদেরকে দেখতো তবে এমন করতো না।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা হলো, ফেরেশতাগণ কাফেরদের অন্তরে ভয় ঢেলে দিয়েছেন, ফলে তারা চলে গেছে।

মুজাহেদ এবং কালবী (রঃ) বলেছেন, বদরের দিন ফেরেশতারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহায্য করেছিলেন। এই পর্যায়ে আয়াতাংশের অর্থ হবে যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম গুহার ভেতর ছিলেন আল্লাহ পাক দুশমনের ষড়যন্ত্রকে তাঁর তরফ থেকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন এবং বদরের দিনও ফেরেশতা প্রেরণ করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সাহায্য করেছেন।

এবনে আদি এবং এবনে আসাকের হযরত আনাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত হাস্যান (রাঃ)-কে বলেছিলেনঃ তুমি আবু বকর সম্পর্কে কোন কবিতা রচনা করেছ? হযরত হাস্যান আরজ করলেন জি-হ্যাঁ। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ বল আমি শুনবো। হযরত হাস্যান (রাঃ) বললেনঃ

"তিনি সুউচ্চ গুহার দু'জনের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন যখন দুশমন পাহাড়ের উপর উঠে ঘুরাফেরা করতে লাগলো। সাহাবায়ে কেরাম জানতেন সমস্ত মানুষের মধ্যে হযরত আবু বকর (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট সর্বাধিক প্রিয়, কারণ তিনি হযরত আবু বকরের সমান কাউকে পাননি।"

এই কবিতাটি শ্রবণ করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হাসলেন ফলে তাঁর দাঁত মোবারকগুলো প্রকাশিত হলো। এরপর তিনি এরশাদ করলেন, আবু বকর তেমনই,যেমন তুমি বর্ণনা করেছ।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, এরপর তাঁরা উভয়ে তিন রাত পর্যন্ত সওর নামক গুহায় আত্মগোপন করে থাকেন। এ সময়ে আবদুল্লাহ এবনে আবু বকরও

রাত্রিকালে তাঁদের কাছে থাকতেন, দিনে যা কিছু কথা বার্তা শ্রবণ করতেন রাত্রে সেগুলো তাঁদেরকে অবহিত করতেন।

আবু এসহাক বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর (রাঃ)–এর কন্যা আসমা (রাঃ) খাবার তৈরী করে সন্ধার সময় পৌছিয়ে দিতেন। আমের এবনে ফোহেরা যে কোরায়েশের গৃহ পালিত পশুগুলোর সঙ্গে হযরত আবু বকর (রাঃ)–এর বকরীও চরাতো, সন্ধার এক ঘন্টা পর ঐ জন্তুগুলো নিয়ে সওর গুহার কাছে যেতো। সে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ)–কে প্রত্যেক রাতে তাজা দুধ সরবরাহ করতো, যখন তিন রাত অতিবাহিত হলো এবং যারা তাদের অনুসন্ধান করছিল তারাও ব্যর্থ হলো তখন ঐ ব্যক্তি উষ্টী দু'টি নিয়ে হাজির হলো, যাকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তাঁরা উভয়ে উষ্টীর উপর আরোহন করলেন। আমের এবনে ফোহেরাও খেদমতের জন্য সফর সঙ্গী হলো।

আমের এবনে ফোহেরা আবদুল্লাহ এবনে তোফায়েলের গোলাম ছিল। তারা তাঁদের উভয়কে নিয়ে সমুদ্র তীরের পথ ধরে অগ্রসর হলেন।

বর্ণিত আছে যে, হযরত বরা এবনে আজেব (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)–কে জিজ্ঞাসা করছিলেন, যে রাতে আপনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে (হিজরতের উদ্দেশ্যে) রওয়ানা হয়েছিলেন তার বিস্তারিত বিবরণ দিন। তিনি বললেনঃ সারা রাত এবং পরের দিন অর্ধেক চলতাম। যখন ঠিক দ্বিপ্রহর হতো এবং রাস্তায় কোন লোক দেখা যেতো না, আর কোন ছায়াদার স্থান দেখতাম (যেখানে রৌদ্রের তাপ না পৌছতো) সেখানে আমরা অবতরণ করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা করতাম। তাঁর বিছানা ঠিক করে দিয়ে আরজ করতাম, আপনি এখানে বিশ্রাম গ্রহণ করুণ। আমি চারিদিকে প্রহরায় মশগুল থাকতাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘুমিয়ে পড়তেন।

(এক দিনের ঘটনা) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘুমিয়ে পড়লেন। আমি একটু বাইরে এসে চারদিকে নজর রাখলাম, তখন আমি দেখলাম একজন রাখাল তার বকরীগুলো নিয়ে এদিকে আসছে। আমি একটু অগ্রসর হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম তুমি কার গোলাম? সে মক্কাবাসীর মধ্যে একজনের নাম বললো, যাকে আমি চিনে ফেললাম। অতঃপর জিজ্ঞাসা করলামঃ তোমার বকরীগুলোর দুধ আছে? সে বললো, জি–হ্যাঁ। তখন আমি বললাম, আমি কি দুধ দোহন করে নিব? সে বললোঃ জি–হ্যাঁ।

এরপর সে একটি বকরী ধরে আনলো। আমি তাকে বললামঃ দুধের বাঁটগুলো পরিস্কার করে দাও। সে আমাকে এক বাটি দুধ দিল। আমার নিকট একটি পাত্র ছিল যাতে আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পান করার এবং অজু করার জন্য পানি রাখতাম। আমি দুধ নিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট পৌছলাম। কিন্তু তাঁকে জাগ্রত করা সমীচিন মনে করলাম না। তবে জাগ্রত করার

নিয়তে দণ্ডায়মান অবস্থায় দুধের পাত্রে পানি ঢালতে লাগলাম। এমন সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জাগ্রত হলেন। আমি আরজ করলামঃ ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটু দুধ পান করুন। তিনি পান করলেন, আমি সন্তুষ্ট হলাম। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ এখনও রওয়ানা হওয়ার সময় হয়নি?

আমি আরজ করলামঃ জি-হ্যাঁ হয়েছে। একটু পর আমরা রওয়ানা হলাম।

উম্মে মা'বাদের ঘটনা

তেবরাণী, হাকেম, আবু নাঈম এবং আবু বকর শাফেয়ী হযরত সোলায়েত এবনে আমর আনসারীর সূত্রে বর্ণনা করেছেনঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং তাদের পথ প্রদর্শক আমের এবনে ফোহেরা মদীনা শরীফ গমনের পথে উম্মে মা'বাদ খাজায়ীর তাঁবু অতিক্রম করেন, উম্মে মা'বাদ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে চিনতনা, বয়সে সে প্রৌঢ়া ছিল, সে পর্দা করতনা, এ অতিথিপরায়না মহিলা তার তাঁবুর আংগিনায় বসত এবং পথিক মুছাফিরদের মেহমানদারী করত। মদীনাগামী এ পবিত্র কাফেলা উম্মে মা'বাদের নিকট থেকে গোশ্‌ত এবং খেজুর ক্রয় করতে ইচ্ছা করলেন। কিন্তু তখন তাদের খুব অভাব অনটনের সময়। উম্মে মাবাদের নিকট খেজুর বা গোশ্‌ত কিছুই ছিলনা। উম্মে মা'বাদ বলল, আল্লাহর শপথ। যদি আমাদের কাছে এসব কিছু থাকত তবে আমরা তোমাদেরকে দুঃখিত অবস্থায় রাখতামনা। তাঁবুর এক কোনে একটি বকরী দেখা গেল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, এ বকরীটির কি অবস্থা উম্মে মা'বাদ বলল, এটি দুর্বলতার কারণে অন্য বকরীর সঙ্গে (জঙ্গলে) যেতে পারেনি।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, ওর কাছে কি দুধ আছে? উম্মে মা'বাদ বলল, এ বকরীটি অত্যন্ত দুর্বল। তিনি এরশাদ করলেন, তুমি অনুমতি দিলে আমি এ বকরী থেকে দুগ্ধ দোহন করতে পারি। উম্মে মা'বাদ আরজ করল, আমার পিতা-মাতা কোরবান, তার নিকট থেকে কখনো দুগ্ধ দোহন করা হয়নি, কোন নর ছাগলের সংগে তার মেলা মেশাও হয়নি। যদি আপনি মনে করেন, তার কাছে দুধ আছে তবে আপনি চেষ্টা করতে পারেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বকরীটি কাছে আনিয়ে তার পৃষ্ঠদেশে এবং বাঁটের উপর হাত বুলিয়ে দিলেন এবং বিসমিল্লাহ পাঠ করলেন এরপর উম্মে মা'বাদের জন্যে এবং বকরীর জন্যে দোয়া করলেন। এর সঙ্গে সঙ্গে ঐ বকরী থেকে দুগ্ধ প্রবাহিত হতে লাগল।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটি পাত্র আনিয়ে নিলেন। পাত্রটি এত

বড় ছিল যে তা থেকে সকলে দুগ্ধ পান করে তৃপ্তি লাভ করতে পারতেন। তিনি ঐ পাত্রেই দুগ্ধ দোহন করলেন। পাত্রটি পরিপূর্ণ হয়ে গেল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম উম্মে মা'বাদকে দুগ্ধ পান করালেন সে তৃপ্তি লাভ করল। এরপর তিনি তাঁর সাথীদের দুধ পান করালেন। তাঁরাও তৃপ্ত হ'ল। তিনি নিজে এরপর দুধ পান করলেন এবং এরশাদ করলেনঃ "যে পান করাবে তার সর্বশেষে পান করা উচিত।" এরপর তিনি দ্বিতীয়বার দুগ্ধ দোহন করলেন এবং পাত্রটি পুর্ণরায় পরিপূর্ণ হ'ল এবং তা উম্মে মা'বাদের নিকট রেখে তাঁরা রওয়ানা হয়ে গেলেন।

এবনে সাদ এবং আবু নাঈম উম্মে মা'বাদের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, যে বকরীটির উপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হাত বুলিয়ে দিয়েছেন সে বকরীটি আমার নিকট আঠার হিজরী পর্যন্ত ছিল। তা ছিল হযরত ওমর (রাঃ) –এর খেলাফতের যুগ। সে বছরটি ছিল অত্যন্ত দুর্ভিক্ষের সবুজ বলতে কোন কিছু তখন ছিলনা। কিন্তু আমরা সকাল সন্ধায় ঐ বকরীটির দুগ্ধ দোহন করতাম সে সর্বদা দুধ দিত তার দুধ কোন সময় বন্ধ হয়নি।

হেশাম এবনে হাবশ্ বর্ণনা করেন (হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রওয়ানা হওয়ার কিছুক্ষণ পর) মা'বাদের পিতা কয়েকটি দুর্বল বকরী নিয়ে বাড়ী পৌছল। ঘরে দুধ দেখে সে আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, মা'বাদের মা এ দুধ কোথা থেকে আসলো? বকরীগুলো–তো দূরে জঙ্গলে ছিল। আর বাড়ীতে দুধ দেয়ার মত কোন বকরীও ছিল না।

মা'বাদের মা বললোঃ এই দুধ হলো একজন অত্যন্ত বরকতময় মানুষের বরকত যাঁর ঘটনা এভাবে ঘটেছে মা'বাদের পিতা বললোঃ তাঁর কিছু অবস্থা বর্ণনা কর। উম্মে মা'বাদ বললোঃ তিনি ছিলেন অত্যন্ত উজ্জ্বল চমৎকার সুন্দর এবং উত্তম স্বভাবের অধিকারী।

তাঁর আবয়ব ছিল অতি আকর্ষনীয়, সর্ব প্রকার ত্রুটিমুক্ত। চক্ষুদ্বয় হলো কালো, ভ্রু প্রশস্ত এবং ঘন, আর কণ্ঠস্বরও ছিল বৈশিষ্ট্য মন্ডিত। যখন নিরব থাকতেন তখন অত্যন্ত গাম্ভীর্য পূর্ণ মনে হতো, আর যখন কথা বলতেন তখনও অত্যন্ত সুন্দর মনে হতো। দূর থেকে অত্যন্ত সুন্দর এবং আকর্ষণীয় দেখা যেত। আর নিকট থেকে বড় মধুর লাগতো। কথা বার্তা ছিল অতি পান্ডিত্যপূর্ণ, কমও নয়, বেশীও নয়। কথাগুলো যেন সাজানো গুছানো মুক্তার হারের মত। তাঁর আবয়ব ছিল মধ্যম ধরণের। এত লম্বাও নয় যে দেখতে খারাপ লাগে, আর এত খাটও নয় যে দেখতে ছোট মনে হয়, অতীব আকর্ষণীয়, অত্যন্ত মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন তিনি। তাঁর সাথীরা সর্বক্ষণ তাঁকে ঘিরে থাকেন। তিনি যখন "শ্রবণ কর" বলতেন, তখন সকলে মনযোগ সহকারে শ্রবণ করতো। আর যখন কোন আদেশ দিতেন তখন আদেশ পালনের জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা করতো। অতীব ভক্তি শ্রদ্ধার সাথে তাঁর খেদমত এবং আদেশ পালন করা হতো, তিনি কঠোর মেজাজের অধিকারী ছিলেন না।

আবু মা'বাদ বললোঃ আল্লাহর শপথ। এ-তো সে কোরায়েশী, মক্কায় যাঁর আবির্ভাব হয়েছে, তাঁর সম্পর্কে আলোচনা শ্রবণ করেছি আমার ইচ্ছা ছিল তাঁর সান্নিধ্য লাভ করার এবং যদি সুযোগ হয় তবে আমি ভবিষ্যতে অবশ্যই তা করবো।

ইমাম বায়হাকী অন্য সূত্র থেকে একটু পার্থক্য সহ এ ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। সন্ধ্যাকালে উম্মে মাবাদের পুত্র বকরী নিয়ে যখন আসল, তখন উম্মে মা'বাদ একটি ছুরি এবং বকরী প্রেরণ করলেন।

এবং তার পুত্রকে বললোঃ তাদেরকে বল এই বকরী জবেহ করে (ভুনে) খেয়ে নিন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঐ ছেলেটিকে বললেনঃ তুমি ছুরি নিয়ে যাও এবং একটি বড় পাত্র নিয়ে এস। সে বললোঃ এটি বন্ধা, এর দুধ নেই। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বকরীটির বাঁটগুলোর উপর হাত বুলিয়ে দিলেন এবং দুধ দোহন করে পাত্র পূর্ণ করে নিলেন। এই বর্ণনায় এ কথাও রয়েছে যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেনঃ আমরা দু'রাত সেখানে ছিলাম, এরপর রওয়ানা হলাম।

উম্মে মা'বাদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে "মোবারক" বলতে লাগলো। তার অনেক বকরী হয়েছিল। এমনকি সে কিছু দিন পর ঐ বকরীগুলো নিয়ে মদীনা শরীফ এসেছিল। তার পুত্র হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে দেখে চিনে ফেলে এবং তার মাকে বললো মা, এ ব্যক্তি "মোবারকের" সঙ্গে ছিল। উম্মে মা'বাদ হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর নিকট এসে বললোঃ হে আবদুল্লাহ (আল্লাহর বন্দা) যিনি তোমার সঙ্গে ছিলেন তিনি কে?

হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেনঃ তিনি আল্লাহ পাকের নবী (সঃ)। সে বললোঃ আমাকে তাঁর নিকট নিয়ে চল। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির করলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে খাদ্য ও পোষাক দান করলেন এবং সে পরে মুসলমান হয়েছিল।

হযরত আসমা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন চলে গেলেন তখন আমাদের নিকট কোরায়েশের কিছু লোক আসলো তাদের মধ্যে আবু জেহেলও ছিল। তারা গৃহের দ্বার প্রান্তে দাড়িয়ে রইল, আমি ঘর থেকে বের হলাম তখন তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করলোঃ তোমার পিতা কোথায়?

আমি বললামঃ আল্লাহর শপথ। আমি জানিনা আমার পিতা কোথায়, আবু জেহেল অত্যন্ত বদ মেজাজ এবং খবিস লোক ছিল, সে আমার গন্ডদেশে একটি চাপড় মারলো, যে কারণে আমার বালি পর্যন্ত পড়ে গেল। এরপর তারা চলে গেল। তিন দিন পর্যন্ত এ অবস্থাই রইল। আমরা কিছুই জানতে পারলাম না যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন্ দিকে গমন করলেন। তিন দিন পর মক্কার নিচু এলাকার

দিক থেকে একটি জ্বীন আরবদের গানের মত গান গেয়ে গেলো। মানুষ তার পেছনে ছুটলো। কিন্তু কেউ তাকে দেখতে পেল না। জ্বীনের আবৃত্তিকরা কবিতার অর্থ হলো "মহান আরশের মালিক উত্তম বিনিময় দান করুন সেই দু' সাথীকে, যাঁরা উম্মে মা'বাদের তাবুতে দ্বি-প্রহরে অবস্থান করেছেন, তাঁরা উভয়ে সঠিক পথে গমন করেছেন যাঁর কাছ থেকে আমি হেদায়েত পেয়েছি, আর যে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথী হয়েছে সে সফলকাম হয়েছে। হে বণী কোসাই! আল্লাহ পাক মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লামের সৌজন্যে তোমাদের বৈশিষ্ট্য এবং নেতৃত্বকে বিলুপ্ত করেননি।

বণী কাবকে মোবারক হোক যে একজন স্ত্রীলোক মুসলমানদের পথে অবস্থান করতো, তার ভগ্নি থেকে তার বকরী এবং পাত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। তোমরা যদি বকরীকে জিজ্ঞাসা কর তবে সেও সাক্ষ্য দেবে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম সে বকরী ঐ মহিলার নিকট রেখে যান, যেন দুগ্ধ দোহনকারী তার থেকে দুগ্ধ দোহন করে।"

বায়হাকী লিপিবদ্ধ করেন যে, কোরায়েশরা হুজুর সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করতে করতে অবশেষে উম্মে মা'বাদের নিকট পৌছে তাকে হুজুর সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে এবং তাঁর আকৃতির বিবরণ দেয়। উম্মে মা'বাদ জবাব দিল তোমরা কি বলছ? একজন মেহমান আমার এখানে অবস্থান করেছিলেন, তিনি একটি বন্ধা বকরীর দুধ দোহন করেছিলেন।

কোরায়েশরা বললোঃ আমরাও সে ব্যক্তিরই সন্ধান করছি।

বায়হাকী ঘটনার দুটি বর্ণনায় মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন যে, হযরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁবুর কোণে বকরী দেখেছিলেন। তার পুত্র বকরী নিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওযাসাল্লামের নিকট এসেছিল। আর উম্মে মাবাদ তার স্বামী আসলে তার নিকট হুজুর সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলী বর্ণনা করেছিল। আর এ কারণেই কোরায়েশরা হুজুর সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসন্ধানে উম্মে মাবাদের নিকট পৌছেছিল।[১]

সোরাকার ঘটনা

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৮৬-৮৭

আছে যে, সোরাকা নিজে বর্ণনা করেন, কোরায়েশের প্রতিনিধি আমাদের কাছে আসে যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবু বকরকে হত্যা অথবা গ্রেফতার করবে তার জন্য ১০০ উষ্ট্র ঘোষণা করা হলো। আমি বণী মোদলাজ গোত্রের লোকদের সঙ্গে একটি বৈঠকে ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি হাজির হলো। সে বললোঃ সোরাকা, আমি সমুদ্র তীরে কিছু লোক দেখেছি।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনজন আরোহী দেখেছি, আমার ধারণা তাঁরা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাথী। এ কথাটি শ্রবণ করা মাত্র আমি বুঝলাম তাঁরাই হবে। আমি ঐ ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করলাম যে নিবর থাক, সে নিরব হলো। আমি উঠে বাড়ী গমন করলাম। বাঁদীকে আদেশ দিলাম–আমার অশ্বটি "বতনে ওয়াদী" নামক স্থানে পৌছিয়ে দাও, আর নিজে তাঁবুর পিছন দিয়ে হাতিয়ার নিয়ে বের হয়ে গেলাম। বর্শাটা টেনে নিয়ে গেলাম বল্লমের উপরের অংশটা নিচু করে রাখলাম এভাবে অশ্ব পর্যন্ত পৌছলাম। অশ্বে আরোহন করে দ্রুতবেগে অগ্রসর হলাম। এর মধ্যে ঐ দু' ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম, আমি কাছেই পৌছে গেলাম। কিন্তু আমার অশ্ব হোচট খেলে, আমি নিচে পড়ে গেলাম, এরপর উঠে দাড়িয়ে তীর দ্বারা এ বিষয়টি পরীক্ষা করলাম যে, আমি তাদের ক্ষতিসাধন করতে পারবো কি–না। যে ফল পাওয়া গেল তা আমার পছন্দনীয় ছিল না অর্থাৎ আমি তাঁদের ক্ষতি করতে পারবো না। কিন্তু আমার মনে একটি আশা ছিল যে, আমি এ অবস্থার পরিবর্তন করে ১০০ উষ্ট্রের পুরস্কার পেয়ে যাব। তাই পুনরায় অশ্বে আরোহন করে দ্রুত এগিয়ে গেলাম, এমনকি তাদের নিকটে পৌছলাম। আমি এত নিকটবর্তী হলাম যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র কোরআন পাঠের শব্দ শ্রবণ করলাম। আমার দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ) আমার গতিবিধি লক্ষ্য করছিলেন, এই অবস্থায় আমার অশ্বের দু'টি পা মাটিতে ধ্বসে যায়। আমি নিচে পড়ে যাই এবং পরে উঠে গেলাম। কিন্তু অশ্ব তার পা বের করতে পারলোনা। যখন সে এজন্য চেষ্টা করতে লাগলো তখন ধুল বালুউঠে অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে গেল। আমি তীর দ্বারা পুনরায় পরীক্ষা করলাম দেখা গেল যে, আমি তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবনা তখন আমি এ সত্য উপলব্ধি করলাম যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হেফাজত করা হয়েছ আর তিনি বিজয়ী হবেন। তাই বাধ্য হয়ে তাঁর নিকট আমি আমার নিরাপত্তার জন্য আবেদন করলাম যে, আপনারা আমার অবস্থা দেখুন, আল্লাহর শপথ! আমি আপনাদের কোন ক্ষতি সাধন করবো না। আমার পক্ষ থেকে আপনাদের ব্যাপারে কোন প্রকার অন্যায় কাজ হবে না। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকরকে বললেনঃ তাকে জিজ্ঞাসা করো সে কি চায়? আমি বললামঃ আপনার ব্যাপারে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে, যা হোক, আমি আপনাকে এ খবরটি জানিয়ে দিলাম। তিনি আমাকে কোন কষ্ট দেননি, শুধু এতটুকু

কথা বললেন যে "আমাদের খবর মানুষকে জানাবে না"। আমি তাঁর নিকট আবেদন করলাম (ভবিষ্যতের জন্য) আমাকে একটি নিরাপত্তা বাণী লিখে দিন। তখন তিনি হযরত আবু বকরকে লিখে দেয়ার আদেশ দিলেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি আমের এবনে ফোহায়রাকে আদেশ দিলেন "লিখে দাও"। তখন আমের চামড়ার একটি টুকরায় লিখে দিল। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অগ্রসর হলেন। মদীনা মোনাওয়ারা প্রবেশের সময় তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে বললেনঃ দেখ, নবীর জন্য মিথ্যা কথা বলা কোন অবস্থাতেই উচিত নয়। আমাকে যদি কেউ পরিচয় জিজ্ঞাসা করে (আমাকে তো সুস্পষ্ট ভাষায়) সঠিক কথা বলতেই হবে। অতএব, তুমি কোনভাবে মানুষকে জবাব দেবে (এর কারণ হলো-পথে যদি তাঁর পরিচয় প্রকাশ পায় তাহলে দুশমন তাঁর ক্ষতি করতে পারে) তাই যখন হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তোমার সাথী ইনি কে? তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেনঃ পথ প্রদর্শক, যিনি আমাকে পথ দেখান। যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফের নিকটে পৌঁছলেন তখন আবু বোরায়দা আসলামী ৭০ জন লোক নিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বর্ধনা জানালেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ তুমি কে? তিনি বললেন, বোরায়দা।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আবু বকর আমাদের কাজ সঠিক হয়েছে। কারণ বোরায়দা অর্থ ঠান্ডা-এর তাৎপর্য হলো কলহের অগ্নি নিভে গেছে, আর কাজ সঠিক হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বোরায়দা শব্দটি শ্রবণ করে তাঁর মোবারক ভবিষ্যতের দিকে ইঙ্গিত করলেন। সম্বর্ধণাকারীর নামের অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে এর দলিল পেশ করলেন। অতঃপর তিনি তাকে (বোরায়দাকে) জিজ্ঞাসা করলেনঃ তুমি কোন্ গোত্রের লোক? তিনি বললেনঃ বণী আসলাম গোত্রের।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকরকে বললেনঃ আমাদের জন্য শান্তি এবং নিরাপত্তা অর্জিত হয়েছে। আসলাম শব্দটি থেকে শান্তি এবং নিরাপত্তার অর্থ গ্রহণ করেছেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ বণী আসলামের কোন্ শাখা?

তিনি বললেন, বণী সাহাম। তিনি এরশাদ করলেনঃ তোমার অংশ নির্দৃষ্ট হয়েছে। সকাল হলে বোরায়দা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করলেনঃ মদীনা মোনাওয়ারা প্রবেশ করার সময় আপনার একটি পতাকা থাকা দরকার। তাই তিনি নিজের পাগড়ি খুলে পতাকা বানালেন এবং বর্শার মাথায় বেঁধে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করলেন।

হাকেম লিখেছেন, এ কথা সর্বজন বিদিত যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম সোমবার দিন মক্কায়ে মোয়াজ্জমা থেকে বের হয়েছিলেন এবং সোমবার দিনই মদীনা তৈয়্যেবায় প্রবেশ করেছিলেন।

وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ

"আর আল্লাহ পাক কাফেরদের কথাকে নীচ করে দেন।"

'কাফেরদের কথা হলো শেরক ও কুফরের কথা যা আল্লাহ পাক ব্যর্থ করে দিয়েছেন এবং মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফ পর্যন্ত এ সুদীর্ঘ পথে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লামের হেফাজত করেছেন, আর তাঁর বিরুদ্ধে কাফেরদের সকল ষড়যন্ত্রকে বাতিল করেছেন। বিভিন্ন স্থানে ফেরেশতাদের দ্বারা সাহায্য করেছেন। যেখানে কাফেররা হামলায় উদ্যত হয়েছে সেখানেই আল্লাহ প্যকের সাহায্য নেমে এসেছে এবং দুশমনের সকল অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে তাঁকে হেফাজত করেছেন।

ঠিক এমনিভাবে বদরের যুদ্ধের দিন আল্লাহ পাক কাফেরদেরকে পরাজিত করেছেন, এভাবে তাদের শেরকের কথাকে নীচ করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে, আল্লাহর কথাকে চির উর্ধে রেখেছেন তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ

আর আল্লাহর বাণী যে চির উর্ধে। আল্লাহর বাণী হলো তৌহিদ অথবা ইসলামের দাওয়াত।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের কথার অর্থ হলো তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার যে ষড়যন্ত্র করেছিল এবং মক্কার দার-উন নদওয়ায় পরামর্শ করে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল আল্লাহ পাক তাদের সে সিদ্ধান্তকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন। আর আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর কলেমা বলতে উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ পাকের সে ওয়াদা যে, তিনি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সাহায্য করবেন,সে ওয়াদা তিনি পূরা করেছেন।

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝٤٠

আর আল্লাহ পাক সব বিষয়ে পরাক্রমশালী, তিনি বিজ্ঞানময়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে আল্লাহ পাকের প্রতিটি সিদ্ধান্তই হেকমত পূর্ণ। তাঁর ব্যাপারে গৃহিত যাবতীয় কর্মসূচী নিখুঁত এবং নির্ভুল।১

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৮৮-৯০
তফসীরে কবীর, খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-৯৮-৯৯

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ لَوْ كَانَ
عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ
الشُّقَّةُ ۚ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ
يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٤٢﴾

তরজমা

(৪১) তোমরা অভিযানে বের হয়ে পড়, হালকা অথবা ভারী অবস্থায়, নিজেদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর রাহে জেহাদ করতে থাক, এটিই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা তা বুঝতে পার।

(৪২) যদি ধন–সম্পদ কাছে থাকতো এবং সফর সহজ হতো তবে তারা অবশ্যই (হে রসূল!) আপনার অনুসরণ করতো কিন্তু তারা যে সুদীর্ঘ দূরত্ব দেখতে পায় আর তারা আল্লাহ পাকের নামে শপথ করে বলবে আমাদের পক্ষে সম্ভব হলে আমরা অবশ্যই আপনার সঙ্গে বের হতাম। তারা নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ করছে। আর আল্লাহ পাক জানেন যে, নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী।

তফসীরুল কোরআন

তাবুকের যুদ্ধে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সংগে বের হওয়ার জন্য অনুপ্রানিত করে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ "তোমরা আল্লাহর পথে বের হয়ে পড়, হালকা অবস্থায় অথবা ভারী অবস্থায়।" তফসীরকারগণ এ বাক্যটির একাধিক অর্থ বর্ণনা করেছেন।

(১) অর্থাৎ যুবক হও বা বৃদ্ধ, জেহাদে বের হয়ে পড় এই মত পোষণ করেছেন, যাহ্যাক (রঃ) হাসান (রঃ) মুজাহেদ (রঃ) একরামা (রঃ)।

(২) (আল্লাহর রাহে বের হয়ে পড়) মজবুত থাক বা দুর্বল।

(৩) (আল্লাহর রাহে বের হয়ে পড়) অভাবগ্রস্থ হও অথবা সম্পদশালী।

(৪) (আল্লাহর রাহে বের হয়ে পড়) অস্ত্রশস্ত্র কম থাকুক বা অধিক এই মত পোষণ করেছেন হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)।

(৫) তাবুকের যুদ্ধের জন্যে বের হয়ে পড় যানবাহনে আরোহী অবস্থায় অথবা পদব্রজে। এইমত পোষণ করেছেন আতিয়া উফী।

(৬) (আল্লাহর রাহে জেহাদের জন্য বের হয়ে পড়) সম্পদ শালী হও বা না হও এই অর্থ বর্ণনা করেছেন এবনে জায়েদ (রঃ)।

(৭) (আল্লাহর রাহে জেহাদে বেরহয়ে পড়) কাজে ব্যস্ত থাক অথবা অবসর। এই অর্থ বর্ণনা করেছেন হাকীম এবনে তওবা।

(৮) (আল্লাহর রাহে জেহাদে বের হয়ে পড়) সুস্থ বা অসুস্থ হও, এই অর্থ বর্ণনা করেছেন হামদানী (রঃ)।

(৯) (আল্লাহর রাহে জেহাদের জন্য বের হয়ে পড়) অবিবাহিত অবস্থায় অথবা বিবাহিত

(১০) (আল্লাহর রাহে জেহাদে বের হয়ে পড়) তোমাদের আপন জন এবং চাকর খাদেম খেদমতগার থাকুক বা না থাকুক।

(১১) (আল্লাহর রাহে জেহাদের জন্য বের হয়ে পড়) অর্থ সম্পদের বোঝা হালকা থাক অথবা ভারী।

কোন কোন তফসীরকার এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, জেহাদের আহবান শ্রবণ মাত্র আল্লাহর রাহে জেহাদের জন্য বের হয়ে পড়।[১]

ইমাম জুহরী (রঃ) লিখেছেন, হরত সাঈদ এবনে মোসাইয়াব (রঃ)–এর একটি চোখ অকেজো হয়ে যায় এই অবস্থায় তিনি জেহাদের জন্য বের হলেন। লোকেরা বললো, আপনিতো অসুস্থ আপনারতো জেহাদে অংশ গ্রহণ না করলেও চলে। তখন তিনি বলেনঃ আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا

তোমরা আল্লাহর রাহে বের হয়ে পড় হালকা অথবা ভারী অবস্থায় অর্থাৎ সুস্থ অথবা অসুস্থ অবস্থায়, আল্লাহ পাক সকলকে জেহাদে অংশ গ্রহণের আহবান জানিয়েছেন। যদি আমার দ্বারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা সম্ভব নাও হয় তবে আমি

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড–৫, পৃষ্ঠা–২৯০–৯১
তফসীরে কবীর, খন্ড–১৬, পৃষ্ঠা–৬৯–৭০
তানবিরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা–১৫৮
খোলাসাতুত্‌তাফাসীর, খন্ড–২, পৃষ্ঠা–২৩৭

মুসলমানদের দল ভারী করার উপকরণ হতে পারি, আর মুসলমানদের মালপত্র হেফাজত করতে পারে।

আতা খোরাসানী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এই আয়াতের আদেশকে আল্লাহ পাক

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً

আয়াত দ্বারা বাতিল করেছেন।

তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, যখন এই আয়াত নাজিল হলো তখন মানুষের জন্য তা অত্যন্ত কঠিন মনে হলো। তখন আল্লাহ পাক এই সাধারণ আদেশকে একটা বিশেষ আদেশের মাধ্যমে বাতিল করেন সে আয়াত হলো

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى

জেহাদে শরীক হওয়ার আহবান

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, এ আয়াতে সকল মুসলমানকে কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদে অংশ গ্রহণের আহবান জানানো হয়েছে। মন চায় বা না চায় এই অভিযান সহজ মনে হোক বা কঠিন, কেউ বৃদ্ধ হোক বা অসুস্থ, যুবক বৃদ্ধ সকলকেই এ অভিযানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথী হওয়া উচিত।

হযরত আবু তালহা (রাঃ) আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন। তিনি আয়াতে বর্ণিত আদেশ মোতাবেক সিরিয়া গমন করেন এবং নাসারাদের সঙ্গে জেহাদ করে অবশেষে শাহাদত বরণ করেন।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, একবার তিনি পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করার সময় এ আয়াতে পৌঁছে বলেন, আমার মনে হয় আমাদের প্রতিপালক তো বৃদ্ধ যুবক সকলকেই জেহাদের আহবান করেছেন। আমার প্রিয় সন্তানেরা, আমার জন্য তোমরা ব্যবস্থা কর, আমি সিরিয়ার জেহাদে অংশ গ্রহণের জন্য অবশ্যই যাব। তাঁর সন্তানেরা বললোঃ আব্বাজান, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তাঁর নেতৃত্বে আপনি জেহাদ করেছেন। এরপর হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খেলাফতের আমলে আপনি মুজাহিদদের সঙ্গে ছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ)-এর যুগেও জেহাদী প্রেরণার

জন্যে আপনার খ্যাতি ছিল। এখন আপনার বয়স জেহাদের উপযোগী রয়নি, আপনি বাড়ীতে বিশ্রাম গ্রহণ করুন, আমরা আপনার পক্ষ থেকে জেহাদের জন্য বের হয়ে বীর বিক্রমে জেহাদ করি। কিন্তু তিনি সন্তানদের এ কথা মানলেন না। আর তখনই বাড়ী থেকে বের হয়ে পড়লেন। সমুদ্র পার হওয়ার জন্যে নৌকায় আরোহন করলেন। কিন্তু পথেই ইন্তেকাল করলেন। ৯ দিন পর্যন্ত নৌকা চলতে থাকে। এর মধ্যে কোথাও মাটির সন্ধান পাওয়া যায়নি, যেখানে তাঁকে দাফন করা যায়। ৯ দিন পর তীর পাওয়া গেল। তখন তাঁকে দাফন করা হলো। এর মধ্যে লাশের কোন বিকৃতি ঘটেনি; বরং যেমনটি ছিল তেমনই রইল।(রাজিয়াল্লাহু আনহু)

অনেক তফসীরকার আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদে অংশ গ্রহণের যে আহবান রয়েছে তাতে শরীক হতে হবে সকলকে, সকল অবস্থার লোককে। যুবক হোক কি বৃদ্ধ, ব্যস্ত হোক কি অবসর, ধনী হোক কি দরিদ্র, দুর্বল হোক কি সবল, হালকা হোক কি ভারী, অবিবাহিত হোক কি বিবাহিত– এক কথায় সকলকে কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদে অংশ গ্রহণ করতে হবে।[১]

وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ

"আল্লাহর রাহে সম্পদ ও জীবন দিয়ে জেহাদ কর" অর্থাৎ যেভাবে সম্ভব অর্থ সম্পদ দিয়ে হোক অথবা জীবন দিয়ে হোক আল্লাহর রাহে জেহাদে অংশ গ্রহণ কর। আর এটিই তোমাদের জন্যে উত্তম পন্থা। যদি তোমরা তা বুঝতে পার তথা যদি তোমরা ভাল মন্দের পার্থক্য উপলব্ধি করতে পার তবে এ সত্য অবশ্যই উপলব্ধি করবে যে, তোমাদের জন্য জেহাদের পথই হলো কল্যাণকর।

ইমাম রাজী (রঃ) এই আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ) বদরের যুদ্ধে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গী হয়েছিলেন এবং এরপর কোন জেহাদে তিনি অনুপস্থিত ছিলেন না। তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করে বলতেন, আলোচ্য আয়াতে হালকা বা ভারী উভয় অবস্থায় জেহাদে অংশ গ্রহণের নির্দেশ রয়েছে, আর এই দু' অবস্থার যে কোন অবস্থায় আমি থাকি, তাই আমাকে অবশ্যই জেহাদে যেতে হবে।

সফওয়ান এবনে আমের বর্ণনা করেন, আমি হেম্মাসের শাসনকর্তা ছিলাম। আমি দেখলাম দামেস্কবাসী একজন বুজুর্গ জেহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন। আমি বললামঃ হে পিতৃব্য! বয়োবৃদ্ধ হওয়ার কারণে আপনি আল্লাহ পাকের দরবারে মাজুর। তখন তিনি আমাকে বললেনঃ হে ভ্রাতুষ্পুত্র! আল্লাহ পাক এ আয়াতে হালকা বা ভারী উভয় অবস্থায় জেহাদে অংশ গ্রহণের আদেশ দিয়েছেন।[২]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), খন্ড–১১, পৃষ্ঠা–৬০

১। তফসীরে কবীর, খন্ড–১৬, পৃষ্ঠা–৭০

আলোচ্য আয়াতে মোমেনদের প্রতি জীবন ও সম্পদ দ্বারা জেহাদ করার আদেশ রয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের জন্য চাঁদা দেয়ার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামকে অনুপ্রাণিত করেছেন। তাই সর্ব প্রথম হযরত আবু বকর (রাঃ) চার হাজার দেরহাম পেশ করেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ পরিবার বর্গের জন্য কি রেখে এসেছেন?

হযরত আবু বকর (রাঃ) আরজ করলেনঃ আমি তাদের জন্য শুধু আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের পবিত্র নাম রেখে এসেছি।

হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর সম্পদের সমান অর্ধেক নিয়ে এসেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ পরিবার বর্গের জন্য কিছু কি রেখে এসেছেন?

হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করলেন, জি হ্যাঁ, যতখানি নিয়ে এসেছি, ততখানিই রেখে এসেছি।

হযরত আব্বাস (রাঃ), হযরত তালহা এবনে ওবায়েদুল্লাহ এবং হযরত সাদ এবনে ওবায়দাকে যান বাহন সরবরাহ করেছেন। হযরত আবদুর রহমান বিন আওফও দুই শত উকিয়া স্বর্ণ পেশ করেছেন।

হযরত আসেম এবনে আদি ৯০ ওয়াসক খেজুর দিয়েছেন। (এক ওয়াসক হলো এক ছা, আর এক ছা হলো প্রায় চার সেরের সমান)

হযরত ওসমান (রাঃ) সৈন্যবাহিনীর এক তৃতীয়াংশের ব্যয় ভার বহন করেছেন। তাই লোকেরা বলতোঃ হযরত ওসমান (রাঃ) এই সেনাবাহিনীর সকল প্রয়োজনের আয়োজনকরেছেন।

মোহাম্মদ ইউসুফ সালেহী লিখেছেন, তাবুকে সৈন্য সংখ্যা ৩০ হাজারের কিছু বেশী ছিল। এর দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, হযরত ওসমান (রাঃ) দশ হাজার সৈন্যের যাবতীয় আসবাব পত্রের ব্যবস্থা করেছেন। আবু ওমর "আদ্ দোরার"–এ লিখেছেন, হযরত ওসমান (রাঃ) ৯০০ উষ্ট্র, একশত অশ্ব এবং যাবতীয় আসবাব পত্র দিয়েছেন।

ইবনে ইসহাক লিখেছেন, হযরত ওসমান (রাঃ) এই সেনা বাহিনীর প্রস্তুতিতে এত সম্পদ ব্যয় করেছেন যা আর কেউ করেনি।

এবনে হেশাম লিখেছেন, হযরত ওসমান (রাঃ) তাবুকের যুদ্ধের জন্য দশ হাজার দেরহাম ব্যয় করেছেন।

মোহাম্মদ ইউসুফ সালেহী লিখেছেন, যান বাহনের খরচ ব্যতীত আরো দশ

হাজার দেরহাম ব্যয় করেছেন। এ জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত ওসমান (রাঃ)–এর জন্য এ দোয়া করেছেনঃ হে আল্লাহ! ওসমানের প্রতি তুমি রাজী থাক, আমি তার প্রতি রাজী হয়েছি।

ইমাম আহমদ, তিরমিজি এবং বায়হাকী হযরত আবদুর রহমান এবনে সামুরার সূত্রে লিখেছেন, হযরত ওসমান (রাঃ) এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা এনে হুজুর সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করলেন।

তিনি ঐ স্বর্ণ মুদ্রাগুলো দাস্তে মোবারক দ্বারা নাড়াচাড়া করে এরশাদ করলেনঃ আজকের পর ওসমান যে আমলই করুক তার ক্ষতি হবে না (অর্থাৎ কোন আমলের গুণাহ হবে না)

এবনে আকাবা বর্ণনা করেন, মোনাফেকরা তাবুকের যুদ্ধে যায়নি। কেননা তাদের ধারণা ছিল হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করবেন না। (যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রত্যাবর্তন করলেন তখন) তারা নিজেদের মিথ্যা ওজর পেশ করলো।[১]

(অর্থাৎ আমরা এ কারণে জেহাদে শরীক হতে পারিনি)

মোহাম্মদ এবনে ওমর বর্ণনা করেন, কিছু সংখ্যক মোনাফেক হুজুর সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে তাবুক যুদ্ধে শরীক না হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করার জন্য হাজির হলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে অনুমতি দিয়ে দিলেন। এদের সংখ্যা ৮০ জনের চেয়ে কিছু বেশী ছিল তাদের সম্পর্কেই নাজিল হয়েছে–

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَّسَفَرًا

ইমাম রাজীও (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে সেই মোনাফেকদের সম্পর্কে যারা তাবুকের যুদ্ধে শরীক হয়নি।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড–৫, পৃষ্ঠা–২৯২–৯৩
তফসীরে কবীর, খন্ড–১৬, পৃষ্ঠা–৭২

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে তাবুকের যুদ্ধের ব্যাপারে মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে প্রস্তুতির নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আর এ আয়াতে মোনাফেকদের জঘন্য আচরণ এবং তাদের অপরাধী মনের কুৎসিত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মানা বা ইসলামের জন্য ত্যাগ তিতিক্ষার পরিচয় দেয়া, ঈমানের প্রমাণ উপস্থাপিত করা বা সত্য ও ন্যায়ের জন্যে ত্যাগ তিতিক্ষার দৃষ্টান্ত পেশ করা আদৌ এ মোনাফেকদের কাম্য নয়, বরং তাদের কাম্য হলো পার্থিব স্বার্থ হাসিল করা এবং তাদের দানবীয় অর্থ লিপ্সা চরিতার্থ করা। তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে–

لَوْ كَانَ عَرَضًا

যদি অর্থ–সম্পদ হাতের কাছে পাওয়া যাবে এমন নিশ্চয়তা থাকতো, আর পথও সহজ সুগম হতো তবে মোনাফেকরা অবশ্যই (হে রসূল!) আপনার সাথী হতো। কিন্তু যেহেতু পথ দুর্গম, বিপদজনক, অভিযান অত্যন্ত কঠিন এবং ধন–সম্পদ লাভের আশাও নিশ্চিত নয়, তাই তারা তাবুকের জেহাদে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথী হয় নাই। বিভিন্ন টাল বাহানা করে এই অভিযান থেকে দূরে থাকে। আর যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অভিযান শেষে মদীনা মোনাওয়ারা প্রত্যাবর্তন করলেন তখন তারা মিথ্যা কৈফিয়ত পেশ করতে প্রয়াসী হয়। কিন্তু এ নির্বোধ লোকেরা বুঝে না যে, তাদের মিথ্যাবাদীতা আল্লাহ পাকের নিকট অজানা নয়, তাই আল্লাহ পাক পূর্বাহ্নেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অবগত করেছেন।

وَسَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ

অদূর ভবিষ্যতে তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, যদি আমাদের সাধ্য থাকতো তবে আমরা অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে এ অভিযানে শরীক হতাম।

يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ

এভাবে মিথ্যা শপথ করে তারা নিজেদেরকেই ধ্বংস করে, নিজেদের সর্বনাশই ডেকেআনে।

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ

আর আল্লাহ পাক ভালভাবেই জানেন, নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী, তাদের এ অভিযানে শরীক হওয়ার শক্তি ছিল কিন্তু তারা শরীক হয়নি এবং তারা মিথ্যা কৈফিয়ত পেশ করেছে।[১]

عَفَا اللّٰهُ
عَنْكَ ۚ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ
الْكٰذِبِيْنَ ﴿٤٣﴾ لَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ ۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٤﴾
اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ
قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ
لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً وَّلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيْلَ
اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ ﴿٤٦﴾ لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا زَادُوْكُمْ اِلَّا خَبَالًا
وَّلَاَ۠اَوْضَعُوْا خِلٰلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ ۗ
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ ۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٧﴾

তরজমা

(৪৩) (হে রসূল!) আল্লাহ পাক আপনাকে ক্ষমা করেছেন, কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী এ কথা আপনার নিকট সুস্পষ্টভাবে পরিজ্ঞাত না হওয়া পর্যন্ত কেন আপনি তাদেরকে অব্যাহতি দিলেন?

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৯৩

(৪৪) যারা আল্লাহ পাকের প্রতি এবং কেয়ামতের দিনের প্রতি বিশ্বাস করে তারা নিজেদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা জেহাদ করার ব্যাপারে অব্যাহতি লাভের জন্যে আপনার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেনা। আল্লাহ পাক মোত্তাকীনদের সম্পর্কে অবগত।

(৪৫) (হে রসূল!) আপনার নিকট শুধু তারাই অব্যাহতি প্রার্থনা করে যারা আল্লাহ পাক ও আখেরাতের দিনের প্রতি বিশ্বাস করেনা, তাদের অন্তর সমূহ সন্দিহান হয়ে রয়েছে, তারা নিজেদের সন্দেহের আবর্তে ঘোরপাক খাচ্ছে।

(৪৬) যদি তারা অভিযানে বের হওয়ার ইচ্ছা করতো তবে তজ্জন্য কিছুনা কিছু আয়োজনও করতো। কিন্তু তাদের অভিযাত্রা আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় ছিল না, তাই তিনি তাদেরকে বিরত রাখেন এবং তাদেরকে বলা হয় যারা বসে আছে তোমরা তাদের সাথে বসে থাক।

(৪৭) যদি তারা তোমাদের সাথে বের হতো তবে তারা তোমাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করতো, তোমাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির চেষ্টায় ছুটাছুটি করতো, আর তোমাদের মধ্যে রয়েছে তাদের চর, আর আল্লাহ পাক জালেমদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, তাবুকের যুদ্ধে অংশ গ্রহনের ব্যাপারে মোনাফেকরা মিথ্যা ওজর আপত্তি পেশ করে অব্যাহতি প্রার্থনা করেছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের ছল চাতুরী বুঝতে পেরেও তাদেরকে অব্যাহতি দিয়েছেন। কেননা যুদ্ধ ক্ষেত্রে এমন ধরণের লোক অধিকতর ক্ষতির কারণ হতে পারে তাই তাদের ঘরে বসে থাকাই উত্তম।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করেছেনঃহে রসূল। আপনি তাদেরকে তাবুকের অভিযানে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে কেন অব্যাহতি দিলেন? যদি তাদেরকে অব্যাহতি না দিতেন, তবে ভাল হতো কেননা, অব্যাহতি না দিলেও তারা যুদ্ধে যেতনা, ফলে তাদের মনের মুখোশ সুস্পষ্ট ভাবে মানুষের সম্মুখে প্রকাশ পেত, কে সত্যিকার মোমেন, আর কে মিথ্যাবাদী এ বিষয়টি নগ্নভাবে ধরা পড়তো, অব্যাহতি দেয়ার কারণে তাদের ছল চাতুরী জন সম্মুখে প্রকাশ পেলনা তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ

হে রসূল! কেন তাদেরকে অনুমতি দিলেন? কিন্তু এ প্রশ্ন করার আগে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ

"আল্লাহ পাক আপনাকে ক্ষমা করেছেন"–এই বাক্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসল্লামের ব্যাপারে পরবর্তী বাক্যে যে অভিযোগ আসতেছে তার পূর্বেই আল্লাহ পাক তাঁকে ক্ষমা করার কথা ঘোষণা করেছেন। এটি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসল্লামের উচ্চ মর্যাদার জীবন্ত স্বাক্ষর। আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এই বাক্যটি সম্পর্কে সুফিয়ান এবনে উয়াইনা বলেছেনঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসল্লামের প্রতি আল্লাহ পাকের দয়া মায়া কত বেশী এবং তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কি সুন্দর ব্যবস্থা এবাক্যে রয়েছে তা তত্ত্বজ্ঞানী মাত্রই উপলব্ধি করবেন। কেননা অভিযোগ প্রকাশের পূর্বেই আল্লাহ্ পাক তাঁর তরফ থেকে ক্ষমা ঘোষণা করেছেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) আরো লিখেছেন, যদি এই পন্থায় ক্ষমা ঘোষণা করা না হতো তথা অভিযোগ আগে পেশ করা হতো তবে হয়ত আল্লাহ পাকের ভয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের আশংকা ছিল। কেননা, তাঁর অন্তরে আল্লাহর ভয় ছিল অত্যন্ত বেশী। এজন্যে আল্লাহ পাক এভাবে অভিযোগ আনয়নের পূর্বেই ক্ষমা ঘোষণা করেছেন।১

এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য তাহলো عفو বা ক্ষমা শব্দ দেখেই পাপের অস্তিত্ব আছে বলে মনে করা উচিত নয়। পাপ বা অপরাধ যেখানে নেই সেখানেও এমন ভাষা ব্যবহার করা হয়। এখানে শুধু কথা এতটুকুই যে, অতি উত্তমকে পরিহার করে শুধু উত্তমকে গ্রহণ করা হয়েছে, আর এ কারণেই আল্লাহ পাক এ কথা এরশাদ করেছেন। মোনাফেকদেরকে অনুমতি দেয়ার মধ্যে কোন পাপ কাজ হয়নি, অবশ্য অনুমতি না দিলে আরো ভাল হতো।

হাকীমুল উম্মত মাওলানা থানবী (রঃ) লিখেছেন, যেভাবে আলোচ্য আয়াতে অভিযোগ আনয়নের পূর্বেই আল্লাহ পাক নিজের তরফ থেকে ক্ষমা ঘোষণা করেছেন ঠিক এ পন্থাই তিনি তাঁর অন্যান্য প্রিয় বন্দাদের ব্যাপারেও অবলম্বন করেন। কোন কোন প্রিয় বন্দাকে তিনি হয়ত শাসনও করেন এবং তার মাঝেও দয়ামায়া করতে থাকেন। হযরত থানবী (রঃ) আরো লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে মুর্শিদদের জন্য এই শিক্ষা রয়েছে যে, মুরিদদের ওজর আপত্তি গ্রহণের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা এবং ওজর সঠিক কিনা তা লক্ষ্য রাখা।২

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড–৫, পৃষ্ঠা–২৯৪

২। তফসীরে বয়ানুল কোরআন, খন্ড–১, পৃষ্ঠা–৩৯৯

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ বাক্যটির তাৎপর্য হলো যখন মোনাফেকরা আপনার নিকট যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলো আপনি সঙ্গে সঙ্গে অনুমতি কেন দিলেন? বরং যদি অপেক্ষা করতেন তবে তাদের মুখোশ খুলে যেত, তাদের আসল চেহারা জন সাধারণের নিকট প্রকাশ পেত।

কাজী ইয়াজ এই আয়াত সম্পর্কে লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে শব্দটি মাগফেরাত তথা গুণাহ মাফ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। এর দৃষ্টান্ত হলো যেমন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

عفا الله لكم عن صدقة الخيل والرقيق

আল্লাহ পাক অশ্ব এবং বাঁদী গোলামের জাকাত আদায়ের ব্যাপারে তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন অর্থাৎ এ সবের জাকাত আদায় করা তোমাদের উপর ওয়াজেব নয়।

কাজী ইয়াজ আরো লিখেছেন, যারা বলেন এই বক্যের অর্থ হলো গুণাহ মাফ করা তারা মূলতঃ আরবী ভাষা সম্পর্কে অবগত নন, বরং এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক আপনার এ কাজকে গুণাহ বলে স্বাব্যস্ত করেননি।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এই আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীবের সঙ্গে কত মধুর এবং হৃদ্যতাপূর্ণ পন্থায় কথা বলেছেন তার দৃষ্টান্ত এই বাক্যটি যে, অভিযোগ অনুযোগ পেশ করার পূর্বেই মাফ করার কথাও ঘোষণা করেছেন। আর যে বিষয়ে অনুমতি দেয়ার কারণে এ অভিযোগ সে অনুমতির ব্যাপারেও সূরায়ে 'নূর'–এ এরশাদ করেছেনঃ

فَاِذَا اسْتَاْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَاْنِهِمْ

"হে রসূল! যদি তারা আপনার নিকট কোন কাজের জন্যে অনুমতি প্রার্থনা করে তবে আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকেই অনুমতি দিতে পারেন।" এই আয়াত সে সব লোকদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে যারা পরস্পর এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা কর। যদি অনুমতি পাওয়া গেল তবে ভাল, আর যদি অনুমতি নাও পাওয়া গেল তবুও আমরা যাব না। তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, "আপনি কেন তাদেরকে অনুমতি দিলেন?" কেননা অনুমতি না দিলে

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড–৫, পৃষ্ঠা–২৯৪
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত–আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড–৩, পৃষ্ঠা–৩৪৮.

এতটুকু উপকার হতো যে, কে মিথ্যাবাদী, কে সত্যবাদী তা সকলেই দেখতে পেত, যাদের মধ্যে ঈমান আছে তারা অবশ্যই জেহাদের জন্য উপস্থিত হতো, আর যাদের মধ্যে ঈমান নেই তারা আত্মগোপন করতো। আর এভাবে ভাল মন্দের মধ্যে পার্থক্য করা সকলের পক্ষেই সম্ভব হতো।১

حَتّٰى يَتَبَيَّنَ

অর্থাৎ আপনি কেন তাদেরকে অনুমতি দিলেন? । আপনার নিকট তাদের মধ্যে কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত;

এই আয়াতের তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, তখন পর্যন্ত হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মোনাফেকদেরকে চিনতেন না।

এবনে জরীর আমর এবনুল মায়মুনের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দু'টি কাজ এমন করেছেন যে সম্পর্কে ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোন আদেশ তাঁকে প্রদত্ত হয়নি, তন্মধ্যে একটি হলো মোনাফেকদেরকে জেহাদে শরীক না হওয়ার অনুমতি প্রদান, আর দ্বিতীয়টি হলো বদরের যুদ্ধের বন্দীদেরকে মুক্তিপন নিয়ে ছেড়ে দেয়া। এই দু'টি বিষয়েই পরে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে পথ-নির্দেশ করেছেন।

لَا يَسْتَأْذِنُكَ

অর্থাৎ হে রসূল। যারা আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান রাখে, যারা আখেরাতের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস রাখে তথা যারা খাটি মোমেন তারা কোন দিনও আপনার নিকট জেহাদ থেকে অব্যাহতি লাভের অনুমতি প্রার্থনা করবেনা। কেননা যে প্রকৃত মোমেন তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ করা। প্রকৃত মোমেন আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করেই শান্তি লাভ করে। আর আল্লাহ পাক সে সব লোকদেরকে খুব ভালভাবেই জানেন যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং পরহেজগারী অবলম্বন করে।

মূলতঃ জেহাদে অংশ গ্রহণ থেকে অব্যাহতি লাভের অনুমতি শুধু তারাই প্রার্থনা করবে যারা আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস করে না এবং আখেরাতের প্রতিও ঈমান আনে না, তাদের অন্তর সন্দেহের ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তারা নিজেরাও সিদ্ধান্ত

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৬২

করতে পারে না যে, তাদের করণীয় কি? কোন সময় তারা মুসলমানদের সঙ্গে এ আশায় জেহাদে যেতে চায় যে, যদি মুসলমানগণ সফলকাম হয় তবে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশীদার হওয়া যাবে। আর কখনও তারা জেহাদে শরীক হতে চায় না যেমন তাবুকের যুদ্ধে তারা শরীক হতে ইচ্ছুক হয়নি। কেননা তাদের ধারণা ছিল হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রোমের সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধ করে মদীনা শরীফ প্রত্যাবর্তন করতে পারবেন না।

তফসীরকারগণ বলেছেন, মোমেনদের ও মোনাফেকদের আলোচনায় ঈমান থাকা না থাকার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জেহাদের প্রতি আকর্ষন ঈমানেরই ফলশ্রুতি, যেন পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দগীতে এর সওয়াব বা শুভ পরিণতি পাওয়া যায়। এজন্য মোমেন মাত্রই জেহাদকে একটি সুবর্ণ সুযোগ মনে করে। আর ঈমানের অভাব জেহাদ বর্জনে প্ররোচিত করে। কেননা ঈমানের অভাবে আখেরাতে সওয়াব পাওয়ার কোন আশা থাকে না। এরপর এরশাদ হয়েছে–

وَلَوْ اَرَادُوْا ·

যদি এই মোনাফেকদের তাবুকের জেহাদে অংশ গ্রহণের কোন প্রকার ইচ্ছা থাকতো তবে তার জন্যে তারা কিছু না কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করতো। জেহাদের আসবাবপত্র, যথা অস্ত্র শস্ত্র অশ্ব বা উষ্ট্র প্রভৃতির ব্যবস্থা গ্রহণ করতো, মূলতঃ আল্লাহ পাক তাবুক অভিযানে তাদের অংশ গ্রহণ পছন্দ করেননি। তাই এর জন্য তাদেরকে তওফিক দান করেননি। তাদেরকে বলা হয়েছে পঙ্গু লোকদের ন্যায় যারা ঘরে বসে আছে তোমরাও তাদের সাথে ঘরে বসে থাক। এ কথাটির তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, মোনাফেকদের জেহাদে অংশ গ্রহণের কোন ইচ্ছাই ছিল না। যদি ইচ্ছা থাকতো তবে তারা এর জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করতো। কিন্তু এর কোন লক্ষণ তাদের মধ্যে দেখা যায়নি। মূলতঃ আল্লাহ পাক তাদের জেহাদে অংশ গ্রহণ আদৌ পছন্দ করেননি তাই তাদেরকে তওফিক প্রদান করেননি। আর যেভাবে অসুস্থ পঙ্গু লোকেরা, মহিলা এবং শিশুরা ঘরে বসে থাকে তাদেরকে বলা হয়েছে তোমরাও এভাবে ঘরে বসে থাক।

তাবুক অভিযান

নবম হিজরীর রজব মাসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফ থেকে বের হলেন সানিয়াতুল বেদায়ে সেনা বাহিনীর ছাউনী তৈরী হলো। ৩০

হাজারের চেয়ে কিছু বেশী সাহাবী এই জেহাদে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গী হলেন। মোহাম্মদ এবনে এসহাক এবং মোহাম্মদ এবনে আমর এবনে সাদ সৈন্যদের এই সংখ্যাই বর্ণনা করেছেন। হাকেম বলেছেন, এদের মধ্যে দশ হাজার অশ্বারোহী ছিলেন। আবদুর রাজ্জাক এবং এবনে এসহাক বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাবুকের উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফ থেকে বৃহস্পতিবার রওয়ানা হয়েছিলেন, আর বৃহস্পতিবার রওয়ানা হওয়াই তিনি পছন্দ করতেন।

এবনে হেশামের বর্ণনা হলো এই–মদীনা মোনাওয়ারায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মোহাম্মদ এবনে মোসলেমা আনসারীকে তাঁর স্থলাভিসিক্ত করে গিয়েছেন। আবু ওমর বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আলী এবনে আবু তালেবকে মদীনা মোনাওয়ারায় তাঁর স্থলাভিসিক্ত করেছিলেন। আবদুর রাজ্জাক হযরত সাদ এবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)–এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাবুকে রওয়ানা হলেন তখন তিনি মদীনা মোনাওয়ারায় হযরত আলী (রাঃ)–কে তাঁর স্থলাভিসিক্ত নিযুক্তকরেছেন।

মোহাম্মদ এবনে এসহাক বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ)–কে তাঁর স্থলে আহলে বয়তের দেখাশুনার দায়িত্ব অর্পন করেছেন। মোনাফেকরা এই ঘটনাকে ফেৎনা সৃষ্টি করার কাজে ব্যবহার করে। তারা বলতে শুরু করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলী (রাঃ)–এর প্রতি অসন্তুষ্ট। এজন্য তাঁকে সঙ্গে রাখা পছন্দ করেননি। হযরত আলী (রাঃ) মোনাফেকদের এ কথা সম্পর্কে অবগত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে হাতিয়ার নিয়ে বের হয়ে পড়েন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে পৌছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন জরফ নামক স্থানে ছিলেন।

হযরত আলী (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মোনাফেকদের কথা সম্পর্কে অবহিত করলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ মোনাফেকরা মিথ্যাবাদী, আমি তোমাকে শুধু তাদের দেখাশুনার জন্য আমার স্থলে রেখে এসেছি, যারা আমার পরে রয়ে গেছে। অতএব, তুমি আমার স্থলে আমার এবং তোমার পরিবার বর্গের দেখা–শুনা কর। হে আলী! তুমি কি এ কথার উপর সন্তুষ্ট নও যে, তুমি আমার নিকট এমন হও যেমন মুসার নিকট হারুন ছিলেন। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, আমার পরে কোন নবী হবে না।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মোতাবেক হযরত আলী (রাঃ) মদীনা শরীফ প্রত্যাবর্তন করেন।

(বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ)

মোনাফেকদের নেতা আবদুল্লাহ এবনে উবাই তার মোনাফেক সঙ্গীদেরকে নিয়ে মদীনা মোনাওয়ারার নিচু এলাকা জোবাব নামক স্থান পর্যন্ত গিয়েছেল। কিন্তু যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাবুক হওয়ানা হলেন, তখন সে মদীনা শরীফ প্রত্যাবর্তন করে বললোঃ মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এমন গরমের সময় এত দীর্ঘ এবং দুর্গম পথ অতিক্রম করে বনীল আসফারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চলেছেন, যার শক্তি তাদের নেই। তারা বনীল আসফারের সঙ্গে লড়াই করা খেলা মনে করছে। আল্লাহর শপথ! আমিতো দেখছি তার সাথীরা বন্দী হয়ে যাবে। আবদুল্লাহ এবনে উবাই এমন সব উদ্ভট ভিত্তিহীন গুজব রটিয়ে মুসলমানদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়ার অপচেষ্টা করে। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا زَادُوْكُمْ اِلَّا خَبَالًا

অর্থাৎ যদি এই মোনাফেকরা তোমাদের সাথে যুদ্ধের জন্য গমনও করতো তবে অশান্তি সৃষ্টি করা ব্যতীত কোন কাজ করতা না। যুদ্ধের সময় গুজব রটিয়ে মুসলমানদের মনোবল ভেঙ্গে কাফেরদেরকে সাহায্য করতো এবং মুসলমানদেরকে ধোকা দিত অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে তারা তো সর্বদাই ফেৎনা ফাসাদ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয় কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে তারা আরো বেশী অশান্তি সৃষ্টি করতো শুধু তাই নয়, বরং

وَّلَاۡاَوْضَعُوْا خِلٰلَكُمْ

তারা তোমাদের মধ্যে ছুটাছুটি করবে অর্থাৎ দ্রুত এখান থেকে সেখানে যাবে এবং চোগোলখোরী করবে, নিজেরা পরাজিত হয়ে মুসলমানদের মনোবল বিনষ্ট করতে সচেষ্ট হবে।

কোন কোন তফসীরকার এই বাক্যটির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে, তারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে কলহ দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে।

يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ

অর্থাৎ তারা তোমাদের মধ্যে ফেৎনা সৃষ্টি করার অপচেষ্টা করবে। তোমাদের পরস্পরের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করে এবং তোমাদের অন্তরে দুশমনের ভয় সৃষ্টি করে এভাবে মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের অপচেষ্টা করবে।

وَفِيكُمْ سَمَّٰعُونَ لَهُمْ ط

আর এখনও তোমাদের মধ্যে তাদের কিছু চর রয়েছে যারা তাদের পক্ষ হয়ে তোমাদের কথা শ্রবণ করে এবং তাদের নিকট তা পৌঁছায়। আলোচ্য বাক্যটির এই অর্থ বর্ণনা করেছেন হযরত কাতাদা (রঃ)।এ বাক্যটির আর একটি অর্থ হলো তোমাদের মধ্যে এমন কিছু দুর্বল লোক রয়েছে যারা তাদের কথা শ্রবণ করে এবং মেনে চলে।

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّٰلِمِينَ

আর আল্লাহ পাক জালেমদেরকে খুব ভাল ভাবেই জানেন, তাদের মনের গোপন কথা এবং তাদের তৎপরতা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ন ওয়াকেফহাল। তাই তাদের কেউ আল্লাহ পাকের শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে না।

لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوْا
لَكَ الْاُمُوْرَ حَتّٰى جَآءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَ
مِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَلَا تَفْتِنِّيْ ؕ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ؕ
وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ ۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿٤٩﴾ اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ
تَسُؤْهُمْ ۚ وَاِنْ تُصِبْكَ مُصِيْبَةٌ يَّقُوْلُوْا قَدْ اَخَذْنَاۤ اَمْرَنَا
مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَّهُمْ فَرِحُوْنَ ﴿٥٠﴾ قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَاۤ اِلَّا مَا
كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلٰىنَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿٥١﴾
قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَاۤ اِلَّاۤ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ؕ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ
بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖۤ اَوْ بِاَيْدِيْنَا ۖ
فَتَرَبَّصُوْۤا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ ﴿٥٢﴾

তরজমা

(৪৮) নিশ্চয়ই তারা পূর্ব থেকেই ফেৎনা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। (হে রসূল!) আপনার কাজ পন্ড করতে তারা ছিল স্বচেষ্ট, অবশেষে আল্লাহ পাকের সত্য ওয়াদা এসেছে এবং আল্লাহ পাকের হুকুমই প্রবল হয়েছে, অবশ্য তারা অসন্তুষ্টই রয়েছে।

(৪৯) এবং তাদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা বলে আমাকে (জেহাদ থেকে) অব্যাহতি দান করুন এবং আমাকে বিপদে ফেলবেন না। সাবধান! তারা নিজেরাই বিপদে পড়ে আছে, দোজখতো কাফেরদেরকে পরিবেষ্টন করেই আছে।

(৫০) (হে রসূল!) যদি আপনার কোন মঙ্গল হয় তবে তাদের খারাপ লাগে, আর যদি আপনার কোন বিপদ আসে তবে তারা বলে আমরা আমাদের কাজ পূর্বেই সেরে নিয়েছি এবং উল্লাসিত অবস্থায় তারা ফিরে যায়।

(৫১) (হে রসূল!) আপনি বলে দিন আল্লাহ পাক আমাদের জন্য যা লিখে দিয়েছেন তা ব্যতীত কিছুই আমার নিকট পৌছবার নয়। তিনিই আমাদের অভিভাবক, আর আল্লাহ পাকের প্রতিই মোমেনদের ভরসা করা উচিত।

(৫২) (হে রসূল!) আপনি বলে দিন তোমরা আমাদের দু'টি মঙ্গলের একটির অপেক্ষা করছ এবং আমরা অপেক্ষা করছি যে, আল্লাহ পাক তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে সরাসরি শাস্তি দেবেন অথবা আমাদের হাতে, অতএব, তোমরা অপেক্ষা কর আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে রয়েছে যে, তাবুকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে মোনাফেকরা তাদের আসল চেহারা দেখিয়ে দেয়। চরম গরম এবং অন্যান্য ওজর আপত্তি দেখিয়ে তারা তাবুকের অভিযান থেকে অব্যাহতি লাভের জন্যে নিবেদন করে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের নিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরকে অব্যাহতি দান করেন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, মোনাফেকদের ধোকাবাজি, ছলচাতুরী, নতুন কিছু নয়; বরং ইতিপূর্বেও তারা ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে থাকে। ইসলামের বিজয় অভিযানকে প্রতিহত করার অপচেষ্টা তারা সর্বদাই করে। মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের অপচেষ্টায় তারা সর্বক্ষণ লিপ্ত থাকে। ওহোদের যুদ্ধে মুসলমানদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়ার লক্ষ্যে মোনাফেক সরদার আবদুলাহ এবনে উবাই এবনে সলুল তার তিনশত মোনাফেক সাথী নিয়ে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বক্ষনে সরে দাড়ায়। অতএব, আজ যদি তাবুকের যুদ্ধে তারা শরীক না হয় তবে তা আদৌ বিশ্ময়কর ব্যাপার নয়। তারা মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের যত চেষ্টাই করুক না কেন আল্লাহ পাক তাদের শাস্তি বিধান করবেন, ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন এবং তাদের পরিণাম হবে শোচনীয়, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ

অর্থাৎ এই মোনাফেকরা ইতপুর্বেও অশান্তি সৃষ্টি করার অপচেষ্টা করেছে,আপনার সত্য-সাধনাকে ব্যর্থ করতে চক্রান্ত করেছে।

حَتّٰى جَآءَ الْحَقُّ

অবশেষে যখন সত্য উদ্ভাসিত হয়েছে, আল্লাহ পাকের আদেশ প্রাধান্য বিস্তার করেছে অপ্রতিহতভাবে, ইসলামের বিজয় যাত্রা এগিয়ে চলেছে, বদরের যুদ্ধে কাফেরদের তথাকথিত নেতারা ধরাশায়ী হয়েছে, তখন এই মোনাফেকরা উপলব্ধি করলো যে, ইসলামকে এভাবে আর বাধা দেয়া যাবে না। তাই তারা মুখে ঈমানের কথা প্রকাশ করতে থাকে, কিন্তু অন্তরে ইসলামের বিরুদ্ধে হিংসা এবং শত্রুতা পোষণ করতে থাকে। ইসলামের অগ্রযাত্রা দেখে তাদের অন্তর জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।।

মোনাফেকদের চক্রান্ত

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক মোনাফেকদের অব্যাহত নাফরমানীর বিবরণ দিয়ে এরশাদ করেছেন যে, মোনফেকরা তাবুকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে নানা প্রকার মিথ্যা ওজর আপত্তি পেশ করছে। অথচ হে রসূল! এই মোনাফেকরা ইতিপূর্বেও আপনার সত্য-সাধনাকে ব্যর্থ করার জন্য কত চক্রান্ত করেছে। মদীনা শরীফে আপনার আগমনের পর থেকে সারা আরববাসী একত্রিত হয়ে প্রাণের মদীনা আক্রমন করে। আর এই সময়ে মদীনার ইহুদী এবং মোনাফেকরা ভেতর থেকে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, কিন্তু আল্লাহ পাক যখন বদরের যুদ্ধে মুসলমানদেরকে ঐতিহাসিক বিজয় দান করেছেন তখন তারা এ সত্য উপলব্ধি করে যে, প্রকাশ্যে মুসলমানদের মোকাবেলা করা যাবে না। তাই তারা মোনাফেকীর পথ অবলম্বন করে, মুখে তারা ঈমানের দাবীদার হয়, কিন্তু অন্তরে ইসলামের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে।[১]

وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ

অর্থাৎ-অবশেষে আল্লাহর সাহায্য আসবে এবং আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী হবে যদিও কাফেররা তাতে অসন্তুষ্ট হয়।

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي ۚ

মোনাফেকদের মধ্যে কোন কোন লোক এ কথা বলে যে, আমাকে এখানে থাকার অনুমতি দান করুন, আমাকে বিপদে ফেলবেন না। এ কথাটি বলেছিল যাদ এবনে কায়েস মোনাফেক। এবনুল মুনজের তেবরানী এবনে মরদাবীয়া এবং আবু নঈম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের সুত্রে, এবনে আবি হাতেম হযরত জাবের

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৬৩

এবনে আবদুল্লাহ (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, যাদ এবনে কায়েস নামক এই মোনাফেক (তার সাথীদের সংখ্যা দশ জনের চেয়ে কম ছিল) হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলো হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এখানেই থাকার অনুমতি দান করুন, আমার কিছু ক্ষেত খামার আছে যার দেখাশুনা করা আমার কর্তব্য, আমি একজন মাজুর। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি প্রস্তুতি গ্রহণ কর, হয়তো যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে বণিল আসফারের কোন স্ত্রীলোকও তোমার ভাগে পড়তে পারে। সে বললো, আমাকে এখানেই থাকতে দিন, আমাকে বিপদে ফেলবেন না। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার দিক থেকে চেহারা ফিরিয়ে নিলেন এবং তাকে অনুমতি দিলেন।

এই হাদীসে মোহাম্মদ এবনে আমর এতটুকু কথা সংযোজন করেছেন যে, যাদ এর পুত্র আবদুল্লাহ ছিলেন খাঁটি মোমেন, তিনি বদরে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এই ঘটনার পর আবদুল্লাহ তাঁর পিতাকে বললেন, আপনি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ফরমান কেন অমান্য করলেন? বনি সালমা গোত্রে আপনার চেয়ে সম্পদশালী আর কেউ নেই, আপনি নিজেও জেহাদে শরীক হচ্ছেন না, আর যারা শরীক হয় তাদেরকে যানবাহন দিয়েও সাহায্য করছেন না।

যাদ বললো, বৎস অত্যন্ত গরম এমন কঠিন সময়ে কিভাবে রুমীদের মোকাবেলায় যেতে পারি? এখনতো আমি আমার নিজের বাড়ীতে রয়েছি তুবওতো তাদের ভয় আমার অন্তরে রয়েছে, এমন অবস্থায় কিভাবে তাদের সাথে লড়াই করতে যেতে পারি? হে আমার পুত্র! আমি জমানার হালচাল বুঝি আমার অভিজ্ঞতা অনেক। তখন তার পুত্র আবদুল্লাহ কঠোর ভাষায় বললেন, আল্লাহর শপথ! আপনার যুদ্ধে না যাওয়ার আর কোন কারণ নেই এটি হল শুধু মোনাফেকী। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি কোন আয়াত নাজিল হবে তখন আপনার মোনাফেকী প্রকাশ পেয়ে যাবে তখন পিতা পুত্রের মুখের উপর পতাকা তুলে মারে। পুত্র চলে গেল, পিতার সাথে আর কোন কথা বলল না। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হল।

তেবরানী, এবনে মরদবিয়া এবং আবু নইমের বর্ণনা হলো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যাদ এবনে কায়েসকে বলেছেনঃ রুমীদের সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে তোমার কি ধারণা? সে বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ! নারী সমাজের প্রতি আমার দুর্বলতা অনেক, আমি রুমী নারীদের ফেৎনায় পড়ে যাব, তাই আমাকে এখানেই থাকতে দিন, আমাকে বিপদে ফেলবেন না।

তেবরানী অন্য একটি সুত্র থেকে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জেহাদ কর এবং গনিমতের মাল যা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে রূমী মেয়েদেরকে (বাঁদী হিসেবে) অর্জন কর। তখন কোন কোন মোনাফেক বললো, তিনি তোমাকে মেয়েদের লোভে ফাসিয়ে নিতে চান, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

وَلَا تَفْتِنِّىْ

অর্থাৎ–আমাকে বিপদে ফেলবেন না। কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন; এ বাক্যটির অর্থ হলো আমার পরিবারবর্গ এবং ধন–সম্পদের দেখাশুনার কেউ নেই, যদি আমি যুদ্ধে চলে যাই তবে আমার পরিবারবর্গের এবং ধন–সম্পদের ক্ষতি হবে, তাই আমাকে এই বিপদে ফেলবেন না, অথবা এর অর্থ হল রূমী মেয়েদের ফেৎনায় আমাকে ফেলবেন না।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেনঃ আমাকে আপনার সাথে না যাওয়ার অনুমতি দান করুন কেননা আপনি অনুমতি দিলে আমি যদি না যাই এমন অবস্থায় আমি গুণাহগার হয়ে যাব, কাজেই এমন ফেৎনায় আমাকে ফেলবেন না।[১]

ইমাম রাজী (রহঃ) বলেছেন, এর কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে–

(১) অর্থাৎ আমাকে বিপদে ফেলবেন না, কেননা যদি আপনি যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার অনুমতি না দেন আর আমি আপনার অনুমতি ব্যতীত বিরত থাকি তবে আমি মহাপাপী হয়ে যাব, তাই আমাকে গুণাহ বা পাপ কার্যের বিপদে ফেলবেন না।

২। আমাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবন না কেননা, তখন অত্যন্ত গরমের সময় এমন গরমে বের হওয়ার সাধ্য আমার নেই।

৩। যদি আমি তাবুক অভিযানে আপনার সাথে বের হই তবে আমার অর্থ–সম্পদ পরিবারবর্গ সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। অতএব, এমন বিপদে আমাকে ফেলবেন না।

اَلَا فِى الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا

(তারা বলেছে যে আমাদেরকে বিপদে ফেলবেন না)

অথচ তারা বিপদে পড়েই গেছে, কেননা আল্লাহর রসূলের নাফরমানীই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ বিপদ, আর তারা আল্লাহর নাফরমান হয়ে সেই বিপদে পড়েছে।[১]

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড–৫, পৃষ্ঠা–৩০০

১। তফসীরে কবীর, খন্ড–১৬, পৃষ্ঠা–৮৩–৮৪

মূলতঃ পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে মোনাফেকদের অবস্থা সাধারণভাবে বর্ণিত হয়েছে, আর এ আয়াতে বিশেষ বিশেষ মোনাফেকের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, যে বিশেষ মোনাফেকের অবস্থা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে তার নাম হলো জ'দ এবনে কায়েস। এই মোনাফেক হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে এ কথা বলেছিল যে, আমাকে বাড়ীতে থাকার অনুমতি দান করুন। আমাকে রোমে সংগে নিয়ে বিপদে ফেলবেন না, আল্লহ পাক এরশাদ করেছেনঃ "বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তারা তাবুক জেহাদে অংশ গ্রহণ থেকে অব্যাহতি চায় অথচ তারা বিপদে পড়েই গেছে।" কেননা, মোনাফেকী এবং কুফরী ও নাফরমানীর চেয়ে বড় বিপদ আর কি হতে পারে?

وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ

নিশ্চয়ই দোযখ কাফেরদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে। কেয়ামতের দিন দোজখ তাদেরকে ঘিরে রাখবে অথবা তাদেরকে এখনই দোজখ ঘিরে রেখেছে। কেননা দোজখে প্রবেশের কারণ হলো মোনাফেকী, আল্লাহর নাফরমানী, যেভাবে তারা দুনিয়াতে মোনাফেকী এবং নাফরমানী থেকে বের হতে পারে না, ঠিক তেমনিভাবে আখেরাতেও দোজখ থেকে বের হতে পারবে না।[১]

এই আয়াতের তফসীরে ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেন, মোনাফেকদেরকে কেয়ামতের দিন দোজখ ঘিরে রাখবে, আর তাদের এই শাস্তির উপকরণ বর্তমানে তাদের মধ্যেই রয়েছে।

তত্ত্বজ্ঞানীগন বলেছেন, তারা আল্লাহর মারেফতের নূর থেকে বঞ্চিত ছিল, তাই তারা আল্লাহর প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, আসমানী কিতাব সমূহের প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস করেনি, তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল এই পার্থিব জীবনের অর্থ-সম্পদ এবং পদমর্যাদা লাভ করা। এরপর তারা মানুষের মধ্যে মোনাফেক হিসেবে কুখ্যাত হয়। তাই হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে তারা নানা প্রকার চক্রান্ত করতে থাকে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও ইসলামের দৈনন্দিন উন্নতি অগ্রগতি দেখে তারা হিংসানলে জ্বলতো। আর নিজেদের ব্যাপারে এবং নিজেদের অর্থ-সম্পদ ও সন্তান সন্তুতির ব্যাপারে তারা সর্বদা ভীত সন্ত্রস্থ থাকতো। এক কথায় তারা হলো সকল আধ্যাত্মিক কল্যাণ থেকে

(১) তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৫০

চির বঞ্চিত, পরিণামে তারা থাকতো সর্বদা ভীত–সন্ত্রস্থ। আর ভয় ভীতি মূর্খতা অবাধ্যতা তাদের জন্য কাল হয়ে পড়েছিল। তাই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করেছেন, নিশ্চয়ই দোজখ কাফেরদেরকে ঘিরে রেখেছে।[১]

এই অবস্থা তথা তাদের শাস্তির সাত্যিকার অবস্থা যদিও পরিপূর্ণ ভাবে আখেরাতেই হবে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও দুনিয়াতেই কুফরী ও নাফরমানীর শাস্তি শুরু হয়ে যায়।[২]

إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ

এই আয়াতে মোনাফেকদের হিংসা বিদ্বেষ তথা–অসৎ চরিত্রের আরো একটি বিবরণ রয়েছে। মোনাফেকরা মুসলমানদের কোন প্রকার কল্যাণ, সাফল্য বা বিজয় দেখলে হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরতো। মুসলমানদের সাফল্য তাদের জন্য ছিল চরম কষ্টদায়ক, এমনকি অসহনীয়। কিন্তু মুসলমানদের কোন প্রকার বিপদ দেখা দিলে বা কোন মুসলমান শাহাদত বরণ করলে মোনাফেকদের আনন্দের সীমা থাকতো না। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ

(হে রসূল!) যদি আপনার কোন কল্যাণ সাধিত হয় তবে তারা দুঃখ পায়, পক্ষান্তরে যদি আপনার উপর কোন বিপদ আপতিত হয় তবে তারা বলে আমরা বোকা নই যে, অযথা প্রাণ দিয়ে দেব। তাই পূর্বাহ্নেই নিজেদের ব্যাপারে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি অর্থাৎ যুদ্ধে শরীক হয়নি, তাই আত্মরক্ষা করতে পেরেছি; যেমন ওহোদের যুদ্ধে মুসলমানদেরকে কঠিন বিপদের সন্মুখীন হতে হয়েছিল।

তখন মোনফেকরা রণাঙ্গন থেকে পলায়নের ব্যাপারে আনন্দিত হয়েছিল এবং বলেছিল আমরা পরিণামদর্শী হিসেবে এই বিপদ আসার পূর্বেই আত্মরক্ষা মূলক ব্যবস্থা করেছি।

মোনাফেকদের এ কথার জবাবে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا

১। তফসীরে মাজেদী, খন্ড–১, পৃষ্ঠা–৪০৭
২। তফসীরে কবীর, খন্ড–১৬, পৃষ্ঠা–৮৪

অর্থাৎ–হে রসূল! আপনি বলে দিন ভাল বা মন্দ যাই হোক তা আল্লাহর হুকুমেই হয়, আল্লাহর হুকুম ব্যতীত কোন কিছুই হয় না। আল্লাহ পাক যা আমাদের জন্য তকদিরে লিখে রেখেছেন তা বিজয় হোক বা শাহাদত বরণের সুযোগ হোক, তা অবশ্যই হবে। আমরা সুখে দুঃখে ভাল মন্দে আল্লাহ পাককেই একমাত্র মাবুদ, এক মাত্র স্রষ্টা ও পালন কর্তা, রিজিকদাতা, ত্রানকর্তা, সর্বময় ক্ষমতার অধিকর্তা মানি। তাঁর বিধি–নিষেধ মেনে চলি, একমাত্র তাঁর প্রতিই আমরা ভরসা করি, আর শুধু তাঁরই কাছে আমরা আশা করি।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করেছেন হযরত সোহাইব (রাঃ) তিনি এরশাদ করেছেনঃ মোমেনের অবস্থা বিস্ময়কর, তার প্রত্যেক কাজেই রয়েছে কল্যাণ।

এটি মোমেনের বৈশিষ্ট্য এই, যদি সে কোন সুখ স্বাচ্ছন্দ লাভ করে এবং তার জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে শোকর আদায় করে তবে এ সুখ তার জন্য কল্যাণকর হয়। পক্ষান্তরে যদি কোন কারণে মুসলমানের কোন দুঃখ হয়, আর সে তাতে সবর অবলম্বন করে তবে সে দুঃখও তার জন্য কল্যাণকর হয়।

(মুসলিম শরীফ, আহমদ)

বায়হাকী এই হাদীস হযরত সা'দ এবনে আবি ওয়াক্কাসের সূত্রে লিপিবদ্ধ করছেন–

هُوَ مَوْلٰىنَا ج

আল্লাহ পাকই আমাদের সাহায্যকারী, তিনিই আমাদের অভিভাবক, আর তিনি আমাদের জন্য যা কিছু লিখে রেখেছেন তার মধ্যেই রয়েছে আমাদের কল্যাণ। যদি দুনিয়াতে আমাদের কোন দুঃখ কষ্টও হয় তবে তিনি অবশ্যই তাকে আমাদের জন্য আখেরাতে অনন্ত অসীম সুখ শান্তির কারণ হিসেবে গ্রহণ করবেন. এবং আখেরাতে চির সুখ ও চির শান্তি দান করবেন।

এটিই আমাদের ঈমান বা অটল বিশ্বাস।[১]

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

আর মোমেনদের আল্লাহ পাকের প্রতিই ভরসা করা উচিত। আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কারো প্রতি ভরসা করা বা কারো নিকট আশা করা মোমেনের শানের খেলাফ।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড–৫, পৃষ্ঠা–৩০১

আল্লাহ পাক মহান দাতা, আল্লাহ পাকের দান অনন্ত অসীম, আর মহান দাতা আল্লাহ পাকের প্রতিই মোমেনের ভরসা। যেহেতু মোমেন মাত্রই এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাই মোমেনের একান্ত কর্তব্য হলো এক আল্লাহ পাকের প্রতিই ভরসা করা, এটি ঈমানের দাবী। পক্ষান্তরে যারা মোনাফেক তারা ক্ষণস্থায়ী জীবনের বিভিন্ন উপকরণের উপর ভরসা করে থাকে।

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَآ اِلَّآ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ط

হে রসূল! আপনি বলে দিন তোমরা আমাদের ব্যাপারে দু'টি কল্যাণের মধ্যে একটি কামনা করতে পার যুদ্ধে আমাদের মৃত্যু হবে; অথচ যে মৃত্যুকে তোমরা আমাদের জন্য অকল্যান মনে কর তা প্রকৃত অবস্থায় আমাদের জন্যে অতীব কল্যানকর বিষয়, কেননা মৃত্যুর মাধ্যমেই শাহাদতের দুর্লভ সুযোগ পাওয়া যায়।

হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে জেহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়, আর তার বের হওয়ার কারণ আল্লাহ পাকের প্রতি ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান ব্যতীত আর কিছু না হয়, (কোন পার্থিব লোভ লালসা যথা দেশের ক্ষমতা লাভ বা সম্পদ অর্জন প্রভৃতি না হয়) তবে আল্লাহ পাক ওয়াদা করেছেন যে, তাকে সওয়াব এবং সম্পদ সহ ফেরৎ দেবো অথবা শাহাদতের মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। অর্থাৎ দু'টি বিষয়ের একটি অবশ্যই দান করবো। বিজয় অথবা জান্নাত।

এ পর্যায়ে এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, বিজয় হলে জান্নাত পাওয়া যাবে না। এর দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয়, সকল অবস্থায় মুসলমানদের লাভ, জীবিত অবস্থায়ও এবং শাহাদত লাভেও।

وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ

মোনাফেকদের পরিণাম

পক্ষান্তরে তোমাদের সম্পর্কেও আমরা দু'টি মন্দ অবস্থার যে কোন একটির অপেক্ষা করছি। তোমাদের মোনফেকী এবং ভন্ডামির শাস্তি স্বরূপ হয়ত আল্লাহ পাক সরাসরি তোমাদের উপর আযাব নাজিল করবেন অথবা আমাদের হাতেই তোমাদের শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। তখন তোমাদের মোনফেকী এবং ছল চাতুরীর প্রকৃত রূপ প্রকাশ পাবে এবং তখন তোমরা অপমাণিত ও লাঞ্ছিত হয়ে তোমাদের দুস্কৃতির

শাস্তি ভোগ করবে। কাফের অবস্থায় আমাদের হাতে তোমাদের মৃত্যু হবে এবং চিরদিন তোমরা দোজখে থাকবে (যদি তোমরা আযাব আসার পূর্বে তওবা না কর) এই অর্থ হবে যখন এই আয়াত দ্বারা সকল কাফেরকে সম্বোধন করা হয় কিন্তু যদি আয়াত দ্বারা শুধু মোনাফেকদেরকে সম্বোধন করা হয় তবে এর অর্থ হবে এই যে, যদি তোমরা মোনাফেকী অবস্থায়ই মৃত্যু বরণ কর তবে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে দুনিয়াতে এভাবে ধংস করবেন যেভাবে পৃথিবীর অন্য জাতিগুলোকে ধংস করেছেন, আর এরপর তোমাদেরকে দোজখের শাস্তি প্রদান করা হবে। আর যদি তোমরা তোমাদের কুফর নাফরমানির কথা প্রকাশ কর তবুও তোমাদেরকে এর শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে উভয় অবস্থাই তোমাদের জন্য বিপদজনক।

فَتَرَبَّصُوٓا۟ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ

অর্থাৎ তোমরা আমাদের পরিণামের জন্য অপেক্ষাকর, আমরাও তোমাদের পরিণামের জন্য অপেক্ষা করছি। হাসান (রঃ) এ বাক্যটির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে, শয়তান তোমাদেরকে যে আশ্বাস দিয়েছে তোমরা তার অপেক্ষা কর, আর আল্লাহ পাক আমাদেরকে যে কথা দিয়েছেন আমরা তার অপেক্ষা করি।১

ইমাম রাজী (রঃ) এই আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, মুসলমানদের কোন দুঃখ হলে মোনাফেকরা তাতে আনন্দিত হয় আর এ আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, মুসলমানগণ যখন জেহাদে অংশ গ্রহণ করে তখন দু' অবস্থার এক অবস্থা অবশ্যই হয়, যদি সে জেহাদে শাহাদত বরণ করে তবে দুনিয়াতে সুনাম এবং আখেরাতে অশেষ সওয়াবের অধিকারী হয় যা আল্লাহ পাক শহীদদের জন্য আখেরাতে তৈরী করে রেখেছেন।

আর যদি মুসলমান জেহাদে বিজয়ী হয় তবে দুনিয়াতে সুনাম হালাল সম্পদ এবং শক্তি অর্জন করে

আর আখেরাতে অশেষ সওয়াব লাভ করে।

পক্ষান্তরে মোনাফেক যখন জেহাদ থেকে বিরত থাকে তথা বাড়ীতে বসে থাকে তখন সে কাপুরুসের ভূমিকা পালন করে এবং অসহায় নারী ও শিশুদের সঙ্গে অবস্থান গ্রহণ করে। আর সর্বদা তার স্ত্রী পুত্র পরিবার ও ধন-সম্পদের ব্যাপারে ভীত সন্ত্রস্থ থাকে। যদি মোনাফেক অবস্থায় তার মৃত্যু হয় তবে কঠিন কঠোর স্থায়ী আযাবের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। অতএব, মোনাফেকরা মোমেনদর সম্পর্কে যে দু'টি বিষয়ের আকাংখা করে তার উভয়টিই সম্মান এবং মর্যাদা পূর্ণ। কিন্তু মোমেনগণ মোনাফেকদের যে দুই অবস্থার অপেক্ষা করছে অর্থাৎ দুনিয়তে অপমানজনক জীবন আর আখেরাতে কঠোর কঠিন শাস্তি। অতএব, তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও অপেক্ষা করছি।২

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২০২-৩
তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-১১৬
২। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-৮৬-৮৭

قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا
لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ؕ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٥٣﴾ وَمَا مَنَعَهُمْ
اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّاۤ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَ
لَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ﴿٥٤﴾
فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُهُمْ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ
بِهَا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٥٥﴾
وَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ؕ وَمَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ
يَّفْرَقُوْنَ ﴿٥٦﴾ لَوْ يَجِدُوْنَ مَلْجَاً اَوْ مَغٰرٰتٍ اَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا
اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُوْنَ ﴿٥٧﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِى الصَّدَقٰتِ ۚ فَاِنْ
اُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَاِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَاۤ اِذَا هُمْ يَسْخَطُوْنَ ﴿٥٨﴾ وَ
لَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَاۤ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ۙ وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ
سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَرَسُوْلُهٗۤ ۙ اِنَّاۤ اِلَى اللّٰهِ رٰغِبُوْنَ ﴿٥٩﴾ ع

তরজমা

(৫৩) হে রসূল! আপনি বলে দিন তোমাদের অর্থ ব্যয় ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত, তোমাদের তরফ থেকে গ্রহণ করা হবেনা, কেননা, তোমরা অবাধ্য সম্প্রদায়।

(৫৪) তাদের অর্থ ব্যয় গ্রহণযোগ্য না হওয়ার একমাত্র কারণ এই যে, তারা আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূলকে অস্বীকার করেছে। নামাজে অত্যন্ত শৈথিল্যের সাথে হাজির হয় আর অত্যন্ত বিরক্ত চিত্তে ব্যতীত ব্যয় করেনা।

(৫৫) (হে রসূল!) তাদের ধন–সম্পদ এবং সন্তান–সন্ততি যেন আপনাকে আশ্চার্যন্বিত না করে, আল্লাহ পাক তো এর দ্বারা দুনিয়ার এ জীবনে তাদেরকে শাস্তি দিতে চান আর কাফের থাকা অবস্থায় যেন তাদের আত্মা দেহত্যাগ করে। (কাফের অবস্থায় যেন তাদের মৃত্যু হয়)

(৫৬) আর এ মোনাফেকরা আল্লাহর নামে শপথ করে বলে যে, তারা তোমাদেরই অন্তর্ভূক্ত কিন্তু (প্রকৃত অবস্থা এই যে) তারা তোমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়; বরং তারা সে সম্প্রদায়,যারা ভয় করে থাকে।

(৫৭) যদি তারা কোন আশ্রয়স্থল, অথবা কোন গিরিগুহায় মাথা গুজবার কোন ঠাঁই পায় তবে বাঁধন ছেড়ে ক্ষিপ্রগতিতে সেদিকে পালিয়ে যায়।

(৫৮) তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা সদকা খয়রাত বন্টনে তোমাদের প্রতি দোষারোপ করে, এরপর তাদেরকে কিছু প্রদান করা হলে তারা সন্তুষ্ট হয়। আর যদি তাদেরকে কিছু না দেয়া হয় তবে তারা বিক্ষুব্ধ হয়।

(৫৯) কত ভাল হ'ত যদি তারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকত এবং বলত, আল্লাহ পাকই আমাদের জন্যে যথেষ্ট, আল্লাহ পাক আমাদেরকে নিজ করুণায় দান করবেন এবং তাঁর রসূল ও, আমরা আল্লাহ পাকের প্রতি আসক্ত।

তফসীরুল কোরআন

শানে নজুল

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ এ আয়াত নাজিল হয়েছে জদ এবনে কায়েস সম্পর্কে। সে ভিত্তিহীন ওজর আপত্তি পেশ করে তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে অব্যাহতি চেয়েছিল। তখন এ কথাও বলেছিল, আমি এ যুদ্ধে যেতে পারব না তবে অর্থ–সম্পদ দিয়ে আপনাকে সাহায্য করব। পূর্ববর্তী আয়াতে তার প্রথম কথার জবাব দেয়া হয়েছে, আর আলোচ্য আয়াতে তার দ্বিতীয় কথার জবাব দেয়া হয়েছে।১

ইসলামের জন্যে কাফেরদের অর্থ ব্যয় গ্রহণযোগ্য নয়

এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, কাফেরদের পক্ষ থেকে ইসলামের জন্যে অর্থ ব্যয় আল্লাহ পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। কোন দান

১। তফসীরে কবীর, খন্ড–১৬, পৃষ্ঠা–৮৮
তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড–১০, পৃষ্ঠা–১১৬

গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্যে ঈমান এবং এখলাস পূর্বশর্ত যা কাফেরদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। যাদের অন্তরে আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান নেই, তাদের কোন এবাদত আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হয় না। তাই আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছেঃ হে রসূল! আপনি ঘোষণা করুন, তোমরা আল্লাহর রাহে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত যা কিছুই দান কর না কেন, আল্লাহ্ পাকের দরবারে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

طَوْعًا

অর্থাৎ সে ব্যয়, যা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবশ্য কর্তব্য বলে ঘোষনা করা হয়নি, আর كَرْهًا সে ব্যয় যা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে অবশ্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে, তাই মোনাফেকরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিতান্ত অসন্তুষ্টচিত্তে ব্যয় করতে বাধ্য হয়। এরশাদ হয়েছেঃ তোমরা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত যা কিছু ব্যয় করনা কেন, আল্লাহ পাকের দরবারে তা কবুল হয়না। কবুল না হওয়ার দু'টি পন্থা।

(এক) যে ব্যক্তি সম্পর্কে এ কথা জানা যায় যে, সে মোনাফেক, তার দান আল্লাহর রসূল এবং তাঁর প্রতিনিধিগণ গ্রহণ করবেন না।

(দুই) আল্লাহ পাক কবুল করবেন না, অর্থাৎ তোমাদের ব্যয়ের জন্যে আল্লাহ পাক সওয়াব দান করবেন না। কেননা, আমলের ভিত্তি হ'ল ঈমান আর তোমাদের নিকট সে ঈমানই নেই। তোমরা অবাধ্য সম্প্রদায়, ইসলামের গন্ডি থেকে তোমরা বাইরে। অতএব, তোমাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্কই নেই। তাই তোমাদের তরফ থেকে কোন প্রকার অর্থ সাহায্য গ্রহণযোগ্য নয়। এ জন্যে পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ

মোনাফেকদের তরফ থেকে আর্থিক সাহায্য এ কারণে গ্রহণযোগ্য নয় যে, তারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হয়েছে। অবাধ্য কাফেরের তরফ থেকে কোন কিছুই আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হয়না। দ্বিতীয়তঃ নামাজেও তাদের মন নেই, তাদের নামাজে থাকে শৈথিল্য। তৃতীয়তঃ আল্লাহর রাহে তারা সাধারণতঃ দান করেনা, তবে যদি দান করেও তবে তা দায়ে পড়ে, বাধ্য হয়ে। কেননা, তাদের সওয়াবের কোন আশা নেই আর আযাবকেও তারা ভয় করেনা। তাদের ধারণায় যাকাত একটি জরিমানা।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এর মর্ম হ'ল এই যে, মোনাফেকরা সন্তুষ্টচিত্তে কোন সময়ই আল্লাহর রাহে ব্যয় করেনা কিন্তু যদি সন্তুষ্টচিত্তেও মোনাফেকরা ব্যয় করে তুবও আল্লাহ পাকের দরবারে তা কবুল হবেনা। কেননা, তাদের দান শুধু লোক দেখানোর জন্যে হয়ে থাকে। আল্লাহ পাকের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক থাকেনা। তাই এমন লোকের দান আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হয়না।

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُمْ ط

কাফেরদের সুখ-সম্পদ রহমত নয়

পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, মোনাফেকদের জন্যে আখেরাতে রয়েছে কঠিন কঠোর শাস্তি। এরপর প্রশ্ন হতে পারে দুনিয়াতে তাদের এত ধন-সম্পদ, সন্তান সন্তুতি কেন? যখন কাফেররা আল্লাহ পাকের অপ্রিয়, অভিশপ্ত তখন তারা এত সুখ-সম্পদ এবং এত শক্তি সামর্থ্য লাভ করে কেন? এ প্রশ্নের জবাবেই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে ঘোষনা করেছেনঃ এ পৃথিবীতে যা তাদেরকে দেয়া হয়েছে, যা ধনবল এবং জনবল তারা পেয়েছে তা তাদের জন্যে রহমত নয়, গজবের উপকরণ। তাই কাফেরদের ধন-সম্পদ দেখে বিস্মিত হওয়ার কোন ন্যায্য কারণ নেই। কেননা, যদিও তাদের কাছে সুখ-সম্পদ অনেক রয়েছে কিন্তু তারা শান্তি থেকে বঞ্চিত। তাদের সুখের মধ্যেই রয়েছে দুঃখ নিহিত, তারা যে এ ক্ষনস্থায়ী জীবনের সুখ সামগ্রী সংগ্রহে ব্যস্ত থাকে। আখেরাতে বা পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর কথা ভুলে থাকে, বর্তমানকে নিয়ে ব্যস্তমুগ্ধ হয়ে ভবিষ্যতের চিন্তা না করে এ অবস্থাতেই তাদের জীবনের অবসান ঘটে এবং আখেরাতের চির শাস্তি ভোগ করে। তাই এ পার্থিব জীবনে কাফেরদের জনবল, ধনবল দেখে এ ভুল ধারণা করার কোন সুযোগ নেই যে, আল্লাহ পাক তাদেরকে নেয়ামত দান করেছেন। কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীস রয়েছেঃ যার অর্থ-সম্পদ বেশী; তার হিসেব হবে কঠিনতর। অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, যে শাসনকর্তার যত বেশী নৈকট্য লাভ করবে আল্লাহর দরবার থেকে তার দূরত্ব তত বেশী হবে।

আর যেহেতু এ মোনাফেকরা তথা কাফেররা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করেনা, প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতিও তাদের ঈমান নেই এবং আখেরাতেও তারা বিশ্বাস করেনা। তাই দুনিয়ার এ জিন্দেগীই তাদের কাছে সবকিছু। তাদের সকল সাধনা দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্যেই। দুনিয়ার

মায়া মোহে তারা মুগ্ধ, মত্ত। তাই তারা এ জীবনের শান্তি থেকে বঞ্চিত, কেননা, শান্তির মালিক আল্লাহ পাকের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই।

এতদ্ব্যতীত মৃত্যুকালে তাদের কষ্ট হয় চরম। সারা জীবনের সঞ্চিত সম্পদ থেকে বঞ্চিত হওয়ার মুহূর্তে তাদের যে কষ্ট হয় তা শুধু বর্ণনাতীতই নয়; বরং কল্পনাতীতও। বর্তমান জগতে পাশ্চাত্য দেশ সমূহে বস্তুবাদী সমাজের লোকেরা ভোগবাদের মরফিয়া পান করে মাতাল অবস্থায় রয়েছে, সম্পদ বৃদ্ধি করা, উপভোগের উপকরণ সংগ্রহ করাই তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। স্বার্থপরতা, হীনমন্যতা তাদের বৈশিষ্ট্য। তারা অশান্তির আগুনে সর্বক্ষণ পুড়তে থাকে, আর এ অবস্থায় পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করে, আখেরাতের চিরশাস্তিতে পতিত হয়।

অতএব, তাদের সুখ-সামগ্রীর সাময়িক দৃশ্য দেখে বিস্মিত হওয়ার কোন ন্যায্য কারণ নেই। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ

অতএব কাফেরদেরকে প্রদত্ত ধনশক্তি এবং জনশক্তি যেন আপনাকে বিস্মিত না করে কেননা, এ পার্থিব জীবনে আল্লাহ পাক তাদেরকে যা কিছু দান করেছেন তার কারণ হ'ল এই যে, তারা অর্থ সম্পদ সংগ্রহে এবং তার সঞ্চয়ে ব্যস্ত থাকবে। আখেরাত থেকে গাফেল থাকবে এবং অর্থ-সম্পদ অন্যায় পথে ব্যয় করবে। এভাবে আখেরাতে তারা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে তাদেরকে যে ধন-সম্পদ এবং শক্তি সামর্থ্য প্রদান করা হয়েছে তা তাদেরকে গাফলতের আবর্তে নিপতিত করে রাখবে। এভাবে তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু যখন তারা জীবন-সায়াহ্নে পৌছবে, মৃত্যুর মুখোমুখি হবে, তখন তাদের কষ্টের সীমা থাকবেনা।১

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেনঃ যাদেরকে দুনিয়াতে অর্থ-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি অধিক পরিমাণে দেয়া হয়েছে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে তাদের কষ্টের কারণ হয়। কেননা, যে বস্তুর জন্যে মানুষের আসক্তি অধিক হয় তা হারিয়ে যাওয়ার আশংকাও অধিক হয় এবং হারিয়ে যাওয়ার কষ্টও অধিকতর হয়। তাই মৃত্যুর অলংঘনীয় বিধানের মাধ্যমে যখন কাফেরদের জীবনের অবসান ঘটে তখন তাদের কষ্ট অধিকতর হয়। দ্বিতীয়তঃ অধিক পরিমান অর্থ-সম্পদ উপার্জনে চরম পরিশ্রম এবং চরম কষ্ট করতে হয় অথচ তা দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ সর্বদা থাকেনা, তাই কষ্ট বশী, উপকার কম।

তৃতীয়তঃ অর্থ-সম্পদের মোহ মায়া যদি মানব অন্তরে বৃদ্ধি পায় তখন দু' অবস্থা

---

১ ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-২৫৩

সৃষ্টি হয়। যদি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ঐ সম্পদ থাকে তবে মৃত্যুর সময় তা ছেড়ে যাওয়ার কষ্ট ভোগ করে। আর যদি মৃত্যুর পূর্বেই সে সম্পদ বিনষ্ট হয় তবে সম্পদ হারানোর আক্ষেপে জীবন যায়।

চতুর্থঃ দুনিয়ার সম্পদ আকর্ষনীয়, মনোহর, মনোরম। মানব মন এর সন্ধান এবং সংগ্রহে মুগ্ধ, মত্ত, মাতোয়ারা থাকে তাই আল্লাহর জিকির থেকে সে বঞ্চিত হয়, তার অন্তর কঠিন কঠোর হয়। এ কারণে দুনিয়ার মহব্বত এবং ভোগ বিলাসের আকাংখা মানব মন থেকে আল্লাহর মহব্বত এবং আখেরাতের চিন্তাকে দূরে সরিয়ে দেয়। অর্থ–সম্পদের লোভ এবং পদলোভ যত বৃদ্ধি পায়, মনের কঠোরতাও তত বৃদ্ধি পায়। আর এ অবস্থায় যখন মানুষের মৃত্যু হয় তখন তাকে যেন বাগান থেকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। এ অবস্থায় সব হারানোর ব্যাথায় সে ব্যথিত হয়। অথচ তখন দুঃখ নিবারণের কোন পথ থাকেনা। যা কিছু সারা জীবনে উপার্জন করে তার সবকিছুই পেছনে ফেলে রিক্ত হস্ত হয়ে পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় নেয়। অথচ আখেরাতের অবস্থা হবে এই যে, যদি হালাল পন্থায় সম্পদ উপার্জিত হয়ে থাকে তবে তার হিসেব দিতে হবে। আর যদি হারাম পন্থায় উপার্জিত হয়ে থাকে তবে তজ্জন্যে আযাব ভোগ করতে হবে। এর দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয়, অধিক পরিমাণে অর্থ–সম্পদ দুনিয়াতে অধিক কষ্টের এবং আখেরাতে অধিকতর আযাবের কারণ হয়।[১]

وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ

মোনাফেকদের অন্তরে সর্বদা এ ভয় থাকত যে, যদি তাদের সত্যিকার স্বরূপ প্রকাশ পায় তবে তাদের সমূহ বিপদের কারণ হবে স্বাভাবিক কারণেই মুসলমানগণ কাফেরদের সঙ্গে যে ব্যবহার করে, মোনাফেকদের সঙ্গেও একই ব্যবহার করবে। তাই তারা তাদের পরিচয় গোপন করার জন্যে আল্লাহর নামে শপথ করে বলতো, আমরাতো আপনাদের সঙ্গেই আছি, আমরাতো মুসলমান। কিন্তু আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে তাদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন এবং ঘোষনা করেছেনঃ

وَمَا هُم مِّنكُمْ

আর তার আদৌ –তোমাদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত নয় তথা তারা মুসলমান নয়।

وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴿٥٦﴾

১। তফসীরে কবীর, খন্ড–১৬, পৃষ্ঠা–৯৩

কিন্তু তারা এমন সম্প্রদায় যারা ভয় করে আর তাদের ভয় হ'ল এ ব্যাপারে, যদি তাদের কুফরী ও নাফরমানী প্রকাশ পায় তবে তাদের পরিণাম হবে ভয়াবহ। কাফেরদের যে অবস্থা তাদেরও সে অবস্থা হবে। তাই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

لَوْ يَجِدُوْنَ مَلْجَاً اَوْ مَغٰرٰتٍ

যদি তারা কোন আশ্রয়ের স্থান পায় অথবা কোন গুহা বা মাথা গুজবার কোন ঠাঁই পায় তবে তারা ক্ষিপ্রগতিতে সেখানে ছুটে যাবে অর্থাৎ তারা যে মুসলমান বলে দাবী করে এ দাবীতো মিথ্যা। যদি মুসলমানদের কবল থেকে বের হয়ে কোথাও আশ্রয় পায় বা একটু মাথা গুজবার ঠাঁই যদি দেখতে পায় তবে সব বাঁধন ছিড়ে সেখানে পালিয়ে যাবে। কিন্তু যেহেতু তাদের কোন উপায় নেই, ইসলামী রাষ্ট্রের বাইরে তাদের আশ্রয় দেয়ার কেউ নেই, তাই আল্লাহর নামে শপথ করে তারা বলছে, আমরা মুসলমান।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِى الصَّدَقٰتِ

কোন কোন মোনাফেক অর্থ লিপ্সায় অন্ধ হয়ে স্বয়ং হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে মিথ্যা এবং অকথ্য উক্তি করে যে, তিনি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বিতরণে ন্যায়বিচার করছেননা। (নাউজুবিল্লাহ মিন জালেক)

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদের বর্ণনার উদ্ধৃতি রয়েছে যে, হোনায়েনের বিজয়ের দিন যখন কবিলায়ে হাওয়াজেন গোত্র থেকে প্রাপ্ত সম্পদ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিতরণ করেছেন, তখন আরব সর্দারদের প্রতি তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন এ অবস্থা দেখে মদীনা শরীফের এক ব্যক্তি বললঃ

এ বিতরণ সুবিচারের ভিত্তিতে হয়নি, অথবা সে বলেছে এ বিতরণ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে হয়নি। হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেনঃ আমি বললাম যে, আমি এ কথাগুলো সম্পর্কে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অবহিত করবো। তাই আমি গিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ সম্পর্কে জানালাম। কথাটি শ্রবণ করার পর (ক্রোধে) তাঁর চেহারার বর্ণ পরিবর্তন হয়ে গেল। তিনি এরশাদ করলেনঃ যদি আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূল সুবিচার না করেন তবে কে সুবিচার করতে পারবে। আল্লাহর রহমত হোক মূসা

(আঃ)–এর প্রতি তাঁকে এরচেয়ে বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছে, কিন্তু তিনি সবর করেছেন। মোহাম্মদ এবনে ওমর এ সমালোচকের নাম উল্লেখ করেছেনঃ মাতাব এবনে কোশায়ের। সে মোনাফেক ছিল।

এবনে এছহাক হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমরের সূত্রে এবং ইমাম বোখারী, ইমাম মুসলিম এবং ইমাম আহমদ হযরত যাবের (রাঃ)–এর সূত্রে লিখেছেনঃ যে সময় হাওয়াজেন গোত্র থেকে অর্জিত মালে গণিমত হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিতরণ করছিলেন, তখন এক ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দিকে মুখ করে দন্ডায়মান হ'ল। হযরত এবনে ওমর (রাঃ) এবং হযরত আবু সাঈদ (রাঃ)–এর কথা মোতাবেক এ ব্যক্তি বনী তামীম গোত্রের ছিল যাকে জুলখোয়াইস বলা হ'ত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ কি হয়েছে? তখন সে আরজ করল, আমার মতে আপনি সুবিচার করেননি। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, আপনি সুবিচার করুন। এ কথা শ্রবণ করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে এরশাদ করলেনঃ যদি আমি সুবিচার না করি তবে কে সুবিচার করবে?

হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করলেন; ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি অনুমতি দান করুন, আমি এ মোনাফেককে হত্যা করি। তিনি এরশাদ করেনঃ আল্লাহ পাকের আশ্রয় গ্রহণ করি, এমন অবস্থায় লোকেরা বলবে, আমি আমার সংগীদের হত্যা করি। অতএব, তাকে ছেড়ে দাও। এ লোকটির কিছু সাথীও থাকবে যাদের নামাজের তুলনায় তোমাদের নামাজ এবং যাদের রোজার তুলনায় তোমাদের রোজা তোমাদের নিকটই ক্ষুদ্র মনে হবে। তারা পবিত্র কোরআন পাঠ করবে কিন্তু কোরআন তাদের কণ্ঠ থেকে সম্মুখে যাবেনা। তারা দ্বীন থেকে এভাবে বের হয়ে যাবে যে ভাবে তীর শিকার থেকে বের হয়ে যায়। এরা দ্বীন থেকে বিমুখ হবে আর সর্বোত্তম দলের বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহ করবে। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ননা করেন, আমি সাক্ষ্য দেই যে, আমি এ হাদীস হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট শ্রবণ করেছি। তিনি বলেন, আমি আরো স্বাক্ষ্য দেই যে, হযরত আলী এবনে আবু তালেব (রাঃ) তাদের সঙ্গে নাহরওয়ান নামক স্থানে যুদ্ধ করেছেন। আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটি নিদর্শন বাতলিয়ে ছিলেন যে, তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি কৃষ্ণ বর্ণের হবে, তার একটি বাজু অপেক্ষাকৃত উঁচু হবে নারীদের স্তনের ন্যায় তথা উচু গোশতের ন্যায়। হযরত আলী (রাঃ) এ নিদর্শন বিশিষ্ট ব্যক্তিটির অনুসন্ধান করে দেখতে বললেন, তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, হযরত আলী (রাঃ)–এর সমীপে তাকে পেশ করা হলে আমি দেখলাম, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বাৎলানো নিদর্শন তার মধ্যে রয়েছে। কালবী (রঃ) বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে একজন কাফেরের সম্পর্কে তার নাম ছিল আবুল খাওয়াছ। সে বলেছিল, মালে গনিমতের বিতরণ ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে হয়নি।

فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا

মোনাফেকদের অবস্থা এই, যদি এদেরকে বিপুল পরিমাণে দেয়া হয় তবে তারা বেশ আনন্দিত ও সন্তুষ্ট থাকে। আর যদি অধিক পরিমানে তাদেরকে না দেয়া হয় তবে তারা সঙ্গে সঙ্গে অসন্তুষ্ট পয়ে পড়ে।

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا

তাদের জন্যে উত্তম হ'ত, যদি তারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল যা দান করেন তাতে রাজী থাকত এবং তারা এভাবে বলত যে, আল্লাহ্ পাক আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং ভবিষ্যতে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল আমাদেরকে আরো দান করবেন। নিশ্চয় আমরা শুরু থেকে বরাবরই আল্লাহ পাকের প্রতি আসক্ত। অর্থাৎ আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সদকা এবং যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ থেকে যা দান করেছেন তার প্রতি যদি তারা সন্তুষ্ট থাকত তবে তাদের জন্যে ভাল হ'ত।

এখানে এ কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, আল্লাহ পাক সরাসরি কাউকে কিছু দান করেন না, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মাধ্যমেই তিনি দান করেন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাকের দান করার যে উল্লেখ রয়েছে, তা দ্বারা এ কথা বোঝানো হয়েছে যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কাজ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই কাজ। (তাঁর নিজের তরফ থেকে নয়, বরং আল্লাহর হুকুমে হয়) অতএব, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কার্যে এভাবেই সন্তুষ্ট এবং অনুগত থাকতে হবে যেভাবে আল্লাহর হুকুমে থাকতে হয়।

حَسْبُنَا اللّٰهُ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক আমাদের জন্যে যথেষ্ট, তিনি অন্য কোন পন্থায় আমাদের প্রয়োজনের আয়োজন করবেন। আর অন্য কোন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দান করবেন।

إِنَّمَا الصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَٰكِينِ وَالْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ
النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ
يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦١﴾ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ
لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾

তরজমা

(৬০) যাকাত শুধু তাদেরই হক্ব যারা নিঃস্ব, অভাবগ্রস্থ, মিসকীন, মোহতাজ আর যারা যাকাতের কাজে নিয়োজিত, আর যাদের চিত্তাকর্ষণ উদ্দেশ্য এবং গোলাম বাঁদীর মুক্তির জন্যে,ঋণে জর্জরিত মানুষের জন্যে, আল্লাহর রাহের মুজাহেদীন এবং পথিক মুসাফিরের জন্যে এটিই আল্লাহ পাকের নির্ধারিত বিধান, আর আল্লাহ পাক সব কিছু জানেন, তিনি অত্যন্ত সুবিবেচক।

(৬১) আর তাদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা নবীকে কষ্ট দেয় এবং বলে সে তো "কর্ণপাতকারী" হে রসূল! আপনি বলে দিন তিনি তোমাদের কল্যাণার্থেই কর্ণপাতকারী, তিনি আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনেন, মোমেনদের কথায় তিনি বিশ্বাস করেন, তোমাদের মধ্যে যারা মুমেন তাদের জন্য তিনি রহমত আর যারা আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

(৬২) তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তারা তোমাদের সম্মুখে আল্লাহ পাকের নামে শপথ করে অথচ তাদের অবশ্য কর্তব্য আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলকে সন্তুষ্ট করা যদি তারা মোমেন হয়।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, মোনাফেকরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি এই অভিযোগ করেছে যে তিনি ন্যায়সংগতভাবে সদকার অর্থ বিতরণ করেননি। তাই আলোচ্য আয়াতে যাকাত, সদকার বিতরণের বিধান পেশ করা হয়েছে আর সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এর বিতরণ বিধি স্বয়ং আল্লাহ পাকের দ্বারা নির্ধারিত। এমনকি, এতে আল্লাহর নবীরও কোন এখতেয়ার নেই এর বিতরণের জন্য আল্লাহ পাক আটটি খাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ঐ নির্ধারিত খাতেই যাকাত সদকা বিতরণ করতে হবে।

মোনাফেকদের অভিযোগের মূল কারণ হল তারা ছিল অর্থলোভী, তাদের লোভ লালসা চরিতার্থ করার জন্যই তারা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট অধিক পরিমাণে অর্থ দাবী করতো এবং বলতো, আমাদের চাহিদা মোতাবেক আমাদেরকে দিয়ে দিন। কিন্তু তিনি যখন তাদের চাহিদা মোতাবেক দিতেন না তখন তারা ভিত্তিহীন অভিযোগ করতো। তাই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াত নাযিল করেছেন যেন একথা সুস্পষ্টভাবে সকলেই জানতে পারে, যারা অধিক পরিমাণে অর্থ লাভের জন্য পীড়াপীড়ি করে তারা সদকার অর্থ লাভের যোগ্যই নয়।

দ্বিতীয়ত, এ আয়াত দ্বারা এ কথাও জানিয়ে দেয়া হল যাকাত ও সদকার বিতরণ একমাত্র আল্লাহ পাকের হুকুম মোতাবেকই হয়। এতদ্ব্যতীত, যাকাত সদকা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবারবর্গ, তাঁর বংশীয় লোকজন এমনকি, তাঁর আজাদ করা গোলামদের প্রতিও হারাম। এমনি অবস্থায় এ ব্যাপারে কোন প্রকার স্বজন-প্রীতির আদৌ কোন সম্ভাবনা নেই। এতে কোন সন্দেহ নেই, মোনাফেকরা হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয়ার জন্য এবং তাদের অর্থলিপ্সা চরিতার্থ করার জন্যেই এমনি বানোয়াট ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন করেছে।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট যাকাত ও সদকার যে অর্থ-সম্পদ আসতো তা তিনি সংগে সংগে আল্লাহ পাকের বিধান মোতাবেক বিতরণ করে দিতেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) এ আয়াতের তফসীর প্রসংগে লিখেছেনঃ এ আয়াতের মর্ম হল একথা প্রকাশ করা যে যাকাত সদকার যোগ্য হল শুধু মিসকীন

কপর্দকহীন লোকেরা, আর ফকির তাকে বলা হবে যে ধনী নয়। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) –এর মতে, ফকির সেই ব্যক্তি যার নিকট যাকাত ওয়াজিব হওয়ার মত সম্পদ না থাকে। এর দলিল স্বরূপ হযরত মাআজ (রাঃ)–এর ঘটনা পেশ করা হয়েছে। ইমাম বোখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত মাআজ (রাঃ)–কে ইয়ামান প্রেরণ করার সময় বলেছিলেন, তুমি এমন লোকদের নিকট গমন করছো যারা আহলে কিতাব, সর্বপ্রথম তাদেরকে "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ"–এর প্রতি সাক্ষ্য দানের জন্যে আহবান জানাও, যদি তারা একথা মেনে নেয় তবে বল তাদের উপরে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ, যদি তারা একথা মেনে নেয় তবে তাদেরকে বলো যে আল্লাহ পাক তাদের প্রতি যাকাত ফরজ করেছেন যা তাদের ধনী লোকদের থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদেরই দারিদ্র- প্রপীড়িত লোকদের মাঝে বন্টন করা হবে। যাকাতে সর্বোত্তম জন্তুটি নিয়ে নিবেনা, মজলুমের বদদোয়াকে ভয় করতে থাকবে, মজলুমের বদদোয়া সরাসরি আল্লাহ পাকের দরবারে পৌছে, তার মধ্যে এবং আল্লাহ পাকের মধ্যে কোন বাধাথাকেনা।

এ হাদীসের আলোকে একথা প্রমাণিত হয় যে, যাকাত গ্রহণকারী মুসলমান হতে হবে, অমুসলিমকে কোন অবস্থাতেই যাকাত দেয়া যাবে না যাহোক, যাকাতের পাত্র বা ক্ষেত্র আটটিঃ

(১) ফকীর –যার কিছুই নেই, তথা কপর্দকহীন।

(২) মিসকীন–যার নিকট একান্ত প্রয়োজনীয় ধন সম্পদ নেই।

(৩) যারা ইসলামী রাষ্টের তরফ থেকে যাকাত উসুল করে ।

(৪) নওমুসলিম যাদেরকে সান্তনা দেয়ার জন্য, যাকাত দেয়া হয়।

(৫) গোলামের মুক্তিপণ আদায়ের জন্য।

(৬) ঋণগ্রস্থ ব্যক্তিদের ঋণ আদায়ের জন্যে।

(৭) আল্লাহর রাহে যারা জেহাদ করেন, তাদের সাহাযার্থে।

(৮) পথিক–মুসাফির, যার অর্থ–সম্পদ থাকলেও সংগে নেই, ফলে সে বিপদগ্রস্থ।

তবে এদের সকলকে যাকাতের অর্থের মালিক বানিয়ে দিতে হবে, যাকাত আদায়ের জন্য এটি পূর্বশর্ত।

لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ

আলোচ্য আয়াতে সর্বপ্রথম যাকাত প্রদানের জন্যে ফকিরদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ফকির বলতে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা কপর্দকহীন, যাদের কিছুই নেই। এরপর উল্লিখিত হয়েছে মিসকীনের কথা। মিসকিন সে ব্যক্তি যার নিকট কিছু আছে কিন্তু প্রয়োজন মোতাবেক নেই। ফকির মিসকিন উভয়ই অভাবগ্রস্থ, দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত। তবে মিসকিনের চেয়ে ফকিরের অভাব অধিকতর, এজন্যে আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম ফকিরের নাম উল্লেখ করেছেন, এরপর মিসকিনের।

وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا

অর্থাৎ–যাদেরকে ইসলামী রাষ্ট্র যাকাত উসুলের জন্য নিযুক্ত করে তাদের ব্যয়ভার বহন করা হবে যাকাতের তহবিল থেকে, তবে যাকাত হিসেবে তাদেরকে দেয়া হবে না, বরং যেহেতু তারা যাকাত আদায়ের খেদমতে নিয়োজিত তাই এ খেদমতের বিনিময়ে তাদেরকে যথা প্রয়োজনে প্রদান করা হবে আর তা–ও তাদেরকে পারিশ্রমিক হসেবে নয় বরং তাদের দ্বীনি খেদমতের পুরস্কার হিসেবে।

যাকাত উসুলকারীর প্রাপ্য প্রসঙ্গে

এ সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেছেনঃ যাকাত উসুলকারীর কাজ কম হোক বা অধিক–সকল অবস্থায় অর্জিত যাকাতের ৮ ভাগের একভাগ তাদের জন্যে ব্যয় করা হবে। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এর মতে, যাকাতের জন্যে পবিত্র কোরআনে যে ৮টি খাত নির্দিষ্ট করা হয়েছে তাতে সমুদয় অর্থ সমান আট ভাগে ভাগ করে আদায় করতে হবে।

কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এবং অন্যান্য ইমামগণ বলেছেন, যাকাত উসুলকারী ব্যক্তি যে পরিমাণ সময় এ কাজে ব্যয় করেছে সে সময়ের বিনিময় তাকে দেয়া হবে। কোন ব্যক্তি যাকাত উসুল করার কাজে একদিন ব্যয় করেছে। এই একদিনের মেহনতের জন্যে যা সমীচিন মনে করা হয় তাই দেয়া হবে। আর যদি সে এক বছর কাল যাকাতের তহশীল কাজে ব্যয় করে সে এক বছরে যা তার প্রাপ্য বিবেচিত হয় তা দেয়া হবে। কেননা, যাকাতে ধনীদের কোন অংশ নেই, যাকাত ফকীরদের হক্ব, তাই ফকীরদের হক্ব থেকে তাকে যা দেয়া

সমীচিন মনে হবে তাই দেয়া হবে। যদি যাকাত হিসেবে যা সে উসুল করেছে, সে সমুদয় অর্থই তার প্রাপ্য হয় তবে সম্পূর্ণ অর্থ তাকে দেয়া হবে না, এ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম একমত; তাকে অর্ধেক দেয়া হবে। অর্ধেক থেকে একটু বেশীও দেয়া হবেনা। যদি অর্ধেকের চেয়ে বেশী দেয়া হয় তবে এর দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হবে যে, সে ফকীরদের জন্যে নয়; বরং নিজের জন্যেই উসুল করেছে আর এভাবে আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে।

وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ

অর্থাৎ–সে নওমুসলিম যারা ইসলাম কবুল করেছে , কিন্তু এখনও ইসলামের প্রতি বিশ্বাস দুর্বল এবং যেহেতু তারা দারিদ্র–প্রপীড়িত, এজন্য তাদেরকে যাকাত থেকে দেয়া হয় যেন ইসলামের উপর কায়েম থাকে। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পরে "মোয়াল্লেফাতুল কুলুবের" অংশ বাতিল হয়েছে। ইমাম কুরতবী (রহঃ) লিখেছেনঃ হযরত আবু বকর (রাঃ)–এর যুগে সাহাবায়ে কেরাম একমত হয়েছেন যে যাকাতের এ ক্ষেত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।১

অবশ্য নওমুসলিম যদি অভাবগ্রস্থ হয় তবে ফকির মিসকিন হিসেবে তাকেও যাকাত দেয়া যেতে পারে। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এবং ইমাম মালেক (রহঃ) এর মতে, যাকাত উসূলকারী ব্যক্তিদের ছাড়া অবশিষ্ট সকল খাতেই যাকাত আদায় শুদ্ধ হওয়ার জন্যে তাদের অভাবগ্রস্থ হওয়া পূর্ব শর্ত।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ "মোয়াল্লাফাতুল কুলুব" অর্থাৎ যাদেরকে চিত্তাকর্ষনের উদ্দেশ্যে দেয়া হয়, তারা দু' প্রকার মুসলমান এবং কাফের। যারা মুসলমান তাদেরকেও দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। (এক) যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, কিন্তু গ্রহণের সময় ইমান দুর্বল ছিল, যেমন উয়াইনা ইবনে বদর ফাজারী, আকরা এবনে হাবেছ এবং আব্বাস এবনে মারদাস। (দুই) সেই মুসলমান ইসলাম গ্রহণের সময় যাদের ঈমান মজবুত ছিল কিন্তু তারা তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নেতা ছিল। দলের মধ্যে কিছু দুর্বল ঈমানের লোক ছিল। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উভয় দলকেই দান করতেন। প্রথম দলকে তাদের ঈমান মজবুত করার জন্যে, দ্বিতীয় দলকে তাদের সম্প্রদায়ের লোকদের মন আকৃষ্ট করার জন্যে। যেমন, হযরত আদী এবনে হাতেম এবং হযরত জবরকান এবনে বদরকে তাদের সম্প্রদায়ের লোকদের মন আকৃষ্ট করার জন্যে দেয়া হয়েছে।

(১) তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত–আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড–৩, পৃষ্ঠা–৩৬০
তফসীরে কুরতুবী, খন্ড–৮, পৃষ্ঠা–১৮১

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বিভিন্ন সময় অর্থ-সম্পদ দান করেছেন। তবে তিনি তাদেরকে যাকাতের তহবিল থেকে দান করেননি; বরং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে দান করেছেন আর কাফেরদের থেকে অর্জিত সম্পদের যে অংশটুকু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে সংরক্ষিত থাকত, তা থেকেও তিনি এমন সব লোকদেরকে দান করতেন।

মোয়াল্লেফাতুল কুলুবের আরেকটি শাখা হ'লঃ সেই মুসলমান, যাদের এলাকায় মুসলমান সৈন্য কাফেরদের মোকাবিলার জন্যে পৌছেছে, আর স্থানীয় মুসলমানদের সাহায্য ব্যতীত মুজাহিদগণ অগ্রসর হতে পারেননা। অথচ অভাব অনটনের কারণে অথবা ঈমানের দুর্বলতার কারণে স্থানীয় মুসলমানগণ জেহাদের জন্যে প্রস্তুত হতে পারে না। এমন অবস্থায় মুসলিম শাসনকর্তার জন্যে ইসলামী শরীয়ত অনুমতি দেয় যে, মুজাহেদদের যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশ থেকে এবং মোয়াল্লেফাতুল কুলুবের যাকাতের অংশ থেকে ঐ মুসলমানদেরকে দান করবেন।

বর্ণিত আছে যে, হযরত আদী এবনে হাতেম তার সম্প্রদায়ের তরফ থেকে যাকাত বাবদ তিনশত উষ্ট্র নিয়ে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খেদমতে হাজির হন। হযরত আবু বকর (রাঃ) তন্মধ্য থেকে ৩০টি উষ্ট্র তাকে দান করেন। অমুসলিম মোয়াল্লেফাতুল কুলুব বলতে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে, যাদের তরফ থেকে মুসলমানদের ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকে। অথবা যাদের ইসলাম গ্রহণের আশা করা যায়। ইমামুল মুসলেমীনের জন্যে অনুমতি রয়েছে তাদেরকে কিছু দিয়ে দিতে পারেন যেন তাদের ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষা করা যায়। অথবা তাদের মুসলমান হওয়ার আশা পূর্ণ হয়। এমন লোকদেরকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দান করেছেন যেমন সাফওয়ান এবনে উমাইয়াকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট দেখে তাকে দান করেছিলেন।

কিন্তু এখন আর অমুসলিমকে এমনিভাবে যাকাত সদকা প্রভৃতি থেকে দান করা বৈধ নয়। আল্লাহ পাক ইসলামকে বিজয় দান করেছেন। অতএব, বর্তমান অবস্থায় এমন পন্থা গ্রহণের অনুমতি নেই। এজন্যে একরামা, শাবী, ইমাম মালেক, সুফিয়ান সওরী, ইসহাক এবনে রাহবীয়া প্রমুখ তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, মোয়াল্লেফাতুল কুলুবের অমুসলিম খাত সম্পূর্ণ বাতিল হয়েছে।

ইমাম মালেক (রঃ) বলেছেন, যদি কোন এলাকায় বিশেষ করে সীমান্ত এলাকায় মুসলমানগণ চিত্তাকর্ষনের উদ্দেশ্যে কোন কাফেরকে অর্থ-সম্পদ দেয়ার

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩১৩-১৪

প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন তবে জাকাতের খাত থেকে, দেয়া যেতে পারে যদি এর যুক্তিসংগত কারণ সৃষ্টি হয়। ইমাম আহমদও (রঃ) এই মত পোষণ করেন।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলমান হয়েছে আর ইসলাম গ্রহণের সময় তার ঈমান দুর্বল ছিল অথবা এমন প্রভাবশালী লোক যাকে কিছু দিলে অন্যরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে তবে এমন লোকদেরকে যাকাতের অর্থ দেয়া বৈধ।

وَفِى الرِّقَابِ

অর্থাৎ গোলাম বাঁদীদেরকে আজাদ করার জন্যে যাকাতের অর্থ দেয়া যাবে।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ), ঈমাম শাফেয়ী (রঃ) এবং ইমাম আহমদ (রঃ)–এর মতে, এর অর্থ হলো মোকাতেব বাঁদী গোলাম, ইমাম মালেকও (রঃ) এ মতই পোষণ করতেন। মোকাতেব অর্থাৎ যে গোলাম বাঁদীকে তার মালিক মুক্তি দেয়ার জন্য নির্দৃষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করার শর্তারোপ করে এমন ব্যক্তি অর্থ লাভ করলে আজাদ হতে পারে। তাই ইসলামী শরীয়তে এমন লোককে যাকাতের অর্থ দিয়ে সাহায্য করার বিধান পেশ করেছে। এমনকি যদি তার কাছে অর্থ সম্পদ থাকেও কিন্তু তার মুক্তি লাভের জন্য তা যথেষ্ট না হয় এমন অবস্থায় তাকে যাকাতের অর্থ দিয়ে তার মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

মুজাহেদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, নিজের যাকাতের টাকা দিয়ে বাঁদী গোলাম ক্রয় করে আজাদ কর।

ময়মুন বর্ণনা করেন, আমি আবু আবদুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করেছি যে, যদি কেউ তার যাকাতের টাকা দিয়ে গোলাম ক্রয় করে আজাদ করে অথবা মুসাফিরদের জন্য ব্যয় করে তবে তার কি হুকুম? আবু আবদুল্লাহ বলেন তা যায়েজ আছে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এই মত পোসণ করতেন। আর এর বিরোধীতা করার কোন কারণ নেই।

ইমাম মালেক (রঃ)–এর মতে, যাকাতের টাকা দিয়ে যে বাঁদী গোলামকে আজাদ করা হয় তার হক্ব মুসলমানদের হবে অর্থাৎ এই আজাদ করা গোলামের মৃত্যুর পর তার যদি কোন ওয়ারিশ না থাকে তবে তার পরিত্যক্ত সম্পদ বয়তুল মাল তথা ইসলামী রাষ্ট্রের কোষাগারে জমা হবে। الرِّقَابِ এর ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরামের আরো একটি অভিমত রয়েছে। যাকাতের সম্পদের যে আংশটুকু এ পর্যায়ে ব্যয় হবে তাকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়, অর্ধেক মুসলিম মোকাতেবদের মুক্ত করার কাজে ব্যয় হবে, আর অর্ধেক দ্বারা মুসলিম গোলাম বাঁদীদের ক্রয় করে আজাদ করা হবে। এবনে আবি হাতেম এবং কিতাবুল আমওয়ালে

আল্লামা আবু ওয়ায়েদ বর্ণনা করেছেনঃ ইমাম জুহরী (রঃ) হযরত ওমর এবনে আবদুল আজিজকে এ কথাটি লিখে পাঠিয়েছিলেন।

মোহাম্মদ এবনে এছহাক বর্ণনা করেনঃ যখন হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) জুমার খোতবা দিচ্ছিলেন, তখন একজন মোকাতেব তাকে সম্বোধন করে বলল, আমার মুক্তি লাভের জন্যে অর্থ-সম্পদ সাহায্যের আবেদন করুন, তিনি আবেদন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে লোকেরা দান করতে লাগল। কেউ মাথার পাগড়ি দিয়ে দিলেন, কেউ হার, কেউ আংটি, কেউ নগদ। অল্পক্ষণের মধ্যে অনেক কিছু জমা হয়ে গেল।

হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) সবকিছু একত্রিত করে বিক্রি করে দিলেন। বিক্রয় লব্ধ অর্থ দ্বারা ঐ মোকাতেবের মুক্তিপণ আদায় করলেন। আর অবশিষ্ট অর্থ দ্বারা গোলাম বাঁদী ক্রয় করে মুক্ত করলেন।

وَالْغٰرِمِيْنَ

অর্থাৎ ঋণ গ্রস্থদের জন্য। সমস্ত ওলামায়ে কেরাম শব্দটির এই ব্যাখ্যাই করেছেন। তবে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ও অন্যান্য তত্ত্বজ্ঞানীগণ ঋণগ্রস্থদেরকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন।

১। সেই ঋণগ্রস্থ, যে ঋণ নিয়ে পাপকার্যে ব্যয় করেনি, এমন ঋণগ্রস্থ লোকের নিকট যদি ঋণ আদায়ের টাকা না থাকে তবে ঋণ আদায়ের পরিমাণ জাকাতের টাকা থেকে দেয়া যেতে পারে।

২। সেই ঋণগ্রস্থ যে ঋণ গ্রহণ করে কোন নেক কাজে বা মুসলমানদের মাঝে মীমাংসা করার কাজে ব্যয় করেছে সে ব্যক্তিগত ভাবে ধনী হলেও তার ঋণ জাকাতের খাত থেকে আদায় করা যেতে পারে।

৩। সেই ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি যে পাপাচারে ব্যয় করার জন্য ঋণগ্রস্থ হয়েছে, অথবা অপচয়ের জন্য, এমন ব্যক্তির ঋণ আদায়ের জন্যে যাকাতের টাকা দেয়া যাবেনা।

কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর মত হল, ঋণগ্রস্থ ব্যক্তির নিকট যদি ঋণ আদায়ের জন্য টাকা না থাকে সে যেমনই হোক না কেন তাকে যাকাতের টাকা দেয়া যাবে। ইমাম সাহেব বলেছেন, الغرمين শব্দটির মধ্যে এমন কোন শর্ত আরোপের ব্যবস্থা নেই الغرمين অর্থ ঋণগ্রস্থ। ঋণগ্রস্থ নেককার কি বদকার এমন কোন শর্ত কোরআনে করীমে নেই।

অনুরূপ মতভেদ ইমাম সাহেব (রহঃ) এবং অন্য ইমামদের মধ্যে সফরের মাসয়ালা সম্পর্কেও রয়েছে। সফর তিন প্রকার হতে পারে। নেককাজের জন্য, বৈধ

কাজের জন্য অথবা পাপকার্যের জন্য সফর। মুসাফিরের জন্য নামাজের কসর করা এবং রোজা কাজা করার যে সুযোগ রয়েছে অন্য ইমামদের মতে প্রথম দুই প্রকার সফরকারী তা ভোগ করবে। যার সফর গুণাহর কাজে হয় সে মুসাফির এই সুযোগ ভোগ করবে না। কিন্তু ইমাম সাহেব বলেন, সকল মুসাফিরই এই সুযোগ ভোগ করবে।

যদি কোন ব্যক্তির নিকট তার ঋণ আদায়ের প্রয়োজনের চেয়েও অধিক টাকা থাকে তবে ইমাম আজম আবু হানিফা (রহঃ) ইমাম মালেক (রহঃ) এবং ইমাম আহমদ (রহঃ)-এর মতে, এমন ব্যক্তিকে যাকাতের টাকা দেয়া যাবেনা। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, যদি ঐ ব্যক্তি সওয়াবের কাজের জন্য ঋণ গ্রহণ করে থাকে আর তার নিকট ঋণ আদায়ের টাকাও থাকে তবুও তাকে যাকাতের টাকা দেয়া যেতেপারে।

وَفِىْ سَبِيْلِ اللهِ

যারা আল্লাহর রাহে জেহাদের জন্য বের হন তাদেরকেও যাকাতের টাকা দেয়া যেতে পারে।

وَابْنِ السَّبِيْلِ

কারো নিকট বাড়ীতে অর্থ-সম্পদ আছে কিন্তু সে ভ্রমণরত অবস্থায় থাকার কারণ রিক্তহস্ত হয়ে পড়েছে। তার কাছে এমন টাকা নেই যার দ্বারা সে বাড়ী পৌছতে পারে এমন ব্যক্তিকে ابن السبيل বলা হয়। আর এমন ব্যক্তিকে যাকাত দেয়া যায়।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেনঃ যাকাতের ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল দারিদ্র। যেখানে দারিদ্র থাকে সেখানেই যাকাতের যোগ্যতা প্রমাণিত হয় শুধু যারা যাকাত উসূল করে তারা এর ব্যতিক্রম। কেননা তাদের ব্যাপারে দরিদ্র হওয়া শর্ত নয় তবে তারা দরিদ্রদের প্রতিনিধি আর প্রতিনিধি হিসেবে তারা যাকাত উসূলের ব্যাপারে যে শ্রম দিয়ে থাকে তারই বিনিময়ে তারা যাকাতের খাত থেকে নিজেদের অংশ গ্রহণ করে।

<u>যাকাত প্রদাণের ব্যাপারে প্রাধান্য কার?</u>

মূলতঃ কপর্দকহীন ব্যক্তিই জাকাতের উপযুক্ত। এজন্য সর্বপ্রথম আল্লাহ পাক ফকীরদের উল্লেখ করেছেন। অবশ্য যারা যাকাতের যোগ্য তাদের ব্যাপারে একের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেয়ার বিধানও আছে। যেমন যে মিসকিন কারো নিকট কিছু

চায় না তাকে প্রাধান্য হবে সেই মিসকিনের উপর যে ভিক্ষা করে বেড়ায় এমনিভাবে মুসাফির ফকিরকে বাড়ী ঘরে অবস্থানকারী ফকিরের উপর প্রাধান্য দেয়া হবে।

ঠিক এমনিভাবে গোলামকে আজাদ করার জন্যে ব্যয় করার মাধ্যমে অনেক কল্যাণের পথ উন্মুক্ত হয়। এমনিভাবে আত্মীয়তার বন্ধনও প্রাধান্য দেয়ার একটি কারণ। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, উত্তম সদকাহ হচ্ছেপ্রদানের পর কারো মুখাপেক্ষি হতে হয়না আর দান খয়রাত শুরু কর তোমার আপন পরিবারবর্গ থেকে।

(বোখারী)

হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, একটি দিনার হলো এমন যা তুমি আল্লাহর রাহে ব্যয় করেছ, আর একটি দিনার তুমি গোলাম আজাদ করার ব্যাপারে ব্যয় করেছ, আর একটি দিনার তুমি কোন মিসকীনকে দান করেছ, আর একটি দিনার তুমি তোমার পরিবার ভুক্ত লোকদের জন্য ব্যয় করেছ। সর্বাধিক সওয়াব সেই দীনারটির জন্য হবে যা তুমি তোমার পরিবারভুক্ত লোকদের জন্য ব্যয় করেছ।

(মুসলিম)

হযরত মায়মুনা বিনতে হারেস বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে আমি একটি বাঁদী আজাদ করেছিলাম। আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে বিষয়টি উল্লেখ করলাম। তিনি এরশাদ করলেনঃ তুমি যদি তোমার মামাদেরকে দিতে তবে অনেক সওয়াব হাসিল করতে।

(বোখারী ও মুসলিম)

হযরত সোলায়মান এবনে আমের বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, মিসকীনকে খয়রাত দেয়া একটি খয়রাত, আর আত্মীয়-স্বজনকে দানের মাধ্যমে দু'টি খয়রাত হয়। একটি (সাধারণ খয়রাত) আরেকটি হলো আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য করা।

(আহমদ, তিরমিজী, নেসায়ী, এবনে মাজাহ, দারেমী)

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত আবু তালহা (রাঃ) আরজ করেছেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! বেরোহা (এর বাগান) আমার সর্বাধিক পছন্দনীয় সম্পত্তি, আর এ বাগানটি আমি আল্লাহর রাহে দান করছি। আমি আশা করি এর নেকী আমার জন্যে আল্লাহ পাকের নিকট সঞ্চিত থাকবে। এখন আপনি আল্লাহ পাকের নির্দেশ মোতাবেক তা বিতরণ করুন। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আমি সমীচিন মনে করি যে, তুমি বাগানটি নিজের আত্মীয়-স্বজনকে দান কর। হুজুর

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মোতাবেক হযরত আবু তালহা (রাঃ) ঐ বাগানটি তাঁর নিকট আত্মীয়-স্বজন ও চাচাতো ভাইদের মাঝে বিতরণ করে দেন।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর মতে, পিতা তার সন্তানদেরকে এবং সন্তান তার পিতা মাতাকে, স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে যাকাত দিতে পারেনা। কেননা, যাকাতের জন্যে শর্ত হ'ল যাকাত গ্রহীতাকে মালিকানা প্রদান করা, আর উল্লেখিত ক্ষেত্র সমূহে মালিকানা যৌথ থাকে। তাই এ সব ক্ষেত্রে দেয় যাকাতের মালিকানা শুদ্ধ হয়না। অর্থাৎ সম্পদ একজনের মালিকানা থেকে বের হয়ে অন্যজনের মালিকানায় পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করেনা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ "তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার।" তবে এ ছাড়া অন্য আত্মীয়-স্বজনকে যাকাত দেয়া যায়; বরং আত্মীয়-স্বজনকে যাকাত দেয়া উত্তম। কেননা, এতে আত্মীয়তার হক্ব আদায় হয়, এর পাশাপাশি দান করাও হয়। এজন্যে ভাই-বোন, চাচা-ফুফু, মামা-খালা সকলকেই যাকাত দেয়া যায়। কোন ব্যক্তি যদি তার কোন দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনের ব্যয়ভার বহন করে অথচ কাজী তার প্রতি এ দায়িত্ব অর্পন করেনি, এমন অবস্থায় সে যদি ঐ দরিদ্র আত্মীয়র ব্যাপারে সমস্ত ব্যয় যাকাতের নিয়তে করে তবে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। তবে কাজী যদি ঐ ব্যক্তির ব্যয় ভারের দায়িত্ব সম্পদশালী লোকটির উপর অর্পন করে আর সে তাকে লালন পালন করে তবে এমন ক্ষেত্রে তার ব্যাপারে দেয় খরচ যাকাত হিসেবে আদায় হবে না। কেননা, কাজী বা বিচারক যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, তার উপর আমল করা একটি কর্তব্য, আর যাকাত আদায় করা আরেকটি কর্তব্য। একটি কর্তব্যের মধ্যমে আর একটি কর্তব্য আদায় করা সম্ভব নয়।

ইমাম মালেক (রঃ), ইমাম শাফেয়ী (রঃ), ইমাম আহমদ (রঃ)-এর মতে, এমন আত্মীয়-স্বজনকে যাকাত দেয়া জায়েয নয় যাদের লালন পালনের দায়িত্ব অর্পিত হয় যাকাত দাতাদের প্রতি, ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) এবং ইমাম মোহাম্মদ (রঃ) এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর সাথে একমত যে, যৌথ মালিকানা যাকাত আদায়ের ব্যাপারে বাঁধাস্বরূপ, তবে তাঁরা একখানি হাদীসের অনুসরণে এ মত পোষণ করেন। হযরত জয়নাব (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মসজিদে দেখলাম, তিনি এরশাদ করছিলেন, হে মহিলা সমাজ! তোমরা সদকাহ দিতে থাক এমনকি, যদি নিজের অলংকার দিয়ে হয় তবুও। আমি (আমার স্বামী) আবদুল্লাহর ব্যয়ভারও বহন করতাম এবং কিছু এতীমের দায়িত্ব আমার উপর ছিল। আমি আবদুল্লাহকে বললাম, আপনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করুন জয়নব আবদুল্লাহর এবং কিছু এতীমের প্রতি যে ব্যয় করে তা দ্বারা তার যাকাত আদায় হবে?

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বললেনঃ তুমি নিজেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা কর।

তখন আমি তাঁর নিকট হাজির হলাম। সেখানে গিয়ে আর একজন আনসারী মহিলাকে পেলাম, তারও একই সমস্যা। এমন সময় হযরত বেলাল (রাঃ)-কে অতিক্রম করতে দেখলাম। আমি তাঁকে বললাম, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করুন যে, আমি আমার স্বামী এবং যেসব এতীমদেরকে লালন পালন করি তাদেরকে যদি আমার সম্পদের সদকাহ দান করি তবে তা কি আমার জন্য যথেষ্ট হবে? কিন্তু আমাদের নাম বলবেন না।

হযরত বেলাল (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে মাসয়ালা জানতে চাইলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ এ দুজন মহিলা কে?

হযরত বেলাল (রাঃ) আরজ করলেনঃ একজন জয়নাব। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কোন্ জয়নাব?

হযরত বেলাল (রাঃ) আরজ করলেনঃ আবদুল্লাহর স্ত্রী। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ হ্যাঁ, তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব হবে।

(১) আত্মীয়তার জন্য আর

(২) সদকাহর জন্য।

হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, একদিন ফজরের নামাজের পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মেয়েদের দিকে তশরিফ নিয়ে গেলেন এবং বললেনঃ হে নারী সমাজ! জ্ঞানবুদ্ধি এবং দ্বীনদারীর স্বল্পতা তোমাদের চেয়ে কম আর কারো মধ্যে দেখিনি। আমি দেখেছি যে, কেয়ামতের দিন দোজখীদের মধ্যে তোমাদের সংখ্যাই অধিক। তাই তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহর রাহে দান করার চেষ্টা কর। মহিলাদের দলের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদের স্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। এ কথা শ্রবণ করা মাত্র তিনি হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদের নিকট আসলেন, আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট যা শ্রবণ করেছিলেন তা বর্ণনা করলেন। এরপর তাঁর চাদরটি নিয়ে তিনি রওয়ানা হলেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ (অলংকার এবং পোষাক) নিয়ে কোথায় যাচ্ছ? তিনি বললেনঃ আমি এসব দান খয়রাত করে আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূলের নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করবো। হয়ত আল্লাহ পাক আমাকে দোজখ থেকে রক্ষা করবেন।

আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বললেনঃ তুমি এদিকে আস। এসব আমার এবং আমার সন্তানদের প্রতি ব্যয় কর। (আল্লাহ পাক তোমাকে সওয়াব দান করবেন।) তাঁর

স্ত্রী বললেনঃ আল্লাহর শপথ। এমনটি হতে পারেনা। আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করে নিব।

যখন হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর স্ত্রী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ তার এবং তার সন্তানদের প্রতি তুমি ব্যয় কর তারা এ ব্যয়ের সঠিক স্থান।

ইমাম বোখারী (রঃ) হযরত আবু সাইদ খুদরী (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, ঈদুল ফিতর অথবা ঈদুল আজহার দিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঈদগাহে তশরিফ নিয়ে গেলেন। নামাজের পর লোকদেরকে নসিহত করলেন এবং সদকাহ খয়রাত দানের আদেশ দিলেন। এরপর মহিলাদের দিকে গমন করে তাদের উদ্দেশ্যে বললেনঃ হে মহিলা সমাজ! তোমরা সদকাহ খয়রাত কর। আমাকে দেখানো হয়েছে যে, দোজখে তোমাদের সংখ্যা অধিক পরিমানে রয়েছে। মহিলারা জিজ্ঞাসা করলোঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এমন কেন হলো? তিনি এরশাদ করলেনঃ তোমরা অনেক বেশী লানত করে থাক। আর স্বামীদের প্রতি অকৃতজ্ঞ হও। (আল-হাদীস)

এই হাদীসেও রয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর স্ত্রী বলেছেন, আমার নিকট অলংকার আছে, আমি তা দান করতে চাই। হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ আমি এবং আমার সন্তানরা এর বেশী হক্বদার। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ এবনে মাসউদ ঠিকই বলেছে। তোমার সন্তানেরাই অন্যদের চেয়ে এ দানের অধিকতর হক্বদার, দান গ্রহিতাদের মধ্যে প্রাধান্য দেয়ার ব্যাপারে আরো একটি বিষয় হলো প্রতিবেশী হওয়া অর্থাৎ জকাত, সদকাহ খয়রাতের বিতরণের ব্যাপারে যেমন আত্মীয় স্বজনদের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়, ঠিক তেমনিভাবে প্রতিবেশীর প্রতিও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখতে হয়। কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

ولجارك عليك حق

তোমার প্রতিবেশীর প্রতি রয়েছে তোমার দায়িত্ব।

তিনি আরো এরশাদ করেছেনঃ

احسن الى جارك تكن مؤمنا

তোমার প্রতিবেশীর প্রতি এহসান করো, তাহলে তুমি হবে প্রকৃত মোমেন।

যাকাত সদকাহ বিতরণের ব্যাপারে গ্রহিতাদের মধ্যে প্রাধান্য দেয়ার সম্পর্কে আরো একটি কারণ হলো "সাহায্য চাওয়া" যেমন পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

আর সাহায্য প্রার্থীকে তুমি ধমকি দিওনা। এ সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন সাহায্য প্রার্থীর হক্ব রয়েছে যদিও সে অশ্বে আরোহন করে আসে।

(আহমদ ও আবু দাউদ)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমি কি তোমাদের বলবোনা, সবচেয়ে মন্দ ব্যক্তি কে? সবচেয়ে মন্দ ব্যক্তি সে, যার নিকট আল্লাহর নামে চাওয়া হয় এবং সে না দেয়।

দান গ্রহিতাদের মধ্যে প্রাধান্য দেয়ার আরো কিছু উপকরণ রয়েছে। যেমন, এতিম এবং বন্দী হওয়া। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এ সম্পর্কে এরশাদ করেছেনঃ

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا

আর তারা খাবার খাওয়ায় আল্লাহর মহব্বতে মিসকিন, এতিম এবং বন্দীদেরকে। অথবা এর অর্থ হলো খাবারের প্রতি অত্যন্ত আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও তারা মিসকিন, এতিম এবং বন্দীদেরকে খাবার খাওয়ায়।

প্রিয়নবী (দঃ) ও তাঁর আল্—আওলাদের জন্য যাকাত সদকাহ হারাম

এখানে এ কথা উল্লেখযোগ্য যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর আল-আওলাদের জন্যে যাকাত সদকাহ অবৈধ ছিল এমনকি, তাঁর খান্দান বণী হাসেমের জন্যও যাকাত হারাম ছিল। হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে কোন খাবার পেশ করা হলে তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, এগুলো হাদীয়া না সদকাহ? যদি বলা হত সদকাহ, তখন তিনি এরশাদ করতেন, তোমরা খাও। তিনি নিজে সেগুলো গ্রহণ করতেন না, আর যদি বলা হত হাদিয়া তখন তিনি হাত বাড়িয়ে দিতেন এবং সাথীদের সাথে নিজেও আহার করতেন, এমনিভাবে তাঁর পরিবার বর্গের জন্যও সদকাহ হালাল ছিল না।

হযরত আবু হোরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত হাসান এবনে আলী (রাঃ) একটি সদকাহর খেজুর মুখে দিয়ে ফেলেছিলেন। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সংগে সংগে তা মুখ থেকে বের করে দেয়ার আদেশ দিয়ে এরশাদ করলেন, আমরা সদকাহ খেতে পারি না, আর এমনিভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খানদান তথা বণী হাসেমের জন্য যাকাত হারাম ছিল। বণী হাসেমের

মধ্যে আলে-আলী, আলে-আব্বাস, আলে-জাফর, আলে-আকীল, আলে-হারেস এবনে আবদুল মোত্তালেব। এই মত হলো ইমামে আজম (রহঃ) এবং ইমাম মালেক (রহঃ)-এর। আর ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর মতে বণী মোত্তালেবও বণী হাসেমের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত তিনি বলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ থেকে নিকটাত্মীয় হিসেবে বণী মোত্তালেবকেও অংশ দান করতেন।

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ও ইমাম মোহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে, বণী হাসেমের গোলামদের জন্য যাকাত হারাম। কেননা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমাদের জন্য সদকা-হালাল নয় এবং কোন সম্প্রদায়ের গোলামও ঐ সম্প্রদায়েরই অর্ন্তভুক্ত হয়।[১]

فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ

অর্থাৎ আলোচ্য আয়াতে যা কিছু বর্ণিত হলো তা আল্লাহর বিধান তথা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে,এ বিধানকে মেনে চলা অবশ্য কর্তব্য।

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

আর আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময় অর্থাৎ আল্লাহ পাক সকলের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত তাই তাঁর সিদ্ধান্ত হেকমতপূর্ণ, তাৎপর্যবহ।

একটি রহস্য

যাকাতের খাত হলো আটটি। আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় এ আটটি খাতের উল্লেখ করেছেন। তবে প্রথম চারটি খাতকে 'আলিফ লাম' দ্বারা সুনিদৃষ্ট করেছেন। আর পরের চারটি খাতে 'আলিফ লামে'র স্থলে فِى শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর কারণ এই প্রথম চারটি খাত তথা-

لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ

অর্থাৎ ফকীর মিসকিন এবং যাকাত তহশীলের কাজে নিয়োজিত কর্মচারী আর যাদের চিত্তাকর্ষণ উদ্দেশ্য। এর তাৎপর্য হচ্ছে, এ চার দল লোক যাকাতের হক্বদার, তাই হক্বদার হিসেবে তাদেরকে 'আলিফ লাম' দ্বারা নির্দৃষ্ট করা হয়েছে, আর এর পর যাদের উল্লেখ করা হয়েছে তাদেরকে কি কারণে যাকাত দেয়া হবে তা فِى শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে। যেমন, গোলামী থেকে মুক্তি লাভ করা, ঋণের বোঝা থেকে আত্মরক্ষা করা এবং আল্লাহর রাহে জেহাদ করা ও অসহায় পথিক মুসাফিরের সফর সম্পূর্ণ করা। এসব কারণে তারা যাকাত পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে এ সব কারণ না থাকলে তারা যাকাত লাভের যোগ্যতা হারাবে।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৪১

পক্ষান্তরে, ফকীর মিসকীন, যাকাত তহসীলদার এবং যাদেরকে তাদের চিত্তাকর্ষণের জন্য যাকাত প্রদান করা হয়, তারা প্রকৃত পক্ষেই যাকাত লাভের যোগ্য।[১]

وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী কয়েকটি আয়াতে মোনাফেকদের মূর্খতা, পথভ্রষ্টতা, ধোকাবাজী, ছলচাতুরী এবং তাদের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। এরপর মোনোফেকরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যাকাত সদকাহ ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বিতরণের ব্যাপারে যে ভীত্তিহীন, বানোয়াট অভিযোগ উথাপন করেছিলো তার জবাব এবং যাকাত সদকাহ বিতরণের বিধান পেশ করা হয়েছে যাতে করে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে পন্থায় অর্থ-সম্পদ বিতরণ করেছেন তা তাঁর ইচ্ছায় নয়; বরং স্বয়ং আল্লাহ পাকেরই বিধান তথা মর্জি মোতাবেকই করেছেন। অতএব, তাঁর কার্যক্রমের উপর প্রশ্ন উথাপন করার কারো কোন অধিকার নেই।

আলোচ্য আয়াতে পূনরায় মোনাফেকদের অপকর্মের বিবরণ স্থান পেয়েছে। মোনাফেকদের সবচেয়ে বড় অপরাধ ছিল এই যে, তারা ছিল বেআদব। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে বেআদবী করাই ছিল তাদের অন্যতম কর্মসূচী।

শানে নজুল

এবনে আবী শায়বা, এবনুল মুনজের, এবনে আবী হাতেম মুজাহেদের বর্ণনা এবং এবনে আবী হাতেম সুদ্দীর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু মোনাফেক একত্রিত হয়। তাদের মধ্যে হাল্লাস এবনে সোয়াইদ, এবনে সামেত, মখশী এবনে হোমাইর এবং ওদীয়া এবনে সাবেত ছিল। তারা ইচ্ছা করলো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে বেআদবী করতে এবং তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে। তাদের মধ্যে একজন বললো, তোমরা এমন মন্দ কাজ করোনা। সে বললো, আমার ভয় হচ্ছে এ খবর মোহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) নিকট পৌছে যাবে, এরপর তোমরা তাঁর দৃষ্টিতে অপরাধী হবে। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি বললো, মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তো শুধু কর্ণ, তিনি সকলের ওজর আপত্তি শ্রবণ করেন, আমরা শপথ করবো এবং তিনি আমাদেরকে সত্যবাদী মনে করবেন। হাল্লাস বললো, আমরা যা ইচ্ছা তা বলবো এরপরে তার নিকট গিয়ে আমাদের কথা অস্বীকার করবো এবং আমরা শপথ করে নিব আর তিনি আমাদের কথা সত্য বলে মেনে নিবেন, কারণ

(১) তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৬৩
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৩২

মোহাম্মদতো (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কর্ণসর্বস্ব। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, নাবতাল এবনে হারেস্ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে বসে তাঁর কথা শ্রবণ করে মোনাফেকদের নিকট তা বর্ণনা করতো,তখন আল্লাহ পাক তার সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল করেন।

মোহাম্মদ এবনে এসহাক লিখেছেন, এই নাবতাল লোকটি অত্যন্ত কৃষ্ণ বর্ণের, লম্বা ছিল অনেক বেশী, তার চোখ থাকতো সর্বদা লাল, অত্যন্ত কুৎসিত চেহারা বিশিষ্ট ছিল। তার সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,"শয়তানকে দেখার যদি কারো ইচ্ছা হয় তবে তাকে দেখে নেবে।" এই লোকটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথা মোনাফেকদেরকে চুপি চুপি শুনিয়ে দিত তাকে বলা হয়েছিলো, তুমি এমন কাজ করো না তখন সে বলেছিলো মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামতো শুধু কর্ণ, তাঁর কাছে যে যা বলে মেনে নেন, আমরা যা ইচ্ছা তা বলবো। এরপর মিথ্যা শপথ করে নিব আর যা বলেছি তা অস্বীকার করবো।

তিনি তো কর্ণ সর্বস্ব। যা কিছু তোমরা তার নিকট যা বল, তাই বিশ্বাস করবে। অতএব, আমরা যা কিছু বলি না কেন, তিনি আমাদেরকে সত্যবাদী মনে করবেন। তখন এ আয়াত নাজিল হয়েছে। আল্লাহ পাক তাদের জবাবে এরশাদ করেছেনঃ

وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ

এবং তাদের কিছু লোক নবীকে কষ্ট দেয় এবং বলে তিনি কান সর্বস্ব। হে রসূল! আপনি বলে দিন তোমাদের কল্যাণার্থেই তিনি কান সর্বস্ব, আল্লাহ পাকের প্রতি তিনি বিশ্বাস রাখেন এবং মোমেনদের কথায় তিনি বিশ্বাস করেন। আর ঈমানদারদের জন্য তিনি হলেন রহমত। যারা আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয়, তাঁর দুর্ণাম রটায় তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

এই আয়াতে একদিকে মোনাফেকদের কথার জবাব দেয়া হয়েছে অন্যদিকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। মোমেনদের সম্পর্কে তিনি ভাল ধারণা রাখেন। যে ঈমানের কথা প্রকাশ করে,তাকে সত্যবাদী মনে করেন কিন্তু মোনাফেকদেরকে সত্যবাদী মনে করেন না। তবে তারা ওজর আপত্তি পেশ করলে তা গ্রহণ করেন।

প্রিয়নবী (দঃ) হলেন তোমাদের জন্য রহমত

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানের কথা প্রকাশ করে তাদের জন্য তিনি রহমত স্বরূপ। যেহেতু তিনি তোমাদের জন্য রহমত এবং অতীব দয়াবান, তাই তোমাদের সঙ্গে তিনি বিনম্র ব্যবহার করেন, কোন ওজর আপত্তি পেশ করলে তা গ্রহণ করেন।

অথবা এর অর্থ

হলো তোমাদের মধ্যে যারা প্রকৃত মোমেন তাদের জন্য তিনি জীবন্ত রহমত। তোমাদেরকে তিনি কুফরের অন্ধকার থেকে বের করে হেদায়েতের আলোর দিকে নিয়ে আসেন। তিনিই মানব দরদী, মানবতার কল্যাণ সাধনই তাঁর লক্ষ্য। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত মনযোগ সহকারে তোমাদের কল্যাণের কথা শ্রবণ করেন, তোমাদের ক্ষতির কথা শ্রবণ করেন না। গীবত সেকায়েত, কুৎসা রটনা, পরনিন্দা, পরচর্চা, চোগলখোরী প্রভৃতি শ্রবণ করেননা। কেউ যদি তার ওজর আপত্তি বা কৈফিয়ৎ পেশ করে তবে তা শ্রবণ করেন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মোমেন হয় সরল প্রকৃতির এবং ভদ্র, আর কাফের হয় খবীস, নীচ এবং মন্দ।

(আবু দাউদ, তিরিমিজি)

يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ

তিনি আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস রাখেন এবং মোমেনদের কথায়ও আস্থা স্থাপন করেন।

তিনি কেয়ামতের দিন তোমাদের জন্য শাফায়াত করবেন এবং দোজখ থেকে মুক্ত করে জান্নাতে নিয়ে যাবেন।

এর দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর অসাধারণ ভদ্রতা নম্রতা, উদারতা এবং মহানুভবতার কারণে মিথ্যাবাদীর মিথ্যাবাদীতা, ধোকাবাজের ধোকাবাজি উপলব্ধি করেও তা তার মুখের উপর প্রকাশ করতেন না। এ কারণে নির্বোধ মোনাফেকরা মনে করতো তিনি হয়ত কিছুই বুঝতে পারেননি অথচ এটি ছিল তাদের ভুল ধারণা, তাঁর মহান আদর্শকে এবং তাঁর মধুর ব্যবহারকে তারা মূল্যায়ন করতে অক্ষম হয়েছে এবং তাঁকে কান-সর্বস্ব বলার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। আল্লাহ পাক তারই জবাবে এরশাদ করেছেনঃ তাঁর এই উদারতা এবং মহানুভবতাকে তোমরা যদি কান-সর্বস্বতা বল তবে তা-ও তোমাদের উপকারার্থেই, তোমাদেরকে অপমানের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যেই।

এরপর আল্লাহ পাক এ দূরাত্মা মোনাফেকদের শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেনঃ

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦١﴾

যারা আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ

কখন কখন এমনও হতো দূরাত্মা মোনাফেকদের প্রতারণা ধোকাবাজি তাদের সম্মুখে ধরিয়ে দিলে তারা বলতো আল্লাহর কসম, আমাদের নিয়তে কোন দোষ নেই। আমাদের উদ্দেশ্য অত্যন্ত মহৎ, এ কথা আল্লাহ পাক জানেন, এভাবে তারা মুসলমানদেরকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করতো। অথচ তাদের কর্তব্য ছিল আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূলকে সন্তুষ্ট করা, তার জন্যে সর্বপ্রথম কর্তব্য হলো প্রকৃত মোমেন হওয়া। মিথ্যা শপথ করে কোন অবস্থাতেই আল্লাহ পাককে রাজি করা যায় না। কেননা, আল্লাহ পাকের দরবারে কোন কিছুই গোপন নেই। তাই যদি তারা প্রকৃত মোমেন হতো, আর আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলকে সন্তুষ্ট করতে সচেষ্ট হতো তবে তা-ই হতো তাদের জন্য উত্তম। কিন্তু তারা যেহেতু প্রকৃত মোমেন হয়নি তাই আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলকেও সন্তুষ্ট করেনি।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতও সেই মোনাফেকদের সম্পর্কেই নাজিল হয়েছে যারা তাবুকের যুদ্ধে শরীক হয়নি, আর এজন্যে মিথ্যা ওজর আপত্তির আশ্রয় নিয়েছে যেন মোমেনদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারে। অথচ তাদের কর্তব্য ছিল কৃত অন্যায় থেকে তওবা করে প্রকৃত মোমেন হয়ে আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করা।[১]

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-১১৮

أَلَمْ يَعْلَمُوٓا أَنَّهُۥ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَأَنَّ لَهُۥ نَارَ
جَهَنَّمَ خَٰلِدًا فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْخِزْىُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٦٣﴾ يَحْذَرُ ٱلْمُنَٰفِقُونَ
أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِى قُلُوبِهِمْ ۚ قُلِ
ٱسْتَهْزِءُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿٦٤﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ
لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ
كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ ۚ
إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةًۢ بِأَنَّهُمْ كَانُوا
مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾

তরজমা

(৬৩) তারা কি জানেনা যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের সাথে সংঘর্ষ বাধায় তার জন্যে রয়েছে দোজখের অগ্নি, যেখানে সে চিরকাল থাকবে, এটিইতো চরম অবমাননা।

(৬৪) মোনাফেকরা ভয় করে যে, মুসলমানদের প্রতি এমন কোন সূরা নাজিল না হয়ে যায় যা মোনাফেকদের মনের কথা মুসলমানদেরকে জানিয়ে দেয়।

(হে রসূল!) আপনি বলে দিন, তোমরা বিদ্রুপ করতে থাক, তোমরা যা কিছুর ভয় কর আল্লাহ পাক তা অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন।

(৬৫) (হে রসূল!) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন তবে তারা বলবে, আমরাতো শুধু আলাপ আলোচনা এবং তামাসা করছিলাম মাত্র, (হে রসূল!) তবে কি তোমরা আল্লাহ পাক ও তাঁর নিদর্শন সমূহ এবং তার রসূলকে বিদ্রুপ করছিলে?

(৬৬) টালবাহানা করোনা, তোমরা তো ঈমান আনয়নের পর কাফের হয়েছ, তোমাদের এক দলকে যদি আমি ক্ষমাও করি কিন্তু অন্য দলকে আমি অবশ্যই শাস্তি দেব কেননা, তারা ছিল অপরাধী।

তফসীরুল কোরআন

মোনাফেকরা কি জানেনা যে, যে ব্যক্তিই আল্লাহপাক ও তাঁর রসূলের বিরোধীতা করবে, আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধাবে, তাকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। আর এটি সবচেয়ে বড় অপমান। ইমাম রাজী (রঃ) আলোচ্য আয়াতের يحادد শব্দটির একাধিক ব্যাখ্যাকরেছেন।

يخالف الله يحادد الله

অর্থাৎ যে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের বিরোধীতা করে। আর শব্দটি এ অর্থেও ব্যবহৃত হয় يحارب الله অর্থাৎঃ যে আল্লাহ পাকও তাঁর রসূলের সঙ্গে লড়াই করে। অথবা يعادى الله (অর্থাৎ) যে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের সঙ্গে শত্রুতা করে। মোনাফেকরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সর্বদাই শত্রতা করত, তাঁর সঙ্গে তারা লড়াইও করত, আর সর্বদা তাঁর বিরোধিতা করত। তাই তাদের জন্যে শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে যে, তারা দোজখের শাস্তি ভোগ করবে এবং চিরদিন তাদেরকে দোজখে থাকতে হবে।

أَلَمْ يَعْلَمُوٓا أَنَّهُۥ

ইমাম রাজী (রঃ) আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে বলেছেনঃ এ আয়াতের বর্ণনাশৈলী এ কথার দিকে ইঙ্গিত করে যে, এত সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত আল্লাহর রসূল তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন এতদসত্ত্বেও তারা এ কথাটুকু উপলব্ধি করতে পারেনি যে, যারাই আল্লাহর রসূলের বিরোধীতা করবে তাদের জন্যে রয়েছে দোজখের কঠিন এবং চিরস্থায়ী শাস্তি।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ ইয়াজিদ এবনে হারুন বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) একদিন একটি ভাষণ দেন, সেই ভাষণে তিনি বলেন, আল্লাহ পাকের সম্মুখে তার এক বান্দাকে দাঁড় করানো হবে, দুনিয়াতে যাকে অগাধ অর্থ-সম্পদ, অনেক নেয়ামত প্রদান করা হয়েছিল, তাকে সাস্থ্যের নেয়ামতও দেয়া হয়েছিল, তখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে তুমি এ দিনের জন্যে কি নেক আমল করে পাঠিয়েছ? সে কোন নেক আমল দেখতে পাবেনা কেননা, সে কোন নেক আমলই পাঠায়নি, তাই কাঁদতে থাকবে। তার নয়নযুগল থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকবে। এরপর তাকে লজ্জা দেয়া হবে,

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-১১৯-২০

তফসীরে মাজেদী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪১১

অপমানিত করা হবে। তখন সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দোজখে প্রেরণ করুন এবং এ স্থান থেকে আমাকে নাজাত দিন। এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।[১]

مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا ؕ

তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

ذٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْمُ ۝

এটি অত্যন্ত বড় অপমান।

এ আয়াতে আল্লাহর অবাধ্য কাফের ও মোনাফেকদের জন্যে দু'টি শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে। (এক) দোজখ (দুই) চিরদিন দোজখে থাকার শাস্তি।

يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ

মোনাফেকরা তাদের আমলে প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যে সব ষড়যন্ত্র করত এবং তাঁর সম্পর্কে যে সব কটাক্ষ করত সে ব্যাপারে তারা সর্বদা ভীত সন্ত্রস্থ থাকত। যদিও তারা তাদের যাবতীয় কার্যক্রমের গোপনীয়তা রক্ষা করতে স্বচেষ্ট থাকত যে, হয়তো আল্লাহ পাক তাদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাজিল করে তাদের মুখোশ খুলে দেবেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উদারতা এবং মহানুভবতার কারণে তারা কিছুটা আশ্বস্ত ছিল যে, হয়তো তিনি তাদেরকে অপমানিত করবেন না। কিন্তু তাদের ভয় ছিল পবিত্র কোরআন সম্পর্কে। যদি আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনের কোন আয়াত নাজিল করে তাদের সকল গোপন রহস্য জনসমক্ষে ফাস করে দেন তখন তাদের কি অবস্থা হবে? এজন্যে তাদের বুক কম্পিত থাকত। সাধারণতঃ অপরাধী মনের এ অবস্থাই হয়।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, মোনাফেকরাতো কাফের, এমন অবস্থায় তারা পবিত্র কোরআনের আয়াতকে কেন ভয় করবে? তফসীরকারগণ এর জবাব দিয়েছেন। মোনাফেকরা যদিও আল্লাহর রসূলকে মানত না, তাঁর দ্বীনকে অস্বীকার করত, কিন্তু

১। তফসীরে মাজেদী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৪৪
খোলাসাতুত্তাফাসীর, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫৫

তারা লক্ষ্য করেছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অনেক সময় তাদের মনের এমন কথা বলে দিয়েছেন যা তারা গোপন রেখেছে। এজন্যে তাদের অন্তরে ভয় সৃষ্টি হয়েছিল।

দ্বিতীয়তঃ তিনি যে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রেরিত রসূল এ কথা তারা সঠিক ভাবে উপলব্ধি করত। কিন্তু প্রতিহিংসা এবং শত্রুতার কারণে তারা তাঁকে অস্বীকার করত, আর এজন্যে তাদের অন্তরে ভয় হ'ত।

তৃতীয়তঃ আয়াতের অর্থ হ'ল এরূপ–মোনাফেকদের ভয় করা উচিৎ যে, যে কোন সময় আল্লাহ পাক কোরআনে করীমের আয়াত নাজিল করে তাদের মুখোশ খুলে দেবেন, তাদের চেহারার উপরে মিথ্যা ধোকার যে অবগুণ্ঠন রয়েছে তা সরিয়ে দেবেন এ ভয়ে সর্বক্ষণ ভীত সন্ত্রস্ত থাকত, তাই পরবর্তী বাক্যে তাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

قُلِ اسْتَهْزِءُوْا اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ ۝

হে রসূল! আপনি মোনাফেকদের জানিয়ে দিন তোমরা উপহাস করতে থাক কেননা, তারা সর্বদা ইসলামকে এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে উপহাস করত। তাই কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এরশাদ হয়েছেঃ তোমরা যত বিদ্রুপ বা উপহাস করনা কেন, অবশেষে আল্লাহ পাক তোমাদের সকল গোপন পরামর্শ এবং ষড়যন্ত্র, বিদ্রুপ এবং উপহাস অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন আর তার শাস্তিও তোমরা ভোগ করবে।

হাসান (রঃ) বলেছেনঃ বার জন মোনাফেক তাদের মোনাফেকী কার্যক্রম সম্পর্কে কুপরামর্শের উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়। হযরত জীব্রাঈল (আঃ) এ সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অবহিত করেন এবং তাদের নামও তাঁকে জানিয়ে দেন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন, কিছু লোক এমন অসৎ উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়। অতএব, তারা এখন মজলিশে দণ্ডায়মান হোক এবং অপরাধ স্বীকার করুক ও আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করুক, তাহলে আমি তাদের জন্যে সুপারিশ করব, কিন্তু তাদের কেউ দণ্ডায়মান হয়নি। এরপর হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রত্যেকের নাম নিয়ে বললেন, অমুক দাড়াও, অমুক দাড়াও, তখন তারা স্বীকার করল এবং ক্ষমাপ্রার্থী হ'ল। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন, যখন আমি দাড়াতে বলেছিলাম, তখন তোমরা দাড়াওনি, অথচ আমার ইচ্ছা ছিল তোমাদের

জন্যে সুপারিশ করব আর আল্লাহ পাকও সেই সুপারিশ কবুল করতেন, কিন্তু এখন তোমরা আমার নিকট থেকে বের হয়ে যাও। তিনি একথা বলতে থাকলেন অবশেষে তারা সকলে বের হয়ে যায়।[১]

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহ পাক সত্তর জন মোনাফেকের নাম পরিচয় উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু এর পর আল্লাহ পাক দয়া করে এ আয়াত সমূহ মনসুখ করে দিয়েছেন যেন তাদের বংশধরদের মধ্যে যারা খাঁটি মুসলমান হয়েছে তাদেরকে মানুষ এই মর্মে লজ্জা না দেয় যে, তোমার পিতা, পিতামহ অমুক মোনাফেক ছিল।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, এই আয়াত নাজিল হয়েছে সেই বারো জন মোনাফেকের সম্পর্কে যারা একটি উপত্যকায় উপর আরোহন করে এই অসৎ উদ্দেশ্যে জড় হয়েছিল যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তন করবেন তখন হঠাৎ তাঁর উপর আক্রমন করবে। কিন্তু হযরত জিব্রাঈল (আঃ) পূর্বাহ্নেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অবহিত করেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) এই ঘটণার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। ইমাম আহমদ (রঃ) হযরত আবু তোফায়েলের সূত্রে, বায়হাকী হযরত হোজায়ফার সূত্রে আর এবনে সাদ হযরত জুবাইর এবনে মাতআমের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন পথ অতিক্রম করছিলেন তখন মোনাফেকরা পরামর্শ করে এই সিদ্ধান্ত করলো যে, উপত্যকায় উপর আরোহন করার পর হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সেখান থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা করবো। এই পরামর্শের পর তারা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। যখন তিনি উপত্যকায় আরোহনের ইচ্ছা করলেন তখন মোনাফেকরাও তাঁর সংগী হলো। আল্লাহ পাক হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে অবগত করলেন। তাই তিনি যখন সেখানে আরোহন করতে লাগলেন তখন একজন ঘোষক এই ঘোষণা করলেন, রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উপত্যকার পথে গমন করছেন, খবরদার! কেউ যেন এ পথে গমন না করে, সকলেই যেন ময়দানের পথে যায়, তোমাদের জন্য ঐ পথই সহজ। নির্দেশ মোতাবেক সকলেই ময়দানের পথ অবলম্বন করলো। কিন্তু যে মেনোফেকরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিলো তারা এ আদেশ অমান্য করল। তারা তাদের ষড়যন্ত্র সফল করার জন্যে তৈরী হল। কাপড় দ্বারা চেহারা ঢেকে দিল এবং উপত্যকায় আরোহন করে আত্মগোপন করে রইলো। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উষ্ট্রীর রশি ধরে অগ্রসর হচ্ছিলেন হযরত আম্মার এবনে ইয়াসির (রাঃ) আর পেছনে ছিলেন হযরত হোযায়ফা এবনে ইয়ামান (রাঃ)। হঠাৎ আত্মগোপনকারী

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-১৩১

লোকদের কিছু শব্দ অনুভূত হলো। তখন সংগীগন বর্শা হাতে নিয়ে নিলেন এবং উষ্ট্রীকে দ্রুত এগিয়ে নিলেন। রাতের অন্ধকার অত্যন্ত বেশী ছিল।

হযরত হামজা এবনে আমর আসলামী (রাঃ) তাঁর নিকট পৌছলেন। হযরত হামজা (রাঃ) বর্ণনা করেন, যখন আমি উপত্যকায় আরোহন করলাম তখন আমার পাঁচটি অংগুল প্রদীপের ন্যায় আলোকিত হলো যার আলোকে আমি কোড়া, রশি এবং অন্যান্য মালপত্র দেখে একত্রিত করলাম। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত হোজায়ফা (রাঃ)-কে আদেশ দিলেন এ পথে আগমনকারীদেরকে ফেরত দিয়ে দাও। হযরত হোজায়ফা (রাঃ)-এর নিকট একটি লাঠি ছিল। তিনি এই লাঠি দিয়ে যারা আসছিলো তাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর দুশমনেরা। এ দিকেই থাক। এরা জানতে পেরেছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের ইচ্ছা সম্পর্কে অবগত হয়েছেন, তাই অতি দ্রুত সেখান থেকে অবতরণ করে এবং অন্য লোকদের সংগে মিশে যায়। হযরত হোজায়ফা (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ হোজায়ফা উষ্ট্রীকে মার আর আম্মার তুমি পদব্রজে চল। সকলে দ্রুতবেগে অগ্রসর হলেন। তারা উভয়ে উপত্যকার কাছে পৌছলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে বের হয়ে তাদের অপেক্ষা করতে লাগলেন। এরপর হযরত হোজায়ফা (রাঃ)-কে বললেন, তুমি যাদেরকে ফেরত দিয়েছ তাদের কাউকে চিন?

হযরত হোজায়ফা (রাঃ) আরজ করলেন, হুজুর রাতের অন্ধকার ছিল তাদের চেহারা কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল, আমি সেজন্য তাদেরকে চিনতে পারিনি তবে তাদের উষ্টিগুলোকে চিনেছি। তখন তিনি এরশাদ করলেন, তুমি কি বুঝতে পেরেছো তাদের কি ইচ্ছা ছিল? হযরত হোজায়ফা আরজ করলেনঃ আল্লাহর শপথ, হুজুর আমি কিছুই জানিনা। তখন তিনি এরশাদ করলেন, তারা এই ষড়যন্ত্র করেছিলো যে আমার সংগে সংগে চলবে, যখন আমি পাহাড়ের টিলার উপর আরোহন করবো তখন পাথর নিক্ষেপ করে আমাকে নিচে ফেলে দেবে। আল্লাহ পাক আমাকে তাদের নাম এবং তাদের পিতার নাম পর্যন্ত বলে দিয়েছেন। ইনশাআল্লাহ আমি তোমাকে এ সম্পর্কে অবহিত করবো। হযরত হোজায়ফা (রাঃ) আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। যখন লোকেরা আসবে তখন আপনি আদেশ দিবেন যেন এই বেঈমানদেরকে হত্যা করা হয়। তিনি এরশাদ করলেন, না, এমন অবস্থায় লোকেরা বলবে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথীদেরকে হত্যা করা শুরু করেছেন।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত হোজায়ফা (রাঃ) ও হযরত আম্মার (রাঃ)-এর নিকট এই মোনাফেকদের নাম বলে দিয়েছিলেন। তবে

তাগিদ করেছেন যে, এখন গোপন রাখ। সকাল হলে হযরত উসায়েদ এবনে হোজায়ের আরজ করলেনঃ ইয়া রসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আপনি ময়দানের পথ ছেড়ে দিয়ে উপত্যকার পথ কেন বেছে নিলেন। এ পথতো সহজ ছিল, তিনি এরশাদ করলেনঃ আবু ইয়াহিয়া, তুমি কি জান মোনাফেকদের আমার সম্পর্কে কি কর্মসূচী ছিল? তাদের ইচ্ছা ছিল তারা আমার পিছু পিছু আসবে রাতের অন্ধকারে আমার উষ্ট্রীর রশি কেটে দেবে এবং উষ্ট্রী থেকে আমাকে নীচে ফেলে দেবে। তখন হযরত উসায়েদ আরজ করলেনঃ এখন সব লোক একত্রিত হয়েছে, আপনি প্রত্যেক গোত্রের লোকদের আদেশ দিন যে গোত্রের লোক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে তারা যেন এই লোকদের হত্যা করে। যদি আপনার মর্জি হয় তবে আমাকে তাদের নাম বলে দিন শপথ সে আল্লাহ পাকের, যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন আমি যে পর্যন্ত তাদের মস্তক আপনার খেদমতে হাজির না করবো সে পর্যন্ত এ স্থান ত্যাগ করবো না। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমি পছন্দ করিনা লোকেরা এ কথা বলুক যে, যখন মোশরেকদের সঙ্গে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের লড়াই শেষ হয়েছে তখন তিনি তাঁর সাথীদেরকে হত্যা করেছেন।

হযরত উসায়েদ (রাঃ) আরজ করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! তারাতো আপনার সাথী নয়। তিনি এরশাদ করলেনঃ তারা কি লাইলাহা ইল্লাল্লাহু-এর সাক্ষ্য প্রকাশ করেনা? হযরত উসায়েদ আরজ করলেনঃ জি হ্যাঁ তাতো করে। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ এজন্য আমি তাদের হত্যা করা থেকে বিরত রয়েছি।১

মোহাম্মদ এবনে এসহাকের বর্ণনা হল এই, যখন সকাল হ'ল তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত হোযায়ফা (রাঃ)-কে নির্দেশ দিলেন যে, আবদুল্লাহ এবনে সাদ এবনে সারহ, আবু হাজের তরাবী, আমের, আবু আমের, হাল্লাস এবনে সোয়াইদ, এবনে সামেত, মাজমা এবনে হারেসা, মালিহ তামিমী, হোসায়ের এবনে নোমায়ের, তোওয়া এবনে উবায়রাক, আবদুল্লাহ এবনে উয়াইনা, মোররা এবনে রাবীকে ডেকে আন। হাল্লাসই সে ব্যক্তি যে বলেছিল, যে পর্যন্ত আজ রাত পাহাড়ের টিলার উপর থেকে মোহাম্মদকে ফেলে না দেব সে পর্যন্ত বিরত হবনা। যদি মোহাম্মদ এবং তাঁর সাথী আমাদের থেকে উত্তম হয় তাহলে আমরাতো বকরি হয়ে যাব, সে যদি রাখাল হয় তবে আমরাতো বে-আকল হয়ে যাব, আর সে হবে বুদ্ধিমান।

মালিহ তামিমী সে ব্যক্তি, যে কাবা শরীফের সুগন্ধী চুরি করেছিল এবং মোরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে পলায়ন করেছিল কিন্তু কোথায় যাবে তা বুঝতে পারছিলনা, তাই এদিক সেদিক ঘুরাফিরা করছিল। এরপর হোসায়ের এবনে নোমায়ের সে ব্যক্তি, যে

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৪৮

যাকাতের মালামাল চুরি করেছিল। হযরত রসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হে বদনসীব! তুই এ কাজটি কেন করলি? তখন সে বলেছিলো এজন্য যে আমার ধারণা ছিল আল্লাহ পাক আপনাকে এ সম্পর্কে অবগত করবেন না। (কেননা আমার ধারণায় আপনি আল্লাহর রসূল নন) কিন্তু এখন যখন আল্লাহ পাক আপনাকে এ সম্পর্কে অবগত করে দিয়েছেন তাই আমার একীন হয়েছে যে আপনি আল্লাহর রসূল। আর আমি সাক্ষ্য দেই যে আপনি সত্যিই আল্লাহর রসূল। ইতিপূর্বে আমি আপনার প্রতি ঈমান আনি নাই। হযরত রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ কথা শ্রবণ করে তাকে ক্ষমা করলেন।

আবদুল্লাহ এবনে উয়াইনা সে ব্যক্তি, যে বলেছিল আজকের রাতই জাগ্রত থাক, সব সময়ের জন্য নাজাত লাভ করবে। আল্লাহর শপথ! এ ব্যক্তিকে হত্যা করা ব্যতীত তোমাদের কোন কাজ নেই। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে বদনসীব! আমার মৃত্যু হলে তোর কি উপকার হতো? আল্লাহর দুশমন বললো, আল্লাহর শপথ হে আল্লাহর নবী! যখন থেকে আল্লাহ পাক আপনাকে বিজয় দান করেছেন তখন থেকে আমরা খুব ভাল আছি, আল্লাহর রহমতে এবং আপনার বরকতে আমরা ভাল আছি। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে ছেড়ে দিলেন।

মোররা এবনে রাবী হ'ল সে ব্যক্তি, যে আবদুল্লাহ এবনে উবাই এবনে কাবের উপর হাত রেখে বলেছিলো, এ বাঁধাকে অপসারণ কর, এই একটি ব্যক্তিকে হত্যার পর আমাদের জন্য শান্তিই শান্তি। এ ব্যক্তিকে হত্যা করার পর সাধারণ মানুষ নিশ্চিন্ত হবে। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুই এসব কথা কেন বলেছিলি? তখন সে বললো, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি এসব কথা বলিনি, যদি আমি এসব কথা বলতাম তাহলে তো আপনি জানতেনই। যাহোক, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এই বার জন মোনাফেকদের একত্রিত করেন যারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চেয়েছিল, তাঁকে হত্যা করার চক্রান্ত করেছিল। এই বার জন মানাফেক মোনাফেকী অবস্থায় পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করে।

বায়হাকী হযরত হোজায়ফা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য বদদোয়া করে বলেছিলেন, হে আল্লাহ! তাদেরকে ফোঁড়ার রোগে আক্রান্ত কর অর্থাৎ অগ্নি স্ফুলিংগ যা তাদের অন্তরের ধমনিতে আঘাত করে এবং তারা ধ্বংস হয়ে যায়।

মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমার সাথীদের মধ্যে বারজন মোনাফেক রয়েছে তারা সে পর্যন্ত জান্নাতে যাবেনা যে পর্যন্ত সূচের ছিদ্রে উষ্ট্র প্রবেশ না করে, আর সূচের ছিদ্রে উষ্ট্রের প্রবেশও সম্ভব নয় তাই তাদেরও জান্নাতে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। তন্মধ্যে আট জন তো ফোঁড়ার কারণেই শেষ হবে অর্থাৎ অগ্নি স্ফুলিংগ যা তাদের বাজুর মধ্যে সৃষ্টি হবে এবং বক্ষ বিদীর্ণ করবে।[১]

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ

হে রসূল! যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন তবে তারা বলবে আমরাতো শুধু কথাবার্তা বলছিলাম এবং শুধু তামাসা করছিলাম আপনি বলুন, তবে কি তোমরা আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহ এবং তাঁর রসূলের সাথে বিদ্রুপ করছিলে।

শানে নজুল

এবনে আবী হাতেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমরের সূত্রে বর্ণনা করেছেনঃ এক মসলিশে জনৈক ব্যক্তি বলেছিল আমরা এই কোরআন পাঠকদের ন্যায় আর কাউকে দেখিনি যারা খাওয়ার প্রতি লোভী, মিথ্যাবাদী এবং ভীরু। একজন মুসলমান একথা শ্রবণ করে বললেন, তুই মিথ্যা কথা বলেছিস, তোর এ কথার খবর আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কাছে পৌছাব। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কাছে এ খবর পৌছে। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেন, ঐ সাহাবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সংবাদ দেয়ার পূর্বেই এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাজিল হয়।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, শোরাইহ এবনে ওবায়েদ বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি হযরত আবু দারদা (রাঃ)-কে বলেছিল, হে কোরআন পাঠকের দল! এর কি কারণ যে, তোমরা আমাদের চেয়ে অধিকতর ভীরু, তোমাদের কাছে কিছু চাওয়া হলে তোমরা কার্পন্য কর, আহার করার সময় বড় বড় লোকমা ধর। হযরত আবু দারদা (রাঃ) তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, কোন জবাব দিলেন না এবং হযরত ওমর (রাঃ)-এর কাছে গিয়ে এই খবর দিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) এই লোকটিকে তার গলায় কাপড় পেচিয়ে টেনে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির করলেন। সে বললো, আমরা শুধু গল্প গুজবের স্থলে এসব বলেছি।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৪৮-৪৯

এবনে জরীর কাতাদার বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কয়েক জন মোনাফেক তাবুকের যুদ্ধের সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিদ্রুপ করে বলে, এই লোকটি কি মনে করেছে যে, আরবদের সংগে যুদ্ধে জয় লাভ করা যত সহজ সিরিয়া এবং রোমান সাম্রাজ্যের সুদক্ষ সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করা কি তত সহজ হবে? তারা বলেছে, আমরা মনে করি আমরা তাঁকে এবং তাঁর সংগীদেরকে রোমান সৈন্যদের হাতে বন্দী দেখবো। আল্লাহ পাক তাদের এ কথা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমরা এমন কথা বলেছিলে? তারা বললো, আমরা গল্প গুজব করছিলাম এবং নিতান্ত খেলার স্থলেই এমন কথা বলেছিলাম। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

আল্লামা বগভী (রহঃ) এ আয়াতের শানে নজুল কালবী, মোকাতেল এবং কাতাদার মতানুসারে এভাবে লিখেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন তাবুক অভিযানে গমন করছিলেন তখন তাঁর সম্মুখে তিনজন মোনাফেকও চলছিল। যাদের মধ্যে দু'জন পবিত্র কোরআন এবং হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিদ্রুপ করছিল আর তৃতীয় ব্যক্তি উপহাস করে হাসছিল।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, তারা বলছিল মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাথীরা মনে করেন যে, কোরআন আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে; অথচ এটিতো তাঁরই কথা, আল্লাহ পাক তাদের এসব কথা তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দিলেন। তখন তিনি আদেশ দিলেন এই উষ্ট্রের আরোহীদেরকে আমার নিকট নিয়ে আস যখন তারা হাজির হল তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমরা এমন কথা বলেছিলে? তখন তারা বললো, আমরা নিতান্ত গল্প গুজবের স্থলেই এসব কথা বলেছি, আমরা মূলতঃ এসব কথায় বিশ্বাস করিনা।[১]

قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾

অর্থাৎ–হে রসূল! আপনি বলুন তোমরা কি আল্লাহ পাক ও তাঁর নিদর্শন সমূহের সংগে বিদ্রুপ করছিলে, বিদ্রুপ বা তামসার জন্য তোমরা আর কোন স্থান পাওনি অতএব, মিথ্যা ওজর–আপত্তি করোনা, টালবাহানা করোনা, নিজেদেরকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিবেনা।

১। তফসীরে কবীর, খন্ড–১৬, পৃষ্ঠা–১২২
তফসীরে মাজহারী, খন্ড–৫, পৃষ্ঠা–৩৫০–৫১

إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ

যদি আমরা তোমাদের কিছু লোককে ক্ষমাও করি, কিন্তু কিছু লোককে অবশ্যই শাস্তি দেব, কেননা, তারা ছিল অপরাধী।

অর্থাৎ খাঁটি তওবা করার কারণে, নিয়ত সঠিক হওয়ার জন্য কিছু লোককে মাফ করা হবে। কিন্তু অন্য মোনাফেকরা খাঁটি তওবা করেনি, অবশ্যই তাদের শাস্তি হবে। কেননা তারা মোনাফেকীর, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয়ার, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ও পবিত্র কোরআনের প্রতি বিদ্রুপ করার ন্যায় জঘন্য অপরাধে অপরাধী, তাই তাদের শাস্তি অবধারিত।

মোহাম্মদ এবনে এসহাক বর্ণনা করেছেন, মখশী এবনে হোমাইর আশ্‌য়ায়ীর অপরাধ মাফ করা হয়েছে। মখশী মোনাফেকদের সাথে মিলে-মিশে হাসতো। নিজে কোন মন্তব্য করতোনা এবং অন্যদের থেকে ভিন্ন হয়ে চলাফেরা করতো, বরং মোনাফেকদের কোন কোন কথা অপছন্দ করতো, যখন এ আয়াত নাজিল হয় তখন সে মোনাফেকী থেকে তওবা করে এবং দোয়া করে-হে আল্লাহ! আমি এমন আয়াত শ্রবণ করেছি যার কারণে আমার নয়ন মন শীতল হয়। হে আল্লাহ! তোমার পথে আমাকে প্রাণ উৎসর্গ করার তওফিক দান কর, যেন কেউ আমাকে গোছল না দেয়, কাফনও না পরায়। (তাঁর এই দোয়া কবুল হয়েছিল, ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করেন, আর কেউ জানতে পারেনি যে, কোথায় শহীদ হয়েছেনএবং কোথায় দাফন হয়েছেন,

মখশী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করেছিলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার নাম পরিবর্তন করে দিন যেন কুফরীর যুগের নামও তাঁর নিকট অপছন্দনীয় ছিল।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর নামকরণ করেছিলেন আবদুর রহমান বা আবদুল্লাহ।[১]

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৫৩

اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۘ
يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ
اَيْدِيَهُمْ ؕ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ؕ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٦٧﴾
وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ
فِيْهَا ؕ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿٦٨﴾
كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْۤا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّاَكْثَرَ اَمْوَالًا وَّ
اَوْلَادًا ؕ فَاسْتَمْتَعُوْا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا
اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِيْ
خَاضُوْا ؕ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَ
اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٦٩﴾

তরজমা

(৬৭) মোনাফেক নর–নারী, সকলের একই আচরণ, তারা অন্যায় কাজের নির্দেশ দেয় এবং ভাল কাজে বাধা দেয়। আর নিজেদের মুষ্টিবদ্ধ করে রাখে। তারা আল্লাহ পাককে ভুলে গেছে। তাই আল্লাহ পাকও তাদেরকে ভুলে গেছেন, নিশ্চয়ই মোনাফেকরা পাপাচারী।

(৬৮) মোনাফেক নর–নারী এবং কাফেরদেরকে আল্লাহ পাক দোজখের অগ্নির কথা বলে দিয়েছেন। তাতেই তারা চিরদিন পড়ে থাকবে, এটিই তাদের জন্যে যথেষ্ট এবং আল্লাহ পাক তাদেরকে লানত দিয়েছেন আর তাদের জন্যে রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।

(৬৯) তোমাদের অবস্থা তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থার অনুরূপই, তারা তোমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ও সম্পদশালী এবং সন্তান সন্ততি সম্পন্ন ছিল।

তাদের ভাগ্যে যা ছিল তা তারা ভোগ করে গেছে, তোমাদের ভাগ্যে যা ছিল তোমরাও তা ভোগ করেছ। যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের ভাগ্যে যা ছিল তা ভোগ করেছে তারা যেভাবে অনর্থক আলাপ আলোচনায় লিপ্ত ছিল, তোমরাও তেমনি আলাপ আলোচনায় লিপ্ত রয়েছ। তারাই সে সব লোক, দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানে যাদের সাধনা ব্যর্থ হয়েছে, আর তারাই সর্বস্বান্ত।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে দূরাত্মা মোনাফেকদের ছলচাতুরী এবং দূরভিসন্ধির বিরবণ ছিল, আর এ আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ কপটচিত্ত সকল মোনাফেক কি নারী কি পুরুষ সকলে আল্লাহর নাফরমানী এবং অবাধ্যতায় একই প্রকার। যে মন্দ আচরণ তাদের পুরুষের মধ্যে রয়েছে তা তাদের নারীদের মধ্যেও রয়েছে। তারা মুখে ইসলামের কথা প্রকাশ করে, কিন্তু ইসলামের ক্ষতি সাধনে সর্বদা তৎপর থাকে। তারা মানুষকে বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট এবং আদর্শচ্যুত করতে সর্বদা স্বচেষ্ট থাকে। তাদের অবস্থা এই যে, মন্দ কাজের নির্দেশ দেবে এবং ভাল কাজে বাধা দেবে অর্থাৎ তারা আল্লাহর সাথে শেরক করার এবং আল্লাহ পাকের অবাধ্য হওয়ার নির্দেশ দিয়ে থাকে এবং সৎকাজে বাঁধা দিয়ে থাকে যেমন তারা বলে, গরমে জেহাদে যেওনা।

এ আয়াতে মোনাফেকদের একটি দাবীর মিথ্যাবাদীতা প্রমাণিত হয়েছে। তারা মুসলমানদেরকে বলত, আমরা তোমাদের সঙ্গেই রয়েছি। কিন্তু আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

وَمَا هُمْ مِّنْكُمْ

"আর তারা তোমাদের মধ্য থেকে নয়;" বরং মোনাফেকরা পরস্পর একে অন্যের অনুরূপ। মুসলমানদের সঙ্গে তাদের কোন মিল হতেই পারেনা, মোনাফেকরা পুরুষ হোক কি নারী মোনাফেকীতে তারা এক ও অভিন্ন। তাদের আরেকটি অন্যায় আচরণ হ'ল তারা কৃপন। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ

তারা নিজেদের মুষ্টিকে বন্ধ করে রাখে অর্থাৎ আল্লাহ্ রাহে ব্যয় করার ব্যাপারে কার্পন্য করে।

نَسُوا اللّٰهَ

তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। তারা যেন একথা জানেওনা যে, তাদের একজন স্রষ্টা রয়েছেন এবং তিনি তাদের যাবতীয় কৃত কর্মের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। অবশেষে, তাদেরকে আল্লাহ পাকের দরবারে জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ড সম্পর্কে হিসাব নিকাশ দিতে হবে, তাই তারা আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য পরিত্যাগ করেছে।

فَنَسِيَهُمْ

এজন্যে আল্লাহ্ পাকও তাদেরকে ভুলে গিয়েছেন অর্থাৎ তিনি তাদেরকে দুনিয়াতে ঈমানের তৌফিক থেকে বঞ্চিত করেছেন এবং ইসলামের হেদায়েত থেকে মাহরুম করেছেন; শুধু তাই নয়; বরং আখেরাতে আল্লাহ্ পাক তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত করে তাদেরকে চিরস্থায়ী আযাবে নিক্ষেপ করবেন। এর দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় نَسِيَهُمْ শব্দটির نِسْيَان এর তাৎপর্য হ'ল এ দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জাহানে আল্লাহ পাকের রহমত থেকে মাহরূম করা। দুনিয়াতে ঈমানের তওফিক থেকে বঞ্চিত করেছেন এবং আখেরাতে দোজখে নিক্ষেপ করবেন।

إِنَّ الْمُنٰفِقِينَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿٦٧﴾

নিশ্চয় মোনাফেকরা পাপাচারী। আল্লাহর নাফরমানীতে তারা সর্বক্ষণ মগ্ন। যদিও তারা ঈমানদার হওয়ার দাবী করে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তারা ঈমান থেকে অনেক দূরে।

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِينَ

আল্লাহ্ পাক মোনাফেক নারী পুরুষ এবং কাফেরদেরকে দোজখের কঠিন শাস্তি দেয়ার অঙ্গীকার করেছেন। তাদের এ শাস্তি অবধারিত। তারা চিরদিন এ শাস্তি ভোগ করবে।

هِيَ حَسْبُهُمْ

তাদের জন্যে এ শাস্তি যথেষ্ট, তাদের মোনাফেকী এবং কুফরীর জন্যে এ শাস্তি যথোপযুক্ত। এ শাস্তি এত বেশী যে এর চেয়ে আরো বেশী শাস্তি সম্ভব নয় এবং যেহেতু তাদেরকে আখেরাতে কঠিনতর শাস্তি দেয়া হবে তাই তাদেরকে দুনিয়াতে শাস্তি দেয়ার প্রয়োজন নেই। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হ'ল তাদেরকে এত কঠিন শাস্তি দেয়া হবে যে, তার চেয়ে কঠিন শাস্তি চিন্তাও করা যায় না।[১]

وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ

আর আল্লাহ পাক তাদেরকে লানত দিয়েছেন তথা তাঁর রহমত থেকে তাদেরকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন এবং তাদেরকে অপমানিত করেছেন।

وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٦٨﴾

আর তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী শাস্তি, যা কোন দিন শেষ হবেনা।

এ আয়াতে যে শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে তার অর্থ হ'ল আখেরাতের শাস্তি, অথবা এর পাশাপাশি দুনিয়ার শাস্তিও হতে পারে। কেননা, মোনাফেকরা যেহেতু শুধু মৌখিক ইসলামের কথা বলত, মনে প্রাণে ইসলাম গ্রহণ করতনা, তাই তাদের রহস্য উদঘাটিত হওয়ার ভয়ে তারা সর্বদা ভীত সন্ত্রস থাকত। দুনিয়াতে তারা এ কষ্ট ভোগ করত। আর আখেরাতে তাদের জন্যে রয়েছে চিরস্থায়ী কঠোর শাস্তি। অতএব, আলোচ্য আয়াত দ্বারা দুনিয়ার অপমানের ভয় এবং আখেরাতের চিরস্থায়ী শাস্তি উভয়টিকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে।[২]

كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ

অর্থাৎ এ মোনাফেকদের দৃষ্টান্ত হ'ল পূর্ব যুগের কাফেরদের ন্যায়। তারাও আল্লাহর অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হয়েছিল। তারা অর্থ-সম্পদ, ক্ষমতা এক কথায় জনবল ও অর্থবল সবই লাভ করেছিল।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৫৪
তফসীরে কবীর, খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-১২৭
তফসীরে মাজেদী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪১৩
২। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-১২৮
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৫৪-৫৫

এমনকি, তোমাদের চেয়ে তাদের বাহুবল, জনবল, ধনবল অনেক বেশী ছিল, কিন্তু এসব কিছু আল্লাহর আযাব থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারেনি। তারা আনন্দ উল্লাসে মত্ত ছিল। ভোগ বিলাসই তাদের জীবনের কাম্য ছিল। ক্ষণিকের জন্যেও তারা তাদের পরিণামের কথা চিন্তা করেনি। অবশেষে তারা তাদের অন্যায় অনাচারের শাস্তি ভোগ করেছে, কোপগ্রস্থ হয়েছে, ধ্বংস এবং সর্বস্বান্ত হয়েছে। তাদের অদৃষ্টে যে সুখ--স্বাচ্ছন্দ ছিল তা তারা ভোগ করে গেছে। অতএব, হে মোনাফেকরা! তোমাদের অদৃষ্টে যে ভোগ ও সম্পদ রয়েছে তা তোমরা ভোগ কর তোমাদের পূর্ববর্তী কাফেরদের ন্যায়,আর তোমাদের জন্যে নির্দিষ্ট শাস্তির জন্যে অপেক্ষা কর।

وَخُضْتُمْ كَالَّذِىْ خَاضُوْاؕ

আর যেহেতু তোমরাও তাদের ন্যায় মন্দ, নিন্দনীয় কাজে লিপ্ত হয়েছ তাই তোমরাও তার শাস্তি ভোগ করার জন্যে তৈরী থাক।

اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ

এরা সে সব লোক, যাদের দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের সকল সাধনা ব্যর্থ হয়েছে, তারা ঈমানের দাবী করেছে, কিন্তু যেহেতু এ দাবী আন্তরিক ছিল না তাই এর সওয়াব থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে। এভাবে তাদের জীবন-সাধনা ব্যর্থ হয়েছে।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম (মোনাফেকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন) তোমরা তোমাদের পুর্ববর্তী লোকদের অনুসরণ করবে সম্পূর্ণভাবে. অর্থাৎ তারা যে মন্দ কাজ করেছে, তোমরাও সে মন্দ কাজ করবে। আমরা আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! পূর্ববর্তী লোকদের বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে? ইহুদী নাসারাদেরকে? তিনি এরশাদ করেন, তবে আর কাকে?

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, তোমরা বণী ইসরাঈলের সম্পূর্ণ অনুকরণ করবে, আমি জানিনা যে, তোমরা বছুরের পূজাও করবে কিনা।

أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ
وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ
لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٧٠﴾ وَالْمُؤْمِنُونَ وَ
الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ
يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ
يُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ﴿٧١﴾ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ
عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾

তরজমা

(৭০) তাদের (মোনাফেকদের) নিকট কি পূর্ববর্তী লোকদের খবর আসেনি? নুহের জাতি, আদ ও সামুদ জাতি, ইব্রাহীমের জাতি, মাদায়েনবাসী এবং যাদের বস্তি উল্টিয়ে দেয়া হয়েছিল, তাদের সকলের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ নিয়ে রসূলগণ এসেছিলেন, আর আল্লাহ পাক তাদের প্রতি জুলুম করছিলেননা, কিন্তু তারা নিজেরাই যে নিজেদের প্রতি জুলুম করত।

(৭১) আর মোমেন নর এবং নারীগণ একে অন্যের সাহায্যকারী, তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয়, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে, তারা নামাজ কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিধি নিষেধ মেনে চলে, এরাই সে সব লোক যাদেরকে আল্লাহ পাক দয়া করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত পরাক্রমশালী, অতীব প্রজ্ঞাময়।

(৭২) আল্লাহ পাক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মোমেন নর এবং নারীকে জান্নাতের–যার নিম্নদেশে নির্ঝরমালা প্রবাহিত, যেখানে তারা চিরদিন বাস করবে। (আর আল্লাহ পাক তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন) স্থায়ী জান্নাতে উত্তম বাসস্থানের এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ, আর তা বিরাট সাফল্য।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে মোনাফেকদেরকে অতীতের কাফেরদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর প্রেরিত নবী রসূলগণকে অস্বীকার করেছিল, এজন্যে তারা কঠিন শাস্তি ভোগ করেছে। ঠিক তেমনিভাবে মোনাফেকরাও সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করেছে, তাই তাদের পরিণামও হবে পূর্বকালের কাফেরদের ন্যায়। এ প্রসঙ্গে আলোচ্য আয়াতে পূর্বকালের ছয়টি কোপগ্রস্থ জাতির উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লেখিত জাতিগুলোর মধ্যে প্রথম হ'ল নুহ জাতি। আল্লাহ্ পাক তাদেরকে প্রলয়ংকরী বন্যায় ধ্বংস করেছেন, আর দ্বিতীয় হ'ল আদ জাতি, তাদেরকে ঝড়-ঝঞ্জা দিয়ে নিপাত করেছেন, তৃতীয় হ'ল সামুদ জাতি, তাদেরকে ধ্বংস করেছেন বজ্র-নিনাদে, আর চতুর্থ হ'ল ইব্রাহীম (আঃ)-এর জাতি, তাদের নিকট থেকে নেয়ামত ছিনিয়ে নিয়েছেন এবং একটি সামান্য প্রাণী মশার মাধ্যমে নমরুদকে ধ্বংস করেছেন, আর পঞ্চম হ'ল হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর সম্প্রদায় মাদায়েনবাসী, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে বজ্র নিনাদ এবং ভুমিকম্প দ্বারা। আর লুত সম্প্রদায়কে এভাবে ধ্বংস করা হয়েছে যে, তাদের উপর মুষলধারে শিলাবৃষ্টি হতে থাকে এবং তাদের বস্তিটি উল্টিয়ে দেয়া হয়।[১]

আল্লাহ পাক অযথা কোন সম্প্রদায়কে আযাব দেননা, তিনি কারো প্রতি কোন সময়ই জুলুম করেননা। কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করে অর্থাৎ তারাও তোমাদের ন্যায় তাদের নিকট প্রেরিত নবী রসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করে তাদের হুকুম অমান্য করে, যার পরিণামে তারা কঠিন শাস্তি ভোগ করেছে। অতএব, তোমাদেরও ভয় করা উচিৎ, যে কোন সময় তোমাদের নাফরমানীর শাস্তি স্বরূপ তোমাদের প্রতিও আযাব আসতে পারে।

আলোচ্য আয়াতে এভাবে প্রশ্ন উথাপন করা হয়েছে যে,

أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-১২৯

পৃথিবীতে ইতিপূর্বে যে সব সম্প্রদায় আল্লাহর নাফরমানীর কারণে কোপগ্রস্থ হয়েছে, তাদের খবর কি মোনাফেকদের নিকট পৌছেনি? একথা মোনাফেকদের উদ্দেশ্যেই বলা হয়েছে এবং তাদেরকে বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছে, কিন্তু সরাসরি তাদেরকে সম্বোধন করা হয়নি। এতে এ কথার প্রতি সুক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে যে, মোনাফেকরা আল্লাহ পাকের সম্বোধনের যোগ্য নয়।[১]

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ م

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে মোনাফেকদের অপকর্মের এ বিবরণ ছিল যে, তারা ইসলামের বিরুদ্ধে একে অন্যের সহায়ক হিসেবে কাজ করে। আর আলোচ্য আয়াতে মোনাফেকদের মোকাবেলায় মোমেনদের গুণাবলী এবং শুভ পরিণতি বর্ণিত হয়েছে। যে মোমেনগণ সৎকাজে একে অন্যের সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে। আরো ঘোষণা করা হয়েছে আল্লাহ পাক মোমেনদের জন্য রহমত এবং মাগফেরাতের অংগীকার করেছেন। এর সংগে জান্নাতে মোমেনদেরকে যে অনন্ত অসীম নেয়ামত দেয়া হবে তারও উল্লেখ রয়েছে। আরো এরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ পাক তাঁর ভক্ত প্রেমিকদেরকে সবার উপরে যে সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত দান করবেন তা হলো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি।

اللهم اجعلنا منهم آمين برحمتك يا ارحم

الرّحمين يا ذالجلال والاكرام

এরশাদ হয়েছেঃ

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ

"আর মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারীগণ পরস্পর একে অন্যের সাহায্যকারী"

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের আনুগত্য প্রকাশে, ইসলামের পতাকা উড্ডিন রাখার ব্যাপারে তারা একে অন্যকে সাহায্য করে।

يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৫৬

এবং তারা সৎকাজ তথা ঈমান ও নেক আমলের নির্দেশ দেয়

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

এবং মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে তথা শেরক কুফরী ও মোনাফেকী এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অবাধ্যতা থেকে বিরত রাখে।

وَيُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ

আর তারা নামাজ কায়েম করে তথা নামাজের সকল শর্ত এবং যাবতীয় আরকান-আহকাম সঠিকভাবে পালন করে এবং নিয়মিত জাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের যাবতীয় বিধি-নিষেধ পালন করে।

পূর্ববর্তী আয়াতে মোনাফেকদের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে যে, তারা ভাল কাজে বাধা দেয়, মন্দ কাজে উৎসাহিত করে। পক্ষান্তরে, মোমেনদের বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, তারা ভাল কাজের নির্দেশ দেয় মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।

দ্বিতীয়তঃ মোনাফেকরা অত্যন্ত কৃপন। কোন দিনও কল্যাণকর কাজে ব্যয় করেনা, কিন্তু মোমেনদের অবস্থা এই যে, তারা যাকাত সদকা নিয়মিত আদায় করে, মুক্ত হস্তে আল্লাহর রাহে দান করে।

তৃতীয়তঃ মোনাফেকরা আল্লাহকে স্মরণ করেনা, পক্ষান্তরে মোমেনগণ সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করেন। এতদ্ব্যতীত মোনাফেকরা আল্লাহর রসূলের বিরোধীতায় তৎপর থাকে তাই তাদের শাস্তি অবধারিত, দোজখ হবে তাদের স্থায়ী ঠিকানা। আর মোমেনগণ আল্লাহর রসূলের হুকুমে প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকে এজন্য পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ

এরাই সে সব লোক যাদের প্রতি আল্লাহ পাক রহম করবেন। মোমেনগণই হবে আল্লাহ পাকের রহমতে সমৃদ্ধ আর তারাই হবে চির সুখের কেন্দ্র জান্নতের অধিবাসী।

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝٧١

নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক অত্যন্ত পরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়। তিনি যদি কোন বন্দার প্রতি রহমত নাজিল করতে চান অথবা কোন বন্দাকে শাস্তি দিতে চান তবে কেউ তাঁকে বাধা দিতে পারেনা তিনি প্রজ্ঞাময়, তাঁর প্রতিটি সিদ্ধান্ত হেকমতপূর্ণ, তাৎপর্যবহ।

মোমেনের বৈশিষ্ট

এ আয়াত দ্বারা মোমেনদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য প্রমানিত হ'ল–

১। মোমেনদের পরস্পরের মধ্যে থাকবে ভ্রাতৃত্বভাব এবং মমত্ববোধ কেননা তাদেরকে পরস্পর বন্ধু বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

২। মোমেনের কাজ হ'ল ভাল কাজের নির্দেশ দেয়া, ঈমান ও নেক আমলের দিকে মানুষকে আহবান করা।

৩। এমনিভাবে মোমেনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখা।

৪। সঠিকভাবে নামাজ কায়েম করা।

৫। যথানিয়মে যাকাত আদায় করা, তথা বন্দার হক্বের প্রতি দায়িত্ব পালনে সদা সক্রিয় থাকা।

৬। সব বিষয়ে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা। এ কথাটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কয়েকটি সুনির্দৃষ্ট ফরজ আদায় করাই যথেষ্ট নয়; বরং সকল অবস্থায় আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি অনুগত থাকা একান্ত কর্তব্য।

আর এর দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের হক্ব রয়েছে। এমনিভাবে আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারে কর্তব্য পালন করাও ঈমানেরই নিদর্শন। এতিম মিসকিন গরীব দুঃখীদের সাহায্য করাও মোমেনের বৈশিষ্ট্য, আর কোন মোমেনকে কথায় বা কাজে কষ্ট দেয়া মোমেনের জন্য বৈধ নয়। এ সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

المسلم من سلم المسلون من لسانه ويده

প্রকৃত মুসলমান সে ব্যক্তি যে অন্য মুসলমানকে তার কথায় ও আচরণে কষ্ট দেয় না।[১]

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

১। খোলাসাতুত্তাফাসীর, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৫৯

আল্লাহ্ পাকের অঙ্গীকার

আল্লাহ পাক অংগীকার করেছেন যে, মোমেনদেরকে এমন জান্নাত দান করবেন যার তলদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত হয়, আর জান্নাতিগণ সেখানে চিরদিন থাকবে অর্থাৎ জান্নাতের নেয়ামত ক্ষণস্থায়ী হবেনা; বরং চিরস্থায়ী হবে।

وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ

জান্নাতে আদনের বিবরণ

আর আল্লাহ পাক আদনের বাগান সমূহে মোমেনদেরকে উত্তম আবাস দানের কথাও ঘোষণা করেছেন, যেখানে তারা সর্বপ্রকার সুখ শান্তি উপভোগ করবে এবং পরিতৃপ্ত হবে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, জান্নাতে উত্তম আবাস স্থলের তাৎপর্য হ'ল সেখানে জীবন অত্যন্ত আনন্দময় এবং পবিত্র হবে। অথবা এর অর্থ হ'ল মোমনগণ সে জীবনকে অত্যন্ত পছন্দ করবে।

কোন কোন তফসীরকার লিখেছেন, আদন একটি জান্নাতের নাম। আর কোন কোন তফসীরকার লিখেছেন, জান্নাতের একটি বিশেষ স্থানের নাম আদন। হাদীস শরীফেও এ সম্পর্কে ইংগীত রয়েছে।

এবনে মোবারক, তেবরানী এবং আবুশ শেখ হযরত এমরান এবনে হোসাইন (রাঃ) এবং হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, জান্নাতে আদন হল মুক্তার একটি মহল, যাতে লাল বর্ণের ইয়াকুত দ্বারা নির্মিত সত্তরটি বাড়ী থাকবে, আর প্রত্যেক বাড়ীতে সবুজ বর্ণের জমরত পাথর দ্বারা সুসজ্জিত সত্তুরটি কক্ষ থাকবে আর প্রত্যেক কক্ষে থাকবে একটি পালঙ্ক, আর প্রত্যেক পালঙ্কে বিভিন্ন বর্ণের ফরাস থাকবে এবং সেখানে হুরগণ জান্নাতীদের স্ত্রী হবে, প্রত্যেক ঘরে সত্তুরজন পরিচারক পরিচালিকা থাকবে, মোমেনের জন্য প্রত্যহ সকালে রকমারী সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য এবং পানীয় পেশ করা হবে।

আবুশ শেখ কিতাবুল আজমতে হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমরের সুত্রে লিখেছেন আল্লাহ পাক চারটি জিনিস স্বীয় দস্ত মোবারকে তৈরী করেছেন। তাহ'ল আরশ, কলম আদম এবং আদন। তিনি এরশাদ করেছেনঃ "হয়ে যাও' তখন প্রত্যেকটি জিনিসই আত্মপ্রকাশ করেছে।

দারে কুতনি হযরত আবু দারদা (রাঃ)-এর সুত্রে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ফরমানের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আদন এমনি একটি স্থান যা কোন মানুষের চক্ষু কোন দিন দেখেনি বা কেউ কোনদিন চিন্তাও করেনি। জান্নাতে আদনে শুধু তিন প্রকার লোক থাকবেন, আম্বিয়ায়ে কেরাম, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে সংকলিত এবং হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দুটি জান্নাত রয়েছে রুপার তৈরী যার প্রত্যেকটি বস্তুই রূপালী, আর দু'টি জান্নাত রয়েছে স্বর্ণের, যার প্রত্যেকটি বস্তুই সোনালী। আর জান্নাতে আদনের অধিবাসী এবং তাদের প্রতিপালকের মধ্যে কোন আড়াল থাকবেনা, আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্বের এবং মাহাত্মের আড়াল ব্যতীত।

ইমাম আহমদ, আবু দাউদ এবং বায়হাকী এই হাদীস খানিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন, জান্নাতুল ফেরদৌস চারটি হবে, দু'টি স্বর্ণ নির্মিত হবে। বায়হাকী আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে তাঁর অনুমতি ব্যতীত কেউ তাঁর দিকে তাকাতে পারবে না, তাহলে শ্রেষ্ঠত্ব এবং মাহাত্মই মানুষের দৃষ্টি থেকে তাঁকে গোপন রাখার উপকরণ হবে।

আল্লামা বগভী লিখেছেন, আ'দনের বাগান সমূহ জান্নাতের মধ্যস্থলে হবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর এবনুল আস(রঃ)বলেছেন, জান্নাতের মধ্যে একটি মহল রয়েছে যাকে আদন বলা হয়, তার চারিপার্শ্বে সবুজ বাগান রয়েছে, যার পাঁচ হাজার দ্বার থাকবে যার মধ্যে নবীগণ, সিদ্দীকগণ এবং শহীদগণ ব্যতীত কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।

হাসান বসরী (রহঃ) বলেছেন, জান্নাতে আদন হ'ল স্বর্ণ নির্মিত একটি মহল আম্বিয়ায়ে কেরাম অথবা সিদ্দিকগণ অথবা শহীদগণ অথবা সুবিচারক শাসন কর্তা ব্যতীত সেখানে কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।

আতা এবনে সায়েব (রহঃ) বলেছেন, আদন হ'ল জান্নাতের একটি নহর যার দুই তীরে রয়েছে বাগান।

মোকাতেল এবং কালবী (রহঃ) লিখেছেন, আদন হ'ল জান্নাতের একটি অতি উচ্চ মর্তবা, আর তাতেই রয়েছে সুগন্ধি ঝরণা, এই উচ্চ মর্তবার চারিপার্শ্বে রয়েছে ঘন বৃক্ষ, এই ঘন বৃক্ষ দ্বারা ঐ উচ্চ মর্তবার স্থানটিকে সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে ঢেকে রাখা হয়েছে। আর সেদিন পর্যন্ত ঢেকে রাখা হবে যেদিন আম্বিয়ায়ে কেরাম, সিদ্দিকগণ, শহীদগণ এবং নেককারগণ তাতে প্রবেশ করবেন। আর এতে তাঁরাই প্রবেশ করবেন যাদের প্রবেশ করা আল্লাহ পাকের মর্জি হবে। আদন হ'ল মুক্তা,

ইয়াকুত এবং স্বর্ণ নির্মিত মহল। আরশের নিম্নদেশ থেকে একটি পবিত্র খুশবু বের হবে যা আদনবাসীর নিকট বিপুল পরিমাণ সাদা ধবধবে কস্তুরি পৌঁছাবে।[১]

এবনে কাসীর (রহঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আরো কয়েকখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, মোমেনদের জন্য জান্নাতে একটি তাঁবু থাকবে যা মুক্তা নির্মিত হবে, এই তাঁবুটি ষাট মাইল ব্যাপী সুদীর্ঘ হবে মোমেনদের স্ত্রীগণও সেখানে থাকবে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এরশাদ হ'ল যে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনবে নামাজ কায়েম করবে আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন। সে হিজরত করুক অথবা নিজের দেশেই থাকুক। লোকেরা বললো, আমরা কি এই হাদীস অন্যান্যদের কাছে বর্ণনা করবো?

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ জান্নাতে আল্লাহ পাক একশ'টি মর্তবা রেখেছেন যা আল্লাহ পাক তাঁর রাহের মুজাহেদদের জন্য তৈরী করেছেন। প্রত্যেক দুটি মর্তবার মধ্যে এতটুকু দূরত্ব রয়েছে যতখানি দূরত্ব আসমান জমীনের মধ্যে রয়েছে। অতএব, তোমরা যখনই জান্নাতের আরজি পেশ কর তখন জান্নাতুল ফেরদৌস–এর জন্য আবেদন করবে তা সর্বোচ্চ এবং সর্বোত্তম জান্নাত। জান্নাতের নহর সমূহ সেখান থেকে বের হয়, তার ছাদ হ'ল দয়াময় আল্লাহ পাকের আরশ। জান্নাতবাসীগণ জান্নাতের ইমারত সমূহকে এভাবে দেখবে যেভাবে তোমরা আসমানের উজ্জল নক্ষত্রগুলো দেখ। আর সকল জান্নাতের মধ্যে একটি বিশেষ উচ্চ স্থান রয়েছে যার নাম হল ওসীলা, যা এক ব্যক্তিকে প্রদান করা হবে। আল্লাহ পাকের দরবারে আমার সুদৃঢ় আশা এই যে, সে ব্যক্তি আমিই হব। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ মোয়াজ্জিন যখন আজান দেয় তখন তোমরা তার জবাব দিও, এরপর আমার প্রতি দরূদ পাঠ কর, যে আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ পাক তার প্রতি দশটি রহমত নাজিল করেন। এরপর আমার জন্য তোমরা ওসীলা প্রদানের দরখাস্ত কর। যে ব্যক্তি আমার জন্য ওসীলা চেয়ে আরজি পেশ করে কেয়ামতের দিন তার জন্য আমার শাফায়াত হালাল হ'ল। এরপর এরশাদ করেন, তোমরা আমার জন্য ওসীলার দরখাস্ত করবে। দুনিয়াতে যে আমার জন্য ওসীলা চেয়ে দোয়া করবে কেয়ামতের দিন আমি তার জন্য সাক্ষ্যী এবং সুপরিশকারী হব।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড–৫, পৃষ্ঠা–৩৫৮–৩৬০
তফসীরে কবীর, খন্ড–১৬, পৃষ্ঠা–১৩২–১৩৩
তফসীরে রুহুল মা'আনী, খন্ড–১০, পৃষ্ঠা–১৩৬

একদিন সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, "ইয়া রসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমাদেরকে জান্নাত সম্পর্কে বলুন, কি জিনিস দিয়ে তা তৈরী করা হয়েছে। তিনি এরশাদ করলেন, স্বর্ণ এবং রূপার দ্বারা আর খাঁটি কস্তুরি দ্বারা তার মসল্লা তৈরী করা হয়েছে, লুলু এবং ইয়াকুত পাথর হ'ল তার কংকর, জান্নাতের মাটি হল জাফরান। যে জান্নাতে যাবে সে এমন নেয়ামত সমূহের মধ্যে থাকবে যা কোন দিন শেষ হবেনা। জান্নাতীগণ চিরস্থায়ী জিন্দেগী পাবে আর মৃত্যু কোন দিন তাদের কাছে আসবে না। জান্নাতীর পোশাক পুরান হবে না, তার যৌবন বিদায় নেবেনা। তিনি এরশাদ করেনঃ জান্নাতে এমন ইমারত সমূহ রয়েছে যার ভেতরের অংশ বাহির থেকে দেখা যাবে।

একজন গ্রাম্য ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেনঃ এই মহল সমূহ কাদের জন্য?

তিনি এরশাদ করলেনঃ যে ভাল কথা বলে, মানুষকে আহার করায়, রোজা রাখে, মানুষ যখন রাত্রিবেলা ঘুমন্ত থাকে, তখন যে তাহাজ্জদের নামাজ আদায় করে।

এরপর তিনি এরশাদ করেন, আছে কেউ জান্নাতের আকাংখাকারী? আছে কেউ তার জন্য সাধক? জান্নাতের কোন সীমা নেই, তা হ'ল অপূর্ব সুন্দর, নূর, অসাধারণ সুগন্ধময় বাগান, সুউচ্চ মহল, সেখানে নহর সমূহ প্রবাহিত, তাজা সুস্বাদু ফল সমূহ, অতি সুন্দর এবং অতি উত্তম চরিত্রের অধিকারীনী হুরগণ অতি মূল্যবান পোশাক সমূহ, এটি হ'ল সর্বকাল অবস্থানের স্থান, যেখানে রয়েছে শান্তি ও নিরাপত্তার স্থান আরাম আনন্দ-উল্লাস এবং অনন্ত অসীম নেয়ামত এবং রহমত। এসব কথা শুনে সকলে সমবেত কণ্ঠে বলে উঠলেন, হুজুর আমরা সকলেই জান্নাতের আকাংখা রাখি এবং তা হাসিল করার জন্য সচেষ্ট রয়েছি। তিনি এরশাদ করলেন, তোমরা 'ইনশাআল্লাহ' বল তখন তাঁরা সকলে 'ইনশাআল্লাহ' বললেন।[১]

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ۭ

আর আল্লাহ পকের সন্তুষ্টি হ'ল সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ।

ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٧٢﴾

অর্থাৎ ইতিপূর্বে যে সমস্ত নেয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে তার চেয়ে বড় নেয়ামত হ'ল আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ, আর যে এই নেয়মত লাভ করে সে জীবন সাধনায় সফলকাম হয়, আর এটিই হ'ল সর্বশ্রেষ্ঠ মহান সাফল্য।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৭৫

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَ
مَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٧٣﴾ يَحْلِفُوْنَ بِاللهِ مَا قَالُوْا ۖ
وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوْا
بِمَا لَمْ يَنَالُوْا ۚ وَمَا نَقَمُوْا إِلَّا أَنْ أَغْنٰىهُمُ اللهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ
فَضْلِهٖ ۚ فَإِنْ يَّتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَإِنْ يَّتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ
اللهُ عَذَابًا أَلِيْمًا ۙ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ
مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿٧٤﴾

তরজমা

(৭৩) হে নবী! কাফের এবং মোনাফেকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন। তাদের প্রতি কঠোর হোন, তাদের ঠিকানা দোজখ, আর তা অত্যন্ত জঘন্য প্রত্যাবর্তন স্থল।

(৭৪) তারা আল্লাহর শপথ করে বলে যে, তারা কিছু বলে নাই, অথচ তারা কুফরী কলেমা বলেছে এবং ইসলাম গ্রহণের পর তারা কাফের হয়েছে। তারা এমন জিনিষ কামনা করেছে যা তারা লাভ করতে পারেনি। তাদের এই প্রতিশোধের একমাত্র কারণ এই যে, আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূল স্বীয় কৃপায় তাদেরকে অভাবমুক্ত করেছিলেন। অতএব, তারা যদি তওবা করে তবে তা তাদের জন্য ভাল, আর যদি তারা তা না মানে তবে আল্লাহ পাক তাদেরকে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন আর পৃথিবীতে তাদের কোন অভিভাবক এবং সাহায্যকারী নেই।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে মোমেনদের গুণাবলী এবং তাদের জন্যে সংরক্ষিত নেয়ামত

সমূহের উল্লেখ রয়েছে। আর এ আয়াতে কাফের এবং মোনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ এবং কঠোর নীতি অবলম্বনের নির্দেশ রয়েছে। পবিত্র কোরআনের বর্ণনা শৈলীর একটি বৈশিষ্ট্য হলো এতে সওয়াব এবং আযাবের কথা পাশাপাশি থাকে। সৎ কাজের সওয়াব বা শুভ পরিণতির আশা যেখানে থাকে, সেখানেই অন্যায় অনাচারের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতে মোমেনদের জন্যে জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে, আর আলোচ্য আয়াতে কাফের ও মোনাফেকদের জন্য দোজখের কঠোর শাস্তির ঘোষণা করা রয়েছে। যেহেতু প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নম্রতা, ভদ্রতা, উদারতা এবং মহানুভবতার কারণে মোনাফেকদের সাথে বিনম্র ব্যবহার করতেন, তাই এ আয়াতে মোনাফেকদের সাথে কঠোর ব্যবহার করার নির্দেশ রয়েছে।

মোনাফেকরা মুখে নিজেকে মুসলমান বলে প্রকাশ করতো কিন্তু অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ পুষে ষড়যন্ত্র করতো, তাই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে নির্দেশ দিয়েছেন হে নবী! কাফের এবং মোনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করুন এবং তাদের সঙ্গে কঠোর নীতি অবলম্বন করুন। বিনম্র ও ভদ্র ব্যবহারের যোগ্য তারা নয়, তারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের দুশমন, তাই তাদের সাথে দুশমনের ন্যায় ব্যবহার করুন। তাদের ঠিকানা হলো দোজখ আর তা হলো অত্যন্ত মন্দ ও নিকৃষ্ট ঠিকানা।

এ পর্যায়ে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, জেহাদ অর্থ হলো কোন অপ্রিয় বিষয়কে প্রতিরোধ করা বা তাকে অপসারণ করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা। এ জেহাদ শুধু যে অস্ত্র দ্বারা হয় তা নয়, কখনো হাতে, কখনো কলমে, কখনো মুখে কখনো অস্ত্রের মাধ্যমে।[১]

আলোচ্য আয়াতে জেহাদকে ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে বলে তফসীরকারগণ মন্তব্য করেছেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবেঃ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ

হে নবী! কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করুন, অর্থাৎ অস্ত্রের দ্বারা।

وَالْمُنٰفِقِيْنَ

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-১৩৫

আর মোনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করুন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং জাহ্যাক (রঃ) বলেছেনঃ এর অর্থ হ'ল মোনাফেকদের বিরুদ্ধে রসনা দ্বারা জেহাদ করুন। তাদের সাথে বিনম্র ভাষায় কথা বলার আর প্রয়োজন নেই, কঠোর ভাষায় কথা বলুন।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বসরী (রঃ) এবং কাতাদা (রঃ) বলেছেনঃ মোনাফেকদের বিরুদ্ধে শরীয়ত নির্দেশিত শাস্তির বিধান কায়েম করুন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)–এর ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ যদি সম্ভব হয় হাত দ্বারা জেহাদ করুন, অন্যথায় রসনা দ্বারা। যদি তা–ও সম্ভব না হয় তবে অন্তর দ্বারা জেহাদ করুন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) এ আয়াত সম্পর্কে এ কথাও বলেছেনঃ মোনাফেকদের সঙ্গে সাক্ষাত হলে বিনম্র ব্যবহার নয়; বরং কঠোর ব্যবহার করা উচিত।

وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝٧٣

এবং মোনাফেকদের সঙ্গে কঠোরতা অবলম্বন করুন। আর আখেরাতে তাদের ঠিকানা হ'ল দোজখ, এ ঠিকানা অত্যন্ত মন্দ এবং নিকৃষ্ট।

তফসীরকার আতা (রঃ) বলেছেনঃ মোনাফেকদের সাথে ক্ষমা–সুন্দর ব্যবহারের সকল আদেশ, এ আয়াত দ্বারা বাতিল করা হয়েছে। আতা (রঃ)–এর মতে, মোনাফেকদের সঙ্গে ব্যবহার সম্পর্কে এটি সর্বশেষ আয়াত।[১]

কোন কোন তফসীরকার বলেছেনঃ কোরআনে করীমের এ নির্দেশের একটি দৃষ্টান্ত আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে দেখতে পাই। আমরা গরু, ছাগল, মুরগী প্রভৃতি প্রাণীকে খাদ্য সরবরাহ করি এবং তাদের লালন পালনে মেহনত করি কিন্তু সাপ, বিচ্ছু দেখলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে মেরে ফেলতে উদ্যত হই। সাপ বিচ্ছুর ব্যাপারে কারো দয়া হয় না এবং এসব জন্তুকে মেরে ফেলতে ইতঃস্তত করেনা, ঠিক এমনিভাবে মানব সমাজে যারা সাপ বিচ্ছুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম।

তফসীরকারগণ লিখেছেনঃ যার আপত্তিকর আকীদা ও বিশ্বাস সম্পর্কে খবর পাওয়া যায় তার সাথে দলীল প্রমাণ দ্বারা জেহাদ করা হবে এবং প্রয়োজন অনুসারে শক্তি ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হবে।[২]

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড–৫, পৃষ্ঠা–৩৬১

২। তফসীরে মাজেদী, খন্ড–১, পৃষ্ঠা–৪১৫

এবনে জরীর হযরত আবদুল্লাহ এবেন আব্বাসের (রাঃ) সূত্রে লিখেছেনঃ একদিন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটি বৃক্ষের ছায়ায় তশরিফ রেখেছিলেন, তখন তিনি এরশাদ করলেন, এখন এমন এক ব্যক্তি আসবে যে শয়তানের চোখে দেখে, তাঁর এ কথাটি বলার একটু পরেই নীল চক্ষু বিশিষ্ট এক ব্যক্তি হাজির হ'ল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তুমি এবং তোমার সাথীরা কেন আমাকে মন্দ বল? কথাটি শুনে সে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর কয়েকজন সাথী নিয়ে হাজির হ'ল এবং আল্লাহ পাকের নামে শপথ করে বলল, (আমরা আপনার নামে কোন কথা বলিনি) এ শপথ এবং কথার পর হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ক্ষমা করলেন। এরপর পবিত্র কোরআনের এ আয়াত নাজিল হ'ল।

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا ط

মোনাফেকরা আল্লাহর নামে শপথ করে বলে যে, আমরা অমুক কথা বলিনি।

এবনে আবি হাতেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, যাল্লাস এবনে সামেত সেসব লোকের অন্তর্ভূক্ত ছিল যারা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সংগে তাবুক গমন করেনি। যাল্লাস বলেছিল যদি এ ব্যক্তি সত্য হয় তবে আমরা গর্ধবের চেয়েও মন্দ যে, তার সত্যতাও বুঝতে পারিনা। (অথবা এর অর্থ হলো আমরা গর্ধবের চেয়েও অধিক অপমানিত)

হযরত উমাইর এবনে সা'দ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ সম্পর্কে অবহিত করেন। যাল্লাস শপথ করে বলে আমি এসব কথা বলিনি, তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। অনেকের ধারণা, যাল্লাস এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর তওবা করেছিল এবং তার তওবা সঠিক প্রমাণিত হয়েছিল।

এবনে আবি হাতেম হযরত কা'ব এবনে মালেকের সূত্রে এ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন।

এবনে এসহাকও হযরত ক'াবের এ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এবনে সা'দ তাবকাতে উরওয়ার সুত্রে এ বর্ণনাই পেশ করেছেন।

মোনাফেকের বিরুদ্ধে দোয়া কবুল হলো

আল্লামা বগভী (রঃ) কালবীর সূত্রে লিখেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে যাল্লাস এবনে সুয়াইদ সম্পর্কে। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক দিন তাবুকে ভাষণ দান করলেন। এতে মোনাফেকদের আলোচনা ছিল এবং তাদেরকে

তিনি মন্দ এবং অপবিত্র বলেছিলেন। যাল্লাস এ কথা শ্রবণ করে বলেছিল, যদি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সত্য হয় তবে আমরা গর্ধবের চেয়েও মন্দ।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মদীনা শরীফ প্রত্যাবর্তন করলেন তখন হযরত আমর এবনে কায়েস তাঁকে যাল্লাসের এ কথা সম্পর্কে অবহিত করলেন। যাল্লাস বললঃ ইয়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমার সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলা হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উভয়কে মিম্বরের নিকট হাজির হয়ে শপথ করার আদেশ দেন। আসরের পর যাল্লাস মিম্বরের নিকট উপস্থিত হয়ে শপথ করে বললঃ শপথ সে আল্লাহ পাকের, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি এ কথা বলিনি আর আমার সম্পর্কে সে মিথ্যা কথা বলেছে। এরপর হযরত আমের (রাঃ) বললেন, শপথ সে আল্লাহ পাকের যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই সে এ কথা বলেছে, আর আমি মিথ্যা কথা বলিনি। এরপর হযরত আমের (রাঃ) আসমানের দিকে দু'হাত তুলে দোয়া করলেন–হে আল্লাহ! তুমি সত্য নবীর কাছে সত্য কথা নাজিল কর। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ মোমেন আমানতদার হয়। অতঃপর ঐ সাহাবীর দু'টি হাত ভিন্ন হওয়ার পূর্বেই জীব্রাইল (আঃ) আলোচ্য আয়াত–

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ ....

مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

পর্যন্ত নিয়ে উপস্থিত হন। অর্থাৎ–"তারা আল্লাহর নামে শপথ করে যে, তারা কিছু বলেনি, অথচ নিশ্চয়ই তারা কুফরী কলেমা বলেছে। আর ইসলাম গ্রহণের পর তারা কাফের হয়েছে। আর এমন কিছুর আকাংখা করেছে যা তারা পায়নি এবং তারা শুধু এজন্যে প্রতিশোধ নিয়েছে যে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল স্বীয় দানে ধন্য করে তাদেরকে অভাবমুক্ত করেছেন। যদি তারা তওবা করে তবে তাদের জন্য ভাল হবে। আর যদি বিমুখ হয় তবে আল্লাহ পাক তাদেরকে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন।" পৃথিবীতে তাদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী থাকবেনা।

এ আয়াত শ্রবণ করা মাত্র যাল্লাস দন্ডায়মান হয়ে আরজ করলোঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমি শ্রবণ করেছি আল্লাহ পাক তওবার

কথা এরশাদ করেছেন। আমের এবনে কায়েশ তাঁর কথায় সত্যবাদী। আল্লাহ পাকের নিকট আমি ক্ষমাপ্রার্থী, আমি তওবা করি। হযরত আনাস(রাঃ) যাল্লাসের এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেনঃ হযরত জায়েদ এবনে আরকাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এ কথা পৌঁছিয়ে ছিলেন।১

ইমাম রাজী (রঃ) বলেন, এ আয়াতের শানে নজুল এই যে, এ আয়াত নাজিল হয়েছে আবদুল্লাহ এবনে উবাই সম্পর্কে। আবদুল্লাহ এবনে উবাই বলেছিল, আমরা যখন মদীনা প্রত্যাবর্তন করব তখন সম্মানিত লোকেরা অপমানিতদেরকে বের করে দেবে। আর এ কথা দ্বারা সে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করেছিল। আবদুল্লাহ এবনে উবাইয়ের এ কথাটি হযরত জায়েদ এবনে আরকাম (রাঃ) শুনেছিলেন। তিনি এ সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অবহিত করেন। তখন হযরত ওমর (রাঃ) আবদুল্লাহ এবনে উবাইকে হত্যা করার ইচ্ছা করলেন, এমন সময় আবদুল্লাহ এবনে উবাই হাজির হয়ে শপথ করে বলল সে এমন কথা বলেনি। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

এবনে জরীর লিখেছেন, কাতাদা বর্ণনা করেছেন, দু' ব্যক্তির মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল। এক ব্যক্তি ছিল জোহাইনিয়া গোত্রের আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল গেফার গোত্রের। জোহাইনী ব্যক্তি গেফারী ব্যক্তির উপর প্রাধান্য বিস্তার করলে আবদুল্লাহ এবনে উবাই আওফ গোত্রকে ডাক দিয়ে বললঃ তোমরা তোমাদের ভাইকে সাহায্য কর। এরপর সে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে বেয়াদবীপূর্ণ মন্তব্য করলো তখন এ আয়াত নাজিল হয়।২

وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ

আর তারা অবশ্যই কুফরী কলেমা বলেছিল।

وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ

আর প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের পর তারা কাফের হয়েছিল।

وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৬৩
তফসীরে কবীর, খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-১৩৬

২। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-১৩৬
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৬৩

আর তারা এমন কাজের আকাংখা করেছিল যা তারা লাভ করতে পারেনি। এর দ্বারা সে ঘটনাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। মোনাফেকরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। আল্লাহ পাক তাঁকে তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত করেন এবং তাঁকে রক্ষা করেন, এভাবে তাদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দেন।

তেবরানী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের সূত্রে লিখেছেন যে, আসওয়াদ নামক এক ব্যক্তি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিল তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, বণীল মোস্তালেক যুদ্ধের সময় মোনাফেকরা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং মুসলমানদেরকে মদীনা শরীফ থেকে বহিস্কার করার ষড়যন্ত্র করেছিল। আলোচ্য বাক্য দ্বারা সে ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, মোনাফেকরা তাদের এ ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল যে, আমরা মদীনা পৌছে আবদুল্লাহ এবনে উবাইকে মুকুট পরাবো এবং তাকে নেতারূপে বরণ করে নিব, কিন্তু তাদের এ আকাংখ্যা পূর্ণ হয়নি।

وَمَا نَقَمُوٓا۟ إِلَّآ أَنْ أَغْنَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ مِن فَضْلِهِۦ

মোনাফেকরা যে ষড়যন্ত্র করেছে তার কারণ এই নয় যে, তারা মুসলমানদের দ্বারা কোন প্রকার কষ্ট পেয়েছে, বরং কারণ হলো–আল্লাহ পাক তাঁর রসূলের মাধ্যমে তাদেরকে অভাবমুক্ত করেছেন, তারা সম্পদশালী হয়েছে, তাই ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের এ ষড়যন্ত্র।

এবনে জরীর এবং আবুশ শেখ একরামার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এবনে আদি, এবনে কাবের গোলাম একজন মদীনাবাসীকে হত্যা করেছিল। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ খুনের কারণে বার হাজার দেরহাম আদায় করার রায় দিয়েছিলেন। আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, যাল্লাসের গোলামকে মারা হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘাতককে ১২ হাজার দেরহাম দিয়ত হিসেবে জরিমানা করেছিলেন যাল্লাসকে আদায় করা হয়, ফলে সে সম্পদশালী হয়।

কালবী (রঃ) বলেছেন, এ আয়াতের অর্থ হলো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমনের পূর্বে মদীনাবাসী অভাব অনটনে ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়াসাল্লামের শুভাগমনের কারণে মদীনাবাসী মালে গনিমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ পেয়েছেন, এভাবে তারা সম্পদশালী হয়েছেন।

আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ

অর্থাৎ যদি এ মোনাফেকরা তওবা করে তবে তা হবে তাদের জন্য উত্তম। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে আলোচ্য আয়াতের কারণে যাল্লাস তওবা করতে বাধ্য হয়।

وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمْ

আর যদি তারা তওবা করতে রাজি না হয় তবে আল্লাহ পাক তাদেরকে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে মর্মান্তিক শাস্তি দেবেন শুধু তাই নয়, বরং

وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ

পৃথিবীতে তাদের কোন অভিভাবক বা সাহায্যকারীও থাকবে না, যারা তাদেরকে হত্যার শাস্তি অথবা অপমান থেকে রক্ষা করতে পারে।

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰىنَا
مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّآ
اٰتٰىهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٧٦﴾
فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَآ اَخْلَفُوا اللّٰهَ
مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿٧٧﴾ اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ
سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿٧٨﴾ اَلَّذِيْنَ
يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ
لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ ؕ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ ۡ
وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٩﴾ اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ؕ اِنْ
تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ؕ ذٰلِكَ
بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٨٠﴾

তরজমা

(৭৫) তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা আল্লাহ পাকের নিকট অঙ্গীকার করেছিল যে, যদি তিনি আমাদেরকে ধন–সম্পদ দান করেন তবে আমরা নিশ্চয়ই সদকাহ দেব এবং সৎ লোকদের অন্তর্ভূক্ত হব।

(৭৬) এরপর যখন আল্লাহ পাক তাদেরকে নিজ কৃপায় দান করলেন, তখন তারা তাতে কৃপনতা করল এবং বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন অবস্থায় বিমুখ হ'ল।

(৭৭) পরিণামে আল্লাহ পাক তাদের অন্তরে মোনাফেকী রেখে দেন, সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তারা তাঁর সাক্ষাত করবে, কেননা তারা আল্লাহ পাকের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে এবং তারা মিথ্যা কথা বলত।

(৭৮) তারা কি জানেনা যে, আল্লাহ পাক জানেন তাদের গোপন রহস্য, পরামর্শ এবং সকল গোপন বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল।

(৭৯) মোমেনদের মধ্যে যারা স্বতঃস্ফুর্তভাবে দান করে এবং যারা নিজের শ্রম ব্যতীত কিছুই পায়না, তাদেরকে যারা বিদ্রুপ করে আল্লাহ পাক তাদেরকে বিদ্রুপ করেন। তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

(৮০) (হে রসূল!) আপনি তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করুন বা নাই করুন একই কথা, যদি আপনি তাদের জন্যে সত্তুর বারও ক্ষমা প্রার্থনা করেন তবুও আল্লাহ পাক কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। কেননা, তারা আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূলকে অস্বীকার করেছে, আর আল্লাহ পাক অবাধ্য লোকদেরকে পথ প্রদর্শন করেননা।

তফসীরুল কোরআন

শানে নজুল

আল্লামা বগভী, এবনে আবি হাতেম, এবনে জরীর, এবনে মরদবীয়া এবং বায়হাকী শোয়াবুল ঈমানে হযরত আবু উমামা বাহেলীর (রাঃ) সূত্রে বর্ণনা করেছেনঃ সা'লাবা এবনে হাতেব নামক এক ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করল, আমার জন্যে দোয়া করুন, যেন আল্লাহ পাক আমাকে অনেক ধন-সম্পদ দান করেন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ

ويحك يا ثعلب قليل تودى شكره خير من كثير لا تطيقه

হায় আক্ষেপ! হে সা'লাবা! অনেক ধন-সম্পদ পেয়ে যদি তার যথাযোগ্য শোকর আদায় না করা হয় তবে তার পরিবর্তে অল্পে তুষ্টি ভাল অর্থাৎ এমন সমৃদ্ধি লাভের স্থলে অতি অল্প সম্পদই উত্তম যার জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে শোকর আদায় করা হয়। কিন্তু সা'লাবা ছিল নাছোড় বান্দা, সে পুনরায় একই আবেদন করে। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ

يا ثعلب ترضى ان تكون مثل نبى الله لوشئت

ان تسير معى الجبال ذهبا لسارت

হে সা'লাবা! আমার আদর্শ অনুসরণ করা কি তোমার পছন্দনীয় নয়? আমি যদি ইচ্ছা করি তবে এ পাহাড় স্বর্ণে রূপান্তরিত হয়ে আমার সাথে চলতে থাকবে।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও সা'লাবা অধিক সম্পদ লাভের জন্যে পীড়াপীড়ি করতে থাকে এবং আল্লাহ পাক ধন-সম্পদ দান করলে তার শোকরিয়া আদায় করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার সমৃদ্ধির জন্যে দোয়া করেন। ফলে তার সমৃদ্ধির দ্বার উন্মুক্ত হয়। সে অত্যন্ত বড় সম্পদশালী হয়ে পড়ে। প্রথমে সে কয়েকটি ছাগল পালে কিন্তু পরে তার ছাগলের সংখ্যা এত বেড়ে যায় যে, মদীনা মোনাওয়ারায় তার স্থান হয়না। লোকালয়ে এত ছাগল পোষণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই তাকে মদীনা ছেড়ে চলে যেতে হয়। ক্রমে তার এ সম্পদ আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। মসজিদে নববীর জামাতে নামাজ তো দূরের কথা, জুমার নামাজ পর্যন্ত তার বাদ পড়তে থাকে। কিছু দিন পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার নিকট যাকাত আদায়ের জন্যে লোক প্রেরণ করেন। সে দম্ভভরে বলল, যাকাত আর জিযিয়ার মধ্যে পার্থক্য কি? একথা বলে দু' দুবার সে টালবাহানা করে। অবশেষে সে যাকাত আদায়ে অস্বীকৃতি জানায়। এ কথা শ্রবণ করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তিনবার আফসোস করে বলেন, হায় সালাবা!

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এ আক্ষেপের কথা শ্রবণ করে সমাজে অপমানের ভয়ে যাকাত নিয়ে তাঁর দরবারে হাজির হয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার নিকট থেকে যাকাত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান এবং এরশাদ করেনঃ "আল্লাহ পাক তোমার নিকট থেকে যাকাত গ্রহণ করতে আমাকে নিষেধ করেছেন।"

এরপর সে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তিরোধানের পর হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর আমলে সে যাকাত নিয়ে হাজির হয়। কিন্তু তিনিও তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। এমনিভাবে হযরত ওমর (রাঃ)ও তারপর হযরত ওসমান (রাঃ)-এর যুগেও সে যাকাত নিয়ে হাজির হয়। কিন্তু তাঁরা একই কথা বলেন, যা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম গ্রহণ করেননি, তা আমরা গ্রহণ করতে পারবনা। অবশেষে সা'লাবা অপমানিত অবস্থায় হযরত ওসমান (রাঃ)-এর আমলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তার সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।[১]

অন্যান্য তফসীরকারগণ এই ঘটনাটির আরো বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন সালাবার জন্য এই

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৬৫
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৮২-৮৩
তফসীরে কবীর, খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-১৩৮

দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! সালাবাকে সম্পদ দান কর। তখন সা'লাবা কিছু বকরী রাখলো। কয়েক দিনের মধ্যে তার বকরীর সংখ্যা এত বৃদ্ধি হ'ল যে, মদীনা শরীফের শহরে এত বকরী নিয়ে বাস করা তার পক্ষে সম্ভব হলনা। তাই মদীনার উপকণ্ঠে নিজের জন্য স্থান করে নিল। কিন্তু তার বকরীগুলো কীট পতঙ্গের মত বৃদ্ধি পেতে লাগলো। তাই ঐ স্থানটি তার জন্য সংকীর্ন হয়ে পড়লো, এ জন্য সে আরো দুরে সরে গেল। তখন সালাবা জোহর এবং আছরের নামাজ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সংগে আদায় করতো। অবশিষ্ট নামাজ সমূহ বকরীর চারন্ ক্ষেত্রেই পড়ে নিত। কিন্তু এরই মধ্যে তার বকরীর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেল। সেজন্য সে মদীনা ছেড়ে আরও দুরে সরে গেল। তখন শুধু জুমার নামাজের জন্য সে মদীনা শরীফে আসতো। কিছু দিন পর তার সম্পদ এত বৃদ্ধি পেল এবং সে তাতে এত ব্যস্ত হয়ে পড়লো যে, জুময়ার দিনও হাজিরী বন্ধ হয়ে গেল। জুম'য়ার দিন সে শুধু এতটুকু কাজ করতো যে, রাস্তায় দন্ডায়মান হয়ে থাকতো এবং মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করে খবর জেনে নিত। একদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, সালাবার কি হ'ল? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, সে বকরী রেখেছিল, আর সে বকরী এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, তাকে উম্মুক্ত ময়দানে চলে যেতে হয়েছে (এ জন্য সে জমাতে হাজির হয়না) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ সা'লাবা ধ্বংস হয়ে গেছে। কথাটি তিনি তিনবার বললেন, এরপর যখন জাকাত আদায়ের হুকুম নাজিল হ'ল তখন যাকাত উসূলের জন্য দুই ব্যক্তিকে নিযুক্ত করলেন, একজন বনী সলিমের আর একজন জোহায়নার। দু'জনকে একটি লেখা দিলেন যার মধ্যে জন্তুর বয়স লিপিবদ্ধ ছিল আর তাকে এই হেদায়েত লিপিবদ্ধ করা হয় যে কিভাবে জাকাত উসূল করবে, আর মৌখিক আদেশ প্রদান করেন যে, সালাবা এবনে হাতেব এবং বণী সালিমের অমুক ব্যক্তির নিকট গিয়ে যাকাত আদায় করে আন। আদেশ মোতাবেক তাঁরা সালাবার নিকট গমন করেনএবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের লেখা পাঠ করে শুনান, আর যাকাতের জন্তু তলব করেন। সা'লাবা বললো, এ যাকাততো অমুসলিম করের ন্যায়। এখন তোমাদের যেখানে যাবার চলে যাও। যখন সব স্থান থেকে অবসর পাও তখন প্রত্যাবর্তন কালে আমার নিকট আসবে। তারা উভয়ে বণী সলিমের সে ব্যক্তির নিকট হাজির হলেন। তিনি সর্বোত্তম জন্তুগুলো যাকাতের জন্য পেশ করলেন। উসূলকারীরা বললেন, এত উত্তম জন্তু দেয়া জরুরী নয়। তিনি বললেন, আমি অত্যন্ত আনন্দের সংগে দিচ্ছি, আপনারা গ্রহণ করুন। অন্যান্য স্থান থেকে যাকাত উসুল করার পর সা'লাবার নিকট পুনরায় তারা গমন করলেন। সা'লাবা বললো, আমাকে লেখাটি দেখিয়ে দিন। লেখা পাঠ করার পর সে বললো, এ-ত হল অমুসলিম করের ভাই। তোমরা এখন চলে যাও, আমি চিন্তা করে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো। তাঁরা মদীনায়ে মোনাওয়ারায় ফিরে

আসলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলেন তাদের কোন কথা বলার পূর্বে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তিনবার বললেন, "সালাবা ধ্বংস হয়ে গেছে।" এরপর যে ব্যক্তি তাঁর নির্দেশ মোতাবেক যাকাত আদায় করেছিল তার জন্য দোয়া করলেন। পরে তাঁরা সালাবা যা বলেছে তা জানিয়ে দিলেন। তখন সালাবা সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়। এরশাদ হয়েছেঃ

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰىنَا مِنْ فَضْلِهٖ

এবং তাদের মধ্যে কিছু লোক এমনও রয়েছে যে, আল্লাহ পাকের সংগে অংগীকার করেছে, যদি আল্লাহ পাক আমাদেরকে ধন-সম্পদ দান করেন তবে অবশ্যই সদকাহ প্রদান করবো এবং নেককারদের অন্তর্ভূক্ত হব।

এবনে জারীর এবং এবনে মারদাবীয়া উফির সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের অর্থ বর্ণনা করেছেন; মোনাফেকদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা আল্লাহ পাকের সাথে অংগীকার করেছে যে আল্লাহ পাক যদি আমাদেরকে ধন-সম্পদ দান করেন তবে আমরা যাকাত আদায় করবো এবং নেককারদের ন্যায় কাজ করবো অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য করবো, যাকাত আদায় করবো এবং আল্লাহর রাহে দান করবো।

فَلَمَّآ اٰتٰىهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ

এরপর আল্লাহ পাক যখন তাকে তাঁর দানে ধন্য করে অনেক সম্পদ প্রদান করলেন, তখন সে তাতে কার্পন্য করে যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানালো, আল্লাহ পাকের অবাধ্য হলো, আল্লাহ পাকের হক্ব আদায় করলো না, আল্লাহ পাকের রসূলের অবাধ্য হলো।

فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِىْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ

তাই আল্লাহ পাক অন্যায় আচরণের শাস্তি স্বরূপ তার অন্তরে মোনাফেকী রেখে দেন, এটি তার বিশ্বাসঘাতকতার এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করার পরিণাম ব্যতীত আর কিছুই নয়, মোনাফেকী তার অন্তরে চির প্রতিষ্ঠিত। সে মোনাফেকীর এই বিপদ থেকে কোন দিন নাজাত পাবেনা, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

بِمَآ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ۝٧٧

কেননা, সে অঙ্গীকার করেছিল যে, নেককার হবে, জাকাত আদায় করবে পরে এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে এবং মিথ্যা বলেছে।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মোনাফেকের তিনটি নিদর্শন

(ক) যখন কথা বলে তখন মিথ্যা বলে;

(খ) অঙ্গীকার করলে তা ভঙ্গ করে;

(গ) আর তার নিকট আমানত রাখলে সে খেয়ানত করে।

এই হাদীস বর্ণনা করেছেন হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ), সংকলিত হয়েছে সমস্ত বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ সমূহে। আর মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে এ কথাটি সংযোজিত হয়েছে-"যদিও সে নামাজ আদায় করে, রোজা রাখে এবং মুসলমান হওয়ার দাবী করে।" আল্লামা বগভী, এবনে জরীর হযরত আবু উমামা (রাঃ)-এর সূত্রে পূর্বোল্লেখিত হাদীস বর্ণনার পর এ কথাও লিখেছেন; যখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হলো তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট সালাবার কোন আত্মীয় উপস্থিত ছিল। সে আয়াত শ্রবণ করে সংগে সংগে সালাবাকে এ খবর জানালো যে, তোমার সম্পর্কে আল্লাহ পাক এই আয়াত নাজিল করেছেন। তখন সালাবা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে যাকাত কবুল করার জন্য দরখাস্ত করলো। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ"আল্লাহ পাক আমাকে তোমার যাকাত কবুল করতে নিষেধ করেছেন।" তখন সালাবা তার মাথার উপর মাটি ফেলতে লাগল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এটি তোমার কীর্তি-কলাপ। আমি তোমাকে আদেশ দিয়েছিলাম, তুমি অমান্য করেছ।[১]

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) সাঈদ এবনে জোবায়ের (রাঃ) এবং কাতাদা (রঃ) বর্ণনা করেছেন, একদিন আনসারদের এক মজলিশে সালাবা হাজির হলো এবং আনসারদেরকে সাক্ষী করে বললঃ যদি আল্লাহ পাক আমাকে তাঁর দানে ধন্য করেন তবে আমি তা থেকে প্রত্যেক হক্কদারের হক্ক আদায় করব। দান খয়রাত করব, আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য করব। ঘটনাক্রমে তার চাচাতো ভাইয়ের ইন্তেকাল হলো এবং সালাবা তার ওয়ারিশ হলো। ফলে অনেক ধন-সম্পদের মালিক হলো। কিন্তু সে কথা ঠিক রাখেনি, তখন আল্লাহ পাক এ আয়াত নাজিল করেন।

হাসান বসরী এবং মুজাহেদ (রঃ)-এর কথা হলো এই আয়াত নাজিল হয়েছে সালাবা এবনে হাতেব এবং মাতাব এবনে কোশায়ের সম্পর্কে। এ দু' ব্যক্তি বনু আমর এবনে আওফের বংশধর ছিল। গোত্রের সরদারদের এক মজলিশ অনুষ্ঠিত হয়।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৭৯-৮০

সেখানে এ দু'জন বলে "আল্লাহর শপথ! যদি আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাঁর দানে ধন্য করেন তবে আমরা আল্লাহর রাহে দান খয়রাত করব।" কিন্তু যখন আল্লাহ পাক তাদেরকে ধন-সম্পদ দান করলেন তখন তারা কৃপন হয়ে গেল এমনকি যাকাত পর্যন্ত আদায় করলনা।

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ

এই মোনাফেকরা কি জানেনা যে, আল্লাহ পাক তাদের গোপন রহস্য এবং পরামর্শ সম্পর্কে অবগত, আল্লাহ পাকের নিকট কোন কিছুই গোপন নেই, তাদের মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠের কথা তিনি জানেন এবং তাদের গোপন পরামর্শ সম্পর্কেও তিনি ওয়াকেফহাল। যে সব পরামর্শে তারা ইসলামের বিধি-নিষেধ সম্পর্কে সমালোচনা করে এবং যাকাতকে কর বলে মন্তব্য করে আল্লাহ পাক তাদের মনের সম্পূর্ণ গোপনতম রহস্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেনঃ যখন সদকাহর আয়াত নাজিল হলো তখন আমি শ্রমিকের কাজ করতাম, বোঝা বহন করতাম। কিন্তু যখন সদকাহর আয়াত নাজিল হলো তার ফলশ্রুতিতে অনেকেই আমাকে অনেক ধন-সম্পদ দান করলো। আর কোন কোন লোকে খুব সামান্যই দিল। যারা অধিক পরিমাণে দিল তাদের সম্পর্কে মোনাফেকরা বললঃ সে-তো লোক দেখানোর জন্য দিয়েছে, আর যে কম দিল তার সম্পর্কে মোনাফেকরা মন্তব্য করল, "আল্লাহ পাকের এত সামান্য সম্পদের কোন প্রয়োজন নেই, এই ক্ষুদ্র দানের আর কি সওয়াব হবে?" এরপর আলোচ্য আয়াত নাজিল হল।

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ

মোমেনদের মধ্যে যারা সন্তুষ্ট চিত্তে স্বতঃস্ফুর্তভাবে আল্লাহর রাহে দান খয়রাত করে এবং যারা নিজেদের শ্রম ব্যতীত কিছুই পায়না তাদেরকেই মোনাফেকরা বিদ্রুপ করে, আল্লাহ পাকও তাদেরকে বিদ্রুপ করেন, আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

আল্লামা বগভী লিখেছেন, তফসীরকারগণ বলেছেনঃ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মানুষকে আল্লাহর রাহে দান করতে উদ্বুদ্ধ করেন। তখন হযরত আবদুর রহমান এবনে আওফ (রাঃ) চার হাজার দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) পেশ

করে আরজ করেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার নিকট আট হাজার দিনার ছিল আমি তন্মধ্যে চার হাজার দিনার আপনার খেদমতে হাজির করেছি আপনি তা আল্লাহর রাহে ব্যয় করুন, অবশিষ্ট চার হাজার দিনার আমার পরিবারবর্গের জন্য রেখে এসেছি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যা কিছু তুমি দিয়েছ আর যা কিছু তুমি রেখেছ আল্লাহ পাক সব কিছুর মধ্যে বরকত দান করুন। এই দোয়ার কারণে আল্লাহ পাক হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)-এর সম্পদে অনেক বরকত দান করেছিলেন। ইন্তেকালের সময় তাঁর দুই স্ত্রী ছিল যারা হযরত আবদুর রহমান এবনে আওফের মোট পরিত্যক্ত সম্পদের এক অষ্টমাংশ পেয়েছিলেন। এক অষ্টমাংশে দুই স্ত্রীকে এক লক্ষ ষাট হাজার দিনার দেয়া হয়েছিল।

সেদিন হযরত আসেম (রাঃ) এবনে আদী আজলানী একশত ওয়াসাক খেজুর (প্রায় পাঁচশত মন) পেশ করেছিলেন (এক ওয়াসাকে ষাট সা হয়, আর এক সা-এ চার সের হয়) আবু আকীল আনসারী (রাঃ) সেদিন এক সা খেজুর পেশ করে আরজ করেছিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! সারা রাত পানি টেনে আমি দু'সা খেজুর পারিশ্রমিক হিসেবে পেয়েছি। তন্মধ্যে এক সা পরিবারবর্গের জন্য রেখে এসেছি আর এক সা আপনার খেদমতে হাজির করেছি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন সদকাহ হিসেবে যা অর্জিত হয়েছে তার উপর এই খেজুর গুলোকে ছড়িয়ে দাও। এই সময় মোনাফেকরা বিদ্রূপ করে বললো আবদুর রহমান এবনে আওফ (রাঃ) এবং আসেম (রাঃ) যা কিছু দিয়েছেন তাতো লোক দেখানোর জন্যে আর আবু আকীল যে এক সা এনেছেন তার কোন গুরুত্বই নেই, তখন এই আয়াত নাজিল হয়। আলোচ্য আয়াতে-

الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

বাক্যটি হযরত আবদুর রহমান এবনে আওফ (রাঃ) এবং হযরত আসেম (রাঃ)-এর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। আর لَا يَجِدُوْنَ দ্বারা হযরত আবু আকীলের কথা বলা হয়েছে। আবু আকীল (রাঃ) ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র সাহাবী। তিনি সারারাত ইহুদীর বাগানে পানি দিয়ে যে দু' সা খেজুর রোজগার করেছিলেন তারই অর্ধেক তিনি আল্লাহর রাহে দান করেছিলেন। কিন্তু দুরাত্মা মোনাফেকরা তাঁকেও বিদ্রূপ করেছে, তাই আল্লাহ পাক তাদের ভয়াবহ পরিণামের কথা ঘোষণা করে এরশাদ করেছেনঃ

سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ

আল্লাহ পাক তাদেরকে পরিহাস করছেন অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাদেরকে তাদের বিদ্রূপের শাস্তি দেবেন।

বায়হাকী হযরত হাসানের সূত্রে লিখেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মোমেনদেরকে যারা বিদ্রুপ করে তাদেরকে এভাবে শাস্তি দেয়া হবে যে, তাদের জন্য জান্নাতের দ্বার উন্মুক্ত করে তাদেরকে ডাকা হবে, তারা অস্থির হয়ে আসবে যখন প্রবেশ করার মুহূর্ত আসবে তখন দ্বার বন্ধ হয়ে যাবে। এভাবে তাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত উপহাস করা হবে যতক্ষণ তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করার জন্যে ডাকা হলে তারা আর অগ্রসর হবেনা।১

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ط

হে রসুল! আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন বা না করুন একই কথা, যদি আপনি তাদের জন্য সত্তুর বারও ক্ষমা প্রার্থনা করেন তবুও আল্লাহ পাক কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না।

শানে নজুল

আবদুল্লাহ এবনে উবাই ছিল মোনাফেক সর্দার। কিন্তু তার পুত্র ছিল প্রকৃত মোমেন, যখন আবদুল্লাহ এবনে উবাই মৃত্যু শয্যায় ছিল তখন তার মোমেন পুত্র আবদুল্লাহ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে তার মাগফেরাতের জন্য দোয়া করার আরজি পেশ করলেন তখন এ আয়াত নাজিল হয়।২

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ যখন মোনাফেকদের সম্পর্কে পূর্ববর্তী আয়াত নাজিল হয় তখন তারা বলে, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, অচিরেই আমি তোমাদের জন্য এস্তেগফার করবো। এরপর তিনি তাদের জন্য এস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা শুরু করলেন তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ

অর্থাৎ হে রসূল! আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন বা না করুন একই কথা, এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা পরিত্যাগ করলেন।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৬৯-৭০
তফসীরে কবীর, খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-১৪৫

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৭০

হযরত হাসান বসরী (রাঃ) বলেছেন, মোনাফেকরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে তাদের নানা ওজর আপত্তির কথা বলতো এবং এ কথাও বলতো যে, আমাদের নিয়ত ছিল মহৎ, আমরা আপনাদের সাথে কল্যাণ ছাড়া অন্য কিছু কামনা করিনা তখন এ আয়াত নাজিল হয়। আর অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যখন মদীনায়ে তৈয়্যেবায় মসজিদে নববীতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খোৎবা দিতেন তখন আবদুল্লাহ এবনে উবাই দাড়িয়ে বলতো ইনি হলেন আল্লাহর রসূল, আল্লাহ পাক তাঁকে সম্মানিত করেছেন, মর্যাদা সম্পন্ন করেছেন এবং তাঁকে সাহায্য করেছেন কিন্তু ওহোদের যুদ্ধের দিন এই আবদুল্লাহ এবনে উবাই এবনে সলুল বিশ্বাস ঘাতকতা করে তার তিনশ লোক নিয়ে রণাঙ্গণ থেকে পলায়ন করেছে। ওহোদের যুদ্ধের পরও সে পূর্বের ন্যায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ভাষণের পর বক্তব্য রাখার উদ্দেশ্যে দাড়ালো। তখন হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর দুশমন বসে পড়, তোমার কুফুরী ও নাফরমানী সবদিক থেকে প্রকাশ পেয়েছে। তখন সে মসজিদে নববী থেকে বের হয়ে পড়লো। তার সম্প্রদায়ের একজনের সাথে তার দেখা হলে সে জিজ্ঞাসা করলো তোমার কি হয়েছে? সে ঘটনা বর্ণনা করলো। তখন ঐ ব্যক্তি বললো তুমি আল্লাহর রসূলের নিকট ফিরে যাও তিনি তোমার জন্য এস্তেগফার করবেন। সে বললো আমার জন্য এস্তেগফার করুক বা না করুক আমি পরোয়া করিনা তখন নাজিল হল–

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ

যখন তাদেরকে বলা হয় আস তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূল এস্তেগফার করবেন তখন তারা ঘাড় বাঁকা করে চলে যায়।

বর্ণিত আছে যে, মোনাফেকরা ওহোদের যুদ্ধের পর হাজির হয়ে নিজেদের ওজর আপত্তি পেশ করে এবং তদের জন্য এস্তেগফার করার আরজি পেশ করে তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।[১]

এই আয়াত দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, মোনাফেকী অত্যন্ত জঘন্য এবং মারাত্মক মহাপাপ, কেননা স্বয়ং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যদি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন তবুও আল্লাহ পাক তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। আর একবার দুবার নয় যদি সত্তুর বারও তিনি

১। তফসীরে কবীর, খন্ড–১৬, পৃষ্ঠা–১৪৬
তফসীরে রুহুল মা'আনী, খন্ড–১০, পৃষ্ঠা–১৪৮

ক্ষমা প্রার্থী হন তবুও তদেরকে ক্ষমা করা হবেনা বলে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন।

বস্তুতঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছিলেন দয়ার সাগর, তিনি ছিলেন রাহমাতুল্লিল আলামীন। যারা ছিল মোনাফেক, যারা আজীবন তাঁর সাথে শক্রতা করেছে, যারা সর্বক্ষণ তাঁর শক্রতায় ছিল লিপ্ত তাদের সরদার আবদুল্লাহ এবনে উবাই এবনে সলুল যখন মারা যায় তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার কাফনের জন্যে তাঁর নিজের জামাটি খুলে দেন, তার জানাযার নমাজও পড়েন এবং তার মাগফেরাতের জন্য দোয়াও করেন। এ সময় হযরত ওমর (রাঃ) এই অবস্থা সইতে পারলেন না, ইসলামের এত বড় শক্রর সংগে এমন উদারতা এটি অত্যন্ত বিস্ময়কর সম্পূর্ণ অচিন্তনীয়। তাই হযরত ওমর (রাঃ) বলেছিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ যে লোকটি আজীবন ইসলামের ক্ষতি সাধনে তৎপর ছিল তার সাথে এ কেমন ব্যবহার? তার জবাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর (রাঃ)-কে বললেন হে ওমর! তাদের জন্য দোয়া করতে আমাকে নিষেধ করা হয়নি, আমাকে বলা হয়েছে, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা না করা সমান, তাই আমি আমার কাজ করে যাই, আল্লাহ পাকের যা মর্জি তাই করবেন।

বোখারী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি সত্তুর বারের অধিক ক্ষমা প্রার্থী হলে তারা ক্ষমা পেত তবে আমি তাদের জন্য সত্তুর বারের অধিক ক্ষমা প্রার্থনা করতাম। অবশেষে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ফরমান জারি হয়।

وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا

তাদের কোন লোকের মৃত্যু হলে আপনি আর তাদের জানাজার নামাজ আদায় করবেন না। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন মোনাফেকের নামাজে জনাযায় শরীক হন নাই।

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝٨٠

আর আল্লাহ পাক পাপীষ্ঠ সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না, কেননা তারা ঈমানের স্থলে কুফরী ও নাফরমানীর অন্বেষণ করে; বরং নাফরমানীর সমুদ্রে সর্বক্ষণ নিমজ্জিত থাকে।

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْٓا اَنْ
يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْا لَا
تَنْفِرُوْا فِى الْحَرِّ ؕ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ؕ لَوْ كَانُوْا
يَفْقَهُوْنَ ﴿٨١﴾ فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا
يَكْسِبُوْنَ ﴿٨٢﴾ فَاِنْ رَّجَعَكَ اللّٰهُ اِلٰى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَاْذَنُوْكَ
لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِىَ اَبَدًا وَّلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِىَ
عَدُوًّا ؕ اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخٰلِفِيْنَ ﴿٨٣﴾
وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ؕ
اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٨٤﴾

তরজমা

(৮১) যারা পশ্চাতে রয়ে গেল তারা আল্লাহর রসূলের বিরোধীতা করে বসে থাকার মধ্যেই আনন্দ লাভ করল এবং নিজেদের ধন–সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর রাহে জেহাদ করাকে অপছন্দ করলো, এমনকি তারা বলল দারুন গরমে জেহাদে বের হয়োনা। (হে রসূল! আপনি বলুন দোজখের আগুণ অধিকতর গরম, যদি তারা বুঝতে পারে।

(৮২) অতএব, তারা সামান্য হাসুক তাদের কৃতকর্মের পরিণামে তাদেরকে অনেক কাঁদতে হবে।

(৮৩) (হে রসূল!) আল্লাহ পাক যদি আপনাকে তাদের কোন দলের নিকট ফেরত আনেন এবং তারা জেহাদের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার জন্যে আপনার অনুমতি প্রার্থনা করে তবে আপনি বলুন তোমরা কখনও আমার সাথে বের হবে না এবং তোমরা আমার সংগী হয়ে কখনও দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, তোমরাতো প্রথম বার বসে থাকাই পছন্দ করেছিলে অতএব, যারা পেছনে পড়ে থাকে তাদের সংগেই বসে থাক।

(৮৪) (হে নবী!) তাদের মধ্যে যদি কারো মৃত্যু হয় তবে আপনি কখনও তার জানাযার নামাজ পড়াবেন না নিশ্চয়ই তারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলকে অস্বীকার করেছিল আর অবাধ্য অবস্থায়ই তাদের মৃত্যু হয়েছে।

তফসীরুল কোরআন

শানে নজুল

এবনে জরীর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে লিখেছেন, তাবুকের যুদ্ধের জন্য যখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আহবান জানালেন তখন এক ব্যক্তি আরজ করলো এখন প্রচন্ড গরম এই গরমে জেহাদের জন্যে বের হবেন না তখন এ আয়াত নাজিল হয়।[১]

আয়াতের মর্মকথা

এ আয়াতে মোনাফেকদের আরো একটি অপরাধের উল্লেখ করা হয়েছে, আর তা হ'ল মোনাফেকরা শুধু যে অপরাধ করতো তাই নয়; বরং অপরাধ করতে পেরে আনন্দিত হতো যেমন, তাবুকের যুদ্ধের সময় যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য আহবান জানালেন প্রকৃত মুসলমানগণ চরম গরম থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধে শরীক হলেন। কিন্তু মোনাফেকরা বিভিন্ন প্রকার মিথ্যা ওজর আপত্তি পেশ করে অক্ষম অসহায় লোকদের ন্যায় ঘরে বসে রইল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আহবানে সাড়া দিয়ে জেহাদে শরীক হওয়াতো দূরের কথা; বরং জেহাদ থেকে বিরত থাকতে পেরে তারা আনন্দিত হল। তফসীরকারগণ বলেছেনঃ

خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ

এই বাক্যটির দু'টি অর্থ হতে পারে-

১। যারা জেহাদে শরীক হয়নি তারা আল্লাহর রসূলের পেছনে পড়ে থেকে আনন্দবোধ করেছে।

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-১৪৮
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৭২

২। অথবা এর অর্থ হল তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধীতা করে আনন্দবোধ করেছে কেননা তারা ছিল আল্লাহর রসূলের শত্রু।[১]

وَكَرِهُوٓا أَن يُجَٰهِدُوا بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ
وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِى ٱلْحَرِّ

আর ধন–সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর রাহে জেহাদ করাকে তারা অপছন্দ করলো। তফসীরকারগণ বলেছেন, এই বাক্যটিতে পরোক্ষভাবে মুসলিম মুজাহেদদের প্রশংসা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর রাহে ধন–সম্পদ ও জীবন দিয়ে জেহাদে শরীক হয়েছেন এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করে ধন্য হয়েছেন, অথচ তাদেরকে জেহাদ থেকে বিরত রাখার জন্য মোনাফেকরা বলেছিল, এই চরম গরমে জেহাদের জন্য বের হয়োনা। আল্লাহ পাক পরবর্তী বাক্যে এর জবাব দিয়ে এরশাদ করেছেনঃ

হে রসূল! আপনি বলে দিন দোজখের আগুণ প্রচন্ডতম গরম।

হযরত আনাস এবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে–

إِنَّ نَارَكُمْ هَٰذِهِ جُزْءٌ مِّنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِّنْ نَارِ جَهَنَّمَ
وَلَوْلَا أَنَّهَا أُطْفِئَتْ بِالْمَاءِ مَرَّتَيْنِ مَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا
وَإِنَّهَا لَتَدْعُو اللَّهَ أَنْ لَا يُعِيدَهَا فِيهَا

নিশ্চয় তোমাদের এই অগ্নি দোজখের অগ্নির সত্তুর ভাগের এক ভাগ, যদি এই অগ্নিকে দু'বার পানি দ্বারা নির্বাপিত না করা হত তবে তোমরা তা দ্বারা উপকৃত হতে পারতে না, আর এই অগ্নি আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া প্রার্থী যেন তাকে পুনরায় দোজখের অগ্নিতে প্রবেশ না করা হয়।

অতএব, মোনাফেকরা জেহাদ থেকে বিরত থেকে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধীতা করে তাদের নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুঠারাঘাত করেছে, নিজেদেরকে ধ্বংস করেছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড–৫, পৃষ্ঠা–৭২

এরশাদ করেছেনঃ দোজখের অগ্নিকে এক হাজার বছর পর্যন্ত প্রজ্জ্বলিত রাখা হয় তখন তার বর্ণ হয় লাল, এরপর আরো এক হাজার বছর পর্যন্ত জ্বালিয়ে রাখা হয় তখন তার বর্ণ হয় সাদা এরপর আরো এক হাজার বছর জ্বালিয়ে রাখা হয় তখন তা কালো বর্ণ ধারণ করে তাই এখন দোজখের অগ্নি অন্ধকার রাত্রির ন্যায় কালো।

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে দোজখের অগ্নির একটি স্ফুলিংগ যদি প্রাচ্যে থাকে তবে তার তাপ প্রতীচ্য পর্যন্ত পৌছবে।

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, দোজখীদের মধ্যে সবচেয়ে কম আজাব হবে সে ব্যক্তির যার দু'টি পাদুকা অগ্নির হবে কিন্তু ঐ পাদুকা দুটির কারণে তার মাথার মগজ বের হয়ে আসবে। সে ধারণা করবে সর্বাধিক আজাব বোধ হয় তারই হচ্ছে অথচ দোজখীদের মধ্যে সবচেয়ে কম আজাব হবে তার।[১]

তাই পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ﴿٨١﴾

যদি এই মোনাফেকরা বুঝতো যে তাদের পরিণাম কত ভয়াবহ হবে তবে কত ভাল হত।

فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সংগী হয়ে জেহাদে না যাওয়ার কারণে মোনাফেকরা আনন্দিত হয়েছে এবং এই খুশি ও আনন্দের কারণে তারা হাঁসতেছে। তাই আলোচ্য আয়াতে তাদের উদ্দেশ্যে এই সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। তোমাদের অবশেষে অনেক কাঁদতে হবে সামান্য কয়েক দিনই তোমরা হাঁসতে পারবে। আর আখেরাতে তাদেরকে কাঁদতে হবে তা তাদের কীর্তিকলাপের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপই।

একখানি হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ হে লোক সকল! তোমরা কাঁদতে থাক যদি কাঁদা না আসে তবে অন্ততঃ ক্রন্দনকারীর আকৃতি ধারণ কর।

এবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) আলোচ্য আয়াতের এই তফসীর করেছেন যে, দুনিয়া অতি সামান্য, এখানে যত ইচ্ছা

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৮৩

হাঁসতে পারো। কিন্তু যখন দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহর নিকট প্রত্যেকেই হাজির হবে তখন এত ক্রন্দন করতে হবে যে, সেই ক্রন্দন কোন দিন শেষ হবেনা।

এবনে মাজাহ, আবু ইয়ালা, বায়হাকী হযরত আনাস (রাঃ) –এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন তিনি বর্ণনা করেন আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি দোজখীদের ক্রন্দনে অশ্রুর বন্যা প্রবাহিত হবে। কিন্তু তারা এত ক্রন্দন করবে যে, যখন অশ্রু শেষ হয়ে যাবে তখন রক্ত বের হবে এবং তাদের চেহারার মধ্যে বড় বড় গর্ত হবে।

হাকেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে কায়েসের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দোজখীরা এত ক্রন্দন করবে যে, তাদের অশ্রুর নদীতে নৌকা ভাসাইতে চাইলে তা ভাসবে। এরপর তারা রক্তের অশ্রু ফেলবে।

হযরত জায়েদ এবনে রাফী থেকে বর্ণিত হয়েছে, দোজখীরা যখন দোজখে প্রবেশ করবে তখন সুদীর্ঘ কাল পর্যন্ত তারা কাঁদতে থাকবে এবং অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকবে। এরপর অশ্রুর স্থলে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে। তখন দোজখের ফেরেশতারা তাদেরকে বলবে, হে বদনসীবের দল! তোমরা দুনিয়াতে (গুনাহর কারণে) ক্রন্দন করনি, আজকে তোমাদের ফরিয়াদ কে শ্রবণ করবে, এরপর তারা এই বলে চিৎকার দেবে, হে আমাদের পিতা মাতা! হে আমাদের সন্তান সন্তুতিরা! আমরা কবরে তৃষ্ণার্ত ছিলাম, এখনও তৃষ্ণার্ত আছি, সামান্য পানি আমাদের দিকে ফেলে দাও। আর যে নেয়ামত আল্লাহ পাক তোমাদেরকে দান করেছেন তা থেকেও আমাদেরকে দান কর। এভাবে তারা চল্লিশ বছর যাবৎ চিৎকার দিতে থাকবে। কিন্তু কেউ জবাব দিবেনা। অবশেষে এ জবাব দেয়া হবে–তোমাদেরকে এখানেই থাকতে হবে এরপর তারা সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যাবে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, দুনিয়াতে কম হাসবে এবং কাঁদবে অধিক। অধিক হাসি দিলের মৃত্যুর কারণ হয়, আর অধিক ক্রন্দনের কারণে গুণাহ মাফ হয়।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যা কিছু আমি জানি যদি তোমরা তা জানতে তবে কম হাসতে, বেশী কাঁদতে।

(বোখারী, মুসলিম তিরমিজি নেসায়ী, এবনে মাজাহ)

এবনে মাজাহ শরীফে হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ

করেছেনঃ যে মোমেন বান্দা আল্লাহর ভয়ে (ক্রন্দন করে) তার নয়ন যুগল থেকে অশ্রু বের হয় আর সেই অশ্রু মাছির মাথার সমান হলেও যদি সে এজন্য দুঃখিত ব্যথিত হয় তবে আল্লাহ পাক তার জন্য দোজখ হারাম করে দেন।[১]

فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ

যদি আল্লাহ পাক আপনাকে নিরাপদে মদীনা শরীফে প্রত্যাবর্তনের তৌফিক দান করেন এরপর মোনাফেকদের কোন লোক যদি জেহাদে আপনার সংগী হওয়ার আরজী পেশ করে তবে হে রসূল! আপনি তাদেরকে সুস্পষ্ট ভাষায় জবাব দিয়ে দিন– তোমাদের মুখোশ খসে পড়েছে, তোমাদের আসল চেহারা প্রকাশিত হয়েছে, তোমাদের বীরত্বের দৌড় আমরা দেখে ফেলেছি, আর কখনও তোমরা আমার সংগে বের হতে পারবে না। যখন তোমাদেরকে জেহাদের জন্য বলা হয়েছে প্রথম বারেই তোমরা অসহায় অক্ষম নারী এবং শিশুদের সংগে বসে থাকা পছন্দ করেছ। এই পর্য্যায়ে প্রথম বার তোমরা নিজেদের জন্য যে কর্মপন্থা গ্রহণ করেছ তাই তোমাদের জন্য সমীচীন, অসহায় নারী পুরুষদের সংগেই তোমরা বসে থাক।

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে মোনাফেকদের জন্য এস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। আর এই আয়াতে মোনাফেকদের উপর নামাজে জানাযা আদায় না করার নির্দেশ রয়েছে। বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। মোনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ এবনে উবাইর মৃত্যু হল তার পুত্র হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে নিজের পিতার জন্য তার একটি জামা দানের আরজি পেশ করে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে তা দান করেন। এরপর তাকে জানাযা পড়াবার জন্যে আবেদন করলে তিনি জানাযা পড়াবার জন্য তৈরী হন। তখন হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আল্লাহ পাক মোনাফেকদের জানাযা পড়াবার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন, আমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি বা না করি এক সমান। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ যদি সত্তর বারও তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি তবুও আল্লাহ পাক তাকে মাফ করবেন না। আমি তার জন্যে সত্তুর বারের চেয়েও অধিক পরিমাণে ক্ষমা প্রার্থনা করবো।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড–৫, পৃষ্ঠা–৩৭৪–৭৫

হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করলেন, সে তো মোনাফেক ছিল। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন তার নামাজে জানাযা পড়িয়ে দেন তখনই আল্লাহ পাক এই আয়াত নাজিল করেন-

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا

এ মোনাফেকদের মধ্যে কেউ যদি মারা যায় কখনও আপনি তাদের প্রতি নামাজে জানাযা পড়বেন না এবং কখনও তাদের জন্য দোয়া ও এস্তেগফার করবেন না শুধু তাই নয়,

وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ

কখনও তাদের কবরের পার্শ্বে দাড়াবেন না, দাফন বা জেয়ারত কোন কিছুর জন্যেই তাদের কবরের পার্শ্বে দাড়াবেন না, কেননা

إِنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ فَٰسِقُونَ

তারা আল্লাহ পাক ও তার রসূলের অবাধ্য হয়েছে, আর অবাধ্য অবস্থায়ই মারা গেছে। যারা কাফের, যারা অবাধ্য নাফরমান,তাদের সংগে এই ব্যবহারই সমীচিন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীস বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে যে আবদুল্লাহ এবনে উবাই-এর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) তার পিতার মৃত্যুর সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট তার পিতার জন্য দোয়া করার জন্য আরজী পেশ করেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার জন্য দোয়া করেন, তখন এই আয়াত নাজিল হয়।

হাকেম এবং বায়হাকী হযরত উসামা এবনে জায়েদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এবনে উবাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট তার মাগফেরাতের ব্যাপারে দোয়া করার জন্য আবেদন করেছিল। আর যে পোশাক তাঁর দেহ মোবারকে ছিল তার কাফনের জন্য সেই পোশাকটি প্রদানের জন্য দরখাস্ত করেছিল। আর এ আরজীও পেশ করেছিল যে, আমার জানাযার নামাজ আপনি পড়াবেন। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার কাফনের জন্য নিজের জামা দান করলেন এবং তার জানাযার নামাজও পড়িয়ে দেন।

বোখারী শরীফে হযরত জাবের (রাঃ) সংকলিত হাদীসে রয়েছে, বদরের দিন হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে বন্দী হিসেবে আনা হয়। তাঁর দেহে কোন জামা ছিলনা। আবদুলাহ এবনে উবাই তার নিজের জামাটি হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে দিয়েছিলেন,

তা তার দেহের মাপ অনুযায়ী ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেই জামাটি হযরত আব্বাসকে পরিয়ে দিলেন। তারই বিনিময়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর জামা আবদুল্লাহ এবনে উবাইকে দেন যা দ্বারা তাকে দাফন হয়।

আল্লামা বগভী লিখেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ এবনে উবাইর সাথে যে ব্যবহার করেছেন (তার মৃত্যুর পর) এ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম কথা বলেন তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমার জামা এবং আমার নামাজ তাকে আল্লাহর আজাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহর শপথ! আমার আকাংখা ছিল এই যে এর কারণে তার সম্প্রদায়ের এক হাজার লোক ইসলাম গ্রহণ করুক। বর্ণনাকারী বলেন, আবদুল্লাহ এবনে উবাইর সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন দেখল যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জামা দ্বারা সে তবাররুক হাসিল করেছে তখন এক হাজার ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে।

আল্লামা বগভী লিখেছেন, এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন মোনাফেকের নামাজে জানাযা পড়েননি। আর তাঁর ইন্তেকাল হওয়া পর্যন্ত কোন মোনাফেকের কবরের সামনে দোয়া করার জন্যে দন্ডায়মান হননি।

وَلَا
تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا
فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٨٥﴾ وَإِذَا أُنزِلَتْ
سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو
الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ ﴿٨٦﴾ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا
مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٨٧﴾ لَٰكِنِ
الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ
وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨٨﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ ﴿٨٩﴾

তরজমা

(৮৫) আর তাদের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্তুতি যেন আপনাকে বিস্মিত না করে। আল্লাহ পাক এর দ্বারাই তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে শাস্তি দিতে চান আর কাফের অবস্থায়ই যেন তাদের প্রাণ বের হয়।

(৮৬) আর যখন কোন সূরা নাজিল হয় (এ মর্মে) যে, আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আন এবং আল্লাহর রসূলের সঙ্গী হয়ে জেহাদ কর (হে রসূল!) তাদের মধ্যে যাদের শক্তি সামর্থ আছে তারা আপনার নিকট (জেহাদ থেকে) অব্যাহতি চায় এবং তারা বলে, আমাদের ছেড়ে দিন, আমরা তাদের সঙ্গে থেকে যাই, যারা বসে রয়েছে।

(৮৭) যারা পেছনে রয়ে গেছে, অন্তঃপুরবাসিনীদের সঙ্গে আবস্থান করাই তারা পছন্দ করেছে, তাদের অন্তর মোহর করা হয়েছে, তাই তারা বুঝতে পারেনা।

(৮৮) কিন্তু রসূল এবং যারা তাঁর সঙ্গে ঈমান এনেছিল, তারা তাদের অর্থ-সম্পদ এবং জীবন দিয়ে আল্লাহ পাকের রাহে জেহাদ করেছে, তাদের জন্যেই রয়েছে কল্যাণ, আর তারাই সফলকাম।

(৮৯) আল্লাহ পাক তাদের জন্যেই তৈরী করেছেন জান্নাত যার নিম্নদেশে প্রবাহিত হয় নির্ঝরমালা, জান্নাতীগণ সেখানে চিরদিন থাকবে, এটিই মহা সাফল্য।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে ঘোষণা করা হয়েছে যে, মোনাফেকরা কোপগ্রস্থ, তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে তিনি যেন তাদের জন্যে এস্তেগফার না করেন, তাদের নামাজে জানাযা না পড়েন, এমনকি তাদের কবরের পার্শে দোয়ার জন্যে না দাঁড়ান। এ সবই তাদের প্রতি আল্লাহর আযাবের নিদর্শন।

এ পর্যায়ে একটি প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে যে, মোনাফেক ও কাফেররা ধন-সম্পদে সমৃদ্ধ। এতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ পাকের নেয়ামত তারা ভোগ করছে। এ প্রশ্নেরই জবাব আলোচ্য আয়াতে দেয়া হয়েছে। মোনাফেকদের অর্থ-সম্পদ দেখে কেউ যেন বিস্মিত না হয়, কেননা, আল্লাহ পাক তাদেরকে ধন-সম্পদ নেয়ামত হিসিবে দান করেননি; বরং আল্লাহ পাক তাদেরকে এর দ্বারা দুনিয়াতে শাস্তি দিতে চান আর আখেরাতের শাস্তিতো অবধারিত রয়েছেই।

এখানে এ কথা প্রনিধাণযোগ্য যে, ধন–সম্পদ যদি আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের উপকরণে পরিণত হয় তবে তা আল্লাহ পাকের নেয়ামত। পক্ষান্তরে, ধন–সম্পদ যদি আল্লাহর নাফরমানী এবং পাপাচারের কারণ ও উপকরণ হয় তবে তা আযাব এবং বিপদ। কেননা, ধন–সম্পদের কারণে মানুষ ক্ষেত্র বিশেষে অধিকতর অন্যায় অনাচারে লিপ্ত হয়। তাই ঐ ধন–সম্পদ তাদের জন্যে অবশেষে মহা বিপদের কারণ হয়, আর এ অবস্থাই হয়েছিল মদীনার মোনাফেকদের ব্যাপারে।

এজন্যেই পরবর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

وَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ

পবিত্র কোরআনের কোন সূরা যখন নাজিল হত এই মর্মে যে তোমরা একাগ্রচিত্তে আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনায়ন কর এবং আল্লাহর রসূলের সংগী হয়ে দুশমনের বিরুদ্ধে জেহাদে অংশ গ্রহণ কর তখন মোনাফেকরা আত্মরক্ষার চেষ্টা করতো, নানা প্রকার টাল বাহানা করে জেহাদ থেকে বিরত থাকার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করতো, এরা সে সব লোক যারা ছিল সম্পদশালী, তাদের অর্থ–সম্পদই তাদের জন্য অনর্থের কারণ হয়েছে! দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে তারা এর শাস্তি ভোগ করে। অতএব, এই মোনাফেক বা কাফেরদেরকে যে সম্পদ দেয়া হয়েছে তা দেখে বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ নেই। কেননা এ ধন–সম্পদ রহমত নয় বরং গজব হিসেবেই তাদেরকে দেয়া হয়েছে।

এখানে একথা উল্লেখ্য যে, আলোচ্য সূরার ৫৫ নং আয়াতেও অনুরূপ কথার উল্লেখ রয়েছে। আয়াতটি হল এই–

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَٰلُهُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا
فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَٰفِرُونَ

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা কয়েছে।[১]

তফসীরকারগণ বলেছেন, বিষয়টি অতিব গুরুত্বপূর্ণ বলে বিশেষভাবে তাগীদ করার লক্ষ্যেই এ বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত পবিত্র কোরআনে একই ঘটনাকে বার বার পেশ করার কারণ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে।[২]

رَضُوا۟ بِأَن يَكُونُوا۟ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ

১। এই খন্ডের ২৯৭–২৯৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

২। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন, খন্ড–১, পৃষ্ঠা–৭১–৭৩

অর্থাৎ সম্পদশালী মোনাফেকরা জেহাদে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রয়েছে এবং অন্তঃপুরবাসিনী তথা মহিলাদের সাথে ঘরে বসে থাকাই পছন্দ করেছে।

وَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ

অর্থ–সম্পদের মোহে অন্ধ থাকার কারণে তাদের অন্তরকে মোহর করে দেয়া হয়েছে তাই ভাল কাজের কল্যাণ এবং মন্দ কাজের অকল্যাণ তারা উপলব্ধি করতে পারেনা। এরশাদ হয়েছেঃ

فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ

এ জন্যই তারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণে এবং জেহাদে অংশগ্রহণে যে উপকার ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে এবং তাঁর বিরোধীতায় ও জেহাদ থেকে বিরত থাকায় যে অপকার ও অকল্যাণ রয়েছে তা তারা বুঝতে পারেনা।

لٰكِنِ الرَّسُوْلُ

কিন্তু হযরত রসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সংগে যে মোমেনগণ ছিলেন তারা তাদের সম্পদ এবং জীবন দিয়ে আল্লাহর রাহে জেহাদ করেছেন, অর্থাৎ যদিও এই মোনাফেকরা জেহাদের ব্যাপারে কোন সহাযোগিতা করেনি; বরং বিরোধীতা করেছে কিন্তু তারা ইসলামের কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করতে পারেনি কেননা তাদের চেয়ে উত্তম লোকেরা জেহাদ করেছে।

وَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ

অর্থাৎ তাদের জন্যই রয়েছে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের কল্যাণ সমূহ।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেনঃ الْخَيْرٰتُ শব্দটির ব্যাখ্যা হল জান্নাতের হুরগণ। কেননা পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فِيْهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)–এর কথার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে তিনি বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে خَيْرٰت শব্দটির প্রকৃত ব্যাখ্যা আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ জানেনা, কেননা আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِىَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ

আল্লাহ পাক জান্নাতবাসীদের নয়ন মনের তৃপ্তির জন্যে কি কি নেয়ামত গোপন করে রেখেছেন তা কেউ জানেনা।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রঃ)–এর এ কথার তাৎপর্য হলো এই যে, خير "খায়র" শব্দটির মধ্যে যাবতীয় কল্যাণ ও সর্ব প্রকার উপকার অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। যেহেতু আল্লাহ পাকের সমস্ত নেয়ামত সম্পর্কে কেউ সম্পূর্ণ অবগত নয়, তাই "খায়র" শব্দটির অর্থ আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ জানেনা।[১]

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

আর তারাই হবে সফলকাম।

হাকীমুল উম্মত মওলানা থানবী (রঃ) বলেছেন আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক

(لَٰكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ)

আল্লাহর রসূলের সঙ্গে মোমেনদের উল্লেখ করে তাদেরকে সম্মানিত করেছেন এবং তাদের এখলাস বা আন্তরিকতা যে পরিপূর্ণ এ কথার স্বীকৃতি দিয়েছেন।[২]

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ...

যারা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গী হয়ে ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে প্রাণপন যুদ্ধ করে তাদের জন্য আল্লাহ পাক এমন জান্নাত সমূহ তৈরী করে রেখেছেন যার তলদেশে নহর প্রবাহিত হয়। আর এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ সাফল্য।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড–৫, পৃষ্ঠা–৩৭৯
তফসীরে কবীর, খন্ড–১৬, পৃষ্ঠা–১৫৭

তফসীরে বয়ানুল কোরআন, পৃষ্ঠা–৪১২

وَجَآءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ
الَّذِيْنَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ
عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۹۰﴾ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى وَلَا
عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَ
رَسُوْلِهٖ ؕ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۹۱﴾ وَّلَا
عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَآ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ اَجِدُ مَآ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ
تَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ ﴿۹۲﴾
اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ وَهُمْ اَغْنِيَآءُ ۚ رَضُوْا بِاَنْ
يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ ۙ وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۹۳﴾

তরজমা

(৯০) আর মরুবাসীদের মধ্যে কিছু লোক ওজর আপত্তি পেশ করে জেহাদ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্যে হাজির হলো, আর যারা আল্লাহ পাককে এবং তাঁর রসূলকে মিথ্যা কথা বলেছিল তারা বসে রইল। তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে অচিরেই তাদের শাস্তি হবে অত্যন্ত মর্মান্তিক।

(৯১) যারা দুর্বল, যারা অসুস্থ এবং যাদের নিকট ব্যয় করার মত কিছুই নেই তাদের কোন দোষ নেই যদি আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের সঙ্গে তাদের মন পরিচ্ছন্ন থাকে। যারা নেককার তাদের প্রতি অভিযোগের কোন পথই নেই। আর আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

(৯২) আর সে সব লোকেরও কোন অপরাধ নেই যারা (হে রসূল!) আপনার নিকট যান বাহনের জন্যে হাজির হলে আপনি বলেছিলেন আমার কাছে এমন কিছুই নেই যার উপর তোমাদেরকে আরোহন করাতে পারি। তাই তারা অর্থ ব্যয়ে অসামর্থ হওয়ায় দুঃখে অশ্রু বিগলিত নেত্রে ফিরে গেল।

(৯৩) মূলতঃ অভিযোগের পথ তাদের প্রতি, যারা সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও জেহাদ থেকে অব্যাহতি চায়, পেছনে পড়ে থাকা অবলাদের সঙ্গে বসে থাকাতেই তারা খুশি, আর আল্লাহ পাক তাদের অন্তরকে মোহর করে দিয়ছেন, তাই তারা জানতে পারে না।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে মদীনা শহরের মোনাফেকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে গ্রাম্য এলাকার মোনাফেকদের অবস্থার বিবরণ স্থান পেয়েছে।[১]

প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা মরীফ থেকে মদীনা শরীফ হিজরত করলেন, তখন যারা ইসলামের বিরোধিতা করতে সাহস পেলোনা, তারা প্রকাশ্যে ইসলামের দাবীদার হ'ল কিন্তু গোপনে ইসলামের দুশমনই রয়ে গেল। এরাই মোনাফেক। এদের নেতা ছিল আবদুল্লাহ এবেন উবাই এবনে সলুল। মদীনা শহরে যেমন খাঁটি মুসলমানগণ বাস করতেন, তাঁদের সঙ্গে এ মোনাফেকরাও থাকত, ঠিক তেমনিভাবে গ্রাম্য এলাকায় যেখানে বেদুঈনরা বাস করত, সেখানেও খাঁটি মুসলমানদের পাশাপাশি মোনাফেকরাও থাকত। আলোচ্য আয়াতে তাদের কথাই এরশাদ হয়েছে। তারা অভাব-অনটনের ওজর আপত্তি পেশ করে বলেছে যে, আমরা অত্যন্ত অভাবগ্রস্থ, আমাদেরকে জেহাদে অংশ গ্রহণ না করার অনুমতি দিন।

মোহাম্মদ এবনে ওমর বর্ণনা করেন, কিছু মোনাফেক হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে জেহাদ থেকে অব্যাহিত লাভের আবেদন করে, অথচ তাদের কোন ওজর ছিলনা, তিনি তাদেরকে অনুমতি দান করেন।

এবনে মরদবীয়া হযরত যাবের এবনে আবদুল্লাহর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জেহাদের জন্যে আহবান করলেন, তখন এবনে কায়েস নামক এক ব্যক্তি জেহাদে না যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে। তিনি তাকে অনুমতি দান করেন। এরপর আরো কিছু মোনাফেক আসে, তিনি তাদেরকেও অনুমতি দান করেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

এবনে এসহাক লিখেছেনঃ এরা ছিল বণী গাফফার গোত্রের লোক। এদের সংখ্যা দশের কম ছিল।

যাহ্যাক (রঃ) লিখেছেনঃ যাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, তারা হ'ল আমের এবনে তোফায়েলের সম্প্রদায়। তারা এসে এভাবে আরজ করেছিল,

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-১৫৮
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৯১

ইয়া রসূলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যদি আমরা জেহাদে যেতাম, তবে তাঈ গোত্রের জংলী লোকেরা আমাদের স্ত্রী পুত্র পরিবার এবং জন্তুগুলো লুট করে নিয়ে যেত। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ "আল্লাহ পাক পূর্বাহ্নে আমাকে তোমাদের খবর দিয়েছেন, ভবিষ্যতে তোমাদের আর প্রয়োজন হবেনা, আল্লাহ পাক এ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।"

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ যারা টালবাহানা করে জেহাদে অংশ গ্রহণ না করার অনুমতি প্রার্থনা করেছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন।

وَقَعَدَ الَّذِيْنَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ

যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, সেই মোনাফেকরা মিথ্যা ওজর পেশ করে জেহাদ থেকে বিরত রয়েছে, যারা আল্লাহর রসূলের হুকুমকে প্রত্যাখ্যান করে বিদ্রোহী হয়েছে, তাদের সম্পর্কে পরবর্তী বাক্যে বিশেষ শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

যারা কুফর ও নাফরমানীর কারণে জেহাদে শরীক হয়নি, তাদের নিকট যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পৌছবে।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ যারা নিতান্ত গাফলতের কারণে জেহাদ থেকে বিরত রয়েছে, তাদের জন্যে শাস্তির ঘোষণা নয়; বরং যারা কুফর ও নাফরমানী এবং ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কারণে জেহাদ থেকে বিরত রয়েছে, তাদের সম্পর্কেই এ শাস্তির ঘোষণা।

এবনে আবি হাতেম লিখেছেন, হযরত জায়েদ এবনে সাবেত (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের লেখক ছিলাম আর সূরায়ে বারাত লিখছিলাম, কলমকে আমার কানের উপর রেখেছিলাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ওহীর অপেক্ষা করছিলেন। এমন সময় একজন অন্ধ লোক এসে আরজ করে, ইয়া রসূলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমি অন্ধ, আমার সম্পর্কে কি আদেশ, ঠিক তখনই নাজিল হ'ল–

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاۤءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى

যারা দুর্বল, অসুস্থ এবং যাদের নিকট ব্যয় করার মত কিছু নেই তাদের কোন দোষ নেই, যদি আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূলের সঙ্গে মন পরিচ্ছন্ন থাকে। পূর্ববর্তী আয়াতে যারা জেহাদের ব্যাপারে মিথ্যা ওজর আপত্তি পেশ করে অব্যাহতি চেয়েছে তাদের কথা ছিল, আর এ আয়াতে যারা সত্যিই অপারগ, অক্ষম তাদের কথা

এরশাদ হয়েছে। শারীরিক বা আর্থিক অসুবিধার কারণে যুদ্ধে অংশ গ্রহণে যারা অপারগ, তাদের গুণাহ হবেনা বলে আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) ضعفاء শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ তারা হ'ল পঙ্গু, বৃদ্ধ, দুর্বল এবং অসহায়।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হ'ল শিশু। আর কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হ'ল মহিলা। এমনিভাবে, যারা অন্ধ তারাও এর অন্তর্ভূক্ত। এসব লোক জেহাদে শরীক না হলে কোন গুণাহ নেই। তবে শর্ত হল আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস এবং আনুগত্য থাকতে হবে এবং রসনা ও আমলের মাধ্যমে যথা সম্ভব ইসলাম এবং মুসলমানদের কল্যাণ সাধন করবে।

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

আর আল্লাহ পাক অতীব দয়াবান অর্থাৎ আল্লাহ পাক যেহেতু অত্যন্ত দয়াবান তাই এ দুর্বল, অসুস্থ ও অসহায় লোকদেরকে তিনি ক্ষমা করবেন। অথবা এর অর্থ হ'ল আল্লাহ পাকতো গুণাহগারদেরকেও মাফ করবেন, আর এরাতো নেককার অতএব তাদেরকেতো অবশ্যই মাফ করবেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ কাতাদা (রঃ) বলেছেন যে, এ আয়াত নাজিল হয়েছে হযরত আবেদ এবনে আমর এবং তাঁর সাথীদের সম্পর্কে।

যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে হযরত আবদুল্লাহ এবনে উম্মে মাকতুম সম্পর্কে কেননা, তিনি অন্ধ ছিলেন।

ইমাম বোখারী (রঃ) হযরত আনাস (রঃ)–এর বর্ণনা এবং এবনে সাদ হযরত জাবের (রাঃ)–এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তন কালে যখন মদীনা শরীফের নিকটবর্তী হলেন, তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ কিছু লোক এমন রয়েছেন যারা তোমরা যে পথেই চলেছো বা যে মরুভূমি অতিক্রম করেছ, তারা তোমাদের সঙ্গেই ছিল, অর্থাৎ এ অভিযানে সর্বক্ষণ তোমাদের সঙ্গেই ছিল। যদিও তোমরা তাদেরকে দেখতে পারনি কেননা, তারা মদীনা শরীফ থেকে বের হয়নি। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! তারা তো মদীনা শরীফেই ছিল, (অর্থাৎ তাহলে তারা আমাদের সঙ্গে কি করে রইলো)। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ হ্যা তারা মদীনাতেই ছিল, কিন্তু তাদের ওজর তথা অসুবিধে তাদেরকে এ অভিযান থেকে বিরত রেখেছে।

وَّلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَآ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ اَجِدُ مَآ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ

এবং তাদেরও কোন দোষ নেই, যারা (হে রসূল!) আপনার নিকট যানবাহনের জন্যে এসেছিল, আর আপনি তাদেরকে বলেছিলেন, আমার কাছে এমন কিছুই নেই,

যার উপর তোমাদেরকে আরোহন করাতে পারি। তারা ক্রন্দনরত অবস্থায় ব্যথিত ও মর্মাহত হয়ে ফিরে যায় এ দুঃখে যে, তাদের কাছে ব্যয় করার মত কিছুই নেই।

জেহাদে অংশগ্রহণ করতে না পেরে সাহাবায়ে কেরামের ক্রন্দন

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, কিছু লোক তাবুক অভিযানে অংশ গ্রহনের আকাংখায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আরজী পেশ করে বলেছিলেন, আমাদের জন্যে কিছু যানবাহনের ব্যবস্থা করে দিন। যখন তাদেরকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জানিয়ে দিলেন যে, যান বাহনের কোন ব্যবস্থা আপাতত সম্ভব নয় তখন তারা অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্মাহত হলেন। এমনকি, তাদের নয়ন যুগল থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। তারা অবশেষে এ কথাও বলেছিলেন, আমাদের জন্যে জুতা মোজার ব্যবস্থা করে দিন যেন আমরা আপনাদের পাশাপাশি পদব্রজে দ্রুত বেগে অগ্রসর হতে পারি। অবশেষে কোন ব্যবস্থা না হওয়ার কারণে তারা ক্রন্দনরত অবস্থায় ব্যথিত হৃদয়ে ফিরে গেলেন।

এবনে জরীর এবং এবনে মরদবীয়া হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) সূত্রে বর্ণনা করেছেন; সাহাবায়ে কেরামের এক দল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে যানবাহনের আবেদন পেশ করলেন। এ সাহাবীগণ অত্যন্ত অভাবগ্রস্থ ছিলেন। কিন্তু হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গী হওয়ার গৌরব থেকে বঞ্চিত হতে ইচ্ছুক ছিলেননা। তখন তারা ক্রন্দনরত অবস্থায় ব্যথিত হয়ে ফেরত গেলেন এজন্যে যে, ব্যয় করার মত তাদের কাছে কিছুই ছিলনা।

এবনে এছহাক ইউনুস এবং এবনে ওমরের সূত্রে লিখেছেন, আলীয়া এবনে জায়েদ যখন কোন যানবাহনের ব্যবস্থা করতে পারলেননা এবং হুজুর (দঃ)-এর নিকটও কোন ব্যবস্থা ছিলনা তখন তিনি রাত্রে অনেকক্ষণ পর্যন্ত নামাজ আদায় করলেন এবং ক্রন্দন করতে লাগলেন। এরপর এ দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! তুমি জেহাদের আদেশ দিয়েছ এবং এজন্য অনুপ্রানিত করেছ, অথচ আমার নিকট কোন যানবাহন নেই। এখন আমি আমার যা কিছু রয়েছে সবই মুসলমানদের জন্যে সদকাহ করব, সে হক্বের জন্যে যা আমার উপর বর্তায় আর এ দায়িত্ব পালনে আমার সম্পদ অথবা দেহ অথবা সম্মান সবই ব্যয় করবো। যখন সকাল হলো, তখন অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে আলীয়াও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, আজ রাতে সদকাহ দানের অঙ্গীকারকারী কোথায়? সমস্ত লোক নীরব ছিলেন, এমন সময় আলীয়া দাণ্ডায়মান হয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তাঁর কথা জানিয়ে দিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তোমার জন্যে

সুসংবাদ, শপথ সে আল্লাহ পাকের যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রান, তোমার সদকাহ কবুল হয়েছে এবং যাকাত হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

এবনে এছহাক্ এবং মোহাম্মদ এবনে ওমর বর্ণনা করেন, যান বাহনের ব্যবস্থা না হওয়ায় কয়েকজন সাহাবী ক্রন্দনরত অবস্থায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবার থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তাদের মধ্যে আবু ইয়ালা এবং আবদুল্লাহ এবনে মোগাফফালও ছিলেন। পথে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল ইয়ামিন এবনে আমর নাজারীর সঙ্গে। তাদেরকে ক্রন্দনরত দেখে তিনি এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তারা বললেন, আমরা যানবাহনের অভাবে তাবুকের জেহাদে শরীক হতে পারছিনা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়েছিলাম, তাঁর নিকটও কোন যানবাহনের ব্যবস্থা নেই, এ অভিযানে তাঁর সঙ্গী না হতে পারা আমাদের জন্যে অসহনীয়। ইয়ামিন তাঁদের ক্রন্দনের কারণ জানতে পেরে তাঁদেরকে একটি উষ্ট্র এবং প্রত্যেককে আট সের করে খেজুর দিলেন। মোহাম্মদ এবনে আমর বর্ণনা করেনঃ হযরত আব্বাস (রাঃ) দু' ব্যক্তির জন্যে যানবাহনের ব্যবস্থা করেন এবং হযরত ওসমান (রাঃ) আরও তিন জনের জন্যে যানবাহনের ব্যবস্থা করেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ যাদের জন্যে যানবাহনের ব্যবস্থা হয়নি তাদের সংখ্যা ছিল ষোল। তাদের কয়েক জনের এভাবে ব্যবস্থা হয় যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অবশেষে শুধু সাত জন এমন রয়েছেন যারা জেহাদে যাওয়ার জন্যে ব্যাকুল ছিলেন। তাদের সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

وَّلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَآ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ

অর্থাৎ তাদের দোষ নেই, যারা আপনার নিকট যানবাহনের জন্যে হাজির হলে আপনি বলেছিলেন, আমার কাছে এমন কিছুই নেই, যার উপর আমি তোমাদেরকে আরোহন করাতে পারি।

এ ঘটনা দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়ে সাহাবায়ে কেরামের হৃদয়মন আল্লাহ পাকের প্রেমে মুগ্ধ, মত্ত হয়েছিল, আল্লাহ পাকের নামে তারা জীবন ও জীবনের যথাসর্বস্ব কোরবান করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। তাবুকের যুদ্ধের ঘটনাই এ কথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাবুকের পথ অত্যন্ত দুর্গম, সুদীর্ঘ, দারুন দরম, আর পাথেয় বলতে কিছুই ছিলনা। এতদসত্ত্বেও সাহাবায়ে কেরাম প্রাণ উৎসর্গ করে জেহাদের জন্যে রওয়ানা হয়েছেন। যারা সম্পদশালী ছিলেন, তারা তাদের যথাসর্বস্ব আল্লাহর রাহে দান করেছেন। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আহবানে সাড়া দিয়ে সিরিয়া এবং রোমান সাম্রাজ্যের লক্ষ লক্ষ দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে জেহাদে অংশ গ্রহণ করেছেন। আর যারা জেহাদে অংশ গ্রহণের সৌভাগ্য থেকে কোন কারণে

মাহরুম হয়েছেন, তারা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছেন। এটিইতো আল্লাহ পাকের প্রতি প্রেমের অদম্য প্রেরণার জীবন্ত নিদর্শন। আর এঁদের সম্পর্কেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মন্তব্য করেছিলেন যে, তারা মদীনায় থেকেও সর্বক্ষণ তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন। আর আল্লাহ পাক তাদের সম্পর্কে ঘোষণা করেছেনঃ জেহাদে অংশ গ্রহণ না করায় তাদের কোন দোষ নেই।

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ

অর্থাৎ অভিযোগের পথ তাদের প্রতিই, যারা সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও জেহাদে না যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে পেছনে পড়ে থাকা অবলাদের সঙ্গে থেকেই খুশী থাকে।

অর্থাৎ যাদের শক্তি সামর্থ্য ছিল, জেহাদে অংশ গ্রহণের পথে কোন বাধা ছিলনা। তারা আল্লাহর রসূলের দরবারে এসে জেহাদ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্যে আবেদন করে, তারা অসহায়, পঙ্গু বা শিশু ও অবলা নারীদের সঙ্গে ঘরে বসে থাকা পছন্দ করেছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আহবানে সাড়া না দিয়ে আল্লাহ পাকের আদেশ অমান্য করে তারা গুরুতর অপরাধ করেছে।

মূলতঃ মানুষ যখন অনবরত পাপকার্যে লিপ্ত থাকে তখন ভাল মন্দের বিচার শক্তি সে হারিয়ে ফেলে। তার মনে পাপাচারের কারণে কালো দাগ পড়ে যায়। সত্যের আলো গ্রহণের যোগ্যতা সে হারিয়ে ফেলে। তার পাপাচারকে সে গৌরবের বিষয় মনে করে। পাপাচারের কারণে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়ারতো প্রশ্নই ওঠেনা; বরং অপরাধ করে সে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। মানব মনের এই অবস্থাকে মোহর করা বলা হয়। পবিত্র কোরআন এ অবস্থাকে এক বাক্যে প্রকাশ করেছে–

وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

আল্লাহ পাক তাদের অন্তরকে মোহর করে দিয়েছেন, তাই তাদের কৃতকর্মের পরিণাম তারা বুঝতে পারেনা।

আলহামদুলিল্লাহ! অদ্য ২০ শাবান ১৪১১হি , ২৩শে ফাল্গুন ১৩৯৭ মোতাবেক ৮ই মার্চ ১৯৯১ রোজ শুক্রবার রাত ৯–৩০ মিঃ তফসীরে নূরুল কোরআনের দশম খন্ডের রচনা সমাপ্ত হ'ল।

আল্লাহ পাকের দরবারে অগনিত শোকর যে তিনি পবিত্র কোরআনের এক তৃতীয়াংশের তফসীরের তৌফিক দান করেছেন। হে আল্লাহ! হে দয়াময়! তোমার বিশেষ রহমতে এ খেদমতকে কবুল কর, আর এ তফসীরকে সম্পূর্ণ করার তৌফিক দান কর। আমীন।

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين